ঐতিহাসিক চিত্র।

(ঐতিহাসিক মাসিক পত্র)

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল,

সম্পাদিত।

১৩১৭

কলিকাতা

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক।

ঐতিহাসিক চিত্র

বিক্রমপুর মূলচর গ্রামে প্রাপ্ত—সূর্য্যমূর্ত্তি।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

অশোকচল্লদেবের নাম লইয়াও একটু গোল আছে। প্রথম ও তৃতীয় শিলালিপিতে 'অশোকচল্ল' এইরূপ বানান সুস্পষ্ট আছে, কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ শিলালিপিতে 'অশোকবল্ল' এইরূপ লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই নামটিকে প্রথমেই 'অশোকচল্ল' বলিয়া স্থির করেন। (৯) কানিংহাম ইহার দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ করেন। (১০) আমরা 'অশোকচল্ল' পাঠই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কারণ প্রথম ও তৃতীয় লিপি দুইখানি অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে যত্নসহকারে খোদিত এবং ইহাতে ভুল নাই বলিলেই হয়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ লিপি দুখানি অতি অযত্নে খোদিত এবং ভুলে পরিপূর্ণ, তদুপরি এই উভয় লিপিতে 'ব' ও 'চ' এই দুই বর্ণের পার্থক্য বিশেষ স্পষ্ট করিয়া রক্ষিত হয় নাই। এরূপ স্থলে পরিষ্কার ও সযত্নখোদিত লিপির পাঠ অনুসরণ করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

এই লিপিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিপিতে যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। উহাতে যে 'অতীত' পদের উল্লেখ আছে, তাহা কোনও বিশেষার্থবোধক এবং বহু পণ্ডিত বহুভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উনিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ কীলহর্ণ্‌ যখন লক্ষ্মণ সংবৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তখন তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন (১১) সেই সময়েই ঐ প্রবন্ধেই তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে লক্ষ্মণসংবতের সৃষ্টিকাল ১০৪১ শকাব্দের সহিত সমান, ১০২৮ শকাব্দের সহিত নহে। ত্রিহুতের আধুনিক পঞ্জিকাগুলির উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বোক্ত ধারণা (১০২৮ শকাব্দ) অবধারিত হইয়াছিল এই পঞ্জিকাগুলি ভুল। ডাঃ গ্রিয়ারসন শিবসিংহের যে তাম্রশাসন

৯। Ind. Ant. Vol. X. p. 342.
১০। Mahabodhi, p. 78.
১১। Ind. Ant. Vol. XIX, p. I.

প্রকাশ করেন সেখানি যে জাল, তাহাও নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হই গিয়াছে। (১২) 'অতীত,' 'গত' বা তদ্বৎ অন্যান্য শব্দ সকলের রাজ কালাঙ্কের সহিত ব্যবহার অতি বিরল। ডাঃ কীলহর্ণের উত্তরভারতীয় খোদিতলিপির তালিকায় কেবল একটি মাত্র উদাহরণ আছে, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা অন্যভাবে করা হইয়াছে। (১৩) এই বিষয়ে ডাঃ কীলহর্ণের মন্তব্যের অনুবাদ এই স্থলে প্রদত্ত হইল,—

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে তাঁহার রাজ্যকালের বৎসর উল্লেখ করিতে হইলে 'শ্রীমল্লক্ষ্মণদেবপাদানাং রাজ্যে' বা 'প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে' সংবৎ —এইরূপে বর্ণিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐরূপ বর্ণনাই থাকে কিন্তু 'রাজ্যে' পদের পূর্ব্বে "অতীত" প্রভৃতি পদ থাকিলে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে,—লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ কাল হইতেই এপর্য্যন্ত বৎসর গণনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে রাজ্যকাল প্রকৃত প্রস্তাবে অতীত হইয়া গিয়াছে। (১৪)

তৃতীয় শিলালিপির শেষ পংক্তি ডাঃ কীলহর্ণ যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের অনুবাদ অপেক্ষা সরল ও বিশদ হইয়াছে। 'অতীতে' পদ দ্বারা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে কোন ক্লেশ পাইতেই হয় না। তিনি আরও বলেন,—মিঃ ব্লকম্যান ১১৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার

১২। Proc : A. S. B. 1895. p. 144, pt. III.

১৩। Ep. Ind. Vol. V. App. No 166.

১৪। During the reign of Lakshmansena the years of his reign would be described as "*Srimallakshmana-devapadanain rajye* (or *Prabardhamana-vijayarajye*) *samvat*;" after his death the phrase would be retained but *atita* prefixed to the word *rajye* to show that, although the years were still counted from the commencement of the reign of Lakshmanasena that reign itself was a thing of the past."—Ind. Ant. Vol. XIX, p. 2, note 3.

কর্ত্তৃক বাঙ্গলা জয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি এসম্বন্ধে যখন বলেন "শেষ হিন্দুরাজা লখ্‌মণিয়া (Lakhmaniya) ৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করিতেছিলেন"—ইহা দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বুঝা যায় না যে, যখন এই ঘটনা ঘটে তখন লক্ষ্মণসংবতের ৮০ অব্দ চলিতেছিল,—শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানাম্ অতীতরাজ্যে সংবৎ ৮০ হ্" (১৫) অবশেষে ডাঃ কীলহর্ণ্ এই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "সেনরাজগণের সময়-নিরূপণ" নামক প্রবন্ধে বল্লালসেনের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ দানসাগরের কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে বল্লালসেন ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। (১৬) অল্পদিন পরেই পণ্ডিত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সংস্কৃত পুথি অনুসন্ধানের ষষ্ঠ খণ্ড বিবরণ প্রকাশ করেন। এই বিবরণে বল্লালসেনের রচিত 'অদ্ভুত সাগর' নামে আর একখানি গ্রন্থের একটি দীর্ঘ বিবরণ ছিল। (১৭) ইহাতে ডাঃ ভাণ্ডার কর যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তদনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে বল্লালসেন এই গ্রন্থ ১০৯০শকে বা ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করেন। নগেন্দ্রবাবুর কথিত দানসাগরের বৃত্তান্ত ইহাদ্বারা সমর্থিত হইলে ডাঃ কীলহর্ণ্ এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তন করেন। তাঁর মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণগুলি এই,—

১। বঙ্গরাজ বল্লালসেন রচিত 'দানসাগর' গ্রন্থের দুইখানি পুথিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে,—

"নিখিলচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লালসেন পূর্ণে।
শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরোরচিতঃ॥"

১৫। Ind. Ant. Vol. XIX., p. 7.

১৬। J. A. S. B. 1896, pt. I, p, 23.

১৭। Report on the Search for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency, during the years 1889—91, p. LXXXII.

এই পুথি দুইখানির একখানি ইণ্ডিয়া আফিসে সংগৃহীত হইয়াছে। এখানিতে এই সময়নিরূপক শ্লোকে উল্লিখিত বর্ষ-সংখ্যা সংখ্যাদ্বারাও লিখিত আছে। (১৮) অপর পুথিখানি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ পুস্তকালয়ে আছে। এইখানিতে আরও দুইটি শ্লোক আছে, তদ্দ্বারা সময়প্রকাশ আরও বিশদরূপে হইয়াছে।

"রবিভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্যাস্য।
ক্রমশোঽত্র সম্পরিদাক্ষপাস্যা বৎসরাঃ পঞ্চ ॥
তদেবমেকনবত্যধিক বর্ষ সহস্রারেঽষ্টিতে শাকে।
সম্বৎসরাঃ পতাস্ত বিশ্বপদারম্ভা চ ॥" (১৯)

২। বল্লালসেনের রচিত অপর একখানি গ্রন্থ "অদ্ভুতসাগর" সম্প্রতি বোম্বাই গভর্ণমেণ্টে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে,—

'খনবখেন্দ্বব্দে আরেভে অদ্ভুতসাগরম্।
গৌড়েন্দ্র কুঞ্জরালানস্তম্ভবাহোর্মহীপতেঃ ॥'

এইরূপ বিভিন্ন পুথিতে সময়ের একতা দর্শন করিয়া এক প্রকার নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে হয় যে, বল্লালসেন ১০৯০-৯১ শকাব্দায় (১১৬৮-৯ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং লক্ষ্মণসেন ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের পরে রাজ্যারোহণ করেন; কিন্তু ডাঃ কীলহর্ণ ইতিপূর্ব্বে যে লক্ষ্মণসংবতের আরম্ভকাল ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য হয় না দেখিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু নিম্নলিখিত ঘটনার অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "লঘুভারত অনুসারে বল্লালসেন যখন মিথিলা-যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচা-

১৮। Eggeling's India Office Catalogue, pt. III. p, 545.
১৯। Sashtri's notices of Sanskrit Manuscript, 2nd Series, Vol. I. p. 170.

রিত হয়। এই সময়ে বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়"—এই ঘটনায় বল্লালসেন এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নববিজিত মিথিলারাজ্যে একটি নূতন অব্দ প্রতিষ্ঠাপিত করেন ও উহা 'লক্ষ্মণসংবৎ' নামে অভিহিত করেন।" (২০) এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত এই মাত্র জানা গিয়াছে ডাঃ কীলহর্ণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রমাণগুলির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে এপর্য্যন্ত কেহই অগ্রসর হন নাই।

নগেন্দ্রবাবুর নিজসংগৃহীত দানসাগর পুথিখানি বিশেষ প্রাচীন গ্রন্থ নহে। উহা আধুনিক বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পুথিখানি দেখিয়া শুনিয়া আমাকে বলিয়াছেন, উহা দুই তিন শত বর্ষের প্রাচীন হইবে। ইণ্ডিয়া অফিসের পুথিখানিও ঐরূপ অক্ষরে লিখিত। (২১) সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর পুথি অপেক্ষা বড় বেশী প্রাচীন হইবে না। এসিয়াটিক সোসাইটিতে দানসাগরের যে পুথি আছে, তাহাও আধুনিক বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং প্রায় বিশুদ্ধ। এই পুথিতে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তিনটি শ্লোকের একটিও নাই, অথচ সেনরাজবংশাবলী আছে। (২২) কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর মহারাজের পুস্তকালয়ে আর একখানি দানসাগরের পুথি আছে। এখানি ১৭২৮ শকাব্দার (১৮০৬ খৃষ্টাব্দে) প্রতিলিপি। ইহাতেও উক্ত শ্লোকগুলি নাই। (২৩) এইরূপে একই পুস্তকের প্রায় সমসাময়িক চারিখানি পুথি পাইতেছি, তাহার মধ্যে একখানিতে সময়নিরূপক তিনটি শ্লোক, আর একখানিতে একটি শ্লোক আছে এবং অন্য দুখানিতে কিছুই নাই।

২০। J. A. S. B. 1896, pt. I, p. 23.

২১। Eggeling's India Catalogue, pt. III.

২২। Mss. No II.

২৩। Raja Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanskrit, Mss., 1st Series, Vol. I, p. 151.

এই ব্যাপার লইয়া বিবেচনা করিলে ঐ শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারা যায় এবং তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। সময়নিরূপক প্রথম শ্লোকটিই সর্ব্বপ্রথমে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্য উহা দুইখানি পুঁথিতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু শেষ শ্লোক দুইটি উহারও পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া একখানি ব্যতীত অপর কোন পুথিতে নাই। পণ্ডিত ভাণ্ডারকর যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও ঐ একখানি মাত্র পুথিতে দেখা গিয়াছে। "অদ্ভুতসাগরের" আরও অনেকগুলি পুথি অনেকস্থলে সংগৃহীত আছে, কিন্তু তাহাদের কোনখানিতে ঐ শ্লোক নাই ;—

(১) কাশ্মীরে রঘুনাথমন্দিরে একখানি পুথি আছে। (২৪)

(২) বোম্বাই গভর্মেণ্টের পূর্ব্বে সংগৃহীত আর একখানি খণ্ডিত পুথি (২৫)

(৩) বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি। (২৬)

(৪) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুথি। (২৭)

(৫) ইণ্ডিয়া অফিসের পুথি। (২৮)

ইহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়া অফিসের পুথিখানিতে ঐ শ্লোকটি নিশ্চয়ই নাই কারণ, তাহা হইলে ডাঃ এগেলিন্ তাহা নিশ্চয় উদ্ধৃত করিতেন এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি আমি নিজে দেখিয়াছি, তাহাতে ঐ শ্লোক পাই নাই। অপর পুথিগুলি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অধিকাংশই সামান্য বেতনভুক্ পণ্ডিতগণের অযত্ন-সংগৃহীত বিবরণ মাত্র, সুতরাং উহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না।

২৪। Catalogue of Sanskrit Mss. in Kashmir by M. A. Stain.

২৫। Report of the Search of Sanskrit Mss. in the Bombay Presidency, 1884-86 by R. G. Bhandarkar, p. 84, No. 861.

২৬। Govt. No. 1193.

২৭। Sastri's Notices of Sanskrit Mss. Vol. II.

২৮। India Office Catalogue, pt. III No. 712.

এই সময়নিরূপক শ্লোকগুলি যদিও আধুনিক পুথির প্রক্ষিপ্ত সম্পত্তি, তথাপি যদি স্বীকার করা যায় যে, ঐ গুলি আসল পুথিতে আছে এবং বল্লালসেনেরই রচিত, তথাপি একটা বৃহৎ প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে কোন কথাই স্থির করা যাইতে পারে না। প্রশ্নটি এই,—কোন পুথির অতি নব্য প্রতিলিপির প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন খোদিত লিপির প্রমাণের যাথার্থ্যে সন্দেহ করা উচিত হইবে কি? সাহিত্যিক প্রমাণ যদি প্রকৃষ্টরূপে বিশ্বাস্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? তাহাও খোদিত লিপির প্রামাণিকতার সহিত তুল্যমূল্য বিবেচিত হইলে কোন ক্ষতি নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে যে রামচরিত গ্রন্থের টীকা লেখা হইয়াছে, সে পুস্তকের প্রামাণিকতায় কেহ কখন সন্দেহ করে নাই। অথবা নেপাল হইতে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ-গুলির ভণিতাতেও কেহ অবিশ্বাস করে না; কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর হস্তলিপিকে তদপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের পুরাতন খোদিত লিপির বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপে খাড়া করা সমীচীন হইবে কি? 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই গৌড়াধিপ বল্লাল-সেনের রচিত হইত, তাহা হইলে এতাবৎকালের মধ্যে কত প্রতিলিপি থাকিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন যে, মূলের অশুদ্ধতার জন্য অনেকগুলি শ্লোক বুঝা গেল না। আধুনিক হস্তলিপি-গুলিতে অশুদ্ধতার পরিমাণ এতবেশী যে তজ্জন্য কোন্ অংশ আসল এবং কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত তাহা ধরা বড় কঠিন। এই কারণেও আধুনিক পুথিগুলি প্রমাণস্বরূপ ধরা যায় না। খোদিত লিপিগুলি ঘটনার সম-কালীন দলীল, কাহারও প্রতিলিপি নহে। তাহাদের প্রাচীন অক্ষর-মালাই নিঃসন্দেহে তাহাদের প্রাচীনতার প্রমাণ করিয়া থাকে। এরূপ প্রমাণের বলে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তকে আধুনিক পুথির প্রমাণ বলে অবিশ্বাস

করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। এই কারণে আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ডাঃ কীলহর্ণ্ এত দৃঢ় ভিত্তি থাকিতেও কেন নিজমত পরিবর্ত্তন করিলেন।

ডাঃ কীলহর্ণের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত প্রবন্ধ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ৫১ লক্ষ্মণ সংবতে (১১৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল 'অতীত' হইয়া গিয়াছে। ইহাও সম্ভব যে সে সময়ে তাঁহার মৃত্যুও হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু এসম্বন্ধে যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষতঃ খোদিত লিপির প্রমাণের বিরুদ্ধে যাইতেছে। ১১৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে যে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, তিনি যে ১১৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই পারে না; কারণ তাঁহার প্রস্তুত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে অন্ততঃ দুইখানিও তাঁহার রাজ্যকালের তৃতীয় বৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, লক্ষণসংবৎ তাঁহার রাজ্যারোহণের দিন হইতে গণিত হইতেছে না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কথাটা আবার নূতন করিয়া সম্প্রতি তুলিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন এই অব্দটি পূর্ব্বে সামন্তসেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল পরে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারোহণের সময় হইতে উহা রাজগ্রাহ্য অথবা সর্ব্বত্র প্রচারিত করা হয়, এবং "লক্ষ্মণসেনের অব্দ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। তিনি তাঁহার কথার প্রমাণস্বরূপ অনেকগুলি খোদিত লিপির তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি দুইটি বিষম সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই;—

(১) তিনি যে সকল খোদিত লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই "অতীত" বা তদ্বৎ কোন পদ যুক্ত নাই এবং (২) ভারতবর্ষের অব্দ যতগুলি জানা গিয়াছে, তাহার কোনটিই এক রাজা দ্বারা

প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ার পর তাঁহার পরবর্ত্তী অপর এক রাজা দ্বারা পরিগৃহীত বা স্বনামে অভিহিত হইয়াছে, এরূপ ব্যাপার জানা যায় নাই; অন্ততঃ ইহার স্বপক্ষে কোথাও কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। নগেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত প্রবাদের উপর স্থাপিত। পিতার দ্বারা নবজাত পুত্রের নামে অব্দ প্রচলন করার কথাও কোথাও শুনা যায় না। তিনি এ সম্বন্ধে লঘুভারতের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাও অবিশ্বাস্য।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত বঙ্গজয় বিবরণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা তখনকার বঙ্গ ও বিহারের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মালদহের প্রাচীন একডালা দুর্গ।

মুসলমান পাদশাহের সময়ে, পাণ্ডুয়া যখন বাংলার রাজধানী ছিল, সেই সময়ে আমরা একডালা দুর্গের কথা শুনিতে পাই, তাহার পর গৌড় নগর যখন রাজধানী হইয়াছিল, সেই সময়ে সুলতান হোসেনশাহ একডালায় অবস্থান করিতেন। সে কালে একডালা দুর্ভেদ্য দুরাক্রম্য নদীবেষ্টিত দ্বীপাকার সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের মধ্যে এ প্রকার দুর্ভেদ্য দুর্গ আর দ্বিতীয় ছিল না।

একডালার পরিচয়।

বারনীর তারিখ ফিরোজশাহী গ্রন্থে একডালা পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল বলিয়া বোধ হয়। *তিনি একডালাকে পাণ্ডুয়ার একটি মৌজা বলিয়াছেন। ফিরোজশাহ একডালার নাম "আজাদপুর" রাখেন। রিয়াজ-উস-সালাতিনের বর্ণনায় বোধ হয় একডালা পাণ্ডুয়ার খুব নিকটে ছিল না। কারণ পাণ্ডুয়ার দুর্গে সামসউদ্দীন আপনার পুত্রকে রাখিয়া

প্রাচীন মুসলমান গ্রন্থকারদের মত।

একডালা দুর্গে অবস্থান করেন। ফিরোজশাহ পাণ্ডুয়ার দুর্গ অধিকার করিয়া একডালা দুর্গাভিমুখে ধাবিত হন।

ইংরাজ গ্রন্থকারগণের মত

বিভারিজ সাহেবের মতে একডালা ঢাকা জেলার ভাওয়াল বনের উত্তরে অবস্থিত ছিল। ওয়েষ্টমেকট দিনাজপুরে একডালা ছিল বলেন।

গঙ্গানদীতীরবর্ত্তী প্রদেশে একডালা।

একডালা গঙ্গানদীর পূর্ব্বতীরে চতুর্দ্দিকে নদীবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হয়। গৌড়নগরের পশ্চিম পার্শ্বে যে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন, তাহার তীরে একডালার ন্যায় দুর্ভেদ্য দুর্গের সংস্থান আদৌ সঙ্গত নহে বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের কথা।

একডালা সম্বন্ধে প্রবাদের অভাব।

মালদহের কুত্রাপি একডালা নামক একটি সর্ব্বোত্তম দুর্গের কোন প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায় না। এ দেশের প্রাচীনগণ অনেক যুদ্ধ স্থলের কথা বলিয়া থাকেন, অনেক গ্রাম নগরের কথা বলেন, কিন্তু একডালা নাম তাঁহাদের অজ্ঞাত। সুতরাং আমরা বহু অনুসন্ধানেও একডালার সংস্থান সর্ব্বাদৌ স্থির করিতে পারি নাই।

দৈবাৎ একডালার অনুসন্ধান প্রাপ্ত।

ছয় সাত বৎসর অতীত হইল আমরা বর্ষাকালে নৌকারোহণ পূর্ব্বক গৌড়নগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ ভ্রমণে বহির্গত হই। তখন অধিকাংশ নিম্নভূমি জলমগ্ন হওয়ায় আমাদের জলপথে নৌকারোহণে গমনে কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। ভাতিয়া নামক বিল অতিক্রম পূর্ব্বক কর্ণখালি মিরজাত-পুর নামক স্থানে "বারম্যাসা" নামক খাড়ি দিয়া দক্ষিণমুখে চলিলাম। এই স্থানে গৌড়নগর হইতে একটী উন্নত "আইল" যাহাকে এদেশে

'গড়' বলিয়া থাকে, তাহার কতক উন্নত অংশ উক্ত খাড়ির পশ্চিমে রহিয়াছে, মধ্যে এই খাড়ি এই স্থানে গড়ের কোন চিহ্ন নাই। তৎপরে কর্ণখালি, জামবাড়ী, প্রভৃতি উন্নত ভূভাগের উপর দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে এই গড় চলিয়াছে। দেখিলাম, কোথাও উন্নত কোথাও সমতলভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত, কোথাও অস্পষ্ট. এই ভাবে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই গড়ের একাংশ "ষাঁড়বুরুজ" নামে খ্যাত। আমাদের বিশ্বাস উক্ত "ষাঁড়বুরুজ" গড়ের উপরের একটি সুরক্ষিত দ্বার এবং প্রহরী-বেষ্টিত বুরুজ ছিল। এই প্রকারের 'বুরুজ' এ দেশের গড়ের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা রাজমার্গোপরি ক্ষুদ্র দুর্গ গ্রন্থি বিশেষ বলিয়াই বোধ হয়। ক্রমশঃ এই গড় দক্ষিণমুখে বিস্তারিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। আগড়পুর ও ফতেপুর উন্নতগড়ের উপরিস্থ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিল খাল অতিক্রম করিয়া আমরা দক্ষিণমুখে চলিলাম এবং উত্তর হইতে মহানন্দা তীরস্থ উন্নত রক্ত-মৃত্তিকাময় প্রাচীন পল্লী-সমূহের বক্ষ ভেদ করিয়া এই জাতীয় একটি গড় দক্ষিণ মুখে আসিয়া এই গড়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে আমরা ধোপনারায়ণবিল ও জহরপুরের দাঁড়া অতিক্রম করিয়া বিস্তীর্ণ খুবগভীর খাড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলের মধ্য দিয়া দক্ষিণমুখে চলিলাম। আমরা গৌড় ও পাণ্ডুয়া হইতে আগত গড়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে ঘুরিতে ঘুরিতে যাইতেছি বলিয়া কয়েক দিবস অতীত হইয়া গেল। তৎপরে আমাদের পশ্চিমে শিবগঞ্জ অবগত হইলাম,, বামে মহানন্দা, প্রেমনগর, অতিক্রম করিয়া পুনশ্চ আমরা সেই গড়ের দর্শন লাভ করিলাম। কোথাও পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ, কোথাও সমতল দেখিতে দেখিতে এবং উক্ত গড়ের অনুসন্ধানে চলিলাম। অদূরে মহানন্দার পূর্ব্বতীরে নবাবগঞ্জ। এই স্থানে গড়টি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বলিয়া বোধ হইল। পশ্চিমে জলপূর্ণ

জলপথে নৌকারোহণে ভ্রমণ।

ধোপনারায়ণবিল, জহরপুরের দাঁড়া।

দেয়াড়ভূমি, বিল, খাল এবং অনতিদূরে পদ্মানদী ও তাহার পরিত্যক্ত খাতসমূহ, দক্ষিণে বিল, খাল, পদ্মা এবং পদ্মা হইতে মহানন্দা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সাময়িক জলস্রোত প্রবাহ। পূর্ব্বে মহানন্দা ও বিল. উত্তরে জল ভূমি এই জলময় স্থানের মধ্যে আমাদের সেই গড় একমাত্র বিদ্যমান দেখিলাম; গড়ের এই অংশ কিছু অস্বাভাবিক গোছের চাতরা বলিয়া বোধ হইল, দীর্ঘে আধখান পর্য্যন্ত এই প্রকার চওড়া। ছোট-খাট পাহাড় বলিয়া বোধ হয়। গড়টি জঙ্গলে পূর্ণ, হিজল, বেত প্রভৃতি বনে পূর্ণ রহিয়াছে আমাদের নৌকা সেই বনের ধারে রাখিলাম। সেই স্থানে কয়েক ঘর শেরশাহ চাঁদিয়া মুসলমানগণ নূতন পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে, তখন কোন কোন কুটীর অসম্পূর্ণ রহিয়াছে দেখিলাম। আমরা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায় তাহারা "একডালা" বলিল। আমরা সাধ্যমত গড়ের কতিপয় স্থান ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম। সেই উন্নত ভূখণ্ডে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুষ্করিণী. ইষ্টক-প্রস্তর ইতঃস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় প্রাচীন কালের কোন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। চতুর্দ্দিকে নদী, বিল, খালে বেষ্টিত সুরক্ষিত নগর ব্যতীত উক্ত মৃত্তিকা স্তূপটিকে আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। এখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে,—কিছুই নাই। এই স্থানের অনতি সন্নিকটে "বেতবেড়ে" নামক গড়।

একডালা।

বেতবেড়ে।

আমরা যে আন্দাজি মানচিত্র দিয়াছি, তাহাতে দ্বিপতাকা-শোভিত স্থানটিই আমাদের একডালা। জলপথে বিলের মধ্য দিয়া গৌড়নগরে আসিতে হইলে চারি পাঁচ ঘণ্টায় আসা চলে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিলে একদিবসে অতি কষ্টে পৌছান যায়। গৌড় নগরের দক্ষিণ প্রান্ত, যাহা গৌড়ের উপনগর বলিয়া খ্যাত ছিল, তথা হইতে এই একডালা দুই ঘণ্টার পথ মাত্র, সেকালে শিবগঞ্জ, সাহানবান্দা, বিশ্বনাথপুর, হরিপুর প্রভৃতি

বর্ত্তমান নবাবগঞ্জ হইতে বেশী দূর ছিল না। একডালা গৌড়নগরের দক্ষিণস্থ উপনগর হইতে চার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে হইবে। লোক-মুখে অবগত হওয়া যায় এই একডালার পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত এবং গঙ্গানদী এই একডালার পশ্চিমে এক দিন ছিলেন।

গৌড়নগর রক্ষার্থ দক্ষিণ ভাগের এই প্রধান দুর্গ।

একবার মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন গৌড়নগর রক্ষা করিতে হইলে দক্ষিণে এই দুর্গ নিতান্ত আবশ্যক এবং গঙ্গা, পদ্মা, মহানন্দা ও বিল দ্বারা এই এক-ডালা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত থাকাতে ইহা যথার্থ অজেয় হইয়াছিল। এই প্রকার সুরক্ষিত নদীবেষ্টিত দুর্গ গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় আর ছিল না।

একডালা দুর্গের চিহ্ন লোপ পাইল কেন।

এই সুরক্ষিত দুর্গ ধ্বংস করা দিল্লী পাদশাহী আমলে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। তাহার পর মুর্শিদা-বাদের নবাবি আমলে উক্ত দুর্গ উপাদানসমূহ সহজে মুর্শিদাবাদে নীত হইত বলিয়া জলপথে লইয়া যাওয়াই সম্ভব মুর্শিদাবাদের নবাবি দপ্তরে ইহার হিসাব থাকিতে পারে। কারণ গৌড়নগর হইতে ইষ্টক প্রস্তরাদি লইয়া যাইবার হিসাব থাকার কথা অবগত হই। গৌড় নগর হইতে সুলতান হোসেন শাহ যে এই সুরক্ষিত একডালায় অবস্থান করিতেন তাহা সহজে বুঝিতে পারি। কারণ ইহা গৌড় নগর হইতে অধিক দূর নহে এবং তৎকালে গঙ্গার যে শাখা অমরতীর নিকট দিয়া গৌধরাইল ও ভাতিয়ার বিল দিয়া গৌড়নগরের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইত তাহা উক্ত একডালার পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত ছিল সেই পথে গৌড় হইতে একডালা সমর পোতা-রোহণে হুসেনশাহ গমনাগমন করিতেন। স্থলপথে গতায়াতের জন্যও

হোসেন শাহ ও একডালা।

উন্নত জঙ্গাল বা আইল প্রস্তুতও হইয়াছিল। সুতরাং গৌড় হইতে এই একডালায় গমনাগমন সহজসাধ্য ও নিরাপদ ছিল।

পাণ্ডুয়ার পার্শ্বে একডালা অসম্ভব।

পাণ্ডুয়ার নিকট আদিনা এবং আদিনার সিকি মাইল পূর্ব্বে সাতাইশ ঘরা এবং রাহুটবাঁক নামক সুরক্ষিত ইষ্টক-প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাসাদ, উহা একটি দুর্গ! এই দুর্গের মধ্যে সুলতান সামসউদ্দীন হাজি ইলিযাসের প্রাসাদ ছিল। এই প্রাসাদের মধ্যেই দিল্লীর সামসির অনুকরণে সামস্উদ্দীন সামসি নামক জলাশয় খনন করান। এই কারণে ও অন্যবিধ কারণে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ "সত্তর হাজার খাঁনে মুলক, দুই লক্ষ পদাতিক, আটহাজার অশ্বারোহী ও বহু সংখ্যক হস্তী লইয়া পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন। শামস্ সিরাজ আফিক্ বলিয়াছেন সম্রাট এক হাজার জাহাজ বহর লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং কৌশিকী নদীতে আসিয়াছেন শুনিয়া ইলিয়াশের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। যে কালে কৌশিকী প্রায় পিছনী গঙ্গারামপুরের অনতিপশ্চিমে ছিল। ইলিযাস আপন পুত্র সেকেন্দর শাহের অধীনে পাণ্ডুয়ার দুর্গ রক্ষার ভার দিয়া আপন গন্তব্য পথের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সৈন্য রাখিয়া একডালা দুর্গে পলায়ন করেন।

ইলিযাশের প্রাসাদ সাতাইশ ঘরা ও সামসি রাহুটবাঁক প্রাসাদ প্রাচীর।

কোট বা দুর্গ।

পাণ্ডুয়ার পূর্ব্বে বাদশাহী প্রাসাদের একাংশে কোট (Koat) নামক দুর্গ ছিল। অনেকে সেই কোট দুর্গকে একডালা বলিয়া মনে করেন। পাণ্ডুয়াটি একটি দুর্গের ন্যায় গড় ও পরিখা বেষ্টিত ছিল। রাহুটবাঁক ও সাতাইশ-ঘরা তাহার অন্তর্গত রাজপ্রাসাদ ও বেগমমহল ছিল। কোট রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বাংশ।

সুলতান হোসেন শাহা পাণ্ডুয়ার নিকট একডালায় ছিলেন না।

প্রকৃত পাণ্ডুয়া আদিনা মসজিদ ও সাতাইশঘরা লইয়া ছিল; কারণ উক্ত অংশে রাজপ্রাসাদ ছিল। অধুনা যথায় বড়দরগা (বাইশ হাজারী) ছোট দরগা (সাকাহারী) বর্ত্তমান, সেকালে প্রকৃত নগরের প্রান্তে ছিল। নগরের উপান্তবর্ত্তী স্থানে, হিন্দুগণের দেবালয় ছিল, দেবালয়ের ধ্বংস সাধন করিয়াই "মকদুমশা জলাল উদ্দিন তবরেজি ও নুর কুতব আলম তাঁহাদের মস্‌জেদ ও চিল্লা নির্ম্মাণ করান এবং তথায় তাঁহাদের বংশীয়গণের ও শিক্ষাসেবকগণের সমাধিস্থান। আজকাল সেই স্থানটিকেই প্রকৃত পাণ্ডুয়া মনে করিয়া সাতাইশঘরা নামক রাজপ্রাসাদকে একডালা কল্পনা করা হইয়াছে, বাস্তবিক নগরের মধ্যে একডালা ছিল না। যদি তাহাই সম্ভব হয় তবে সমুদায় পাণ্ডুয়াটি একডালা বলিতে হয়।

প্রকৃত পাণ্ডুয়া।

সুলতান হোসেন একডালায় অবস্থান করিতেন এবং প্রতিবৎসর একবার পদব্রজে পাণ্ডুয়ায় নুর কুতব আলমের সমাধি মন্দির দর্শন করিতে গমন করিতেন বা উক্ত পীরের সহিত দর্শন করিতেন। উক্ত পীর হোসেনের মুরশীদ ছিলেন। মুরশীদের চিল্লা (তপস্যার স্থান) হইতে রাহুটবাঁক এক ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও হইতে পারে। এত সন্নিকটে নিয়ত অবস্থান করিয়াও তাঁহার গুরুদেবকে যে বৎসরে একবার দর্শন করিতে যাইতেন তাহা কি সম্ভব? সেকালেও ছোটদরগার সন্নিকট দিয়া সাতাইশঘরা যাইবার রাজপথ ছিল।

পাণ্ডুয়ার সীমা—অদ্যাপি বালীয়া নবাবগঞ্জের উত্তরে বর্ত্তমান রেলওয়ে লাইনের কিঞ্চিৎ উত্তর পার্শ্বে দিনাজপুর যাইবার রাস্তার বাম ধারে একটি পাথরের ক্ষুদ্র থাম প্রোথিত আছে, উহাকে কালুদেও এর শোঁটা বলে। অদ্যাপি ফকিরগণ ঐ স্থান হইতে হজরৎ পাণ্ডুয়ার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তি করিয়া থাকেন।

কালু দেওএর শোঁটা।

সম্ভবতঃ সুলতান হোসেন নৌকাযোগে উক্ত স্থানে অবতরণ করিয়া হজরৎ পাণ্ডুয়ার সীমানায় পদার্পণপূর্ব্বক ভাক্তভরে পদব্রজে গমন করিয়া থাকিবেন। এই ব্যাপারকেই, হোসেনের একডালা হইতে পাণ্ডুয়ায় পদব্রজে যাইবার কথা প্রচলিত আছে।

এ দেশের একটি প্রবাদ।

কোন এক সময়ে গৌড়ের বাদশাহ দক্ষিণে পলায়ন করেন। দিল্লীর পাদশাহ গৌড় অধিকার করেন, এবং সেলিমপুরের অনতিপূর্ব্ব দক্ষিণস্থ সম্‌সপুর নামক দিল্লীর হিন্দুরাজা ও হিন্দুগণ দিল্লীশ্বরের সাহায্যার্থে গৌড়ের পাদশার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে গৌড়েশ্বর, সম্‌সপুরের হিন্দুদিগকে নির্য্যাতন ও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহেন। দিল্লীর পাদশাহের ভয়ে তাহা পূর্ণ হয় নাই।

এই সমসপুর সেকালে পাণ্ডুয়া হইতে একডালা যাইবার স্থলপথের উপর ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহারা দিল্লীশ্বর ফিরোজ সাহের। ফৌজগণের সাহায্য করিয়া থাকিবেন। সেই সময়ে বাঙ্গালার রাজাগণ ফিরোজ সাহের সাহায্য করিয়াছিলেন। উদয়ন কবিকঙ্কণ, মুরারি প্রভৃতি সপ্ত পুত্র লইয়া তাঁহার সাহায্য করেন। সমাসপুর নাম, হাজী সামসউদ্দীন রাখিয়াছেন বলিয়া খ্যাত আছে। তাঁহার এক গাজী এতদঞ্চলে বড়ই উৎপাত করিতেন, কাফের মারিয়া বেড়াইতেন। দিল্লীশ্বরের আদেশে গাজী "জঙ্গলী পীর" নামে শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। সামসপুরে তাঁহার একটি ভগ্ন মসজেদ আছে।

একডালা চতুষ্টয়।

আমরা উপসংহারে এইমাত্র বলিতে পারি চারিটি একডালার মধ্যে গৌড়ের দাক্ষিণ পূর্ব্বের একডালা হোসেনশাহী বা ইলিয়াসী একডালা দুর্গ। কড়ায় একডালা, রাজসাহীর বাঘমারা থানার নিকট একডালা এবং ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থ সোণার-

গাঁর একডালা অপেক্ষা গৌড়ের একডালা বিখ্যাত ছিল। সেকালে একডালা ও এগার সিন্দুর দুর্গদ্বয় অজেয় ছিল।

শ্রীহরিদাস পালিত।

ভারতে ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন।

ভারতবর্ষে কোন্ সময় হইতে ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অতীতের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মহাত্মা মনুর সংহিতাতেও এইরূপ মুদ্রা ব্যবহারের রীতি দেখা যায়। তৎপূর্ব্বে সম্ভবতঃ কপর্দ্দকই একমাত্র ক্রয়-বিক্রয়-বাণিজ্যে মুদ্রার স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন পুরাণাদিতে ইহার বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই সমস্ত মুদ্রার প্রচলন থাকিলেও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত সাধারণ লোকে শস্য ও গোধনের বিনিময়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করিত। * সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ Vincent A. Smith বলেন খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বহির্বাণিজ্যের আবশ্যকতা অনুভব হইলে জনসাধারণ বিশেষতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ সর্ব্বপ্রথম ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং সেই সময় হইতেই ধাতুর মুদ্রাগুলি নির্দ্দিষ্ট ওজনে নির্ম্মিত ও ক্রমে উহার পৃষ্ঠে নামাদি অঙ্কিত হইতে থাকে। J. Kennedy বলেন, এই সকল মুদ্রা ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত হয় নাই। বণিকগণই ইহার মূল। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল ধাতব মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেগুলির প্রত্যেকটির পরস্পর আকৃতি, গঠন ও ওজনে বিলক্ষণ পার্থক্য ছিল এবং সেগুলির পৃষ্ঠে কোনও প্রকারের লেখা পরিদৃষ্ট হইত না।

* See Imperial Gazetteer of India Vol. II. P. 134.

৭ম খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল মুদ্রা নির্ম্মিত হয়, সেগুলি সাধারণতঃ চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট ছিল। নির্দ্দিষ্ট ওজনের পরিমাণ রক্ষা করিবার জন্য কোন কোন মুদ্রার কোণ হইতে কতকাংশ কাটিয়া ফেলা হইত। এই সকল মুদ্রাতে পূর্ব্ব প্রথানুসারে কোনরূপ লেখা দেখা যাইত না, শুধু ২।১টী গোল চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত। James Kennedy বলেন বেবিলন দেশের অনুকরণে এই চিহ্নগুলি অঙ্কিত হইত। ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র, সে সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ-প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই। *

ভারতবর্ষে তৎকালে উপযুক্ত পরিমাণে রৌপ্য না থাকায় ৮০ ভাগ রৌপ্যের সহিত ২০ বিশভাগ দস্তা মিশ্রিত করিয়া, সেই ধাতু মুদ্রা নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। পরে বহির্বাণিজ্যে ক্রমে বহুপরিমাণ রৌপ্য অর্জ্জিত হইলে, মুদ্রাও বিশুদ্ধ রৌপ্যে নির্ম্মিত হইতে থাকে।

বারাণসীর সন্নিকটে বৈরাণ্ড (Bairant) প্রদেশে কার্লাইল † সাহেব কতকগুলি তাম্র-নির্ম্মিত মুদ্রা প্রাপ্ত হন, সেগুলি ৭ম খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রচলিত মুদ্রা অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিৎ বৃহৎ, সম্ভবতঃ সেগুলি রৌপ্য মুদ্রা অপেক্ষাও বহু প্রাচীন। তাহাতেও উক্ত গোল চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। যদি উক্ত চিহ্নগুলিতে Kennedy সাহেবের অনুমান অনুসারে বাবিলন দেশের অনুকরণের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তবে কে বলিতে পারে, ভারতবর্ষ কোন্ প্রাচীন যুগ হইতে স্থলপথে ঐ সকল প্রদেশে বাণিজ্যের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিতেন?

এই গোল চিহ্নিত মুদ্রাগুলিকে ইংরেজীতে punch marked coin বলে। এই সকল মুদ্রাতে পরিশেষে এই চিহ্নগুলি নানারূপে সজ্জিত দেখা যাইত। এই চিহ্নরূপ কোনটীতে বৃক্ষ কোনটীতে জীবজন্তু বা চন্দ্রসূর্য্য অঙ্কিত করা হইত। Theobald সাহেব বিভিন্ন ছবি সংযুক্ত

* Early commerce of Babylon with India J. R. A. S. 1897 P. 287.
† See Arch S. Rep. XXII. 114 also see J. A. S. B. 1897 Pt. P. 208

প্রায় তিনশত প্রকারের মুদ্রার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন * রৌপ্য মুদ্রাগুলি ওজনে ৩২ রতি (৫৫ গ্রেইণ) হইত।

খৃঃ পূঃ ৩ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে punch marked মুদ্রা ব্যতীত আরো এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল সেগুলি সাধারণতঃ তাম্র বা পিতল দ্বারা নির্ম্মিত হইত। ধাতুর অর্দ্ধগলিত অবস্থায় ঐ সকল মুদ্রাতে ক্ষুদ্র ছাপের সাহায্যে ঐ সমচতুষ্কোণ বা গোলাকার ছিদ্র করা হইত। এই অবস্থা হইতে মুদ্রা ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে থাকে; ক্রমে ইহার একপৃষ্ঠে পরে গ্রীক ও রোমান দেশের অনুকরণে উভয় পৃষ্ঠে লেখা অঙ্কিত হইতে থাকে। পঞ্জাব প্রদেশস্থ তক্ষশীলার মুদ্রিত মুদ্রাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মুদ্রার ক্রমোন্নতির বিষয় সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়।

গ্রীক বীর বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী Alexander ৩২৬ পূঃ খৃঃ হইতে ৩২৫ পূঃ খৃঃ অব্দের Sept মাস পর্য্যন্ত পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে অবস্থান করেন। সে সময় তৎপ্রদেশে ভারতীয় ধাতব মুদ্রায় গ্রীক-পদ্ধতির প্রভাব বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল; এমন কি সৌভূতি নামক জনৈক শাসন কর্ত্তা সে সময় এথেনের অনুকরণে বহু রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত করেন; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে সে পদ্ধতি গৃহীত হয় নাই। আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর ময়ূরবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবের সহিত সে পদ্ধতিও লুপ্ত হইয়া যায়।

৪র্থ খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউক্রেডাইডিস মিলিযেণ্ডার প্রভৃতি স্বাধীন ব্রাক্ট্রিয়ান নরপতিগণ ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহাদের প্রবল অসির নিকট আফগানিস্থান বেলুচিস্থান ও পঞ্জাব প্রদেশ মস্তক অবনত করেন। ব্রাক্ট্রিয়ার রাজবংশের সুযোগ্য যুবকগণ এই সকল প্রদেশে অবস্থান পূর্ব্বক নব-পরাজিত প্রদেশগুলির

* J. A. S. B. 1890 part I, pt. VIII—XI.

শাসন-সংরক্ষণ করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহারা বহু রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। সেগুলি শিল্প ও কারুকার্য্য হিসাবে এক সময়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, ১৫০ খৃঃ পূঃ শতাব্দী পর্য্যন্ত সে সকল মুদ্রার খুব প্রচলন দেখা যায়। কোন কোন বিদেশী অধিপতি ভারতবর্ষীয় রীতি অনুসারে সমচতুষ্কোণ-বিশিষ্ট মুদ্রা অঙ্কিত করেন।

পঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুদ্রা সম্বন্ধে প্রতীচ্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। সে সকল প্রদেশে তখনও তাহাদের চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে বণিকদিগের প্রবর্তিত মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই সে সকল মুদ্রায় তদানীন্তন নরপতি অশোক (২৭২-২৩২ খৃঃ পূ-) বা ময়ূর বংশের অপর কাহারও নামাঙ্কিত দেখা যায় না।

১৮৮ খৃঃ পূঃ হইতে ৭৬ খৃঃ পূঃ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল মুদ্রা উত্তর ভারতবর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল সে সকলে অগ্নিমিত্র ও অন্যান্য কতিপয় নরপতির নাম অঙ্কিত দেখা যায়। কেহ কেহ ঐ সকল মুদ্রাগুলি সঙ্গবংশ প্রবর্ত্তিত বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমানের মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করা একেবারে দুঃসাধ্য। ৯০ হইতে ২২০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতবর্ষে আরো কতকগুলি মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। সেগুলি * অন্ধ্রভৃত্য বা অন্ধ্রবংশ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে এবং সেগুলিতে তদানীন্তনকালের নরপতিগণের নাম খোদিত আছে। এই সকল মুদ্রার প্রচলন সত্ত্বেও বণিকদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার সৃষ্টি ও প্রচলনের তিরোভাব ঘটে নাই। অধুনা এই ইংরেজ রাজত্বের প্রচারকালেও ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে বিহার, গোরখপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ঐরূপ † মুদ্রার প্রচলন দেখিতে

* ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অমরাবতীস্তূপ ইহাদের নির্ম্মিত। বাণিজ্যের জন্য প্রাচ্যদেশে ইহারা যাতায়াত করিত।

† Malcolm Central India II. 84. আমাদের দেশে এই পয়সা গুলিকে ঢেবুয়া বা গোরখপুরী বলে।

পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐগুলি নেপাল প্রদেশে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

খৃঃ ১ম শতাব্দীর শেষভাগে কুশাল নরপতিগণ সমস্ত পঞ্জাব ও আফগানিস্থান অধিকার করিয়া স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করেন। সেই সময় রোমের প্রসিদ্ধ সম্রাট অগষ্টাস ও তাহার পরবর্ত্তী বংশীয়গণ তাহাদের রাজত্ব পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সেই সময় কুশাল নরপতি Kadphises I কতকগুলি তাম্রমুদ্রা প্রচলিত করেন সেগুলিতে অগষ্টাসের অনুকরণে একপৃষ্ঠে রাজার মস্তক অপর পৃষ্ঠে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র Kadphises II (৮৫-১২৫ খৃঃ) সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া রোমানদিগের অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। সে গুলি রোমানদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা অপেক্ষা ওজনে ন্যূন না হইলেও তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর্ণে নির্ম্মিত।

Kadphises II স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত কতকগুলি তাম্রমুদ্রাও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রার এক পৃষ্ঠে হিন্দুদেবতা বৃষারূঢ় শিবের প্রতিমূর্ত্তি ও তৎ সহ প্রাকৃত ভাষায় রাজার নাম ও পরিচয় এবং অপর পৃষ্ঠায় গ্রীক ভাষায় ঐরূপ নাম ধাম লিপিবদ্ধ হইত। Kadphises II প্রবর্ত্তিত তাম্রমুদ্রা এতদূর প্রচলিত হইয়াছিল যে, বারাণসীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এখনও উহা পাওয়া যায়।

১২৫ খৃঃ অব্দে কনিষ্ক Kadphises II স্থান অধিকার করেন। কাবুল ও পেশবার তাহার রাজধানী ছিল। ঐ সকল প্রদেশের খনিজাত স্বর্ণ তাম্রে তিনি বহু মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাগুলি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা Kadphises II এর প্রবর্ত্তিত মুদ্রা অপেক্ষা ওজনে ন্যূন না হইলেও, ইহাদের গঠনপ্রণালী ও কারুকার্য্য তদপেক্ষা বিভিন্ন প্রকারের ছিল। ইহার একপার্শ্বে যজ্ঞানুষ্ঠানরত যজ্ঞ-বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজার প্রতিমর্ত্তি ও অপর পার্শ্বে নানা দেব-দেবী, চন্দ্র,

সূর্য্য ও শাক্য মুনির প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। এবং উভয় পার্শ্বেই গ্রীক ভাষায় রাজার রাজা এই উপাধি খোদিত দেখা যায়।

তৎপুত্র হুভিষ্ক (Huvishka) এর রাজত্বকালে (১৫৩ খৃঃ) যে সকল স্বর্ণমুদ্রা নির্ম্মিত হয় সে গুলির এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাজার প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার শরীরের উপরার্দ্ধ এবং তাম্র বা ব্রঞ্জ মুদ্রাতে হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় রাজার প্রতিমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলি ব্রঞ্জ মুদ্রাতে সিংহাসনে পায়ের উপর পা তুলিয়া বা একখানি পা ঝুলাইয়া রাজা উপবেশন করিয়া আছেন এইরূপ দেখা যায়। সকল মুদ্রা গুলিরই অপর পৃষ্ঠে কনিষ্কের মুদ্রার ন্যায় বহু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৮৫ খৃঃ বাসুদেব হুভিষ্কের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার প্রবর্ত্তিত স্বর্ণমুদ্রার ওজন সেইরূপ থাকিলেও উহার বিশুদ্ধতা আর সেইরূপ ছিল না। প্রতি মুদ্রায় (স্বর্ণের পরিবর্ত্তে) ১০ গ্রেইন অপর ধাতু মিশ্রিত হইত। ইনি মুদ্রার এক পার্শ্বে কনিষ্কের ন্যায় যজ্ঞবেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজার প্রতিমূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে Kadphises II ন্যায় বৃষারূঢ় শিবের মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। এই সকল মুদ্রাতেও পূর্ব্বের ন্যায় গ্রীক অক্ষরে নাম সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।

৩২০ খৃঃ অব্দে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত পাটলী পুত্র নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন, তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ৩৩০ খৃঃ অব্দে সমগ্র দাক্ষিণাত্য এবং তাহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ ক্রমে গুজরাষ্ট্র কাথিওয়ার বিজয় করিয়া আরব্যোপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের অধীশ্বর হন। ৪৮০ খৃঃ অব্দে হুনজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমগ্র রাজ্য বিধ্বস্ত করে পুনরায় ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। গুপ্তবংশের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা হইতে এই সকল ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়। এই সকল মুদ্রা কুশাণ নরপতিগণের মুদ্রাপেক্ষা অবিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মিত হইলেও

ইহাদের কারুকার্য্য এক সময় সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। কি সাহিত্যে কি শিল্পে গুপ্ত নরপতিগণের আশ্চর্য্য অনুরাগ দেখা যাইত। তাহারা তাহাদের প্রচলিত মুদ্রায়ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় নাম-ধামাদি সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এই সময়েই বিখ্যাত কবি কালিদাসের আবির্ভাব হয়। * হূনদিগের অত্যাচারে এ সমস্তই চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়াছিল। গুপ্তবংশের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাজার প্রতিমূর্ত্তি অপর পৃষ্ঠে কমলাসনে উপবিষ্টা দেবী মূর্ত্তি দেখা যাইত। ভারতবর্ষের প্রচলিত মুদ্রা-সমূহে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার পদ্ধতি দেখা যায়। এমন কি ১৩৩৯ খৃঃ অব্দেও কাশ্মীর প্রদেশে দণ্ডায়মান রাজার প্রতিমূর্ত্তি-সংযুক্ত মুদ্রা নির্ম্মিত হইত। ১১৯৪ খৃঃ অব্দে মুসলমান নরপতি মহম্মদ বিন সাম কান্যকুব্জ প্রদেশে কমলাসনে উপবিষ্ট দেবী-মূর্ত্তি-সংযুক্তমুদ্রার প্রচলন করেন। এইরূপ মূর্ত্তি-সংযুক্ত মুদ্রার প্রচলন পরে বহু হিন্দুনরপতিগণের মধ্যেও দেখা গিয়াছে।

বংশের অধঃপতনের সহিত মুদ্রার আকৃতি, গঠন ও কারু-কার্য্যেরও বহু অধঃপতন সংঘটিত হয়। হূনগণ ভারতে প্রবেশ করায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অভ্যুত্থিত হইয়াছিল তাহাদের প্রচারিত মুদ্রা-গুলিতে আর সেরূপ শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। ৬০৬ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন ইহার কতক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হইয়াছিল এবং তাহাতে নির্ম্মাণ কৌশলের কিছু মাত্র উপকার সংসাধিত হয় নাই। ইদানীন্তন "হ" অক্ষরসংযুক্ত কতকগুলি মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলি এই হর্ষ-বর্দ্ধনের প্রবর্ত্তিত বলিয়া বহু লোকে অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই

* See Bhandarkar's Essay "A Peep into the Early History of India" (Bombay 1900).

নৃপতির প্রবর্ত্তিত কতকগুলি মুদ্রা বর্ণে সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন। সে গুলি কিন্তু গুপ্তবংশের নির্ম্মিত রৌপ্য মুদ্রারই অনুকরণে নির্ম্মিত।*

সপ্তম হইতে ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল—সে গুলির প্রবর্ত্তক হুনগণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেগুলি পারস্য দেশের সাসেনিয়ানগণের (Sassanian) অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাদের একপার্শ্বে দণ্ডোপরি স্থাপিত যজ্ঞপাত্রের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নির্ম্মাণ-প্রণালী বড়ই কদর্য্য ও অসম্ভোচিত।

নবম শতাব্দীর পর বহু হিন্দু নরপতির অভ্যুত্থান হয়। তন্মধ্যে মহোবা প্রদেশের চান্দেলগণ, দিল্লীর তোমরবংশ, কান্যকুব্জের রাঠোর চেদি বা মধ্য ভারতবর্ষের হুনগণ সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চেদির গাঙ্গেয়দেব নূতন প্রকারের মুদ্রা প্রচারিত করেন। এই মুদ্রাগুলির একপৃষ্ঠে গুপ্তবংশ-প্রবর্ত্তিত কমলাসনে উপবিষ্ট দেবীমূর্ত্তি অপর পৃষ্ঠে মুসলমানদিগের অনুকরণে রাজ-প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তিন পংক্তি তাহাদিগের নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ১১৯৪ খৃঃ অব্দে মহম্মদ বিন সাম যে মুদ্রা প্রচার করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই পদ্ধতিরই অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১২৫০ খৃ অব্দে চান্দেলগণও মুদ্রার প্রচলন করেন।

ওহিন্দের ব্রাহ্মণ নরপতিগণ অনেক প্রকারের মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন সেগুলির একপৃষ্ঠে বৃষ অপর পৃষ্ঠে এক অশ্বারোহী বীরপুরুষের চিত্র অঙ্কিত হইত। দিল্লী ও আজমিরের চৌহান নরপতিগণ ও পরিশেষে ১২৬৫ খৃঃ অব্দে কালবলের রাজত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত মুসলমান বাদশাহগণই এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কাঙ্গরা প্রদেশে এইরূপ মুদ্রা নির্ম্মিত হইতে দেখা গিয়াছে।

* See J. R. A. S. 1906—P. 843.

ইসলামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পর ডামস্কসের খলিফাগণ ৬৯৬-৭ খ্রীঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান মুদ্রা প্রচলন করেন, এই সকল মুদ্রার উভয়পার্শ্বেই কোরাণের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-শ্লোক মুদ্রিত হইত। ইহার কতিপয় বৎসর পরে ৭১২ খৃঃ অব্দে কাশেমের পুত্র মহম্মদ সিন্ধুপ্রদেশ পরাজিত করিয়া তথায় আপন রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাগণ সেইসকল প্রদেশে যে সমস্ত রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করেন সেগুলি বোগ্‌দাদ ও ডামস্কসের খলিফাগণের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার অনুরূপ হইলেও তাহাতে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। সেগুলিতে শাসনকর্ত্তাদিগের নাম ও কোন সহর হইতে মুদ্রা নির্ম্মিত হইল, সে সহরের নাম লিখিত হইত। ভারতবর্ষে এইগুলিই সর্ব্বপ্রথম মুসলমান প্রবর্ত্তিত ধাতব মুদ্রা। সিন্ধু উপত্যকার চতুর্দ্দিকে ও মুলতান প্রদেশে সেই সময় এই সকল মুদ্রা প্রচলিত হইলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বিশেষতঃ জনসাধারণের মধ্যে এই মুদ্রার তত আদর পরিলক্ষিত হয় নাই। তখনও রাঠোর ও চান্দেল প্রভৃতি বংশের নৃপতিগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের সেই কর্কশ ও অপরিষ্কৃত মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। ৯৯৮ হইতে ১০৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহম্মদ গজনী বারম্বার ভারত আক্রমণ-পূর্ব্বক ভারতবাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার প্রবর্ত্তিত মুদ্রায় আর্ব্বিভাষায় কোরাণের ধর্ম্ম-শ্লোকগুলির চতুষ্পার্শ্বে তাহাদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হইত। অতঃপর ইহার পুত্র মসুদ (mosaud) এর সময় হইতে বালবণের (Balban) রাজত্বকাল (১২৬৫) পর্য্যন্ত যে সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সেগুলি ওহিন্দের ব্রাহ্মণগণের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত হইত।

মহম্মদ চিন সামই ভারতবর্ষের প্রকৃত মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপক। ইহার অপর নাম শাহাবুদ্দিন বা মহম্মদ ঘোরী। ইনি ১৬৯৩ হইতে

১২০৫ পর্য্যন্ত ভারতে রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে ভারতে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত হয় তন্মধ্যে কতগুলি ওহিন্দের অনুকরণে বৃষ ও অশ্বারোহীচিত্রে সুশোভিত কতগুলি বা হিন্দুর আরাধ্যা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি সমন্বিত ছিল। ১ম প্রকারের মুদ্রাগুলি তাম্র ও রৌপ্য-মিশ্রিত ধাতু দ্বারা ও ২য় প্রকারের মুদ্রাগুলি স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।

কোরাণ সরিফ।

(১)

'ক্যারায়া' অর্থাৎ 'পাঠ করা' ধাতু হইতে কোরাণ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃত আরবী ভাষায় ইহার অর্থ 'অধ্যয়ন' অথবা "যাহা পাঠ করা উচিত।" এই সংজ্ঞাদ্বারা মহম্মদীয়গণ কেবলমাত্র সমস্ত পুস্তক বা গ্রন্থখানিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এমন নহে, য়িহুদীরা যেমন একার্থ এবং এক প্রকৃতি হইতে সম্ভূত "কারা" বা 'মিক্‌রা' শব্দে সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উহার খণ্ড বিশেষকেও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ইহার কোন অধ্যায় বা বিভাগকেও মুসলমানগণ কোরাণ নাম প্রদান করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই বোধ হয়, কোন কোন আরবীয় পণ্ডিত অনুমান করেন যে, এই গ্রন্থ কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধ্যায় বা বিভাগের একত্র সমাবেশ বলিয়া, ইহা কোরাণ নামে অভিহিত হইয়াছে। 'সরিফ' পদ সম্ভ্রমার্থক শব্দমাত্র। রূপান্তরে 'ক্যারায়া' ধাতুর অর্থ 'সংগ্রহ বা আহরণ করা'। যাঁহারা কোরাণ সরিফকে এককালে আরোপিত গ্রন্থ এবং মুসলমানদিগের কথানুরূপ, ইহা কতিপয় বৎসরের মধ্যে সম্ভবতঃ অংশাকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নহে বলিয়া

আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা এইরূপে স্ব স্ব মতের সমর্থন করেন। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কোরাণের পূর্ব্বে যে 'অল্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহা সংজ্ঞামাত্র। ইংরাজী ভাষায় 'দি' (The) শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাও সেই ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এই বিশেষ নাম ব্যতীত আরও কতিপয় নাম প্রদান করিয়া কোরাণ সরিফের গৌরব রক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে 'ফর্ক্যাণ' নাম প্রদান করেন। এই শব্দ "ফ্যারাকা" অর্থাৎ "বিভাগ বা নির্ব্বাচন করা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তদনুসারে, ফর্ক্যাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি, 'অধ্যায়' বা 'খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থ' অথবা 'সদসতের নির্ব্বাচন'। যোগ্যতানুসারে কেহ কেহ ইহাকে 'অল্ মশাব' অর্থাৎ 'খণ্ড' এবং 'অল্ কিতাব' অর্থাৎ 'গ্রন্থ' শব্দেও উল্লেখ করিয়া থাকেন। আবার, কেহ কেহ ইহাকে 'অল্ ধিকার' অর্থাৎ 'উপদেশ' এই নামেও পেণ্টাটিউক্ ও গস্পেলের ন্যায় ইহাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

কোরাণ সরিফ অসম দৈর্ঘ্যের ১১৪টী বৃহৎ অংশে বিভক্ত। আরবী ভাষায় উহা বহুবচনে 'সাউয়ার' এবং একবচনে 'সুরা' নামে অভিহিত। এই শব্দদ্বয় প্রায়ই অন্য কোন স্থলে ব্যবহৃত হয় না; উহাদিগের অর্থ, 'শ্রেণী,' 'পংক্তি' বা 'নিয়মিত আবলী'। য়িহুদীগণ 'টোরা' (Tora) শব্দও ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কোরাণ সরিফের অধ্যায় সকল একাদি সংখ্যাক্রমে লিখিত নহে; কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা কোনও বিশেষ ঘটনার উল্লেখানুসারে এই অধ্যায় সকলের নামকরণ হইয়াছে; কিন্তু সচরাচর কোনও প্রসিদ্ধ পদ হইতেই উহাদিগের নামকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ য়িহুদীরা ম্যাদরিমে যেরূপে অধ্যায় সকলের নামকরণ করিয়াছে, কোরাণ সরিফের অধ্যায় সকলেও সেই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। তবে উভয়ের প্রভেদ এই যে, যে পদ সকল হইতে কোরাণ সরিফের অধ্যায়গুলির নামকরণ

হইয়াছে, সেই পদগুলি বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের বহুদূরে, কখন বা মধ্যস্থলে, কখন বা সেই অধ্যায়ের একবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত হইয়াছে। কোন কোন অধ্যায়ের দুই বা ততোধিক সংজ্ঞাও দেখিতে পাওয়া যায়। কোরাণ সকল হস্তলিখিত হওয়াতে বোধ হয় এই পার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকিবে।

কোন কোন অধ্যায় মক্কা নগরে এবং কোন কোন অধ্যায় মদিনাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার, বহুসংখ্যক অধ্যায়ের কিয়দংশ মক্কাতে ও কিয়দংশ মদিনাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার, কতকগুলি অধ্যায় কোথায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মীমাংসার জন্য কোরাণ-ব্যাখ্যা-কারগণের মধ্যে বহুল মতভেদ হইয়া থাকে।

প্রত্যেক অধ্যায় আবার অসমদৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উহাদিগকে আমরা প্রথানুসারে 'কবিতা' বলিয়া থাকি; কিন্তু আরবী ভাষায় উহারা 'আয়াৎ' নামে প্রসিদ্ধ। আরবী ভাষার আয়াৎ শব্দ হিব্রু ভাষার 'ওটথ' শব্দের অনুরূপ। উহার অর্থ, 'লক্ষণ' বা 'আশ্চর্য্য ব্যাপার'। যথা;—এই কবিতা সকলের অন্তর্গত ঈশ্বরের গূঢ় রহস্য; তাঁহার গুণ-গরিমা; মহিমা-রাশি; সূক্ষ্ম বিচার; এবং সুব্যবস্থা ইত্যাদি। এই সকলের অধিকাংশের আবার বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা আছে। যে নিয়মানুসারে অধ্যায় সকলের নাম প্রদান করা হইয়াছে, ইহাদিগের নামও সেই নিয়মানুসারে রক্ষিত হইয়াছে।

এই উপবিভাগ সকল আপামর সাধারণও বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইলেও, এবং কোন কোন কোরাণের শিরোভাগে উহাদিগের সংখ্যা লিপিবদ্ধ থাকিলেও, পূর্ব্বোক্ত আয়াৎ বা কবিতা সকলের সংখ্যার ন্যূনাতিরেক লক্ষিত হইয়া থাকে। এই ন্যূনাধিক্য বশতঃই ভিন্ন সংস্করণে কোরাণ সরিফ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন অথবা আদি কোরাণের সাত সংস্করণ প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের দুই

খানি মদিনাতে, তৃতীয়খানি মক্কা নগরে ; চতুর্থখানি কিউবাতে ; পঞ্চম খানি বসোরা নগরে ; এবং ষষ্ঠখানি সিরিয়া প্রদেশে প্রচলিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্তমখানি সাধারণ সংস্করণ। এই সকল সংস্করণের মধ্যে, মদিনার সর্ব্বপ্রথম খানিতে ৬০০০ ; দ্বিতীয় ও পঞ্চম খানিতে ৬২১৪ ; তৃতীয়খানিতে ৬২১৯ ; চতুর্থখানিতে ৬২৩৬ ; ষষ্ঠখানিতে ৬২২৬ ; এবং সর্ব্বশেষ খানিতে ৬২২৫ কবিতা আছে। কিন্তু কথিত আছে, সকল সংস্করণের শব্দসংখ্যা একরূপ অর্থাৎ ৭৭৬৩৯ ; এবং অক্ষর সংখ্যাও তদ্রূপ অর্থাৎ ৩,২৩,০১৫ মাত্র। য়িহুদীরা যেমন আপনাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক অক্ষর অতীব ভক্তি-সহকারে গণনা করিয়া রাখিয়াছে, তেমনই মহম্মদীয়গণ কোরাণ সরিফের প্রত্যেক পদ ও প্রতি অক্ষর গণনা করিয়া রাখিয়াছে। আবার, শেষো-ক্তেরা কোরাণ সরিফের উপর এতাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ যে, কোরাণ সরিফের মধ্যে এক একটী অক্ষর কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত অনায়াসে বলিয়া দিয়া থাকেন।

অধ্যায় ও কবিতার এই সকল অসমান বিভাগ ব্যতীত, মহম্মদীয়গণ কোরাণ সরিফকে আরও ষাট ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা-দিগকে তাঁহারা 'আহজ্জাব' বলিয়া থাকেন ; এই শব্দ বহুবচনান্ত, উহার একবচনে 'হিজব্' ; উহার প্রত্যেকেই আবার চারিভাগে বিভক্ত। কেহ কেহ এই উপবিভাগ যিহুদীগণের অনুকরণ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন ; কিন্তু সচরাচর কোরাণ সরিফ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত ; উহাদিগকে আজ্জা বলিয়া থাকে, উহারা পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত উপবিভাগের দ্বিগুণ হইবে এবং প্রাগুক্তরূপে চারিভাগে বিভক্ত। রাজকীয় মস্‌জিদ এবং সম্রাট্ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের কবরক্ষেত্র পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্‌জিদের কোরাণ পাঠকগণের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মস্‌জিদে এই প্রকারের ত্রিশজন পাঠক অবস্থিতি করেন ; তাঁহারা প্রত্যেকেই

প্রতিদিন এক এক বিভাগ পাঠ করিয়া, ত্রিশ জনে সমস্ত দিনে সমস্ত কোরাণ সরিফ একবার পাঠ করিয়া থাকেন।

মুসলমানেরা কোরাণ সরিফের নবম অধ্যায় ব্যতীত, প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোভাগে এবং অধ্যায়-সূচক সংজ্ঞার নিম্নভাগে "বিস্‌মিল্লা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উহার অর্থ, 'পরম দয়াবান্ ঈশ্বরের নামে।' প্রত্যেক পুস্তক এবং প্রত্যেকবিধ লিখনের প্রারম্ভে উহারা এই রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং ইহাকে উহাঁরা আপনাদিগের ধর্ম্মের প্রধান আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য এবং উহার বিবর্জ্জনে এক প্রকার মহাপ্রত্যবায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। এইরূপ য়িহুদীগণও উহাদিগের রচনার প্রারম্ভে, "প্রভুর নামে" বা "মহান্ ঈশ্বরের নামে" এই দুই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশীয় খৃষ্টানেরা "সেই পিতা, পুত্র, এবং স্বর্গীয় দূতের নামে" এই বাক্য লিখিয়া রচনা আরম্ভ করেন; কিন্তু আমাদের বোধ হয়, মহম্মদ পারস্য দেশীয় ম্যাজি ধর্ম্মের অনুকরণে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই রীতিও অবলম্বন করিয়াছিলেন। ম্যাজিগণ নিম্নলিখিত কয়েকটী শব্দ সর্ব্বাগ্রে লিখিয়া পুস্তকারম্ভ করিয়া থাকে। যথা;—"বিন্যাম্ ইয়েজদাং ককসাইঘর দাদার" অর্থাৎ "পরম দয়াবান ঈশ্বরের নামে।" অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কোরাণাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও টীকা-কারগণ এই রীতি ও অধ্যায় সকলের নামকরণ মূল কোরাণের ন্যায় স্বর্গ-সম্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ঐ সমস্ত ঈশ্বরের বাক্য নহে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গ-সাহিত্যে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস।*

বঙ্গ-সাহিত্যের অভিনব যুগে চারিদিকে আলোচনার দুন্দুভি-নিনাদ আরম্ভ হইয়াছে। যেদিকে কর্ণপাত করা যায়, সেই দিকেই স্পষ্টতর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, এমন কি, সময়ে সময়ে তাহার দ্বারা কর্ণ বধির হওয়ারও উপক্রম হইতেছে। অবশ্য এ সমস্ত যে সুলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। নানা বিষয়ের আলোচনায় ও তাহার ফল প্রকাশে ভাষা ও সাহিত্যের যে পুষ্টি সাধিত হয়, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। তবে সকল বিষয়ের একটা সীমা থাকা আমরা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে করি, শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে হইলে পরিমিত উপাদেয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়, অপরিমিত খাদ্যের বলে অধিক পরিমাণে মেদবৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে মেদশ্ছেদের জন্য চিকিৎসারও প্রয়োজন হইয়া উঠে। মানসিক পুষ্টি-সাধন করিতে হইলে, জ্ঞানচর্চ্চা ও বিজ্ঞান-চর্চ্চা অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু তাহার মাত্রা অধিক হইয়া উঠিলে, মানসিক বিকারের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী।

সেইরূপ ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনেরও নিয়ম আছে। নানা বিষয়ের আলোচনায় ও রচনায় ভাষা ও সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অনেকস্থলে সেই স্থূল কলেবর অন্তঃসার-শূন্য বলিয়াই প্রতীত হয়। বটতলার রাশি রাশি গ্রন্থ ও সেইরূপ অনেক নাটক, উপন্যাস বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবরকে যেরূপ বিন্ধ্য-পর্ব্বতের ন্যায় বাড়াইয়া তুলিতেছে, তাহাতে ইহাকে ভবিষ্যতে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। কাজেই এই সময়ে অগস্ত্যের আগমনের বিশেষ প্রয়োজন।

* বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত।

রূপক ছাড়িয়া দিয়া, বিশদ ভাবে বলিতে হইলে, আমরা এইরূপ বলিতে চাহি যে, এক্ষণে নাটক-উপন্যাসের আবর্জ্জনায় আর বঙ্গ-সাহিত্যকে পঙ্কিল করার প্রয়োজন নাই। যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় তাহার প্রকৃত পুষ্টি সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা নাটক-উপন্যাসের আবর্জ্জনারই কথা বলিয়াছি। সুলিখিত নাটক-উপন্যাস কদাচ পরিত্যাগের বিষয় হইতে পারে না।

সুখের বিষয় যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা হয়, তাহাতে সাহিত্যিকগণ মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দর্শন ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার কথা ছাড়িয়া দিলে, দেশের ও জাতির পুরাতত্ত্ব ও ইতিবৃত্ত অনুশীলনে তাঁহারা নিত্য নিত্য যে সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, এবং তজ্জন্য বঙ্গ-সাহিত্যেরও যে উন্নতি সাধিত হইতেছে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বে কয়েকখানি মাত্র অনুবাদ গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার সে অভাব ক্রমশঃই দূর হইতেছে। আমরা এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে দেখিতেছি যে,পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের অনুবাদ-যুগ শেষ হইয়া আবিষ্কার-যুগের আরম্ভ হইয়াছে।

বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের আবিষ্কার-যুগের প্রারম্ভকাল। অনুবাদ ও আবিষ্কার-যুগের সন্ধিস্থল বলিয়া, ইহাতে অনুবাদ-যুগের কিছু কিছু অন্ধকার ও আবিষ্কার যুগের কিছু কিছু আলোকের যে মিশ্রণ থাকিবে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণ যে একেবারে অনুবাদ বা অনুকরণের হাত এড়াইতে পারিয়াছেন, একথা বলা যাইতে পারে না এই অনুবাদ বা অনুকরণকে পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ না করিলে আবিষ্কারের আলোক তাঁহাদিগের মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইয়া, সকলের সমক্ষে যে প্রতিফলিত হইবে, এরূপ

আশা করা যায় না। অনুবাদ বা অনুকরণে ভাষা বা সাহিত্যের যে পুষ্টি সাধিত হয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যে জাতির ভাষা ও সাহিত্য জগতের অন্যান্য জাতির ভাষা ও সাহিত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য নবীন উদ্যমে অভ্যুত্থিত হইতেছে, তাহা যে, অনুবাদ ও অনুকরণের ভারে ক্রমে ভূগর্ভের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা কদাচ কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। সুতরাং অনুবাদ ও অনুকরণের অন্ধকার এক্ষণে গুহামধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকুক। আবিষ্কারের আলোক আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ুক ; আমরা সকলেই তাহাতে আলোকিত হইয়া উঠি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণ আজিও অনুবাদ বা অনুকরণের হাত এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে সেই পুরাতনী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন আলোচনায় মনোনিবেশের জন্য অনুরোধ করাই এই প্রবন্ধের অবতারণা। যে জাতির জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক জগতে এক নূতন আলোকের আনয়ন করিয়াছেন, সেই জাতির প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণ আজিও যে অনুবাদের তিমিরে মগ্ন হইয়া থাকিবেন, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে ? যাঁহাদের সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে রাশি রাশি উপকরণ আপনাদের হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া পুরাণ-কাহিনী প্রচারের জন্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহারা কিনা, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুবাদের অনুবাদ লইয়া, আপনারা কৃতার্থস্মন্য হইতেছেন ? ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? তাঁহারা যদি আপনাদের স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণাকে প্রসারিত করিতে না পারেন, কেবলই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের "ডিটো" দিয়া যান, তাহা হইলে, সে চিন্তা বা গবেষণার মূল্য কি আছে ? আমরা অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতকে উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না। কেবল তাঁহাদের মতেই নির্ভর না করিয়া, স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান,

অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া, আমরা কেবল তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

যদিও কোন কোন স্থলে আমরা স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় পাইতেছি বটে, কিন্তু তাহাও যেন প্রসারিত হইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকে। পরমুখাপেক্ষা এখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মুখাপেক্ষা কিছু অধিক বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিকগণ যে পরিমাণে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ততটা পারিয়া উঠিতেছেন বলিয়া, আমরা বোধ করি না। তাঁহাদিগকে এখনও কতকগুলি পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইতেছে এবং তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া, তাঁহারা তাহাদেরই চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ঐতিহাসিকেরা ক্রমে ক্রমে কেন্দ্র হইতে দূরে আসিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, একথাও বলা যাইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে আমরা যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণকে দোষ দিতেছি তাহা নহে, ঐতিহাসিকগণের উপকরণ অপেক্ষা তাঁহাদের উপকরণের বিচার কিছু কঠিন বলিয়াই বোধ হয়। সেই জন্য তাঁহারা যেন সঙ্কুচিত ভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইখানে আমরা প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। যে সময়ের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না, কেবল কতকগুলি চিহ্নের উপর নির্ভর করিয়া তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার ও স্থির করিতে হয়। সেই সময়ের তত্ত্বই আমরা প্রত্নতত্ত্ব বলিয়া বুঝিয়া থাকি। এককথায় প্রাগৈতিহাসিক কালেরই তত্ত্বের নাম প্রত্নতত্ত্ব। আর যে সময় হইতে ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়, নানাগ্রন্থে নানা বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হয়, সেই সময়ের তত্ত্বকে আমরা ঐতিহাসিক তত্ত্ব বলিয়া, সাধারণতঃ

অভিহিত করিয়া থাকি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হিন্দু ও বৌদ্ধকালের বিবরণ আমরা প্রত্নতত্ত্ব বলিয়া বুঝি। শিলালিপি, তাম্রফলক, মুদ্রা ও দুই এক খানি খণ্ডিত পুঁথির পত্র প্রভৃতি চিহ্ন হইতে সেই কালের তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হয়। আর মুসলমান ও বৃটিশ রাজত্বের কালকে আমরা ঐতিহাসিক যুগ বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারি। দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকারগণের বর্ণিত বিবিধ গ্রন্থ, মুদ্রা ও সনন্দ প্রভৃতি উপকরণ হইতে উক্ত যুগের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে।

সুতরাং ঐতিহাসিকগণের উপকরণ-বিচার অপেক্ষা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উপকরণ-বিচার যে কঠিনতর ব্যাপার, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে খণ্ডিত ও জটিল উপকরণ লইয়াই সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হয়। এইজন্য সম্ভবতঃ অনেকস্থলে তাঁহারা আপনাদের মত-প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই সমস্ত উপকরণ লইয়া সিদ্ধান্তনির্ণয় করিতে গেলে, অনেক সময়ে যে, গোলযোগে পড়িতে হয়, তাহা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু তাহাতে স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন গবেষণার পরিচয় না দিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। জটিল বিষয়ের মীমাংসা সকল সময়েই অভ্রান্ত হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তাহার বিচারপদ্ধতি যে স্বাধীন ভাবে করা যায় না, ইহা স্বীকার করিব কেন? পরের মুখাপেক্ষা না করিলে, আমরা যে কোন বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম হই না, ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? আমরা যদি সিদ্ধান্ত ও বিচারে আত্মনির্ভরতা ছাড়িয়া পরমুখাপেক্ষার আশ্রয় লই, তাহা হইলে, আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় দিব কোথায়? ফলতঃ আমরা পরমুখাপেক্ষা ছাড়িতে পারিতেছি না। কাজেই স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার বিশেষ কোন পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছি না।

বাস্তবিক অধিকাংশস্থলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ও কোন কোন স্থলে

ঐতিহাসিকগণ কতকগুলি প্রাচীন সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করায়, তাঁহাদের বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় লক্ষিত হইতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। প্রথমতঃ প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দুইচারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত আলোচনা করিলে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হন না। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও কিংবদন্তী বা প্রবাদে যাহা দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা অধিক নাই, এমন কি অনেক স্থলে একেবারে নাই বলিলেও চলে। যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আপনারা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের মতে বা প্রবাদ ও কিংবদন্তীতে শ্রদ্ধাবান্ নহেন কেন? সে সময়ে তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের দোহাই দেওয়া ব্যতীত বিশেষ কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ দুই একটা নূতন প্রমাণ প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেও, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ কি কারণে তাঁহারা আমাদের প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তস্থাপনে প্রয়াসী হন, একথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদের নিকট "বলে গেছে ত্র্যম্বক তেলাং আর হিয়েন্থ সাং" ব্যতীত আর কোনই সদুত্তর পাওয়া যায় না। আমাদের প্রাচীন মত সকলের অনুমোদনীয় না হইতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত চূড়ান্ত প্রমাণের দ্বারা তাহার খণ্ডন না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা কেন তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে যাইব? ত্র্যম্বক তেলাং ও হিয়েন্থ সাং এর মত-বিরুদ্ধ বলিয়া যে, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের মতকে দূরে পরিহার করিতে হইবে, ইহার কোনই হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণ-স্বরূপ আর্য্য অনার্য্য সমস্যার কথা আমরা উত্থাপন করিতে পারি। ভারতের বর্ত্তমান জাতি

সমূহের মধ্যে কতটুকু আর্য্যরক্ত ও কতটুকু অনার্য্যরক্ত প্রবাহিত আছে, তাহার পরিমাণ স্থির করিবার জন্য তাহাদের দেহের প্রতি নানাপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগ চলিতেছে। বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্গালী জাতির আদিপুরুষ আর্য্য কি অনার্য্য, তাহা পণ্ডিতগণ স্থির করিতে পারিতেছেন না। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যখন অনার্য্য রক্তের পরিমাণ আমাদের দেহের মধ্যে কিছু অধিক পরিমাণ দেখিতে পাইয়াছেন, তখন আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে মনে আপনাদিগকে আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরব প্রকাশের ইচ্ছা করিলেও, নিজেদের মত প্রকাশের সময় আপনাদের আদিপুরুষদিগকে অনার্য্যের প্রপৌত্র বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। অনার্য্য শব্দকে এস্থলে আর্য্যেতর বলিয়াই গ্রহণ করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য্য ও দ্রাবিড় (Aryans and Dravidians) দুইটী সংজ্ঞা স্থির করিয়া, ভারতের জাতিসমূহকে বিভক্ত করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আর্য্য জাতির সহিত দ্রাবিড়জাতির কোনই সম্বন্ধ নাই। দুই জাতি ভিন্ন ভিন্ন জনপদ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোনই জাতি ছিল না, যদি থাকে তাহারা খাঁটি অনার্য্য, এবং তাহারাই শূদ্র। যদি কেহ বলেন শূদ্র ও দ্রাবিড় আর্য্য জাতির শাখা বা তাহা হইতে উৎপন্ন, তাহা তাঁহাদের অনুমোদনীয় হইবে না। শূদ্র যে, আর্য্য জাতির শাখা তাহা প্রাচীনকালের গ্রন্থ ও প্রাচীন আর্য্য সমাজ-গঠনের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে যে না পারা যায়, এমন নহে। আর দ্রাবিড় যে, আর্য্য জাতি হইতে উৎপন্ন ইহাও আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

> "ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছাবিরেব চ।
> নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥"

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাগর্ভজসন্তান দেশ-বিশেষে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছবি,

নট, করণ, খস এবং দ্রবিড় আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অন্য এক স্থলে লিখিত আছে।—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খস প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ সংস্কার ও যজনাধ্যাপনাভাবে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে, আমরা দেখিতেছি যে, দ্রাবিড় জাতি ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ক্ষত্রিয়েরা যে আর্য্য, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। যদি ভারতের কোন জাতি দ্রাবিড়ই হয়, তাহা হইলে, আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে তাহারা আর্য্য-বংশোদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু নব্য পণ্ডিতগণের মতে তাহারাও আর্য্য-বংশোদ্ভব হইতেই পারে না, অধিকন্তু এদেশেরই লোক নহে। হয় মিসর, না হয় অন্য কোন একটা দেশ হইতে এ দেশে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, সেই দ্রাবিড় বা ঝল্ল-মল্লগণ আজিও ঝাল, মাল আখ্যা ধারণ করিয়া আপনাদিগকে রাজ-বংশী বা ক্ষত্রিয়োদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আমাদের বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ যদি নিতান্তই ঝাল-মালের বংশধর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারাও যে, আর্য্যবংশোদ্ভব, তাহা আমাদিগকে বলিতেই হইবে। নতুবা আমরা আর্য্য-সন্তান বলিয়া জগতে গৌরব করিব কি লইয়া? বাঙ্গালী জাতির আদি পুরুষ দ্রাবিড় হউন অথবা বিশ্বামিত্রের দস্যু-সন্তান বা বলিরাজার পুত্র হউন, প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মতে যে, তিনি আর্য্য-বংশোদ্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নব্য পণ্ডিতগণ মানবতত্ত্ব, অস্থি-

তত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্বের বলে আমাদিগকে অনার্য্যবংশোদ্ভব না বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু ঐ সকল বিদ্যা সাধারণ নিয়মে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হওয়ায়, তাঁহাদিগকে পদে পদে যে, বিশেষ বিধির আশ্রয় লইতে হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। যদি কেহ বলেন যে, আর্য্যানার্য্যের মধ্যে বংশ-গত কোনই পার্থক্য নাই, কেবল আচার-গত পার্থক্য আছে, সে কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। আর্য্য, অনার্য্য বিধাতার সৃষ্ট দুইটি জীব, ইহা বলিতেই হইবে। কারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাই বলিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর্য্য জাতির আদি বাসস্থান ও আদি ভাষারও সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। আর্য্যগণের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল না, কারণ ভারত-ভূমি আর্য্যভূমি হইতেই পারে না। তবে আর্য্য-গণের আদি বাসস্থান কোথায়? উত্তর, মধ্য এসিয়ার কাস্পিয়ান সাগরের তীর বা তন্নিকটস্থ প্রদেশ, অথবা স্কাণ্ডেনেবিয়া বা সুইডেন ও নরওয়ে, কিম্বা সাইবিরিয়া বা পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র হইবে। কিন্তু কদাচ ভারত-বর্ষ হইবে না, কেন হইবে না, তাহার সদুত্তর পাওয়া কঠিন। তবে এই টুকু পাওয়া যায় যে, প্রাচ্য আর্য্য ও প্রতীচ্য আর্য্যগণের ভাষায় অনেক শব্দের যখন ঐক্য আছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই মূল ভাষা যেখানে প্রচলিত ছিল, সেই স্থলেই আদিম আর্য্যনিবাস। কিন্তু সে ভাষা কি ও তাহার শব্দই বা কি, তাহা কিন্তু আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই! প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মস্তিষ্কে ভিন্ন জগতে তাহার স্থান ছিল কি না, তাহার প্রমাণ আমরা আজিও পাই নাই। যদি বলা যায় যে, ভারতবাসী আর্য্যদিগের নিকট হইতে জগতে ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল জাতি আপনাপন আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল।

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ ॥
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥"

এই উক্তির বলে পৃথিবীর সকল জাতি যে ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে আপনাদের আচার ব্যবহার বা জ্ঞান শিক্ষা করিয়া থাকিবে। একথা প্রমাণের স্থলে উত্থাপন করিলে, তাঁহারা 'হইতে পারে না' ব্যতীত আর কোনই সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। কেন যে তাঁহারা ঐরূপ উত্তর প্রদান করেন, তাহার একটি কারণ আছে। প্রতীচ্য আর্য্যগণ অপেক্ষা প্রাচ্য আর্য্যগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয় বলিয়া, ঐ সমস্ত প্রমাণ তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য। অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাতে সম্মত হইতে না পারেন, কারণ তাঁহাদের আদিপুরুষগণ ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া গরীয়ান, একথা স্বীকার করিলে, তাঁহাদের গৌরবের হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের হৃদয়ে কি আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরববিস্তারের স্পৃহাটাও জাগরূক হয় না? তাঁহারা হয়ত বলিবেন, আমরা সত্যের আদর ব্যতীত কদাচ মিথ্যার আদর করিতে পারি না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়া তাঁহারা কি মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেছেন না? কতকগুলি কাল্পনিক প্রমাণের বলে সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা, মিথ্যার প্রসার বৃদ্ধি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

ইহার পর অক্ষর বা লিপি-সমস্যার কথাটা আমরা বলিতে চাহি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়া বসিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ লিখিতে জানিতেন না, অর্থাৎ তাঁহারা নিরক্ষর ছিলেন। শুকপক্ষীর ধর্ম্মই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। যদি কোন পণ্ডিত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, পাণিনি-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে অক্ষর ও রেখার উল্লেখ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন, সে অক্ষর এ অক্ষর নহে তাহা দেবাক্ষর। সেমিটিক জাতির নিকট হইতে আমরা অক্ষর

শিক্ষা করিয়াছি ইহা বলিতেই হইবে। কারণ ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। যাহা হউক সেমিটিকেরা ত আমাদের অক্ষর শিখাইল। তাহার পর তাহা ক্রমে অশোকলিপি, গুপ্তলিপি, বঙ্গলিপি, দেবনাগরলিপি ইত্যাদিতে পরিণত হইল। ইহাদের ঐক্য প্রদর্শনের জন্য নানারূপ ব্যাপার ও প্রক্রিয়া চলিতেছে। অবশ্য তজ্জন্য তাঁহারা যেরূপ উদ্যম করিতেছেন, তাহা যে প্রশংসনীয় তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা তাহার বলে অনেক স্থলে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতেছেন ও তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইতেছেন, তাহা যেন কেমন কেমন বোধ হয়। বর্ত্তমান লিপি অনুসারে সেই প্রাচীন লিপির অক্ষর স্থির করিতে হয়। তাহাদের আকার কোন স্থলে একটি রেখা, কোন স্থলে একটি বিন্দুমাত্র, আবার শত শত, সহস্র সহস্র বৎসরে তাহারা অনেক স্থলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। সেই সমস্ত অক্ষর আমাদের বর্ত্তমান অক্ষরের সাদৃশ্যে পাঠ করিয়া তাহার সারোদ্ধার করিতে হইবে। তাহাতে কোন স্থলে 'ক' 'র' হইতেছে, 'ব' 'চ' হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা তাহাদের যে পাঠোদ্ধার করিবেন, তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। যদি কেহ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন, অমনি তাঁহারা বলিবেন যে, লিপি-বিজ্ঞান স্থির হইয়া গিয়াছে। তাহা রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার ন্যায় অকাট্য। লিপি পাঠের বিজ্ঞান স্থির হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানবিভ্রাটও যে ঘটিতে পারে ইহা কি তাঁহারা অস্বীকার করেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। অনেকেই জানেন, কুঠীয়াল নাগরী আকার ইকারের বড় ধার ধারে না। কেবল ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির সমাবেশে প্রায় অধিকাংশ শব্দেরই অর্থগ্রহ হয়। কুঠীয়াল নাগরীর এইরূপ বিজ্ঞান স্থির হইয়া গিয়াছে! কিন্তু এই বিজ্ঞান-বিভ্রাটের একটি গল্প বলিতেছি। একটি লোক বাটীতে পত্র লিখিল, "চচ অজমর গয়" লেখকের উদ্দেশ্য থাকিল "চাচা আজমীর গেয়া" অর্থাৎ চাচা আজমীর গিয়াছেন। পাঠক বুঝিয়া লইল, "চাচা আজ মর গেয়া" অর্থাৎ চাচা আজ মরিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের বাটীতে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল। ঐরূপ বিজ্ঞানবিভ্রাটে আমাদেরও যে, অনেক

চাচা মারা যাইতেছে, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে চাহেন না। ফলতঃ বর্ত্তমান অক্ষরের সাদৃশ্যে প্রাচীন লিপির যে অভ্রান্ত সারোদ্ধার হয়, ইহা সকলে স্বীকার করিবেন কিনা, বলিতে পারি না। তাহার প্রমাণও আমরা পদে পদে পাইতেছি। কারণ, শিলালিপি, তাম্রশাসন ও মুদ্রার পাঠের ব্যতিক্রম প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে লাঠালাঠিরও ত্রুটি হয় না। তাঁহারা প্রাচীন লিপির সারোদ্ধার করুন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাকে যেন অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার না করেন, ইহাই অনুরোধ।

এইবার আমরা তাঁহাদের সময়-নির্ণয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিপ্রায় করিতেছি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট কতকগুলি সময় অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করা আছে। যথা বুদ্ধদেবের জন্ম, আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ-বিজয় ইত্যাদি। এই দুই চারিটি অভ্রান্ত সত্যের বলে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বের ও পরের যাবতীয় সময়-নির্ণয়ে অগ্রসর হন। সেই জন্য তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে লিখিতে হয় যে, অশোক-স্তম্ভের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বা পাঁচ শত বৎসর পরে পাঁচী ধোপানীর আবির্ভাব হইয়াছিল। বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল নিশ্চয়ই; এবং তাহা এক সময়েই হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়টা কবে? প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিবেন ৫৫৬ খৃঃ পূর্ব্বে, কারণ সিংহলের সেই মত। যদি বলা যায়, চীন বা তিব্বতের মত কি মহাশয়? নানা তাহা অগ্রাহ্য! কেন অগ্রাহ্য? না তাহা ৫৫৬ হয় না। বাস্তবিক বুদ্ধের জন্ম ও নির্ব্বাণ কোন সময়ে হইয়াছিল। ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কারণ তৎসম্বন্ধে প্রায় তের চৌদ্দটি মত প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যে ৫৫৬ খৃঃ পূঃ বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে মানিয়া লইতেই হইবে। অবশ্য আলেকজাণ্ডার যে ৩২৭ খৃঃ পূঃ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন সে,বিষয়ে বিশেষ কোন আপত্তি দেখা যায় না। কিন্তু তাহা যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় হইয়াছিল। ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ কৈ? Sandracoptus চন্দ্রগুপ্ত, Palibothra, পাটলিপুত্র হইলেও ঐ পাটলিপুত্রে আরও অনেক চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশের সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তেরও পাটলিপুত্রই রাজধানী ছিল। আর Sandracoptus ও Palibothra হইতে চন্দ্রগুপ্ত ও পাটলিপুত্র স্থির

করিতে হইলে Grimm's Law এরও বিশেষ বিধির প্রয়োজন হয়। মেগাস্থিনিস যদি Sandracoptus কে চন্দ্রগুপ্ত ও পাটলিপুত্রকে Palibothra বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভারতের প্রায় সমস্ত জনপদ বা ব্যক্তি ও জাতি ঐরূপ অপভ্রংশে পরিণত হইত। তিনি Gangardai ও Gankar নামে দুইটি জনপদ বা নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। সেখান হইতে ডেল্টা বা বদ্বীপের আরম্ভ, তথায় তাহারা অবস্থিত ছিল। সকলেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের নিকট হইতে বদ্বীপের আরম্ভ। কারণ সেই স্থানে গঙ্গা, পদ্মা ও ভাগীরথী এই দুই স্বতন্ত্র নদীতে পরিণত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের নিকট ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গম স্থানের অনতিদূরে গাঙ্গারডী ও গনকার নামে দুইটি গ্রাম অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া, মিগাস্থিনিসের উল্লিখিত জনপদের সম্পূর্ণ নাম প্রচার করিতেছে। গাঙ্গারডী ও গনকর Gangardai ও Gankar থাকিল, কিন্তু মগধের বিরাট্ রাজধানী পাটলিপুত্র একেবারে পালিবোথরা হইয়া গেল? ভারতের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ মিগাস্থিনেসের গ্রন্থে প্রায় সেই আকারে থাকিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত Sandracoptus হইয়া রহিলেন? Sandracoptus চন্দ্রগুপ্ত ও Palipbothra যে পাটলিপুত্র নহে একথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু ভারতের অনেক অখণ্ড শব্দ যে মিগাস্থিনিসের গ্রন্থে স্বশরীরে বিদ্যমান ছিল ইহারই উল্লেখ মাত্র করিতেছি। আমার কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বন্ধু গ্রীক-বিজয়কে চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে অশোকের রাজত্বকালে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা হইলে Sandracoptus আর চন্দ্রগুপ্ত হইতেছেন না, তিনি অশোকই হইয়া উঠিতেছেন। সুতরাং গ্রীক-বিজয় ৩২৭ খৃঃ পূর্ব্বে হইলেও মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় হইয়াছিল, এই অভ্রান্ত সত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণেরও নিকট স্থান পাইতেছে না। সুতরাং তাহাকে ধ্রুব-তারা করিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করিতে গেলে দিগ্‌ভ্রম যে ঘটিবে, তাহা বোধ হয় অনায়াসে বলা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের বলে, আমাদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খৃষ্টের জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিতেছে। যদি বলা যায় যে, আমাদের জ্যোতিষিকগণ পরাশর, গর্গ, বরাহমিহির প্রভৃতির মতে তাহা ২৪০০ বৎসর খৃঃ পূঃ হয়। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ তাহাতে সম্মতি দান করিবেন না। ঐরূপে বিক্রমাদিত্যকে তাঁহারা সপ্তম খৃষ্টাব্দে ও

শঙ্করাচার্য্যকে অষ্টম খৃষ্টাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে বলবৎ প্রমাণ দেখাইলেও তাঁহারা তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সম্বন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা করি না, কারণ তাহাতে অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে। তবে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, প্রত্নতত্ত্বের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দোষপ্রদর্শন আমাদের অভিপ্রায় নহে, আমাদের কেবল একমাত্র অনুরোধ যে, স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা আশ্রয় করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে পুলকিত করিয়া তুলুন। আর কেবল ত্র্যম্বক তেলাং ও হিয়েন্থসাঙ্গ এর দোহাই না দিয়া আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের উক্তিরও প্রতি একটু শ্রদ্ধা রাখিয়া সত্য-নির্দ্ধারণে অগ্রসর হউন। তাঁহারা যেন সম্প্রদায় গঠন করিয়া কেবল কল্পনা ও অনুমানের রাজত্ব আনয়ন না করেন। সত্যের আদরে কাহারও কোন কালে আপত্তি থাকিতে পারে না। ক্রমশঃ

আজ ভারতের ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত। গত ২৩এ বৈশাখ শুক্রবার রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটের সময়ে শ্বাস-নালি প্রদাহ রোগে আমাদের শান্তিপ্রিয় ন্যায়নিষ্ঠ কল্যাণকামী ভারতের ভাগ্যবিধাতা দয়াবান্ সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড অকস্মাৎ পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। সহসা এই মর্ম্মচ্ছেদী বজ্রবাণীতে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমরা শোকাকুল হৃদয়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যে. তিনি তাঁহার পরলোকগত. আত্মার সদ্গতি করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ও রাজভক্ত প্রজাবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

বুদ্ধগয়া।

ঐতিহাসিক চিত্র।

বঙ্গ-সাহিত্যে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে ঐতিহাসিকগণের প্রতি দুই চারিটী কথা বলিয়া, আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অপেক্ষা ঐতিহাসিকগণ অনেক স্থলেই স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছেন। কিন্তু তাঁহারাও এখন পর্য্যন্ত পরমুখাপেক্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে পক্ষসমর্থনের দোষটাও দেখা যাইতেছে। তাঁহারা স্বাধীন মত প্রকাশের সময় আপন পক্ষ সমর্থনে এরূপ ব্যগ্র যে, তাহাতে অনেক স্থলে সত্যের গোপন ঘটিতেছে। আমাদের মতে নিরপেক্ষতাই ঐতিহাসিকের ধর্ম্ম। ভাব-প্রবণতায় অভিভূত হইলে ঐতিহাসিক আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। সেই জন্য ঐতিহাসিকগণের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে যদি স্বাধীন মত প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মত আদরণীয় হইবে। ভাব-প্রবণতা আশ্রয় করিয়া পক্ষসমর্থনের চেষ্টা করিলে, তাহা সকলের আদরের বস্তু হইবে বলিয়া, আমরা বিশ্বাস করিনা। তদ্ভিন্ন পরমুখাপেক্ষাও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আবার তাঁহাদের মধ্যে পরমুখাপেক্ষা এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছে যে, অনেক স্থলে তাঁহাদের নিজ উক্তিরও প্রতিবাদ ঘটিতেছে। তাঁহারা সাধারণের নিকট সময়ে সময়ে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন মত প্রকাশের চেষ্টা করিলেও, যখন বিদ্যালয়-পাঠ্য

গ্রন্থ লিখিতে বসেন, তখন অনেকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার আপনাপন মতের সঙ্কোচ করিয়া বসেন। সে সময়ে আমরা Philip drunkard এর বিচার লইব কি Philip sober এর বিচার লইব তাহ স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। সকলেই অবগত আছেন যে, বি বিশ্ববিদ্যালয় কি শিশুবিদ্যালয় সর্ব্বত্র যে ইতিহাস অধীত হইয়া থাকে তাহা অভ্রান্ত সত্য। ছাত্রদিগকে তাহার বিরুদ্ধে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব বলিবার উপায় নাই। কাজেই ঐতিহাসিকগণ আপনাদের স্বাধীন মত সঙ্কোচ না করিলে তাঁহাদের গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে পারে না। কিন্তু আমরা বলি, সেরূপ স্থলে বিদ্যালয়ের পাঠ্য লিখিবার লোভটা পরিত্যাগ করিলে কি ভাল হয় না? সত্যের আদরের জন্য একটু স্বার্থত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে আমরা আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে ঐতিহাসিক সমস্যা সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা মাত্র বলিবার ইচ্ছা করিতেছি।

অপরাপর বিষয়ের ন্যায় প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসেরও একটা সন্ধিস্থান আছে। সেই সন্ধিস্থানের বিবরণে ঐতিহাসিকেও কিছু প্রত্নতত্ত্বেরও বিচার করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখ করিতে পারি। চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, ১২০৩ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বক্তিয়ার খিলিজী সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া, নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বাঙ্গলা জয় করিয়া ফেলিলেন, লক্ষ্মণসেন জগন্নাথে পলাইয়া গেলেন। ইতিহাসালোচনায় সপ্তদশ অশ্বারোহী অষ্টাদশে পরিণত হইয়াছে। আবার লক্ষ্মণসেন লাক্ষ্মণে হইতেছেন। ১২০৩, ১১৯৪ হইতে ১২০৭ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ১২০৫ এ আবার বক্তিয়ারের মৃত্যুর কথাও আছে। এই সমস্ত ব্যাপার ঐতিহাসিকগণ স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতে পারিতেছেন কি না সন্দেহ। বল্লালসেন দেবের অদ্ভুত সাগর ১০৯০ শকে বা ১১৬৮ খৃঃ অব্দে

ও দান সাগর ১০৯১ শকে বা ১১৬৯ খৃঃ অব্দে রচিত হয়। আবার শ্রীধরদাস লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে ১১২৭ শকে বা ১২০৫ খৃঃ অব্দে সূক্তি-কর্ণামৃত রচনা করেন। ১২০৫খৃঃ অব্দে যদি বক্তিয়ার খিলিজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মণসেনের সময় বঙ্গবিজয় না হইয়া লাক্ষ্মণেয়ের সময় কিরূপে হয় বুঝা যায় না। শুনিতেছি নাকি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে অদ্ভুত সাগর, দান সাগর ও সূক্তি-কর্ণামৃত উড়িয়া গিয়াছে। যাউক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু এই ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা অভ্রান্তরূপে হইয়া গিয়াছে কি? তাহার পর অষ্টাদশ অশ্বারোহীর বঙ্গ-বিজয়ের কথা। কেশব-সেনের তাম্রশাসনে লক্ষ্মণ সেনের পরিচয়ে লিখিত আছে,—

"বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণিসংবাসবেস্থাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্থ স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমথারম্ভনির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি॥"

অর্থাৎ যিনি জগন্নাথ, কাশী ও প্রয়াগ-ক্ষেত্রে যজ্ঞ-যূপের সহিত সমর-জয়স্তম্ভমালা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি কি না অষ্টাদশ অশ্বারোহীর ভয়ে বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথে পলাইয়া গেলেন? আবার তাঁহার সেই পলায়নের চিত্র এখনও পর্য্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ও চিত্রপটে অঙ্কিত হইতেছে!

বহু প্রাচীনকালের ঘটনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েরও ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। জাহাঙ্গীর বাদশাহ কাহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা সুকঠিন। সাধারণ ইতিহাস ও আগরা প্রভৃতি স্থানের চিত্রপটে দৃষ্ট হয় যে, যোধবাইএর গর্ভে সেলিম বা জাহাঙ্গীর জন্ম গ্রহণ করেন। যোধবাই মাড়বাররাজ মালদেবের কন্যা। কিন্তু আবল

ফজেল তাঁহার আকবরনামায় লিখিতেছেন যে, জয়পুরের বিহারীমল্লের কন্যার গর্ভে সেলিম বা জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। এক্ষণে আবুল ফজেলের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা কি আজও যোধবাইকে জাহাঙ্গীরের মাতা বলিয়া প্রচার করিতে থাকিব? কিন্তু ঐতিহাসিকগণ আজিও যোধবাই-এর মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। আরঙ্গজেব বাদশাহের জন্ম ও মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। এক্ষণে মুসল্‌মান ঐতিহাসিকদিগের কি ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মত গ্রাহ্য, তাহা আমাদের স্বাধীনভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা তাহাতে মনোযোগী হইতেছি না। অন্ধকূপ-হত্যার রহস্য কি তাহাও ঐতিহাসিকগণ স্বাধীনভাবে স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইহাতে দুই দিকে পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা চলিতেছে। রাশি রাশি প্রমাণ-প্রয়োগ ও আলোচনা সত্ত্বেও সিরাজউদ্দৌলার নিষ্ঠুরতা ও নন্দকুমারের পাষণ্ডত্ব আজিও দূর হইল না! সুতরাং ঐতিহাসিকগণও যে নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিতেছেন, তাহাও আমরা বলিতে পারিতেছি না। পরমুখাপেক্ষা ও পক্ষ-সমর্থন উভয় দোষেই তাঁহাদিগকেও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কাজেই তাঁহাদেরও সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

উপসংহার কালে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণ স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার আশ্রয় লইয়া, নিত্য নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারে আমাদিগকে পুলকিত ও জগৎকে মুগ্ধ করিয়া তুলুন। এই গবেষণা করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময় বৈজ্ঞানিক যুগ। যে কোন বিষয়ের আলোচনা হউক না কেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন না করিলে কদাচ তাহা এক্ষণে আদরণীয় হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা induction অবলম্বন করিয়া যদি তাঁহারা অগ্রে নানা উপকরণের বিশ্লেষণ

করেন ও পরিশেষে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও আদরের যোগ্য হইতে পারে কিন্তু কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারকে অভ্রান্ত সত্য স্থির করিয়া deduction এর সাহায্যে যদি তাঁহারা তাহা হইতে অন্যান্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থির করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে বিজ্ঞানের যুগে তাহার আদরের সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞানের রাজত্বে বৈজ্ঞানিক প্রণালীকেই অবলম্বন করিতে হইবে। সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের জন্য লালায়িত না হইয়া, যদি তাঁহারা কোন বিষয়ের নানাবিধ উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণকে তাহাদের বিচারের জন্য আহ্বান করেন তাহাতেও তাঁহাদের কৃতিত্বের প্রকাশ পাইবে। কিন্তু কদাচ চর্ব্বিত-চর্ব্বণকে গলাধঃকরণের জন্য লোকের মস্তকে অঙ্কুশ-প্রহার করিলেও তাহা কেহই গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবে না। যে কোন বিষয় হউক না কেন, আসুন আমরা তাহার পক্ষাপক্ষের বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষান্ত হই, ভবিষ্যদ্‌-বংশীয়েরা তাহার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইবে।

সম্পাদক

প্রাচীন বঙ্গের শাসন-নীতি।

অতীতের সুনিবিড় অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া, নিরপেক্ষতার আলোকে, বঙ্গের পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্যের পুনরুদ্ধার বর্ত্তমানকালে অসম্ভব না হইলেও, অতিশয় কষ্টসাধ্য। আবার যে সকল ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশের সম্বন্ধে স্বজাতিগৌরব-প্রতিষ্ঠা-কামী লেখকগণের পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট রচনা আমাদিগের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিতেছে। নিরপেক্ষভাবে দোষগুণ-বিচারে আমরা বর্ত্তমান কালে একরূপ অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি।

আমরা শুনিতাম, সুদূর অতীতযুগে বঙ্গদেশে হিন্দুরাজগণ স্বাধীন-

ভাবে রাজ্য পরিচালন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজকীয় প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাঁহাদের বলবীর্য্য কিরূপ ছিল, তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তৎকালে প্রজাপুঞ্জের অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র ধারণাই ছিল না। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ আমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, আমাদের অতীত গৌরবসম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, আমরা নির্ব্বিচারে, অবিসম্বাদিত সত্যরূপে সে সকলকে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান ও ইতিহাসালোচনা সেই অতীতযুগের যে সকল অক্ষয় পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন-সমূহ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছে, তাহাতে বিদেশীয় ইতিবৃত্ত-লেখকগণকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইতেছে,—এজাতির পরাক্রম এককালে নিতান্ত সামান্য ছিল না। কি বাহুবলে, কি রাষ্ট্রনীতি-কৌশলে, কি শিল্পকুশলতায়—প্রত্যেক বিভাগেই এই জাতি অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল?

আমাদের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কোন জাতীয় ইতিহাস নাই; আমাদের পূর্ব্ব-গৌরবকাহিনী সকলের কীর্ত্তন করিয়া কোন ধারাবাহিক জাতীয় ইতিহাস লিখিত হয় নাই। আমাদের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ইতিহাস রচনার সম্পূর্ণ প্রতিপক্ষ ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভবিষ্যদ্-বংশধরের জন্য যে সকল অমূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমরা সেই সকল অমূল্যদানে ধনী হইয়াও, ঐতিহাসিক সম্বল সম্বন্ধে নিঃস্ব; ঐতিহাসিক ঘটনা-বহুল কোন গ্রন্থই আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছে নাই। স্বীয় জাতীয় ইতিহাস-সঙ্কলনে এই ঔদাসীন্যের কারণ—তাঁহারা আপনাদিগকে দেবতার নিকট এত ছোট করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আত্মকীর্ত্তি-বর্ণনা দেবমাহাত্ম্যকীর্ত্তনের তুলনায় তাঁহাদের নিকট নিতান্ত বিসদৃশ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল; পার্থিব সম্পদরাজি ধর্ম্মসম্পদের নিকট তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহারা বল-দর্পিত আত্মগৌরবকে

দেবতার বিনয়-নম্র বেদীতলে বলি দিয়া, কেবল ধর্ম্মৈশ্বর্য্যবর্ণনে কাল-ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।

জাতীয় অভ্যুত্থানের সহায় এই এক অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপারের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই বলিয়া, আজ আমাদের নিকট আমাদের প্রাচীন গৌরব কুহেলিকাজাল-সমাচ্ছন্ন স্বপ্নের মত! এই নিশ্চেষ্টতা ন্যায্য গর্ব্ব হইতে আমাদিগকে যেন স্বতঃই দূরে লইয়া যাইতেছে! সেই সুদূরাগত অতীতের গৌরব-গরিমা-বিভাসিত উজ্জ্বল দিবসের অমৃতগন্ধ আমাদের নাসারন্ধ্রে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। অথচ আমরা তাহা সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার অবকাশ পাইতেছি না? শতসুখস্মৃতি-বিজড়িত সেই অতি পুরাতন কাহিনীর পুলক-স্পর্শ যে মোহ-উন্মাদনার মাদকতা লইয়া আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা তাহার আস্বাদ পাইয়াও, সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিতেছি না! আমাদের নিকট হইতে আমাদের ন্যায্য দাবী কে কাড়িয়া লইয়াছে!

এই সুদীর্ঘকাল আমাদের নিকট যেন একটা অন্ধকারের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা আমাদের প্রনষ্ট শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ কোনরূপ স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারি নাই বলিয়া, দুঃখানুভব করিতেছি।

করিবার কথাত বটে;—গর্ব্বের সামগ্রী আছে, অথচ আমরা গর্ব্ব করিতে পারিতেছি না; সেই উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি আমাদের নয়ন-দর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ আমরা অন্ধ বলিয়া সেই আলোক-রস-মাধুর্য্যের সম্পূর্ণ সম্ভোগে অক্ষম!

কিন্তু দুঃখ করিবার হেতু থাকিলেও, নিরাশ হইলে চলিবে না। অতীতগৌরবেতিহাস-সঙ্কলন সহজসাধ্য না হইলেও অসম্ভব নহে। কত স্থানে কত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, কত সুপ্রাচীন গ্রন্থে, তাহার উপকরণরাশি বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

সেই সকল ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানরাশি সংগ্রহ করিয়া, এই শোচনীয় অধঃপতনের দিনে নষ্টসমৃদ্ধিদর্শন, জাগ্রত-গৌরবলাভা-কাঙ্ক্ষার ভিত্তির পত্তন করিয়া যাইতে পারিব। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে শাস্ত্রীয় তত্ত্বালোচনার ভিতরেও, আমাদের অতীত গর্ব্বের নিদর্শন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে আমাদের জড়ত্বময় সমাজ মধ্যে যে, নবজীবন-স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আশা হয়, অল্পদিনে না হউক, ক্রমাগত অকুণ্ঠিত অধ্যবসায়-সহকারে অনুশীলন করিলে, জাতীয় ইতিহাসের অনেক বিলুপ্তপ্রায় তথ্যের পুনরুদ্ধার হইতে পারে; এবং আমরাও বৈদেশিক ইতিহাসপ্রণেতৃগণের বিদ্রূপ-উপহাস হইতে অনেকাংশে আত্মরক্ষা করিয়া, জগৎসমক্ষে আমাদের অতীত গৌরবের বিজয়-পতাকা সদর্পে উত্তোলন করিতে পারিব।

আর্য্য-সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ের প্রকৃষ্ট বিবরণ বর্ত্তমান কালে সুচারুরূপে পাই-বার সম্ভাবনা নাই। মহাভারতে বঙ্গ-রাজ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় দুই এক জন রাজার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিস্তারিত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া, অধুনাতন সময়ে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গৌড়নগর-পতনের পর এদেশে যে সকল রাজবংশের উদ্ভব হয়, এবং যাহাদের সহিত গৌড় সাম্রাজ্যের বিশেষরূপে সংস্রব,—তাহাদের মধ্যে শূর-বংশ, পাল-বংশ ও সেন-বংশের নামই বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য; এবং ইঁহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য রাজবংশাপেক্ষা বেশী বিবরণ সংগৃহীত হই য়াছে। তবে ইঁহাদের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি যে, কালের পরিবর্ত্তনশীল অমোঘ প্রভাবে ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়া, চিরকালের জন্য লোক-লোচ নের অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ বিরল নহে। এই সকল মহা পরাক্রমশালী ভূপতিগণের অনেক কীর্ত্তি-স্তম্ভ অনাবিষ্কৃতাবস্থায় ভূগর্ভ

প্রোথিত থাকিয়া ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছিল; যদি আমরা তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা না করিতাম, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে তাহাদের চিহ্ন ধরাগর্ভ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাহাদের এই সমুন্নত প্রকাশ বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পুরাতন বিস্মৃত, অনধীত, তমসাচ্ছন্ন, গৌরবময় অধ্যায় আলোক-দীপ্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিত না।

বেশীদিনের কথা নয়—এমন কি বিশ বৎসর পূর্ব্বে, গৌড়ের পাল-বংশীয় রাজগণের বিষয় অনেক শিক্ষিত লোকেরই অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নানা তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায়, এই বংশ সম্বন্ধে নানা অপরিজ্ঞাত বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। শুধু তাহাই নহে,—আমাদের দেশে তৎকালে শাসন প্রণালীর কিরূপ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল, তাহাও জানিতে পারিয়া অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি! বঙ্গেতিহাসের একটা অত্যাবশ্যকীয় গৌরবের অধ্যায় যে, অনাদরে ও লোকসাধারণের অজ্ঞতায় বহুকাল মসীলিপ্ত অবস্থায় ছিল, এই তাম্রশাসনাদি সেই মসী-কালিমা অপসারিত করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে! আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, একসময়ে এই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন বাঙ্গালী জাতির মস্তক হইতে যে অভিনব শাসন-প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতির শাসন-পদ্ধতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

পাল ও সেন-বংশের অনেক তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায়, আমরা তৎকালীন শাসন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিয়াছি। পাল-বংশীয় দ্বিতীয় রাজা রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে শাসন-প্রণালীর যে সামান্য আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, একটু বিশেষ মনোযোগ-পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, তৎকালে শাসন-কার্য্যের কিরূপ সুব্যবস্থা ছিল!

ধর্ম্মপাল তদ্বংশীয় দ্বিতীয় রাজা। কোন-কোন ঐতিহাসিকের মতে

তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী শূরবংশীয় রাজার হস্ত হইতে গৌড় অধিকার করেন। রাজ্যাধিকারের পরই যে, তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শূর-রাজগণের শাসন-নিয়ম সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করিয়া, নবপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এরূপ অসঙ্গত অনুমান বোধ হয় কেহই করিবেন না। রাজ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-নীতির পরিবর্ত্তন হয় সত্য, কিন্তু নব-প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালী অতীতের আদর্শে গঠিত ও তাহার ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়; সুতরাং শূরবংশীয় নরপতিগণের সময়ের শাসন-ব্যবস্থা ধর্ম্মপালের সময়ের অনেকটা অনুরূপ ছিল, তাহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমাদের এই অনুমানের সমর্থনের জন্য আমরা সেন-বংশীয় রাজগণের তাম্র-শাসনের উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহাদের তাম্রশাসন-নির্দ্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা পাল-রাজগণের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তিত সংস্করণ বই আর কিছুই নহে।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিবর্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়:—

রাজামাত্য	দোঃসাধসাধনিক	শৌল্কিক
বিষয়পতি	দূত	গৌল্মিক
ষষ্ঠাধিকৃত	খোল	তদাযুক্তক
সেনাপতি	গমাগমিক	বিনিযুক্তক
ভোগপতি	অতিত্বরমাণ	জ্যেষ্ঠকায়স্থ
দণ্ডশক্তিক	হস্ত্যশ্বোষ্ট্রগোমহিষ্যজাবিকাধ্যক্ষ	মহামহত্তর
দণ্ডপাশিক	নাকাধ্যক্ষ	দশগ্রামাদিবিষয়ব্যবহারিক
চৌরোদ্ধরণিক	বলাধ্যক্ষ	মহাসামন্তাধিপতি
	তরিক	

ধর্ম্মপালের দান-পত্রখানি উপরিলিখিত কর্ম্মচারিবর্গকে জানাইয়া দান করা হইয়াছে। ইহাতেও প্রত্যেক কর্ম্মচারীর উপাধিদৃষ্টে অনুমান হয়, তাঁহারা স্ব-স্ব বিভাগের অধ্যক্ষ অথবা উপরিতন কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং

তাঁহাদের অধীনে অনেক কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজকার্য্য ও প্রকৃতিপুঞ্জের সুখসাধনের জন্যই এতগুলি শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছিল ;—প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল।

বর্ত্তমানকালে যেমন প্রত্যেক প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, প্রত্যেক বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, প্রত্যেক জেলা ভিন্ন ভিন্ন মহকুমায়, বিভক্ত,— প্রাচীনকালে সেইরূপ ছিল। ধর্ম্মপাল-প্রদত্ত-ভূমির সীমা-উল্লেখ-কালে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিব্যাঘ্রতটীমণ্ডলসম্বন্ধমহন্তাপ্রকাশবিষয়ে ক্রৌঞ্চশ্বভ্রনাম গ্রামঃ।" মহীপাল ও মদনপালদেবের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী কোটীবর্ষবিষয়ান্তর্গত গোকলিকামণ্ডল ও হলা-বর্ত্তমণ্ডলের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারি—তৎকালে কোনরাজ্য কয়েকটী ভুক্তিতে, প্রত্যেক ভুক্তি কয়েকটী বিষয়ে, এবং প্রত্যেক বিষয় কয়েকটী মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। হিন্দু রাজগণের এই দেশ-বিভাগ-কৌশল বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল কি না, পাঠকবর্গই তাহা বিবেচনা করিবেন।

নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাকর্ত্তাকৃতিক, মহাকুমারামাত্য, রাজস্থানীয়োপরিক, দাসাপরাধিক, ক্ষেত্রপাল, প্রান্তপাল, কোষপাল, অঙ্গরক্ষ, হস্ত্যশ্বোষ্ট্র-নৌবলব্যাপৃতক, দূতপ্রেষণিক, গ্রামপতি—ইহাদের নাম নূতন দৃষ্ট হইল, ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে এই সকল কর্ম্মচারীর নাম নাই। প্রথম, মহীপালদেবের তাম্রফলকেও আমরা এই সকল কর্ম্মচারীর নাম পাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, পাল-বংশ গৌড়রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইলে, শাসন-সংস্কারের উন্নতি হইতে থাকে, এবং উক্ত পদগুলি নূতন সৃষ্ট অথবা পুনঃপ্রচলিত হয়। পুনঃপ্রচলিত বলায় উদ্দেশ্য এই, হয় ত এই সকল পদ শূর-রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল।

শেষে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিলে ইহাদের লোপ পায়, পরে পালরাজগণ, রাষ্ট্রীয় গোলযোগের নিবৃত্তি হইলে, তাহাদের পুনঃপ্রচলন করেন। মদন-পালদেবের তাম্রশাসনে কেবল শৌনিকনামটী নূতন পাওয়া যায়। আবার, ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে যে ষষ্ঠাধিকৃত, নাকাধ্যক্ষ, খোল, বলাধ্যক্ষ, ভোগপতি, মহামহত্তর, দশগ্রামাদি-বিষয়-ব্যবহারিক, জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ—এই সকল পদের নাম দৃষ্ট হয়, নারায়ণপাল, মহীপাল ও মদনপাল দেবের শাসনে তাহাদের নাম নাই। অনুমান হয়, এই সকল রাজপুরুষের কর্ত্তব্য উত্তরকালে প্রচলিত পদসমূহের কাহারও কাহারও অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

রাজতন্ত্রে প্রত্যেক বিভাগের কি কি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা বর্ত্তমান কালে স্থির করা দুরূহ। উদ্ধৃত পদগুলির অধিকার স্পষ্ট বুঝা যায় না।

"বিষয়-পতি", বোধ হয়, প্রত্যেক "বিষয়ে" হিসাব রাখার জন্য যে কার্য্যালয় ছিল, তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। হিন্দু-শাসন-কালে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশমাত্র রাজকররূপে ধার্য্য ছিল। যদিও সংস্কৃত সাহিত্যে মধ্যে মধ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি সাধারণতঃ যে ষষ্ঠাংশমাত্র, রাজকররূপে গৃহীত হইত, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। "ষষ্ঠাধিকৃত", বোধ হয়, এই রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ প্রত্যেক বিষয়পতির অধীনে ভিন্ন ভিন্ন 'ষষ্ঠাধিকৃত' নিযুক্ত হইতেন এবং প্রত্যেক বিষয়-অফিসে ভূমির পরিমাণ ও রাজস্বের হিসাব থাকিত। "দশগ্রামিকাদি-বিষয়-ব্যবহারিক" শব্দে বোধ হইতেছে,—প্রত্যেক 'বিষয়পতি'র অধীনে দশগ্রামের কর্তৃত্ব লইয়া এক একজন 'দশগ্রামিক' নিযুক্ত হইতেন।

"দণ্ডশক্তিক" দণ্ডপ্রদান করিতেন, এবং "দণ্ডপাশিক" দণ্ডদানের যন্ত্রগুলির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। "চৌরোদ্ধরণিক" দস্যু-তস্করাদি ধরিবার

জন্য নিযুক্ত হইতেন। "ক্ষেত্রপাল", "প্রান্তপাল" নগররাজ্যাদির শান্তিরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। "কোষপাল" রাজকোষাধ্যক্ষ ছিলেন। দোঃসাধসাধনিক" সম্ভবতঃ শ্রমজীবিদলের পরিদর্শক ছিলেন। "গমাগমিক", "অভিত্বরমাণ" দ্রুতগামী বার্ত্তাবহদের অধ্যক্ষ ছিলেন। "দূতপ্রেষণিক" দূতপ্রেরণের ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত হইতেন।

পাল-রাজগণ নদী-বহুল দেশের অধীশ্বর ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নৌ-বিভাগের বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। "তরিক" এই নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। বোধ হয়, রাজগণের রাজ্যপরিদর্শন ও স্থানান্তরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাজসরকার হইতে তরণী-পরিচালকগণ নিযুক্ত হইতেন; 'তরিক' এই সকল তরণীর অধিনায়কস্বরূপ ছিলেন। রণতরী-সমূহের অধ্যক্ষের পদ, বোধ হয় ভিন্ন ছিল; কারণ, 'হস্ত্যশ্বো-ষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক' এই শব্দে 'নৌ-বল' কথার উল্লেখ থাকায়, এই পদস্থ কর্ম্মচারীকেই রণতরী-সমূহের অধ্যক্ষ বলিয়া বোধ হইতেছে। তৎকালে এতদ্দেশে রণতরী-সমূহ প্রচলিত ছিল, এবং রাজগণ তাহার ব্যবহার জানিতেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। যুদ্ধের জন্য অশ্ব ও হস্তী, এবং রণ-সম্ভার বহনের জন্য উষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল, এবং এই সকলের সুব্যবস্থার জন্য 'হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক' নিযুক্ত হইতেন।

"তদাযুক্তক" ও "বিনিযুক্তকের" অধিকার স্পষ্ট বলা যায় না। বোধ হয়, তাঁহারা নিম্নতন কর্ম্মচারিনিয়োগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে কায়স্থগণ লেখক অথবা কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। মসী-বৃত্তিই তাঁহাদের উপজীবিকা ছিল। "জ্যেষ্ঠকায়স্থ" ঐ সকল কেরাণী-কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্রত্যেক বিষয়-আফিসে থাকিয়া তদধীন কায়স্থকর্ম্মচারিগণের কার্য্য-প্রণালীর তত্ত্বাবধান করিতেন।

"মহাসামন্তাধিপতি" সামন্ত-রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রাচীন

কালে সন্ধিবিগ্রহের জন্য যে সকল মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন, "মহাসন্ধি-বিগ্রহিক" তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন।

"মহাক্ষপটলিক" দ্যুতাগারসমূহের পরিদর্শক ছিলেন।

'মহাপ্রতীহার' দ্বারপালদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। "অঙ্গরক্ষ" পদটী বোধ হয়, আধুনিক কালের Aid de-cong পদের তুল্য।

"রাজস্থানীয়োপরিক" বিচারক নিযুক্ত হইতেন।

সেন-রাজগণের তাম্রশাসনেও পূর্ব্বোদ্ধৃত অনেক কর্ম্মচারীর নাম দৃষ্ট হয়। আনুলিয়া, দিনাজপুর ও সুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তিনখানি শাসনেই নিম্নলিখিত পদগুলি দৃষ্ট হয়ঃ—

রাজামাত্য	বৃহদুপরিক	চৌরোদ্ধরণিক
		নৌবলহস্ত্যশ্বোষ্ট্র-
পুরোহিত	মহাক্ষপটলিক	গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ
মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ	প্রহাপ্রতীহার	গৌল্মিক
মহাসন্ধিবিগ্রহিক	মহাভৌরিক	দণ্ডপাশিক
মহাসেনাপতি	মহাপীলুপতি	দণ্ডনায়ক
মহামুদ্রাধিকৃত	মহাগণস্থ	বিষয় পতি
অন্তরঙ্গ (বা অঙ্গরক্ষ)	দৌঃসাধিক	

দেখিতেছি, দুই চারিটী পদ নূতন সৃষ্ট হইলেও নারায়ণ পাল, প্রথম মহীপাল ও মদন পাল দেবের তাম্রশাসনের তুলনায়, লক্ষ্মণসেনের সময়ে রাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল; "মহাভৌরিক," "মহাপীলু-পতি," "মহামুদ্রাধিকৃত," "মহাগণস্থ"—এই কয়েকটী পদ নূতন। পদের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বোধ হয়, এই সময়ে, সেন রাজ্যের আয়তন অনেক কমিয়া গিয়াছিল। কারণ, কেশবসেনের ভূমি-দান-পত্রে দৃষ্ট হয়, রাজকর্ম্মচারিগণের পদের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অল্প হইয়া গিয়াছিল। যৎকালে কেশবসেন বিক্রমপুর অঞ্চলে ভূমিদান করেন, সেই সময়ে

গৌড় অঞ্চল মুসলমানগণের করকবলিত,—কেবল পূর্ব্ববঙ্গ সেন-বংশীয়-গণের হস্তে থাকিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, রাজ্যের আয়তন কমিয়া যাওয়ায়, রাজ-কর্ম্মচারিগণের পদের সংখ্যাও কমাইতে হইয়াছিল।

রাজগণ যে সকল ভূমিদান করিতেন, যাহাতে অপরলোকে সেই সকল ভূমির উপর অন্যায় দাবী না করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে, তাঁহারা প্রদত্ত-ভূমির চতুঃসীমা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াগিয়াছেন। লুণ্ঠন-জীবী, তস্কর-দস্যুদের হস্তে যাহাতে প্রদত্ত-ভূমি উপদ্রুত না হয়, তজ্জন্য তাঁহারা যে নানা উপায় ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই সকল তাম্রশাসন অবলোকন করিলেই বুঝিতে পারি।

এই সকল শাসন-পত্রোক্ত ভূমিগুলি চাট্‌ভট্ট, গোদ, মালব, খশ, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, মেদ, অন্ধ, চণ্ডাল প্রভৃতিকে জানাইয়া দান করা হই-য়াছে। বলা হইয়াছে, চাট্‌ভট্ট যেন তোমার অধিকারে প্রবেশ না করে। ইহাতে বোধ হয়, পূর্ব্বে এই সকল জাতি বঙ্গদেশের নানাস্থানে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত; রাজগণ তাহাদিগকে আপনাদের রাজ্যে শান্তভাবে বাস করিবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়া, বাস করিবার অনুমতি দিতেন। যাহাতে তাহারা প্রদত্ত-গ্রামসমূহে প্রবেশ করিয়া উৎপাত না করে, তাহাদিগকে এইরূপে নিষেধ করা হইয়াছে।

এই সকল বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তৎকালে শাসন-প্রণালীর কিরূপ উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ছিল এবং রাজগণের প্রজাসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কিরূপ ঐকান্তিক যত্নছিল। যে রাজতন্ত্র এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল, তাহার শাসন-কার্য্য যে সুন্দররূপে চলিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাম্রশাসনোক্ত আর একটী বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, তাহা রাজকর লইয়া। পূর্ব্বকালে ভূমির পরিমাণের উপর রাজকর

নির্ভর করিত না,—উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের সহিত রাজকরের সংস্রব ছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"পুরাতন তাম্রশাসনে যে সকল ভূমিদান-বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে, তাহার আলোচনার সূত্রপাত হইলেও, সে আলোচনা এখনও একটী নির্দ্দিষ্টপথে ধাবিত হইতেছে। এই সকল পুরাতন ভূমিদানপত্রে চতুঃসীমা লিখিত হইলেও, ভূমির পরিমাণ লিখিত নাই। তৎপ্রসঙ্গে আর একটী উল্লেখ-যোগ্য বিষয় লিখিত আছে। কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাই ভূমির পরিমাণরূপে উল্লিখিত। ইহাতে ভারতবর্ষের একটী উল্লেখ-যোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান লাভ করা যায়। অতি পুরাকালে ভূমির পরিমাণের সহিত রাজকরের সংস্রব ছিল না;—উৎপন্ন শস্যের সহিত তাহার একমাত্র সংস্রব ছিল। তাহাও আবার প্রতিবৎসরের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করিত। যে বৎসর যাহা উৎপন্ন হইত, সেই বৎসরের জন্য তাহারই অংশ বিশেষ রাজপ্রাপ্য বলিয়া গৃহীত হইত। ইহার মূলে যে শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কোনক্রমেই শোষণ-ব্যবস্থা বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। তাহাতে প্রজাই ভূস্বামী, রাজা প্রজার রক্ষকরূপে পরিকল্পিত। এই শাসন-ব্যবস্থা উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত হইবার সময় হইতেই প্রজাকে ভূমি অধিকারের জন্য কর প্রদান করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। তখন হইতেই আর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের দ্বারা ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশের প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে;—ভূমির আয়তনের দ্বারা পরিমাণ নির্দ্দেশের নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। শস্য উৎপন্ন হউক বা না হউক, তাহার উপর এখন আর রাজকর নির্ভর করে না। * * * দেশের লোকের প্রকৃত সুখদুঃখের মূল কারণ এই শাসন-নীতির প্রবল পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে।" *

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (রঙ্গপুর-শাখা) তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

আমরা শুদ্ধ তাম্রশাসন লইয়া আমাদের পূর্ব্বতন শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা করিলাম। প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও এ বিষয়ের যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই সকল শাসন-নীতির বিস্তৃত আলোচনা করিতে বসি নাই; আমরা শুধু দেখাইতে বসিয়াছি, পুরাকালে আমাদের দেশের শাসন-পদ্ধতি কিরূপ সুন্দর ছিল এবং তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুণ্ড্রদেশবাসীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের আর্য্য ঋষিগণও ইহাদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঐতরেয় ও সাংখ্যায়ন শ্রৌত-সূত্রে আমরা পুণ্ড্রদিগের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। এই উভয় গ্রন্থেই পুণ্ড্রগণ বিশ্বামিত্র ঋষির অধঃপতিত বংশধর বলিয়া উক্ত হইয়াছে।১

বৈদিক কাল।

অতঃপর রামায়ণ ও মহাভারতেও পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সুগ্রীব তাঁহার বানর সৈন্যগণকে সীতার অন্বেষণে যে সমুদয় প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পুণ্ড্রদেশেরও উল্লেখ রহিয়াছে। তৎকালে পুণ্ড্রগণ রেশমী কার্য্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের দেশে রৌপ্যের আকর ছিল।২ আদিপর্ব্বের একস্থানে দীর্ঘতমা

রামায়ণ ও মহাভারত।

১। See Notes on the Geography of Old Bengal by Monmohan Chakravarty M.A., B.L., M. R. A. S. in J. A. S. B. for May, 1908, p. 267.

২। মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাংস্তথৈব চ
ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্॥ ৪০ অ, ২৩ শ্লোক।

ঋষি সুদেষ্ণা দেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার আদিত্যতুল্য তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবে; এবং এই ভূমণ্ডলে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক একটী দেশ বিখ্যাত হইবে।১ সভাপর্ব্বে বাসুদেবকে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতের অধীশ্বর বলা হইয়াছে।২ রাজসূয় যজ্ঞকালে মহাপরাক্রমশালী ভীম যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিগ্বিজয়ে প্রেরিত হইয়া অন্যান্য রাজন্যের সহিত মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেবকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। ৩ বাসুদেব, মগধাধিপ জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, একলব্য প্রভৃতি মহাবীরকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা আক্রমণ করেন। তাঁহাদের আক্রমণে দ্বারকাবাসী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে অবস্থান করিয়াছিল। এই সংগ্রামে অনেক যাদব বীর ও বঙ্গীয় বীর প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণের কৌশলে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিহত হন।৪ কাপ্তান উইলফোর্ড সাহেব তাঁহার "আনুগাঙ্গ" শীর্ষক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, গৌড়ীয়গণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্য্যোধনের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।৫ তাঁহার কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে পুণ্ড্রদেশবাসিগণ যে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন

পুরাণ।

১। অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥ ১০৪।৫০

২। বঙ্গপুণ্ড্রকিরাতেষু রাজা বলসমন্বিতঃ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবেতি যোঽসৌ লোকেঽভিবিশ্রুতঃ॥ ১৪।২০

৩। ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
সভাপর্ব্ব, ৩০ অ, ২২ শ্লোক

৪। See বিশ্বকোষ Vol. XII, p. 215.

৫। Asiatick Researches Vol. IX, p. 72.

করিয়াছিলেন ইহা বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে, কারণ পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই বিরোধ ছিল. একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মহাভারতে পুণ্ড্রগণের যেরূপ অবস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, পুণ্ড্রদেশ পূর্ব্বে করতোয়া, পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে গঙ্গা ও উত্তরে জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পৌণ্ড্র হইতে যে সকল হীরক বিদেশে প্রেরিত হইত তাহা সম্ভবতঃ এই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত।১ এই পুণ্ড্রদেশ মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই প্রাচীন সময়ে পুণ্ড্রদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ জানিতে পারা যায় না।

মনুসংহিতায়ও পুণ্ড্রদেশবাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মনুসংহিতা।

মনু বলিয়াছেন যে, পৌণ্ড্রগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্তু স্বীয় কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।২

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অতীতের গাঢ় তমোরাশি ভেদ করিয়া আমাদিগকে এক নূতন তথ্যের পরিচয় দেয়—আমরা পুণ্ড্রদেশবাসীর ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট আভাস প্রাপ্ত হই। তৎকালে ভারতক্ষেত্রে জৈন মহাবীর ও ভগবান বদ্ধদেব প্রচলিত

১। Notes on the Geography of Old Bengal in J. A. S. B. for May, 1908, p. 269.

২। শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪

মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে মহাবীর ও বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার।

ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে যে মহা বিপ্লব সংঘটন করিয়াছিলেন তাহার তরঙ্গাভিঘাতে পুণ্ড্রদেশবাসিগণও আলোড়িত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে মহাবীর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন ও সহস্র সহস্র লোককে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই সময় হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জৈনধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর পর চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সং (খৃঃ ৬৫০) যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অসংখ্য দিগম্বর জৈন দেখিয়াছিলেন তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে সম্ভবতঃ মহাবীরের সময়ে আসিয়া উপনীত হইতে হয়। কথিত আছে যে, বুদ্ধদেবও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া তিন মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ইহার নরপতিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার তিন শতাব্দী পরে এই প্রদেশে অশোক একটী স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিবার শাস্তি স্বরূপ ১৮,০০০ সহস্র আজীবকের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। ভিন্ন ধর্ম্মমত পোষণের জন্য জ্যেষ্ঠ সহোদর অশোক কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে বীতাশোক পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অশোক।

হুয়েন সং এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

অতঃপর চৈনিক হুয়েন সং এর ভ্রমণকাহিনী পাঠে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায়। তিনি ৬৪০ খৃষ্টাব্দে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ভ্রমণ করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন আমরা এ স্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পরিধি ৪০০০ লি (অর্থাৎ ৮০০ মাইল) এবং ইহার রাজধানীর পরিধি ৩০ লি (৬ মাইল)। এখানে অনেক লোকের বাস। স্থানে স্থানে পুষ্করিণী ও পুষ্পোদ্যান আছে। ভূমি সমতল ও কর্দ্দমযুক্ত, প্রচুরপরিমাণে শস্য

উৎপাদন করিতে সক্ষম। এখানে অনেক পনসবৃক্ষ থাকিলেও ইহার ফল সকলের নিকট অতীব প্রিয়। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। অধিবাসিবৃন্দ শিক্ষার আদর করিয়া থাকে। এই স্থানে হীনযান ও মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের ২০টী সংঘারাম ও ১০০টী দেবালয় আছে। সংঘারাম গুলিতে ৩,০০০ সহস্র ভিক্ষুর বাস। এখানে দিগম্বর নিগ্রন্থের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজধানীর ৪ মাইল পশ্চিমে একটী বৃহৎ সংঘারাম আছে, তাহাতে ৭০০ শত ভিক্ষু বাস করে। ইহার অনতিদূরে রাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে, পূর্ব্বকালে তথাগত বুদ্ধদেব এই স্থানে দেবগণের মঙ্গলকামনায় তিন মাস কাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে একটী বিহার আছে তন্মধ্যে বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে।" হুয়েন সং এর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পরিভ্রমণ কালে বঙ্গদেশ পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যথা—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণ। মগধরাজ হর্ষবর্দ্ধন (খৃঃ ৬০৬-৪৮) ইহাদিগকে ন্যূনাধিক পরিমাণে তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই ইহারা পুনরায় স্ব স্ব স্বাধীনতা লাভ করে।

এই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় একজন নরপতিরই শাসনাধীন ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে, ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়ে আগমন করতঃ ইহার নরপতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি গৌড়রাজকে সুহৃদ্‌ভাবে কাশ্মীরে আনয়নপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নিহত করেন। গৌড়বাসিগণ কাশ্মীররাজের এবংবিধ নৃশংস ও অন্যায় ব্যবহারের নিদারুণ বার্ত্তা অবগত হইয়াই বাত্যা-সংক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার পাশবিক দুষ্কৃতির প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে যে প্রতি-

ললিতাদিত্যের গৌড় রাজহত্যা।

হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহার সমক্ষে কাশ্মীরীয় সৈন্যগণ পতঙ্গ-পালের ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গৌড়ীয়গণ রামস্বামীর মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। অবশেষে সাগরতরঙ্গের ন্যায় মহতী কাশ্মীরীয় চমূ আসিয়া পড়িল এবং উভয়দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। গৌড়ীয় সৈন্যগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু হায়! মুষ্টিমেয় সৈন্য গণনাতীত কাশ্মীরীয় সৈন্যগণের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে? তাহারা সকলে একে একে এই ভীষণ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল!

কাশ্মীরে গৌড়বাসীর যুদ্ধ।

গৌড়বাসিগণ এই তুমুল সংগ্রামে যে অদম্য সাহস, ঐকান্তিকী প্রভুভক্তি ও অসীম বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তদুল্লেখে দ্বাদশ শতাব্দীর "রাজতরঙ্গিণী" প্রণেতা কাশ্মীর রাজসভার পণ্ডিত কহ্লন বলিয়াছেন—

কহ্লন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সেনার প্রশংসা।

গৌড়োপজীবিনামাসীৎ সত্ত্বমত্যদ্ভুতং তদা।
জহুর্যে জীবিতং ধীরাঃ পরোক্ষস্য প্রভোঃ কৃতে॥ ৩২৫
তদীয়রুধিরাসারৈঃ সমভূদুজ্জ্বলীকৃতা।
স্বামিভক্তিরসামান্যা ধন্যা চেয়ং বসুন্ধরা॥ ৩৩১
অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥ ৩৩৫

রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ।

এই দুর্য্যোগের সময় গৌড়, শূরবংশীয়গণের হস্তগত হইল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে জয়ন্ত গৌড়ের রাজা হইলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহার রাজধানী ছিল। জয়ন্ত কাশ্মীররাজ জয়াদিত্যের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জয়াদিত্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ

আদিশূর।

করিয়া ইহার বিভূতি ও সম্পদ দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।১ এখানে তিনি গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণীদেবী ও দেবনর্ত্তকী কমলার পাণিগ্রহণ করেন। জয়ন্ত সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ক্রমশঃ রাজ্য বিস্তার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যে সমুদয় বঙ্গ করতলগত করিলেন। কথিত আছে, জয়াদিত্য পঞ্চ গৌড়াধিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বীয় শ্বশুরকে গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছিলেন।২

ইহার পর তিনি আদিশূর উপাধি গ্রহণ করেন। বৌদ্ধপ্রভাবে বঙ্গে বেদবিৎ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞের নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন এবং লুপ্তপ্রায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুদ্ভব সাধন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী 'হোমন্ দীঘি' নামক স্থানে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন।*

পালবংশ।

পালবংশীয় নরপতিগণের দানপত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আদিশূরের পর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত হয়। ধর্ম্মপাল (খৃঃ ৮০০) পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত চারিটী গ্রাম ভিক্ষুদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য সবিশেষ প্রযত্নও লইয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসন সময়েই গৌড়নিবাসী শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব (খৃঃ ৭৫০) যথাবিহিতরূপে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন

১। প্রবিবেশ ক্রমেনাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
তস্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ। ৪২২

২। ব্যধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চ গৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্। ৪৬৮

রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ।

* এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে, কাহারও কাহারও মতে বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানেই উক্ত যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণগণও তথায়ই আগমন করেন।

এবং দ্বিশতাব্দী পরে এই ধর্ম্মের ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকিলে বিক্রমপুর নিবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (খৃঃ ৯৮০-১০৫৩) প্রভৃতি চল্লিশ পঞ্চাশ জন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গমন করিয়া লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করেন। এই পালনৃপতিগণের শাসন কালেই প্রসিদ্ধ উদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইদানীং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (আধুনিক পাণ্ডুয়ায়) যে ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয় তাহার উপাদানের অধিকাংশই পালনরপতিগণের আমলে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গের স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণ পাণ্ডুয়াকে বিবিধ মসজিদ ও অট্টালিকায় শোভিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই সকল মসজিদ ও অট্টালিকার উপাদান ইষ্টক ও প্রস্তর যে বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দু-দেবালয় ধ্বংস করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কারণ পাণ্ডুয়ায় যে সমুদয় মসজিদাদি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাদের গাত্রস্থিত ইষ্টক ও প্রস্তরফলকে পদ্ম, হস্তী, অশ্ব, নাগ, নাগিনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি বিবিধ হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। পাণ্ডুয়ার তড়াগ-সমূহও অদ্যাবধি হিন্দু ও বৌদ্ধ নরপতিগণের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই স্থানে শত শত বৃহৎ পুষ্করিণী এখনও পথিকের নয়নপথে পতিত হয়। সমস্তই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা সুতরাং ইহারা যে মুসলমান কর্ত্তৃক খোদিত নহে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

তিরিমলয়গিরি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, দশম শতাব্দীতে গৌড় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সময়ে রণশূর দক্ষিণরাঢ়ে, মহীপাল উত্তররাঢ়ে, গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গে ও ধর্ম্মপাল পুণ্ড্রভুক্তি বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন; দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্রচোলদেব (খৃঃ ১০১৮-৩৫) ইহাদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

পাল-বংশীয় নৃপতিদিগের পতনের সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত হয়। সেনরাজাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্ত্তক বল্লালসেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মগধের পালনরপতিগণের হস্ত হইতে বঙ্গদেশের অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। এই সময় হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সেনরাজ্যভুক্ত হইয়া থাকিবে। সেনরাজগণ প্রথমাবস্থায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত গৌড়নগরে (আধুনিক মালদহ জেলায়) বসতি করিয়াছিলেন। মালদহ ইংরেজবাজারের দুই মাইল পশ্চিমে উচ্চ প্রাকার ও পরিখা-বেষ্টিত, তাল ও তরাগরাজি সমন্বিত একটি পরিত্যক্ত স্থান অদ্যাবধি "বল্লালবাড়ী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বল্লালবাড়ীর প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অদ্যাবধি প্রস্তরনির্ম্মিত একটী অত্যুচ্চ দ্বার বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাকে সকলে দ্বারবাসিনী বলে। এই দ্বারের গাত্রে একটী কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই জন্যই ইহার নাম দ্বারবাসিনী। ইহা হিন্দু গৌড়ের উত্তর-পশ্চিম দ্বার ছিল।

দ্বারবাসিনী।

দ্বারবাসিনীর এক মাইল দক্ষিণে "বড় সাগরদীঘি"। ইহা প্রায় এক মাইল লম্বা ও অর্দ্ধ মাইল চওড়া। কথিত আছে, এই দীঘি লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক খোদিত হয়।

বড় সাগরদীঘি।

সাগরদীঘির প্রায় ২ মাইল দক্ষিণে "পাতালচণ্ডী"। দ্বারবাসিনী হইতে পাতালচণ্ডীপর্য্যন্ত একটী মৃত্তিকা গড় আছে। হিন্দু রাজাদিগের সময়ে সম্ভবতঃ এখানে চণ্ডীদেবীর পূজা হইত বলিয়া এই স্থান পাতালচণ্ডী বা পাটলা চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি এই স্থানে প্রস্তরে খোদিত চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি পতিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পাতাল চণ্ডী।

পাতালচণ্ডী হিন্দু গৌড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বার। ইহার পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বকালে গঙ্গা প্রবাহিত হইত। গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাত প্রতিরোধ করিবার জন্য বৃহৎ প্রস্তরে যে সুদৃঢ় জেটি (Pier) নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ এখনও সন্তোষজনক অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

জেটী (Pier)।

গড়ের উপরে কতিপয় বুরুজ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থান "লোহা গড়" বলিয়া খ্যাত। এই স্থান হইতে গঙ্গাবক্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইত। জলপথে আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের গতাবিধি লক্ষ্য করিবার ইহা উপযুক্ত স্থান। সম্ভবতঃ উচ্চস্থান হইতে শত্রুপক্ষের উপর গোলাবর্ষণ করিবার জন্য বুরুজগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

লোহাগড় বুরুজ।

গঙ্গা এক্ষণে এইস্থান হইতে প্রায় ১৮।২০ মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে, তথাপি অদ্যাবধি এখানে যে একটি জলপূর্ণ বিস্তৃত দহ রহিয়াছে তাহা দেখিলে বোধ হয় এখানে কৃত্রিম পোতাশ্রয় ও বন্দর তৈয়ারী করা হইয়াছিল।

দহ (খাত), সম্ভবতঃ পোতাশ্রয় ও বন্দর।

সেনরাজাদিগের রাজত্বকালে গৌড়নগরী কিরূপ সুরক্ষিত ছিল এই সমস্ত স্থান দেখিলে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বল্লালের পর লক্ষ্মণসেন ও বিশ্বরূপসেন বহুকাল যাবৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন শাসন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে উৎকল পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছিল। তিনি পণ্ডিতবর্গের অত্যন্ত পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেন। তাঁহার বদান্যতা সম্বন্ধে "তবকতি-নাসিরিতে" লিখিত আছে যে, তিনি অত্যন্ত কম দান করিলেও একলক্ষ কড়ি দান করিতেন। পবনদূত-রচয়িতা কবি দহিক বলিয়াছেন যে, তিনি

সেনবংশ।

লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে হস্তী ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত মক্ষিকা-নিবারণকারী যন্ত্র দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গীত-গোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব, যাঁহার সুললিত সঙ্গীতে একদিন সমুদয় বঙ্গদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল;—তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় বিরাজিত ছিলেন। গোবর্দ্ধন, শরণ, উমাপতি, কবিরাজ, হলায়ুধ প্রভৃতি আরও কতিপয় উজ্জ্বলরত্ন এই সভার শোভা-বর্দ্ধন করিয়াছিল। সেনরাজগণ আপনাদিগকে পরম-বৈষ্ণব বলিতেন। সম্ভবতঃ পালরাজাদিগের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত বৌদ্ধ-প্রভাবের প্রতিবাদ-স্বরূপ ব্রাহ্মণগণকেও সংস্কৃতচর্চ্চার পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁহাদের নীতি-সিদ্ধ ছিল। এই সময় হইতেই নদীয়ায় টোল স্থাপিত হইয়াছিল। ১

মুসলমান রাজত্ব।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের শেষভাগে বক্তিয়ার খিলিজি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ জয় করেন এবং গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন (খৃঃ ১২০৩)। মুসলমান বিজয়ের পর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নাম বিলুপ্ত হয় এবং এই সময় হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হজরত পাণ্ডুয়া নামে অভিহিত হইতে থাকে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারমূলক কুশাসনের ফলে বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে। এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি হাজি ইলিয়াস সাহ (খৃঃ ১৩৪৩-৫৮) গৌড় হইতে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ পাণ্ডুয়া হইতেই বঙ্গদেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। এই সময়ে পাণ্ডুয়া বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত প্রাসাদ ও মসজিদে শোভিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে আদিনা মসজিদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ইহা সেকেন্দরসাহ কর্ত্তৃক ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

১ See Sanskrit Literature in Bengal during the Sena Rule—By Monmohan Chakravarty in J. A. S. B. May, 1906.

দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ তোগলক (খৃঃ ১৩৫১-৮৮) দুইবার বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন এবং দুইবারই অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে চতুর্দ্দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত সুরক্ষিত এক-ডালা দুর্গ বঙ্গনরপতিগণের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল. দিল্লী সম্রাট্ অসংখ্য সেনানীর অধীশ্বর হইয়াও এই দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হন নাই।

ফিরোজ তোগলকের আক্রমণ।

পাণ্ডুয়া পুনরায় কিছুদিনের জন্য হিন্দুনরপতির শাসনাধীন হইয়াছিল। রাজা কংস বা গণেশ (খৃঃ ১৩৮৫-৯২) সাত বৎসর-কাল অতি কৃতিত্বের সহিত পাণ্ডুয়ার মসনদে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া-নগরীর যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং হিন্দু-দেবালয় পুনর্ব্বার মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক অতীত গৌরব-কাহিনীর পুণ্যময়স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরূক করিয়া দেয়।

হিন্দুর পুনরভ্যুদয় রাজা গণেশ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঙ্গাপ্রবাহের দিক্ পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন রাজ-ধানী পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে নীত হয়। এই সময় হইতেই পাণ্ডুয়ার বৈভব সম্পদ দিন দিন লোপ পাইতে থাকে ও অবশেষে ইহা শ্বাপদ-সঙ্কুল বিশাল অরণ্যে পরিণত হয়।

পাণ্ডুয়ার ধ্বংসারম্ভ।

আজকাল এই স্থানে কতিপয় মুসলমান গৃহস্থ ও সাঁওতালের বাস, অধিকাংশ জমিই পতিত রহিয়াছে—স্থানে স্থানে কেবল মৃত্তিকা ও ইষ্টকের স্তূপ এবং পুষ্করিণী গোচর হয়। রাজপ্রাসাদ মস্‌জিদ ও দরগা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি সহস্র সহস্র লোকের মন মুগ্ধ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে আদিনা মসজিদ, একলাখি মস্‌জিদ ও নূরকুতুব-উল আলমের দরগা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কিছুদিন হইতে এইদিকে গভর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। এই

বর্ত্তমান কাল।

ভগ্ন অট্টালিকাগুলি রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টায় সময় সময় ইহাদের জীর্ণ-সংস্কার হইয়া থাকে।

পাণ্ডুয়ার জলবায়ু ইদানীং অতীব অস্বাস্থ্যকর ম্যালেরিয়া রোগের আকর।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যেরূপ প্রাচীন স্থান এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহা যেরূপ বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার লীলাস্থল ছিল, তাহাতে বঙ্গেতিহাসের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বিশেষ স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য এবং ইহার একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রণীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, মালদহ-নিবাসী ধরমপুর-জাতীয়-বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে এই পুণ্য-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং ইতিহাস-প্রণয়নোপযোগী প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, প্রস্তর ও তাম্রমূর্ত্তি, প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি বহু উপকরণেরও সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস" বাহির হইয়া বঙ্গেতিহাসের একটী প্রধান অধ্যায় উজ্জ্বল করতঃ সমগ্র বঙ্গদেশের একটী অবিকৃত ও সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রণয়নের পথ অনেকটা সুগম করিয়া দিবে।

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস প্রণয়ন।

এই সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কে বলিবে, বাঙ্গালী ভীরু ও কাপুরুষ ছিল এবং অষ্টাদশ অশ্বারোহীর ভয়ে লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়াছিলেন?

নিজের বলিয়া গৌরব করিবার উপযুক্ত কোন কীর্ত্তি চিহ্ন দেখিয়া যদি কাহারও নয়ন পরিতৃপ্ত করিবার বাসনা থাকে, তবে তাহাকে মালদহের শ্মশান-ভূমিতে ভস্মরাশির অনুসন্ধান করিতে হইবে। কেবল

মালদহই অতীতের কীর্ত্তিরাশির দু'একটী চিহ্ন বিরলে বক্ষে ধারণ করিয়া অদ্যাপি প্রাচীনকালের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে;—কেদার রায়ের সাধের শ্রীপুর ও রাজা রাজবল্লভের রাজনগর পদ্মার তরঙ্গপ্রহারে চির-দিনের জন্য ধরাবক্ষ হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীবিজয়কুমার সরকার।

ভারতে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দিল্লীর দাসবংশীয় সম্রাটগণের মধ্যে আলতামস কি তাহার কন্যা রিজিয়ার প্রচলিত ধাতব মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখা যায় না। আলতামসের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাগুলির অধিকাংশই তাম্র এবং রৌপ্যের সংমিশ্রণে এক অভিনব ধাতু প্রস্তুত করিয়া নির্ম্মিত হইত।

বালবণের পর দিল্লীর সম্রাটগণের মধ্যে আর কেহ বৃষ ও অশ্বারোহী অঙ্কিত মুদ্রা নির্ম্মাণ করেন নাই। আল্লাউদ্দিন স্বীয় রাজত্ব সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই বহুপ্রকারের তাম্র-রৌপ্য ও আলতামসের ন্যায় মিশ্র ধাতুর মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁহার প্রচারিত স্বর্ণ মুদ্রার সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু সেইগুলির স্বর্ণতত বিশুদ্ধ ছিল না। এবং সম্ভবতঃ দেশীয় রাজন্যবর্গের ধনাগার লুণ্ঠনে প্রাপ্ত স্বর্ণ হইতে এই সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র কুতবুদ্দিন মোবারক মুদ্রার আকার পুনরায় চতুষ্কোণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সাহা-জাহানের রাজত্ব পর্য্যন্ত বহুবার মুদ্রার আকৃতি এইরূপ চতুষ্কোণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তোগলক বংশের প্রসিদ্ধ সুলতান মহম্মদ বিন তোগলক কতকগুলি পিত্তল-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন-প্রয়াসী হন। ঐ গুলি রৌপ্যের ন্যায় সমাদর প্রাপ্ত হউক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তিনি তজ্জন্য উহার পৃষ্ঠে প্রজাবৃন্দকে উপদেশপ্রদানচ্ছলে নিম্নলিখিত বাক্য কয়টি লিপিবদ্ধ করেন। যথা "সুলতান মহম্মদ বিন তোগলককে সম্মান করিলে সত্যই ভগবানকে সম্মান করা হয়।" এই বাক্যটির সমর্থনের জন্য তিনি তাহারই পার্শ্বে কোরাণের এই শ্লোকটীও অঙ্কিত করাইয়াছিলেন যেমন—"ঈশ্বর, প্রেরিত পুরুষ ও রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।" এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার পিত্তল-মুদ্রাগুলি রৌপ্য মুদ্রার ন্যায় কেহ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তোগলকাবাদের দুর্গাভ্যন্তরে রাশি রাশি পিত্তল-মুদ্রা স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

মহম্মদ তোগলকের নির্ম্মিত মুদ্রাগুলির আর একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি মুদ্রাগুলির অপর পৃষ্ঠে স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে মুসলমান জাতির সম্মানিত মিসর প্রদেশের ভূপতির নাম অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর ভারতবর্ষে লোদী বংশের আবির্ভাব হয়। তাহাদের প্রচারিত মুদ্রাগুলিতে তেমন বিশেষত্ব দেখা যায় না। ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে বাবর ইব্রাহিম লোদীর হস্ত হইতে ভারত সিংহাসন কাড়িয়া লন। সেই সময় হইতেই মুদ্রানির্ম্মাণ-প্রণালীর প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। বাবর-পুত্র হুমায়ূনের প্রতিদ্বন্দ্বী শেরশাহ এই উন্নতি বিধান করেন। সেই সময় হইতে ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ঐ প্রণালীতেই মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান ব্রিটিস রাজত্বের কালেও সে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। শেরশাহ মিশ্র ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন রহিত করিয়া সুগঠিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা সকল নির্দ্দিষ্ট ওজনে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত করেন। তাঁহার রৌপ্য-মুদ্রা গুলির পরিমাণ ১৮০ গ্রেইন ছিল। তন্মধ্যে প্রতি মুদ্রাতেই

১৭৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য প্রদত্ত হইত। বর্ত্তমানেও এই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। উহার পৃষ্ঠে আরবী ও নাগরী ভাষায় রাজার নাম অঙ্কিত হইত।

আকবর রাজত্বের প্রথম ভাগে যে সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হয় সেগুলি শেরশাহের অনুকরণে মুদ্রিত হইলেও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ ছিল এবং সেগুলি আরবী শ্লোকাবলীতে পূর্ণ থাকিত। তাঁহার পরের প্রচারিত মুদ্রাগুলির পরিধি অনেক ক্ষুদ্র।

উদার-হৃদয় আকবর বহু-ধর্ম্মের সমন্বয়ে ভারতে এক নবধর্ম্ম-প্রচারে যত্নবান হন। তিনি সেই নব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের দিবস হইতে এক নব শক বা নব অব্দ গণনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পরবর্ত্তী মুদ্রা-সমূহে এই নব অব্দের সন্নিবেশ দেখা যায়। ইং ১৫৫৬ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে এই নব অব্দের সূত্রপাত হয়, এই সন হইতেই উহার ১ম অব্দ বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত এই সকল মুদ্রা-সমূহে আরবের চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে পারস্যের সূর্য্য মাসের উল্লেখ দেখা যায়। আকবরের প্রবর্ত্তিত বহু মুদ্রার গাত্রে "আল্লা হো আকবর" এই দ্বি অর্থ বোধক বাক্য অঙ্কিত থাকিত। তাহাতে আল্লাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা আকবরই আল্লা এই উভয় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইত। আকবর তাহার পুত্র জাহাঙ্গীর ও পৌত্র সাহাজাহানের ন্যায় কোন বস্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার পক্ষে কোরাণের নিষেধাজ্ঞায় কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার প্রাসাদের প্রাচীরাবলী নানা চিত্রে সুশোভিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত মুদ্রাগুলির মধ্যে কচিৎ প্রতিকৃতির ব্যবহার দেখা যায়। আকবরের প্রচারিত আরও কতকগুলি মুদ্রা আছে, সমচতুষ্কোণ সেগুলির এবং সেগুলির কোণ-সমূহে মহম্মদের প্রধান চারি অনুচরের নাম দেখা যায়। ভবিষ্যতে ভারতের নরনারীগণ ঐরূপ মুদ্রা পবিত্র কবচের ন্যায় স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিতেন। আকবরের সুবিস্তৃত রাজ্যে যথেষ্ট

মুদ্রা প্রচলনের জন্য তিনি প্রায় ৭০টী মুদ্রাশালা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর প্রথমতঃ মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে সর্ব্বতোভাবেই প্রায় পিতার অনুকরণ করিয়াছিলেন। শুধু পিতার প্রবর্ত্তিত নব শকের পরিবর্ত্তে তাহাদের চির প্রচলিত পুরাতন মুসলমান শকেরই পুনঃ প্রচলন করেন। মুদ্রার গাত্রে পিতার অনুকরণে দুই পংক্তি পারস্য কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের সময়ে কোনরূপ তাম্র-মুদ্রা মুদ্রিত হয় নাই। সেই সময়ে শেরসাহ ও আকবরের সময়ের যথেষ্ট তাম্রশাসন বিদ্যমান থাকাতেই উহা মুদ্রণের আর প্রয়োজন হয় নাই।

জাহাঙ্গীরের নির্ম্মিত স্বর্ণমুদ্রাগুলি বস্তুতই নয়নমুগ্ধকর ছিল। স্বীয় প্রণয়িনী নূরজাহানের প্রতি তাঁহার গভীর প্রেম তাঁহাকে তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে মুদ্রা-গাত্রে স্বনামস্থিত প্রণয়িনীর নাম অঙ্কিত করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। মুসলমান বাদসাহগণের মধ্যে জাহাঙ্গীর ব্যতীত আর কাহাকেও মুদ্রাগাত্রে স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে দেখা যায় নাই। ইঁহার নানাপ্রকার অবস্থার প্রতিকৃতিই উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পান-পাত্র হস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার মদিরাশক্তিরই পরিচয় প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত কোন কোনও মুদ্রায় মাসের নামের পরিবর্ত্তে সেই মাসের নির্ণয়কারি-রাশিচক্রস্থিত জন্তুর আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ফরোয়াদ্দিন (বৈশাখের) পরিবর্ত্তে মেষ আর্দ্দিবিহিস্ত (জ্যৈষ্ঠের) পরিবর্ত্তে বৃষ ইত্যাদি অঙ্কিত হইত। জাহাঙ্গীরই একমাত্র এই প্রথার উদ্ভাবনকারী আর কোনও বাদশাহই তাহার অনুসরণ করেন নাই।

সম্রাট্ সাহজাহানের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা-সমূহে তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীরের এই সব খেয়াল পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি অতি অল্প-সংখ্যক তাম্র-মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত আর এক প্রকার

শ্বেতবর্ণের পিত্তল-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি সম্ভবতঃ বঙ্গ-প্রদেশে পর্ত্তুগীজদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা সকলের প্রচলনের ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।*

ধর্ম্মোন্মত্ত ঔরঙ্গজেবের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাগুলি কর্কশ ও সৌন্দর্য্যহীন ছিল। অবিশ্বাসীর হস্তে পতিত হইবে বলিয়া, তিনি অপর বাদশাহ্‌গণের কোরাণের শ্লোক উহাতে অঙ্কিত করেন নাই। শুধু ঐ সকল মুদ্রার গাত্রে মুদ্রাশালের নাম লিখিত থাকিত।

ঔরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী মোগলবাদশাহদিগের অঙ্কিত মুদ্রাসমূহে উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় দেখা যায় না। কেবল রাজ্যের নানারূপ গোলযোগ সত্ত্বেও মুদ্রাগুলি তাহাদের সৌন্দর্য্য পরিমাণ ও পরিচ্ছন্নতা অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর ১৭১৭ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি তদানীন্তন বাদশাহ্ হইতে বঙ্গে-প্রদেশে মুদ্রা নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং পরিশেষে ক্রমে ১৭৪২ খৃঃ অব্দে আর্কট নগরে ১৭৫২ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় মুদ্রা-নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যে সকল মুদ্রা নির্ম্মাণ করেন, সেগুলি মোগলদিগের অনুকরণেই মুদ্রিত হইয়াছিল, কেবল অপর পৃষ্ঠে (Cinquefoil and lion) সিংহ ও অশ্বের ন্যায় জন্তু বিশেষের প্রতিকৃতি দেখা যাইত। কোম্পানি পরিশেষে বারাণসী, ফরাক্কাবাদ ও অন্যান্য স্থানেও তঙ্কশালা স্থাপন করেন।

অতঃপর কোম্পানি তদানীন্তন শাসন কর্ত্তৃবিভাগ হইতে বাদশাহী মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতে আদিষ্ট হন এবং সেই সময় হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ মুদ্রা নির্ম্মাণ করেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে

* See Sopara or Podana Bombay Educ Soc Press. p. 7 pt. II, 9; reprinted from J Bom. R. A. S 1882.

কলিকাতার মুদ্রাশালা হইতে শাহা আলম বাদসাহের নামাঙ্কিত মুদ্রার অনুকরণে এবং মুর্শিদাবাদ হইতে উক্ত বাদশাহের ১৯ বর্ষ রাজত্বকালের প্রচলিত সিকার অনুকরণে মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। এই গুলি সিক্কা রূপা বলিয়াই অভিহিত হইত; কিন্তু ফরাক্কাবাদ হইতে উক্ত বাদশাহের ৪০ বর্ষ রাজত্বকালের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রণ প্রচলিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

১৮৩৫।৬ খৃঃ অব্দে কোম্পানি বাদশাহের নামের পরিবর্ত্তে William মস্তকাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিয়া, তাহাদের পূর্ব্ব-প্রচলিত মুদ্রাগুলির প্রচলন রহিত করিয়া দেন। এই সকল মুদ্রার ওজন ১৮০ গ্রেণ (১ তোলা) ছিল। তন্মধ্যে ১৭৫ গ্রেণ খাঁটী রৌপ্য প্রদত্ত হইত। তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঐরূপ ওজনেই মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের মুদ্রাগুলিতে আমাদের সম্রাট্ Edward VII মস্তক মুদ্রিত হইয়া থাকে। তৎপূর্ব্বে জগৎমান্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মস্তক অঙ্কিত হইত। এই সকল মুদ্রা এক্ষণে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

বঙ্গ, মালোর, জোয়ানপুর, গুজরাষ্ট্র প্রভৃতির স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণ সময় সময় যে সকল মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি দিল্লীর প্রচলিত মুদ্রার অনুকরণেই নির্ম্মিত হইত এবং সেইগুলিতে তেমন বিশেষত্ব কিছু দেখা যায় না। আসামের আহোম বংশ একপ্রকার সুগঠিত অষ্টকোণবিশিষ্ট মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগলবংশের অধঃপতনের সহিত ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে যে সকল দেশীয় নৃপতিবৃন্দের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, তাহাদের প্রচারিত মুদ্রাগুলির গঠন-প্রণালী বড়ই কর্কশ ছিল। পরিশেষে তাহাদিগের অধিকাংশকেই ব্রিটিশ মুদ্রা প্রচলন করিতে দেখা গিয়াছে।

কোম্পানীর রাজত্ব সময়ে পর্ত্তুগীজগণ গোয়া, ডেনিসগণ ট্রাঙ্কুবার, ডচগণ পলিকট ও টিটুকরিন প্রদেশ এবং ফরাসীগণ পণ্ডিচারিতে স্ব স্ব প্রক্রিয়ানুরূপ মুদ্রা প্রচারিত করেন। এই সকল মুদ্রার যথাযথ বিবরণ Mr Thumston এবং লিখিত পুস্তকে দেখা যায়। ডেনিসগণের প্রচলিত মুদ্রা এক্ষণে সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। ১৬৪০-৮৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তাহারা কতকগুলি সীস মুদ্রার প্রচলন করেন। ইংরেজ ও ডচগণও ঐরূপ মুদ্রার প্রচলনে বিরত হইয়াছিলেন না। ফরাসীদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাগুলিতে কুক্কুট Heur-de lis অঙ্কিত দেখা যায়।

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।

মুসলমান রাজত্বে হিন্দুর প্রতিপত্তি।

মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদের কি রকম প্রতিপত্তি ছিল, এই বিষয় জানিতে হইলেই আমাদিগের ইতিহাস পাঠ করা দরকার, কিন্তু অধুনা আমাদের দেশে যে সকল ইতিহাস মুখস্থ করান হয় তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ-কালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র, কোথা হইতে কোন বিদেশী জাতি আসিল কাটাকাটি মারামারি করিয়া মারিল, ছেলে বাপকে খুন করিয়া সিংহাসন অধিকার করিল, পাঠান মোগল রাজত্ব করিল তৎপরে ইংরাজ আসিয়া রাজদণ্ড কাড়িয়া লইল, ক্রমে ক্রমে দশ বারজন গবর্ণর জেনেরল ভারতে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে আসিল আবার চলিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করা হইল না কাজেই আমরা প্রকৃত ইতিহাস জানিতেও পারি না। তখনকার সময়ে যে কাটাকাটি মারামারিটাই ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার ছিল তাহা নহে, হইতে

পারে যাহারা রাজত্ব করিতেছিল তাহাদের রাজত্ব ধ্বংস হইল ইহা তাহাদের পক্ষে প্রধান ঘটনা কিন্তু আর্য্যদিগের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ইতিহাস নহে। ঝড়ের দিনে যে পথিকের নদীতে নৌকা ডুবিয়াছিল সেই পথিকের পক্ষে সেই ঝড়ই সেই দিনকার প্রধান ঘটনা কিন্তু যদি কোন গৃহস্থের ঘরে সেই ঝড়ের সময় জন্ম-মৃত্যুর কোন সুখ বা দুঃখ প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের পক্ষে সেই ঝড়ের চেয়ে ঐ জন্ম-মৃত্যুর কথাটাই অধিক স্মরণযোগ্য। হইতে পারে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ পাঠান ও মোগলদিগের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয়, কিন্তু আর্য্যদিগের পক্ষে কবীর, নানক প্রভৃতির জন্মদিনই অধিক স্মরণীয় বিষয়।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, মুসলমানেরা খ্রীঃ ৬৬২ অব্দে ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করেন। তখন তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেও তাহাদের ধর্ম্ম এদেশে বদ্ধমূল হয় নাই। তখন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল, বৌদ্ধ নৃপতিদের সময় হিন্দুধর্ম্ম কিছু মলিন হইয়া পড়িয়াছিল; তৎপর মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের যে পুনরুত্থান সাধিত হইয়াছিল, মুসলমান আক্রমণের প্রথম অবস্থায় ভারতের হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব সেইরূপই বিরাজমান ছিল। কিন্তু সুলতান মামুদের আক্রমণের সহিত ভারতের অদৃষ্ট-বিধাতা আর্য্যদিগের প্রতিকূল হইলেন। এই সময় হইতেই মুসলমান দ্বারা আর্য্যদিগের সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যে কষ্ট করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সাধন করিয়াছিলেন, সুলতান মামুদের ভীষণ অত্যাচারে তাহার পতন হইতে আরম্ভ হইল। সেই সময় মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল যে,হিন্দুদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিলেই তাহাদের পুণ্য ও গৌরব বৃদ্ধি হয়। মুসলমানগণ এই সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেও তাহারা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে ছিলেন না। তখনও ভারতবর্ষ হিন্দুরাজাদের অধীনই ছিল। কিন্তু যে দিন দৃশদ্বতী-তীরে হিন্দু-বীর পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হইল

এবং বিজয়-লক্ষ্মী মুসলমানদিগের অঙ্কশায়িনী হইলেন সেই দিন হইতেই ভারতবর্ষের প্রকৃত অধঃপতন হইল। সাহাবদ্দিনের বিজয়-পতাকা ভারতে পৎ পৎ শব্দে উড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে মুসলমানগণ আর্য্যদিগকে যথেষ্ট ঘৃণা করিতেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিল এবং মুসলমানদের চেষ্টা আংশিক রূপে ফলবতীও হইয়াছিল। পাঠান রাজত্বের প্রথম অবস্থায় হিন্দুদিগকে অনেক কষ্টেই কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল, সে সময় হিন্দু মুসলমানের ভিতরে যথেষ্ট বিদ্বেষভাব ছিল এবং বিজিত ও বিজেতার যে পার্থক্য থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান ছিল। কিন্তু পাঠানেরা ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান জয় করিতে সক্ষম হয় নাই, ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই সে সময় হিন্দুদিগের অধিকার ছিল, মুসলমানদিগের আধিপত্য তৎকালেও দিল্লীর চতুস্পার্শ্বেই প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় হিন্দুগৌরব কবীর, বল্লভাচার্য্য, রামানুজ, রামানন্দ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। পাঠান রাজত্বের সময় কাশ্মীরে শৈব মতাবলম্বী হিন্দুদিগের অধিকার ছিল, পাঠানেরা এস্থানে আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমুল করিতে পারেন নাই। রাজপুতনা, মিবার, মারওয়ার, বিকানের, যশল্মীর প্রভৃতি হিন্দু-রাজ্য স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, মুসলমানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণেও ঐ সকল রাজ্য স্বাধীনতা-বর্জ্জিত হয় নাই। দক্ষিণাপথ, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, কর্ণাট প্রভৃতি স্থানেও হিন্দুরা পাঠান রাজত্বের কতক সময় পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। মহীশূর রাজ্যের হিন্দুরাজারা ক্রমাগত ৫০ বৎসর যাবৎ মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে মহারাষ্ট্রে হিন্দুরাজ্যের বিলোপ ঘটে, দক্ষিণাপথে বিজয়নগরে হিন্দুরাজগণ বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত রাজত্ব করিতেছিলেন এবং তাঁহারা অনেক দিন যাবৎ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে মুসলমানগণ আধিপত্য স্থাপন করি-

লেও হিন্দুদিগের অবস্থা মন্দ ছিল না। প্রধান প্রধান রাজ কার্য্যের ভার হিন্দুদিগের উপরই ন্যস্ত ছিল। হিন্দুরা রাজস্ব আদায় করিতেন এবং উহা রাজকোষে জমা দিতেন। হিন্দুরা সেনাপতির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন, এ সময় হিন্দু ও মুসলমানের বিদ্বেষভাব অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়াছিল।

মুসলমান অধিকারে বাস করিয়া হিন্দুরা একেবারে নির্জীব ছিলেন না, অনেক হিন্দু সেনাপতি দেশ-বিজয়কার্য্যে সহায়তা করিয়া অনেক সময় জায়গীর প্রাপ্ত হইতেন, কেবল যে হিন্দুরা মুসলমানদের দাসত্ব করিতেন তাহা নহে, মুসলমানগণও হিন্দুদের অধীনে কার্য্য করিতেন। মুসলমানভৃত্যগণ যে হিন্দুদিগকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। বাহামনী-রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলেই ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যদিও মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, তথাপি আবার মুসলমানের ভিতরেও অনেকে হিন্দুধর্ম্মের উজ্জ্বল মহিমা দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ হইয়াছিল, অনেক মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরম বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পাঠান-রাজত্বের সময় উড়িষ্যায় হিন্দুদিগের অধিকার ছিল। বঙ্গদেশ যদিও গৌড়নগর বক্তিয়ার খিলিজী দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া, ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন, তথাপি বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাজাদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। সুন্দরবন সন্নিহিত স্থানে স্বাধীন হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন, আগরতলা এবং কোচবিহারে স্বাধীন হিন্দুরাজাগণ নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন। এই সময় পাঠানদিগের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইলে বিজয়লক্ষ্মী মোগলদিগের অঙ্কশায়িনী হইলেন। ভারতাকাশে মোগলদিগের বিজয়পতাকা পত পত শব্দে উড়িতে আরম্ভ করিল। ভারতে মোগল রাজত্বের প্রথম সময়েই ফতেপুর সিকরির

যুদ্ধে হিন্দুদিগের অনেক প্রাধান্য বিনষ্ট হইল এবং এই পতনের পর হইতে হিন্দুদিগকে অধঃপতনাভিমুখে লইয়া চলিল। যদিও মহারাষ্ট্র-শক্তি-প্রভাবে দেশে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা অতি অল্প সময় স্থায়ী হইয়াছিল মাত্র। বাবর, হুমায়ুন, সেরসার রাজত্বে হিন্দুদিগের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। আকবরের রাজত্ব হিন্দুদিগের পক্ষে যথেষ্ট স্মরণীয়। যদিও ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে, আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুরা যথেষ্ট সুখে কালযাপন করিয়াছেন, কিন্তু এ সুখের অর্থ বোঝা দুঃসাধ্য। বন্দীকে লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলে যে যন্ত্রণা, স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেও সেই যন্ত্রণা। আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুদিগের ভিতরে দুই রকমের প্রতিপত্তি বজায় ছিল। প্রথমতঃ এক নিম্নস্তরের প্রতিপত্তি, মানসিংহ প্রভৃতি নৃপতিগণ যাহা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ উচ্চতর স্তরের প্রতিপত্তি যাহার উপমাস্থল স্বদেশপ্রাণ মহারাণা বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ। আকবরের রাজত্ব-সময় হিন্দুদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল বটে, কিন্তু যে প্রতিপত্তি মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে যাইতে বাধা দেয়, তাহা কি প্রকৃত উন্নতি এবং তাহাই কি বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক, ঐতিহাসিক-দের মতে হিন্দুগণ সে সময় বেশ সুখেই কালাতিপাত করিয়াছেন। প্রায় সকল প্রধান রাজকার্য্যেই হিন্দুগণ সমাসীন ছিলেন। সামান্য সৈনিকের পদ—সেনাপতির পদ পর্য্যন্ত—আর এদিকে সামান্য মুন্সীর পদ হইতে প্রধান মন্ত্রীর পদ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই হিন্দুদিগের অধিকার ছিল। এদিকে আবার বীরকেশরী প্রতাপসিংহ স্বীয় অমানুষিক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও বীরত্ব দ্বারা স্বাধীনতা বজায় রাখিতেছিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় প্রভৃতি বীরপুরুষেরা হিন্দুদের বিশেষ গৌরবের পরিচয় দিতে ছিলেম। মুসলমানগণ দেশের সম্রাট্ হইলেও অনেকস্থানে হিন্দুদের

উপরই দেশের শান্তি-স্থাপনের এবং রাজকার্য্যের ভার ছিল। এই সময়ে রাণী দুর্গাবতী হিন্দুদিগের বিশেষ গৌরবের পরিচয় দেন। যদিও তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, তবু আজ পর্য্যন্ত বুন্দেলখণ্ডের সূতগণ তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী গান করিয়া বেড়ান। এই সময়ে বাঙ্গালীরা সবিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন, বঙ্গদেশে ১২জন প্রধান জমিদার ছিলেন, ইঁহারা ভুঁইয়া বলিয়া কথিত হইতেন। ইঁহাদিগের দুর্গ ছিল, রণপোত ছিল, পদাতিক, নৌকা, কামান প্রভৃতি ছিল, ইঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ভুঁইয়াগণ যুদ্ধের সময় সম্রাট্‌কে সৈন্য প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিতেন। ইঁহারা প্রথমে গৌড়ের অধিপতির অধীন ছিলেন, তৎপরে স্বাধীন হন। ইঁহারা কাহাকেও কর দিতেন না এবং কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। এই সময়ে বঙ্গদেশে কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরাম দাস অতি প্রাঞ্জল ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, কৃত্তিবাসও এই সময় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু ঐতিহাসিকদিগের এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কৃত্তিবাস পাঠান কি মোগল রাজত্বের সময় জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। যাহা হউক, এই সময় হিন্দুদিগের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। আকবরের রাজত্বকাল হইতে সাহাজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত হিন্দুগণ একভাবেই ছিলেন। তাঁহারা উচ্চ রাজকার্য্যে পূর্ব্বের ন্যায়ই বিরাজ করিতেছিলেন। তবে আওরঙ্গজেবের সময়ে হিন্দুগণ একটু বিদ্বেষ চক্ষে পতিত হন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তখনই আবার হিন্দুদিগের উচ্চতরের প্রতিপত্তি আরম্ভ হইল। আওরঙ্গজেবের সময় হইতেই মোগল রাজত্বের অধঃপতন আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, হিন্দুদিগের উপর অন্যায় ব্যবহারই এই পতনের কারণ। হিন্দুগণ

পরাধীন অবস্থায় থাকিলেও তাঁহারা রাজ্যের যথেষ্ট উপকার করিতেন, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা এবং দেশের অন্তঃশত্রু ও বহিঃ-শত্রু দমন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। আওরঙ্গজেবের খারাপ ব্যবহারে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং সেই সময় হইতে মুসলমান শাসন কর্ত্তারা নিজ নিজ দেশে স্ব স্ব প্রধান হইতে আরম্ভ করেন। পরাক্রান্ত হিন্দু-রাজগণ ইহাতে কোন বাধা দেন নাই এবং সেই সময়ে হিন্দুদের উচ্চস্তরের প্রতিপত্তির সূচনা হয়। মহারাষ্ট্রকুলে শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করেন এবং এই সময় শিখেরাও বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা সূর্য্যবংশোদ্ভব। যাহা হউক শিবাজী হইতেই তাহাদের রাজত্ব আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৬৬২ খৃঃ হইতে ১৭৬১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের প্রতিপত্তি বজায় ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ, শিখগণ এবং রাজপুতগণ উচ্চতর প্রতিপত্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ এবং সিরাজউদ্দৌল্লার, শাসনকালে বঙ্গদেশের হিন্দুগণ যদিও নিম্নস্তরের প্রতিপত্তি দেখাইতেছিলেন, তথাপি তাহা ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। হিন্দুগণ এই সময় যথেষ্ট ক্ষমতাপন্ন ছিলেন ভারতে মুসলমান রাজত্ব অধিকারের পর আর এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ হয় নাই। এই সময়ে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়দের ভয়ে শঙ্কিত হইত, তাঁহারা দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭৬১ খৃঃ কিন্তু তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি পরাভূত হওয়ার পর হইতেই হিন্দুদিগের পতন আরম্ভ হয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের

উপাদান।

(মাঘ সংখ্যা হইতে অনুবৃত্ত)

উ। মুসলমানদিগের পুস্তক সমূহ—ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুরাজ্যের স্বাধীনতা ক্রমশঃ মুসলমানদিগের দ্বারা নষ্ট হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে ইতিহাস লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল। এবং উহা হইতে তাঁহাদিগের লিখিত অনেক আরবী ও পারশী ভাষার পুস্তকে আমাদিগের দেশের ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু-রাজ্যের পুরাতন বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের পুস্তকের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদিগের সেই সমস্ত গুলির বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হওয়া সাধ্যাতীত। অতএব আমরা এস্থলে প্রধান প্রধান ও প্রাচীন কয়েকখানিরই উল্লেখ করিতেছি।

(১) সিলসিলাতুত্তবারীখ—এই পুস্তক খানি সুলেমান নামক বণিক আরবী ভাষায় ৮৫১ খৃঃ অব্দে লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে তিনি ভারতাদিতে স্বীয় পর্য্যটন বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে দাক্ষিণাত্যের মান্খেট (নিজামরাজ্যের মানখের) নগরে রাঠোর-বংশীয় রাজা অমোঘবর্ষ (প্রথম) ও কনৌজের পরিহার বংশীয় রাজা ভোজদেব (প্রথম) রাজত্ব করিতেন। সুলেমান উক্ত দুইজনেরই রাজ্যের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে রাঠোরদিগের জন্য তিনি বলহরা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহা তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ উপাধি বল্লভ-রাজেরই প্রকৃত রূপ (বলহ রায়)।

(২) মুরুজুল্ জহব—অলম সুদী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে

এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে মান্যখেট, কনৌজাদি রাজ্যের কিছু কিছু বৃত্তান্ত আছে।

উপরি লিখিত দুইখানি পুস্তকেরই সারাংশ স্যার এইচ্ এন্ ইলিয়টের হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ার (The History of India as told by its own Historians) প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৩) তহকীকে হিন্দ—প্রসিদ্ধ মুসলমান জ্যোতির্ব্বিদ্ অবুরিহাঁ আলবেরুণী সুলতান মহমুদ গজনবীর সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কয়েক বৎসর এখানে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইনি প্রায় ১০৩১ খৃঃ অঃ আরবী ভাষায় এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচার এবং ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের বর্ণনা ব্যতীত কয়েকটী প্রাচীন সংবতের এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। ডাঃ এডোয়ার্ড সাচু (Dr. Edward Sachou ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৪) চচ্নামা—এই পুস্তক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের নিকটে আরবী ভাষায় রচিত। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে আলিবিন্ হামিদ ফার্শী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ইহাতে মুসলমানদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সিন্ধুশাসক হিন্দু রাজাদিগের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। উহা অন্য কোন প্রকার উপাদান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সিন্ধু হইতে হিন্দুরাজ্য উচ্ছেদ প্রাপ্তির এবং মুসলমানদিগের আধিপত্য স্থাপনের বৃত্তান্ত অল্ বিলাদুরী রচিত ফতুহল বুল্দান, মীর মাসুমের তারিখ্ উসিন্ধ, মীর তাহির মহম্মদের তারিখ্ তাহিরী, আমির সৈয়দ কাসিমের পুত্র শাহকাশিম খাঁ রচিত বেগলর্নামা, সৈয়দ জমালের তরখাঁনামা বা অরংগুনামা, আলিসেন খানির তুহ ফেতুল কিরাম এবং মজমুয়া উৎতবারিখ্ প্রভৃতি পুস্তকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহাদিগের অপেক্ষা চচ্নামা পুরাতন

পুস্তক। নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকার দ্বাদশ ভাগে মুন্সী দেবীপ্রসাদ মহোদয় লিখিত "হিন্দুস্থান কা ইতিহাস" নামক যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইতেছে উহার দ্বিতীয় প্রস্তাব (সিন্ধমে হিন্দুরাজ্য) * এই সমস্ত পুস্তকের আধারে রচিত। উপরিলিখিত ইলিয়ট্ সাহেবের হিষ্টরী অব্ ইণ্ডিয়ার প্রথম ভাগে এই পুস্তকগুলির ঐতিহাসিক সারাংশ মুদ্রিত হইয়াছে।

(৫) তারিখ যমীনী—এই আরবী পুস্তকখানি ১০২০ খৃঃ অব্দে অলউৎবী কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে উক্ত সময় পর্য্যন্তের সুলতান মহম্মদ গজনবীর ভারতবর্ষে অভিযানগুলির বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। উৎবী উক্ত সুলতানের সমকালীন লেখক। সুতরাং তাঁহার পুস্তক বিশেষ উপযোগী।

(৬) তারিখ উস্সুবুক্তগীন্—এই পুস্তকখানি খ্বাজহ অবুল্ফজল্ ১০৫৯ খৃঃ অব্দে রচনা করেন। ইহাতে গজনীর সুলতান মহমুদ গজনবীর পুত্র নাসিরুদ্দিন মাসুদের সময়ে মুসলমানগণ কাশী, হান্সী প্রভৃতি স্থানে যে আক্রমণ করেন তাহার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

(৭) জামিয়ুল হিকায়ৎ—এই পুস্তক মহম্মদ উফি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচনা করেন। ইহাতে জয়সিংহ (সিদ্ধরাজ), কুমার পাল প্রভৃতির বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৮) তাজুল্ম্ আসির—প্রায় ১২১০ খৃঃ অব্দে হসন্ নিজামী এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে শাহাবুদ্দিন গোরী এবং কুতবুদ্দিন অয়বকের সময়ে দিল্লী আজমীর, মিরাট, কোল, অস্নী, বারাণসী, গোবালিয়র, নেহরওয়ালা (অন্হিল ওয়ালা), কলিঞ্জর, জালোর প্রভৃতি হিন্দুরাজ্য-সমূহে মুসলমানদিগের আক্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

(৯) কামিল্ লুৎতবারীখ—ইব্ন অসীর প্রায় ১২৩০ খৃঃ অব্দে ইহা

* ঐতিহাসিক চিত্রে ইহার অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

রচনা করেন। ইহাতে অবদুল মলিকের নায়কতাধীন হইয়া ৭৭৫ খৃঃ অব্দে সমুদ্রমার্গে ভারতবর্ষের কাঠিওয়াড়ে মুসলমানগণ যে আক্রমণ করেন ও বলব (বোধ হয় প্রসিদ্ধ বল্লভীপুর) বিজয় করেন, এবং বারাণসীর রাজা জয়চন্দ্রকে বিনাশ করেন, তাহার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপরিলিখিত পুস্তকগুলির (৫ হইতে ৯ সংখ্যা) ইংরাজী সারাংশ ইলিয়ট্ সাহেবের হিষ্টরী অব্ ইণ্ডিয়ার দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১০) তবকাতে নাসিরী—মিনহাজ্ উস্‌সিরাজ্ ১২৫৯ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে উক্ত সময় পর্য্যন্তের ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুরাজ্যে মুসলমানদিগের যে যে আক্রমণ সংঘটন হয় তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তক ইতিহাসের পক্ষে বড়ই উপযোগী। রাভার্টি (Raverty) সাহেবকৃত ইহার ইংরাজী অনুবাদ বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা (Bibliotheca Indica) নামক গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে।

(১১) তারিখ অলাই—প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষীয় কবি আমির খুসরো দিল্লীর বাদসাহ আলাউদ্দিন খিলিজির সময়ে এই পুস্তক রচনা করেন। ১৩৪৫ খৃঃ অঃ ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। এই পুস্তকে বাদসাহ কর্ত্তৃক রন্থমভোর, মালব, চিতোর, দেবগিরি, মিবানা, মালাবার, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে আক্রমণের বিবরণ আছে। আমির খুসরো এই পুস্তকে নিজ সময়ের ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব এই পুস্তক উক্ত সময়ের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার ইংরাজী সারাংশ ইলিয়ট্ সাহেবের হিষ্টরী অব্ ইণ্ডিয়ার তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত: হইয়াছে।

(১২) তারিখ ফিরিস্তা—মহম্মদ কাসিম (ফিরিস্তা) আকবর বাদসাহের সময়ে এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে দিল্লী, কুলবর্গা, বিজা-

পুর, আহম্মদ নগর, গোলকুণ্ডা, বেরার, বিদার, গুজরাত (আহম্মদাবাদ) মালব (মাণ্ডু), খান্দেশ, বাঙ্গলা ও বেহার, জৌনপুর, মুলতান, সিন্ধু ও ঠাট্টা এবং কাশ্মীরের মুসলমান রাজ্যের ঐ সময় পর্য্যন্তের বৃত্তান্ত অনেক পুস্তকের আধার হইতে সংকলিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের সময়ের এতদ্দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে এইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ এবং এই এক পুস্তক হইতেই ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুরাজ্যের অস্তমিত হওয়ার অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। ইহার ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

যাহা হইতে আমাদিগের ইতিহাসে কিছুমাত্র সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ আরবী এবং পারশী ভাষার আরও অনেক পুস্তক আছে। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতে পারা গেল না। উহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিরই ইংরাজী সারাংশ হিষ্টরী অব্ ইণ্ডিয়া (৮ম ভাগ) এবং বেলে সাহেবের (Sir E. C. Balay) হিষ্টরী অব্ গুজরাতে মুদ্রিত হইয়াছে।

(গ) প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রানুশাসন—

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে শিলালিপি ও তাম্রানুশাসন (দানপত্র) হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা পাওয়া যায়। শিলালিপিগুলি প্রায় পর্ব্বত, স্তম্ভ, মন্দির, মঠ, স্তূপ, দীর্ঘিকা, কূপ প্রভৃতি সংস্পৃষ্ট, অথবা গ্রাম এবং ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রোথিত শিলাপটে, মূর্ত্তির আসনে এবং স্তূপের মধ্যবর্ত্তী পাষাণ পাত্রে (যাহাতে প্রায়শঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের অস্থি প্রভৃতি রক্ষিত হয়) খোদিত থাকে এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, তামিল, কর্ণাটীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় (গদ্য ও পদ্যে) প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাদিগের মধ্যে যাহাতে রাজাদিগের প্রশংসা থাকে, তাহাকে প্রশস্তি কহে। শিলালিপি পেশওয়ার হইতে কন্যাকুমারী এবং দ্বারকা হইতে আসাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়—কোথাও অল্প কোথাও অধিক। নর্ম্মদার উত্তরের প্রদেশ হইতে দক্ষিণে ইহা অধিক

প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহার কারণ এই যে, তথায় উত্তর অপেক্ষা মুসলমান-দিগের অত্যাচার অনেক পরিমাণে কম হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত কয়েক সহস্র শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতনটী খৃ: পূ: ৪৫০এর সমীপবর্ত্তী কালের। ইহা শাক্যজাতীয় ক্ষত্রিয়দিগের নির্ম্মিত (নেপাল ওরাইয়ে অবস্থিত) পিপ্রবা স্তূপ হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের অস্থিবিশিষ্ট প্রস্তর পাত্রে খোদিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর সর্ব্বাপেক্ষা পরে খৃঃ অব্দের উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকটী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শিলালিপি গুলির মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যে অর্থাৎ মন্দির, মঠ, স্তূপ, গুহা, পুষ্করিণী প্রভৃতির নির্ম্মাণ বা জীর্ণ সংস্কার সাধন, মূর্ত্তি-সমূহ-স্থাপন বা কোন প্রকার দান সূচিত করে। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটীতে উক্ত উক্ত ধর্ম্মকার্য্যে সংস্রব বিশিষ্ট ব্যক্তির অতিরিক্ত উক্ত সময়ের তদ্দেশীয় রাজা বা তাহার বংশের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য প্রকারের শিলালিপিদিগের (অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত ধর্ম্মকার্য্যের সংস্রব নাই) কোনটীতে রাজাজ্ঞা কোনটীতে বিজয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ, কোনটীতে অনেক রাজার প্রশংসা অথবা তাহাদিগের কিছু কিছু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, এবং কোনটীতে তাহাদিগের বংশপরম্পরা অবগত হওয়া যায়। এইরূপ কয়েকটী শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, যাহাতে বীরপুরুষদিগের যুদ্ধে হত, ও স্ত্রীদিগের তাঁহাদিগের সহিত সহমৃত হওয়া, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর দ্বারা কাহারও মৃত্যু, নিরপেক্ষ সমবেত লোক দ্বারা মীমাংসা, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করিবার প্রতিজ্ঞা করা, স্বেচ্ছায় অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক পুরুষদিগের দেহপাত করা অথবা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

৫ম ভাগ—৩য় সংখ্যা।] ষষ্ঠ পর্য্যায়। [আষাঢ় ১৩১৭।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল,—সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সহকারী সম্পাদক।

সূচী।

ঐতিহাসিক চিত্র

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাষাণোপরি লিপি খোদিত করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, উপরি লিখিত ধর্ম্মানুষ্ঠান অথবা ঘটনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের স্মৃতি চিরস্থায়ী থাকে। এই অভিপ্রায়ে রাজা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কয়েক-খানি পুস্তক পর্য্যন্তও (১) শিলায় খোদিত করিয়া গিয়াছেন। রাজা এবং ভূস্বামিগণের পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, ধর্ম্মাচার্য্য, দেবমন্দির, মঠ প্রভৃতিতেও প্রদত্ত ভূমির (গ্রাম ক্ষেত্রাদি) দানপত্র অথবা অন্য

(১) আজমীরের চৌহান রাজা বিগ্রহরাজ (বিশালদেব) স্বরচিত হরকেলি নাটক এবং স্বীয় রাজকবি সোমেশ্বর পণ্ডিত রচিত ললিতবিগ্রহরাজ নাটক শিলাগাত্রে খোদিত করাইয়া তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত আজমীরের (অধুনা আঢ়াই দিন কা ঝোপড়া নামে অভিহিত) পাঠশালায় স্থাপন করেন। প্রমাররাজ ভোজদেব নির্ম্মিত ধারানগরীর সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ নামক (এক্ষণে কমল মৌলা নামে প্রসিদ্ধ) পাঠশালা হইতে কুমার শতক কাব্য, পারিজাত মঞ্জরী নাটিকা ইত্যাদি পুস্তক শিলাপট্টে খোদিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেঠ্ লোলাক উন্নত শিখর পুরাণ নামক (দিগম্বর) জৈন পুস্তকখানি মেওয়ার স্থিত বীজোলীয়ার নিকটবর্ত্তী এক শিলাখণ্ডে বিংসং ১২২৬(১১৭০ খৃঃ অঃ) খোদিত করেন। উহা অদ্যাপি সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। মেওয়ারের মহারাজ রাজসিংহ রাজপ্রশস্তি নামক ২৫ সর্গের একখানি বৃহৎ কাব্য ২৫খানি শিলাপট্টে খোদিত করিয়া স্বনির্ম্মিত রাজ সমুদ্র নামক দীর্ঘিকা তটে স্থাপিত করেন। উহা অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে।

কোন প্রকারের অনুশাসনকে (যাহা তাম্র পত্রে খোদিত হইয়া প্রদত্ত হইত), তাম্রানুশাসন কহে, এবং যাহাতে দানের উল্লেখ থাকে, তাহাকে দানপত্র বলে। তাম্রানুশাসন একই পত্রে খোদিত হইয়া থাকে কিন্তু প্রাচীন তাম্রানুশাসন প্রায় ক্ষেত্রে প্রোথিত অথবা গৃহপ্রাচীর বা ভিত্তিতে রক্ষিত থাকে, এবং কখন কখন কূপ হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রধানতঃ তাম্রানুশাসন প্রায় একাধিক পত্রেও খোদিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার প্রথম এবং শেষ পত্র এক ভিতরের পার্শ্বেই খোদিত হয় এবং সব পত্রগুলি কড়া দ্বারা সংযুক্ত থাকে। তাম্রানুশাসন অধিকাংশস্থলেই দানসূচক। উহাতে দাতা এবং গ্রহীতার নাম ব্যতীত দাতার (রাজা অথবা সামন্তদিগের) বংশ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত শতাধিক তাম্রানুশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীন শিলালিপি এবং তাম্রানুশাসন আমাদিগের প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে পরম উপযোগী। কারণ ইহাদিগের দ্বারা মৌর্য্য, শাতকর্ণী, (আন্ধ্রভৃত্য) শক, ক্ষত্রপ, কুষণ (তুর্ক) আভীর, গুপ্ত, পল্লব, হূণ, বৌদ্ধেয়, বৈশ, লিচ্ছবী, মৌখরী, মৈত্রক, গুহিল, সোলংকী, পরিহার, প্রমার, চৌহান, রাঠোর, কচ্ছবহ, তম্বর, কলচুরি (হৈহয় বংশীয়) চন্দেল, যাদব, গুর্জ্জর, পাল, সেন, কদম্ব, শিলারা, সেন্দ্রক, কাকতীয়, নাগ, নিকুম্ভ, গঙ্গা, বাণ, চোল প্রভৃতি অনেক রাজবংশের অনেক বৃত্তান্ত, তাঁহাদিগের বংশাবলী, এবং অনেক রাজার রাজ্যাভিষেক ও পরলোক গমনের যথাযথ সংবৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল ইহাই নহে, কিন্তু অনেক পণ্ডিত, ধর্ম্মাচার্য্য, ধনাঢ্য দানশীল, বীর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মনুষ্যের নাম ও তাঁহাদিগের যথাযথ সময় প্রভৃতির অনুসন্ধানও প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং অনেক প্রাচীন সংবতের নাম এবং তাহার আরম্ভের নির্ণয় করা যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক আবশ্যকীয় বিষয় অবগত হওয়া যায়।

প্রস্তর এবং তাম্রশাসন ব্যতীত লৌহস্তম্ভে খোদিত লিপিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুতুবমিনার-সমীপবর্ত্তী দণ্ডায়মান প্রকাণ্ড লৌহ-স্তম্ভে খোদিত গুপ্ত বংশের প্রতাপশালী রাজা চন্দ্রের (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) লিপিই প্রধান। উহাতে উক্ত রাজার (বাঙ্গলা হইতে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত) বিজয়ের উল্লেখ আছে।

শিলালিপি ও তাম্রানুশাসন অনেক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধানগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা (৯ম ভাগ), সাউথ ইণ্ডিয়ান্ ইনস্ক্রিপ্শন্স (৩য় ভাগ) এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকা (১২শ ভাগ) ইণ্ডিয়ান্ য়্যাণ্টিকোয়ারী, তামিল এণ্ড সংস্কৃত ইন্‌স্ক্রিপ্‌শন্স (ডাক্তার বর্জেস এবং নটেশ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রচিত), গুপ্ত ইনস্ক্রিপ্‌শন্স (ডাক্তার ফ্লীট কর্ত্তৃক রচিত), অশোক ইনস্ক্রিপ্‌শন্স, (জেনারেল কানিংহাম কর্ত্তৃক রচিত) বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেল, বিয়ানা অরিয়েণ্টেল জর্ণেল, এসিয়াটিক জর্ণেল, আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটীর জর্ণেল, এসিয়াটিক রিসার্চেজ ভাবনগর ইনস্ক্রিপ্‌শন্স, ভাবনগর প্রাচীন শোধ সংগ্রহ (প্রথম ভাগ বিজয় শঙ্কর গৌরীশঙ্কর ওঝা কর্ত্তৃক রচিত), আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট (জেনারেল কানিংহাম সম্পাদিত ২৩শ ভাগ), আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট (ডাঃ বার্জেস সম্পাদিত ৫ ভাগ), আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের য়্যানুয়াল রিপোর্ট (২য় ভাগ—১৯০২—৩ ও ১৯০৩—৪ খৃঃ অব্দের), পালি, সংস্কৃত, য়্যাণ্ড ওলড কানাড়ী ইন্‌সক্রিপ্‌শন্‌স, ডাঃ বর্জেস ও ফ্লীট সম্পাদিত ট্রান্‌সলেশন্‌স অব ইনসক্রিপ্‌শন্‌স ফ্রম বেলগাঁ য়্যাণ্ড কলাড়গী ডিস্‌ট্রিক্‌টস (ডাঃ ফ্লীট ও হরিবামন লিমন্না সম্পাদিত), ইনক্রিপ্‌শন্‌স ফ্রম দি কেভ্‌টেম্পলস্ অব ওয়েস্‌টর্ণ ইণ্ডিয়া (ডাঃ ভগবান লাল ইন্দ্রজী ও ডাঃ বর্জেস সম্পাদিত) এবং আর্কিয়লজিক্যাল সর্ভের প্রোগ্রেস্ রিপোর্ট-গুলি ইত্যাদি।

(ঘ) প্রাচীন সিক্কা, মুদ্রা ও শিল্প।

(অ) প্রাচীন সিক্কা। ভারতবর্ষে প্রচলিত স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র নির্ম্মিত সহস্র সহস্র প্রাচীন সিক্কা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এখনও সময় সময় পাওয়া যাইতেছে। এই সিক্কাগুলিও আমাদিগের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত (চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ও গোলাকার উভয় প্রকারেরই) সিক্কার উপর রাজাদিগের নাম নাই কিন্তু তাহাতে সূর্য্য, চন্দ্র, ধনু, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, স্তূপ, নক্ষত্র প্রভৃতির অনেক প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নযুক্ত মুদ্রা অঙ্কিত হইত। এই জাতীয় সিক্কা প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারে না। সিকন্দরের আক্রমণের পর, বিশেষতঃ কাবুল পঞ্জাব প্রভৃতিতে ব্যাক্ট্রিয়া-প্রবাসী গ্রীকদিগের রাজ্য স্থাপিত হইবার সময় হইতে, আমাদিগের সিক্কার অনেক সংস্কার সাধিত হয়। গ্রীক সিক্কার অনুকরণে উহাতে রাজাদিগের নাম অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয়। এদেশে সুন্দররূপে নির্ম্মিত সিক্কা প্রথম প্রথম ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজারাই প্রচলিত করেন। উহার এক পার্শ্বে প্রাচীন গ্রীক ভাষা এবং অক্ষরে রাজা ও তাঁহার উপাধিযুক্ত লিপি এবং দ্বিতীয় পার্শ্বে পারসীক ভাষার ন্যায় বিপরীত দিক হইতে পঠিতব্য খরোষ্ঠী (গান্ধার) লিপিতে প্রায় একই অর্থের (সংস্কৃত মিশ্রিত) প্রাকৃত ভাষার লিপি (১) প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীকদিগের পর শকেরাও

(১) এই সিক্কাগুলির লিপি উভয় পার্শ্বের প্রান্তদেশেই স্থিত। মধ্যভাগে একপার্শ্বে রাজার মূর্ত্তি, পূর্ণ প্রতিকৃতি, অথবা অন্য কোন চিহ্ন এবং অপর পার্শ্বে কোন দেব দেবীর অথবা পশুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিত।

এদেশে আধিপত্য স্থাপন করে। ইহাদিগের সিক্কাও (১) গ্রীকদিগের সিক্কার পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

কুষণ বংশীয়দিগের সিক্কাও এইরূপে নির্ম্মিত কিন্তু তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী সিক্কার উভয় পার্শ্বেই গ্রীক অক্ষরের লিপি বিদ্যমান। পশ্চিমের ক্ষত্রপদিগের সিক্কার (২) এক পার্শ্বে প্রাচীন দেবনাগরী এবং অপর পার্শ্বে গ্রীক অক্ষরের লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ষ্টেনের পরবর্ত্তী রাজাদিগের সময়ে এদেশীয়দিগের গ্রীক ভাষায় জ্ঞান ছিল, এরূপ অনুমান করা যায় না। কারণ ঐ সিক্কার উপর গ্রীকলিপি যেরূপভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে 'মক্ষিকা স্থানে মক্ষিকার' ন্যায় গ্রীক অক্ষরের অনুকৃতি প্রদত্ত হইত এবং উহা হইতে কোন অর্থ বোধও হয় না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতাপশালী গুপ্ত রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। গুপ্তেরা কুষণবংশীয়দিগের পদ্ধতিক্রমে আপনাদিগের সিক্কার অনুকরণ করেন সত্য, কিন্তু গ্রীকলিপি অপসারিত করিয়া উভয় পার্শ্বেই দেবনাগরী অক্ষরের লিপি-সন্নিবেশ এবং গ্রীক, পারসিক প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিকৃতির স্থানে তদুপরি হিন্দু-দেবদেবীর আলেখ্য স্থাপন করেন। গুপ্তদিগের সময় হইতে হিন্দু-পদ্ধতিক্রমে সুন্দর সিক্কা প্রস্তুত হইতে লাগিল, কিন্তু গুপ্তদিগের পরে সিক্কার কারুকার্য্য পুনরায় বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। নর্ম্মদার উত্তরাংশে প্রচলিত সিক্কায় এই জাতীয় পরিবর্ত্তন বহুল পরিমাণে

(১) শকদিগের সিক্কাগুলি গ্রীকদিগের সিক্কার ন্যায় সুন্দর নহে, উহারা ক্রমে ক্রমে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

(২) পশ্চিমস্থিত ক্ষত্রপদিগের সিক্কার উপর একপার্শ্বে রাজার মস্তক ও সম্বতের অঙ্ক এবং অপর পার্শ্বের, মধ্যে চৈত্য চিহ্ন, ও প্রান্তভাগে প্রাচীন নাগরী অক্ষরের লিপি থাকিত। ইহাতে রাজা এবং উহার পিতার নাম এবং তাহাদের উপাধির উল্লেখ থাকিত। অতএব সিক্কাগুলিকে উপকরণরূপে গ্রহণ করিলে ক্ষত্রপদিগের সময় এবং রাজপারম্পর্য্য নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায়।

দৃষ্ট হয়। দক্ষিণের সিক্কায় বৈদেশিক সিক্কার প্রভাব অতি অল্প পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয়। তথায় বহুকাল হইতে তথাকার প্রাচীন নিয়মের অর্থাৎ লিপি ব্যতিরিক্ত সিক্কাই প্রচলিত থাকে। কেবল শাতবাহন-বংশীয় রাজাদিগের সিক্কায় নবীন পদ্ধতির অনুকরণ পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে তথাকার সিক্কার উপরেও রাজাদিগের নামাদি অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্যের মাত্রা অতি অল্প। আজ পর্য্যন্ত গ্রীক, শক, ক্ষত্রপ, কুষণ, আন্ধ্র, গুপ্ত, মৌখরী (বল্লভীর রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা) মৈত্রক, (ডাহল দেশের যোগীয়া রাজা) পরিব্রাজক, হুণ, চোহাণ, পরিহার পরমার, সোলঙ্কী, তম্বর, (হৈহয় বংশীয়) কলচুরি, চন্দেল, গোহিলোত, নাগ, যাদব, কাকতীয় প্রভৃতি কয়েকটী রাজবংশের এবং কাশ্মীর, নেপাল, আফগানিস্থান প্রভৃতির শাসকরাজ-বংশের সিক্কা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আবার এরূপ কত প্রাচীন সিক্কা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যাহাতে রাজার নাম নাই, কিন্তু তাহাতেও কোন জাতি, দেশ বা নগরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যে রাজাদিগের নাম প্রাচীন পুস্তক, শিলালিপি এবং তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকটীর নাম প্রভৃতির অনুসন্ধান কেবল সিক্কা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডেমিট্রিয়স প্রভৃতি অন্যূন পঞ্চবিংশতি গ্রীক নরপতি আফগানিস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে রাজত্ব করেন। উঁহাদিগের নাম প্রায়শঃ তাঁহাদের সিক্কা হইতেই অবগত হওয়া যায়। এইরূপেই শক, ক্ষত্রপ প্রভৃতি রাজবংশের কতকগুলি নরপতির নাম কেবল সিক্কা হইতেই অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন সিক্কা সংখ্যায় এত অধিক ও এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, একখানি পুস্তক লেখার আবশ্যক হইয়া পড়ে। এতজ্জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল তাহাদিগের উপযোগিতা-মাত্র প্রকাশ করা ব্যতীত তাহাদিগের বিষয় আর কিছু লেখা

সাধ্যাতীত। এতদ্দেশীয় প্রাচীন সিক্কার বৃত্তান্ত ও চিত্র অনেক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান;—য়্যারিয়ানা ইণ্ডিকা (এইচ উইলসন সংগৃহীত), জেম্‌স প্রিন্সেপ্‌ সাহেবের এসেজ্‌ অন য়্যাণ্টিকুইটিজ্‌ ২য় ভাগ (এডওয়ার্ড টমাস সম্পাদিত), ক্যাটালগ অব দি কয়েন্স অব্‌ দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ১ম ভাগ (বি, এ, স্মিথ সম্পাদিত), ক্যাটালগ অব দি কয়েন্স কলেক্টেড্‌ বাই সি, জে, রজার্স য়্যাণ্ড পারচেজ্‌ড বাই দি গভর্ণমেণ্ট অব দি পাঞ্জাব (Catalogue of the coins collected by C J Rojers and purchased by the Government of the Punjab (৩য় ভাগ সি, জে, রজার্স সম্পাদিত), জেনারল কানিংহামের কয়েন্স অব এনশিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া—কয়েন্স অব মিডিভাল ইণ্ডিয়া—কয়েন্স অব দি ইণ্ডোসিদিয়ান্স এবং লেটার ইণ্ডো সিদিয়ান্‌স, সার ওয়াল্টার ইলিয়টের কয়েন্স অব সাউদার্ণ ইণ্ডিয়া, ক্যাটালগ অব ইণ্ডিয়ান কয়েন্স ইন্‌ দি বৃটিশ মিউজিয়ম—গ্রীক য়্যাণ্ড সিদিক কিংস অব বাকট্রীয়া য়্যাণ্ড ইণ্ডিয়া (পার্সি গার্ডনার সংগৃহীত এবং আর, ষ্টুয়ার্ট পুল সম্পাদিত) নিউ মিসম্যাটিক ক্রনিকল্‌, ইণ্টার ন্যাশন্যাল নিউমিস্‌ম্যাটা ওরিয়েণ্টালিয়া জেনরল ক্যানিংহামের আরকিয়লজিকল সার্ভে রিপোর্টস্‌, ইণ্ডিয়ান য়্যাণ্টিকোয়ারী, রয়েল-বাঙ্গালার এবং বোম্বাইয়ের এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেল ইত্যাদি।

(আ) প্রাচীন মুদ্রা—প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে মুদ্রা বা মোহর অঙ্কিত করিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। কয়েকটি তাম্র পত্র এবং কতকগুলি তাম্রপত্রের কড়ার সন্ধিস্থল রাজমুদ্রাঙ্কিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এরূপ কয়েকটি মৃত্তিকার গোলও পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মুদ্রা অঙ্কিত রহিয়াছে। অঙ্গুরীয় ও মূল্যবান প্রস্তরে খোদিত কয়েকটী মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রা হইতেও আমাদিগের দেশের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে কিছু কিছু সহায়তা লাভ করা

যায়। কণৌজের পরিহার নরপতি ভোজদেবের তাম্রপত্রাঙ্কিত মুদ্রায় দেবশক্তি হইতে ভোজদেবের পর্য্যন্তের সম্পূর্ণ বংশাবলী এবং রাজ্ঞী-চতুষ্টয়ের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তত্রত্য রাজা বিনায়কপালের তাম্র-পত্রাঙ্কিত মুদ্রায় দেবশক্তি হইতে বিনায়কপাল পর্য্যন্তের বংশাবলী এবং ছয়টী রাণীর নাম প্রদত্ত হইয়াছে। গুপ্তবংশের রাজা (২য়) কুমারগুপ্তের (অধুনা লক্ষ্ণৌ কৌতুকাগারে স্থাপিত) মুদ্রায় মহারাজগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া (দ্বিতীয়) কুমারগুপ্ত পর্য্যন্তের বংশাবলী এবং ছয়জন রাজমাতার নাম আছে। মৌখরী সর্ব্ববর্ম্মের মুদ্রায় হরিবর্ম্ম হইতে সর্ব্ব-বর্ম্ম পর্য্যন্ত বংশাবলী এবং রাজ্ঞী চতুষ্টয়ের নাম প্রাপ্ত হইয়া যায়। গুপ্ত-বংশীয় নরপতি (দ্বিতীয়) চন্দ্রগুপ্তের পুত্র গোবিন্দগুপ্তের নামের সন্ধান, কেবল এক মৃত্তিকার গোলোপরি অঙ্কিত তাঁহার (গোবিন্দগুপ্তের) মাতা ধ্রুব স্বামিনীর মুদ্রা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে কয়েকজন নরপতি ধর্ম্মাচার্য্য, ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রভৃতির নাম তাঁহাদিগের মুদ্রা হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত দুই শতের অধিক মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহার বিবরণ এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, রয়েল—বাঙ্গলা এবং বোম্বাইয়ের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেল, জেনারল কানিংহামের আর্কি-য়লজিক্যাল সর্ভে রিপোর্ট, ইণ্ডিয়ান য়্যাণ্টিকোয়ারী এবং আর্কিয়-লজিক্যাল সর্ভের য়্যানুয়াল রিপোর্ট (১৯০৩-৪ খৃঃ অব্দের) প্রভৃতি পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(ই) শিল্প—প্রাচীন চিত্র, মন্দির, গুহাদি স্থান এবং প্রাচীন মূর্ত্তি-সমূহও ইতিহাসের বিষয়ে কিছু সহায়তা প্রদান করে। চিত্র সমূহের পরিচ্ছদ, অলঙ্কারাদির বৃত্তান্ত উপলব্ধ ব্যতিরিক্ত তাহাদিগের নির্ম্মাণকালে চিত্রবিদ্যার অবস্থাও অবগত হওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ অজন্তাগিরি-গুহার প্রাচীরে সোলংকী নরপতি (দ্বিতীয়) পুলকেশীর রাজসভার নানাবর্ণের চিত্র হইতে তাঁহার সভার প্রণালীর অতিরিক্ত সেই সময়ের তথাকার

পরিচ্ছদাদির অবস্থাও অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন মন্দির গুহাদি হইতে ও উহাদিগের নির্ম্মাতার নামাদিযুক্ত লিপি হইতে অনুসন্ধান করিলে, ইতিহাস লেখকের পক্ষে কিছু কিছু সহায়তালাভ ঘটে এবং তাহাদের অভ্যন্তরস্থ খোদিত মূর্ত্তির কার্য্যকারিতাও প্রাচীন চিত্রেরই অনুরূপ। কিন্তু এরূপ লেখা বোধ হয় অনুচিত হইবে না যে, আমাদিগের দেশের প্রাচীন মূর্ত্তিগুলিতে বাস্তবিকতা আনয়ন করিবার যত্ন করা হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। কারণ কয়েক ব্যক্তির প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদিগের সকলেরই আকৃতি একরূপ। প্রাচীন চিত্র এবং মন্দিরাদির রসায়ন-চিত্র অনেক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে প্রধান 'দি পেণ্টিংস অফ অজণ্টা' (দুই খণ্ড—জন গ্রিফিথ রচিত), আর্কিয়লজিক্যাল সর্ভের ভিন্ন: ভিন্ন পুস্তক ইত্যাদি।

উপরোক্ত উপাদান সমূহ (ক, খ, গ এবং ঘ) হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রযত্ন কতদূর সফল হইতে পারে, যে পাঠকবর্গ তাহা জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহাদিগকে আমরা সোলংকীদিগের প্রাচীন ইতিহাস বিশিষ্ট 'ভারতীয় ঐতিহাসিক রত্নমালার' প্রথম-খণ্ড * দেখিতে অনুরোধ করি; কারণ উহা কেবল উপরিলিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

* সুযোগ উপস্থিত হইলে, ঐতিহাসিক চিত্রে উহার অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

নরিয়ার ঘটক চৌধুরী-বংশ।

কুলগ্রন্থে কৌলীন্য-প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন-সময়াবধি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ-বংশীয়দিগের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ইতিহাস সমাজের প্রকৃত ইতিহাস নামের যোগ্য না হইলেও ইহাতে মুখ্য কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রিয়দিগের বংশ পরিচয় পাইতে কোনও গোল হয় না। নরিয়ার ঘটক চৌধুরী-বংশ প্রথিত নামা সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ বংশোদ্ভব কুলপতি শিশুরাম হইতে উদ্ভূত। ইঁহারা গাঙ্গুলীগাঁই। শিশুর পুত্র গদাধর, তাহার পুত্র হলায়ুধ, তৎপুত্র আয়ু এবং তৎপুত্র বিনায়ক। বিনায়কের তিন পুত্র শিব, শূলপাণি ও মাধব। মাধবের সাত পুত্র দামো, কামো, গোপাল, নারায়ণ, লোহাই, হরিরাম ও শ্রীরঙ্গ। এই গোপাল গাঙ্গুলীর সময় হইতে ইঁহারা এই গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ গোপাল গাঙ্গুলীর স্থাপিত গোপাল-বিগ্রহ অদ্যাপি এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ বিদ্যমান আছেন। মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেন গৌড়নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিক্রমপুরের রামপাল নগরে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। গোপাল গাঙ্গুলী লক্ষ্মণসেনের সহিত এদেশে আগমন করেন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহের দেবত্রস্বরূপ কিছু ভূমিপ্রাপ্ত হইয়া বসবাস করিতে থাকেন। এতৎ সম্বন্ধে দুইটী কাহিনী শুনা যায়। কথিত আছে, গোপাল গাঙ্গুলীর পৌত্র শুভঙ্কর বহু বয়সাবধি নিঃসন্তান থাকাতে, তাঁহার চিত্তে বৈরাগ্য জন্মে ও জীবনের শেষভাগ গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে দেশত্যাগ পূর্ব্বক ভাগীরথী-তীরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন ও স্বপ্নে লক্ষ্মী-গোপাল প্রাপ্ত হন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কেহ বলেন, গোপাল গাঙ্গুলী ব্রহ্মত্র সম্পত্তি লাভ

করিয়া, এদেশে আসিয়া বাস করেন ও গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তদীয় পৌত্র শুভঙ্কর বহুবয়স পর্য্যন্ত নিঃসন্তান থাকাতে বৈরাগ্য-বশতঃ সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন ও সেখানে তাঁহার পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং তিনি গোপাল কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এতদুভয়ের মধ্যে শেষোক্ত উক্তিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ গোপাল গাঙ্গুলী স্বপ্রতিষ্ঠিত গোপাল সেবার জন্য প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক-প্রাপ্ত হয়েন। এই সম্পত্তির বিস্তৃতি কোনও উপায়ে জানিবার সাধ্য নাই। কারণ তৎকাল প্রচলিত তাম্রশাসন বা কোনও দলিল বিদ্যমান নাই। তবে নিকটস্থ যে কয়েকখানি গ্রামে ইহাদিগের শাখা-প্রশাখা সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায় সেই কয়েকখানি গ্রাম ইহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান নড়িয়া, লোনসিংহ, মূলনাও, মূলপাড়া, শিরঙ্গল ও বকশী-বাজার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম গোপালের দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

গোপাল গাঙ্গুলীর পুত্র চণ্ডীবর তৎপুত্র শুভঙ্কর। শুভঙ্করের পাঁচ পুত্র পঞ্চগঙ্গা নামে খ্যাত, তাহাদের নাম যথাক্রমে গঙ্গাধর, গঙ্গাবর, গঙ্গাগতি, গঙ্গামতি ও গঙ্গাদাস। এই সময় হইতেই বঙ্গীয় কুলীন ও শ্রোত্রিয়-গণের মেল বন্ধন হয়। গঙ্গাধর গাঙ্গুলী হইতেই প্রথম নরিয়া মেলের সৃষ্টি হয়। লিখিত আছে "গাঙ্গে গঙ্গাধরে মেলো নরিয়া নাম বিশ্রুতঃ।" এই গঙ্গাধরের শাখা, অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। গঙ্গাধরের প্রপিতামহ এস্থানে গোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন ও মেল বন্ধনের সময় গঙ্গাধর স্বীয় গ্রামের নামে মেল-বদ্ধ হয়েন। সুতরাং মুসলমান কর্ত্তৃক গৌড় বিজয়ের (১২০৩ খৃঃ) শত বর্ষ পরে মেল বন্ধন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল স্বীকার করিলেও, তাঁহারা অনুমান ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই এই গ্রামে বাস করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু গঙ্গাধরের প্রপিতামহ গোপাল গাঙ্গুলী হইতে প্রত্যেক পুরুষে ৩০ বৎসর তফাত হিসাব করিলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ইঁহারা এস্থানে বসবাস করিতেছেন অনুমান করা যাইতে পারে।

গঙ্গাধর গাঙ্গুলীর দুই পুত্র, যদুনাথ পণ্ডিত ও রঘুনাথ বাচস্পতি। রঘুনাথ বাচস্পতির পুত্রগণ কুলগ্রন্থে তাহাদের নিজ নিজ উপাধি দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নামের পরিচয় পাওয়া যায় না। উক্ত বাচস্পতির কন্যা রাঢ় দেশ হইতে সমানীত মাধাই মেলের লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট অর্পিত হয়। নরিয়া মেলের কুলীনদিগের পালটী ও প্রকৃতি না থাকা প্রযুক্ত, ইঁহারা প্রথম হইতেই মেল ভঙ্গ করিয়া আসিতেছেন। বাচস্পতি মহাশয় মাধাই মেলে কন্যাদান করিয়াও তাঁহাদের সহিত পালটী সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই বা মেলবন্ধনের পূর্ব্বে যে সকল বংশের সহিত আদান প্রদান হইয়াছিল, তাহাদের সহিত কোনও কৌলিক সম্পর্ক রক্ষা করেন নাই। পরন্তু ইঁহারা বিভিন্ন মেলের পাত্রে কন্যাদান এবং শ্রোত্রিয় কন্যার পাণিগ্রহণ করতঃ স্বীয় বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই বাচস্পতির দৌহিত্র সন্তানগণ অর্থাৎ লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সন্তানগণ ঘটক-ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করতঃ এই গ্রামেই বসবাস করিতেছিলেন। ইদানীং কীর্ত্তিনাশার করাল কবলে পতিত হইয়া তাঁহারা স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া নানা স্থানে বসতি করিতেছেন।

রঘুনাথ বাচস্পতির তিন পুত্র ঘটক সার্ব্বভৌম, ঘটক শিরোমণি এবং ঘটক চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত। তাহাদের প্রকৃত নাম কুল-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বাচস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ পণ্ডিত যশোহর জিলার নড়াইল থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সেখানে বর্ত্তমান আছেন।

ঘটক সার্ব্বভৌমের প্রথম পুত্র ঘটক রায় পিতার ন্যায় স্বীয় উপাধি দ্বারা পরিচিত হয়েন। তাঁহার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না। আদিত্য ও

পুরন্দর নামে তাঁহার আরো দুই ভ্রাতা ছিল। ঘটকরায় রায় উপাধি গ্রহণ করতঃ স্বীয় ঘটকতা ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জমিদারীতে মনোনিবেশ করেন। অনুমান এই সময়ে রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা বিজয়ানন্তর বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় কেদার রায়কে শাসন করিতে পূর্ব্ব বঙ্গে আগমন করেন। কেদার রায়ের সহায়তা অপরাধেই হউক বা কেদার রায়ের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়াই হউক ইঁহারা স্বকীয় দেবত্র সম্পত্তির অধিকার চ্যুত হয়েন।

ঘটক রায়ের চারি পুত্র হরি, গৌরী, কৃষ্ণজীবন, ও কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণজীবন, বিশারদ উপাধি গ্রহণ করেন ও ঘটকতা ব্যবসায় করেন। হৃতসম্পদ ঘটকগণ এই সময়ে বড়ই দুরবস্থায় পতিত হয়। বহু পূর্ব্ব পুরুষ হইতে সমাগত সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং নিজেদের যাহা কিছু স্থাপিত ধন ছিল তাহাও লুণ্ঠিত হইয়া যায় কাজেই ইঁহাদের আর দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। কিন্তু এই দুরবস্থা বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। কৃষ্ণজীবন বিশারদের চারি পুত্র ; রাঘবেন্দ্র, যাদবেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ইন্দ্রনারায়ণ। কনিষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ হইতেই ইঁহাদের অবস্থার পুনরুত্থান হয়।

ইন্দ্রনারায়ণ বাল্যকালে অতিশয় উদার চরিত্র সুশীল ও রূপবান ছিলেন। স্বীয় পিতার নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করিতেন এবং অবসর সময়ে সহচরদিগের সহিত গ্রামের নানাস্থলে ভ্রমণ করিতেন ও দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের যথাসাধ্য সেবা করিতেন। গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে দোস্ত ফিরিঙ্গি নামক একজন পর্ত্তুগীজ বণিক জনৈকা হীনবর্ণা সুন্দরীর প্রেমে জড়িত হইয়া বাস করিতেন। তাহাদের কোনও সন্তানাদি ছিল না। পরন্তু তাহার প্রভূত নগদ সম্পত্তি ছিল। এই দোস্ত ফিরিঙ্গি ইন্দ্রনারায়ণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি তাহার মৃত্যুকালে সাত মটকি রৌপ্য মুদ্রা (গোট টাকা) ইঁহাকে দান করেন ও তাঁহার বৃদ্ধা প্রণয়িনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়। কিছুকাল

পরে বৃদ্ধা পরলোক প্রাপ্ত হইলে ফিরিঙ্গি সাহেবের অবশিষ্ট সম্পদও ইন্দ্রনারায়ণের হস্তগত হয়। বহুতর ধনের অধীশ্বর হইয়াও ইন্দ্রনারায়ণ নবাব সরকার হইতে গুণানন্দী পরগণার জমিদারী হস্তগত করেন এবং বিক্রমপুর ও প্রেদবন্দর পরগণার অন্তর্গত যে সকল তালুক হস্তান্তরিত হইয়াছিল তৎসমুদয় পুনর্ব্বার আয়ত্ত করেন।

গুণানন্দী বহু বিস্তীর্ণ পরগণা। এই পরগণা এক্ষণে ঢাকা ফরিদপুর ও কুমিল্লা তিন জিলাতেই অবস্থিত। দুই আনি অংশ মাত্র ফরিদপুর জিলাতে পড়িয়াছে অবশিষ্ট অধিকাংশই কুমিল্লার অধীন, ঢাকা জিলাতেও অতি সামান্য অংশ আছে। মেঘনার পশ্চিম পারে যে অংশ অবস্থিত অর্থাৎ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত তাহার উত্তর সীমা আরা ফুলবাড়ীয়া, পশ্চিমে শ্রীপুর সাহাবন্দর (নড়িকুল) দক্ষিণ সীমানা ফতেজঙ্গপুর এবং পূর্ব্বসীমা মেঘনা নদী। মেঘনা নদীর পূর্ব্ব পারে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত যে অংশ তাহার উত্তর সীমানা নসিংপুর ও চাঁদপুর, পূর্ব্বে সিংহের গাঁও পরগণা এবং দক্ষিণে চড় ভৈরবী। এস্থলে উপরিলিখিত স্থান সমূহের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আরা ফুলবাড়ীয়া এখন নাই। বর্ত্তমান বসাকের চড়ে ইহার কিয়দংশ আছে। বর্ত্তমান নড়িয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বিত। পূর্ব্বে এই গ্রাম উত্তর দক্ষিণে লম্বিত ছিল। প্রায় ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে যখন রথ খোলার খাল (বর্ত্তমান কীর্ত্তিনাশা) দ্বারা পদ্মার জল স্রোত প্রবাহিত হয় তখন আরা ফুলবাড়ীয়া সম্পূর্ণ ও নড়িয়ার প্রায় (৳) সপ্তাংশ পদ্মার কুক্ষিগত হয়। তাহার ফলে এই গ্রাম পূর্ব্ব ও পশ্চিমে লম্বিত হইয়া পরে এই দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মাইল বা তাহার কিছু বেশী বা কম হইবে। কাজেই প্রাচীন নড়িয়া প্রস্থ অনুমান দুই মাইল ও দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মাইলের উপর ছিল। এই গ্রামের উত্তর সীমাতেই আরা ফুলবাড়ীয়া গ্রাম বা নগরে প্রথিতনামা ভূঁইয়া চাঁদরায় ও কেদার রায়ের বসত বাটী ছিল। ফতেজঙ্গপুর গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে। শুনা যায়

কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধের সময়ে রাজা মানসিংহ এইস্থানে শিবির সংস্থাপন করেন ও সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে এইস্থান ফতেজঙ্গপুর অর্থাৎ সমরবিজয় স্থান নামে অভিহিত হয়। অপিচ নড়িয়া এবং ফতেজঙ্গপুরের মধ্যে বিস্তীর্ণ খৈয়ার বিল ভিন্ন অন্য কোনও প্রাচীন গ্রামের নাম পাওয়া যায় না। খৈয়ার বিলের মধ্যে এখন কয়েকটী ছোট ছোট গ্রামের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেই সকল গ্রামে সকলই চাষী মুসলমান প্রজা, পুরাতন কোনও ভদ্রবংশের অস্তিত্ব দেখা যায় না। শ্রীপুর সাহাবন্দর বা নড়িকুলের তৌজিভুক্ত নাম সরকার সোনারগাঁও তাপ কোয়ারহাট শ্রীপুর সাহাবন্দর পরগণা। এখানকার সাহাবংশ বহুকাল হইতেই যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ছিলেন ও নিজেদের নিবাসস্থান নড়িকুল গ্রামকে শ্রীপুর নামে অভিহিত করিতে প্রযত্নপর হইয়াছিলেন কিন্তু সাধারণ্যে তাঁহাদিগের প্রদত্ত নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

ইন্দ্রনারায়ণ ঘটক উপরিউক্ত সীমাবিশিষ্ট জমিদারী রায় চৌধুরী উপাধির সহিত গ্রহণ করতঃ আপনাদিগের চিরপূজিত গোপাল-বিগ্রহের নামে শাসন সংরক্ষণ করিতে থাকেন। প্রায় ১২ * দ্রোণ ভূমির চতুর্দ্দিকে গড় খনন করিয়া আপনাদের বসত বাটী নির্ম্মাণ করেন; এই গড়খাইর মধ্যে ঘটক-ভট্টাচার্য্যের সন্তানগণ ও নিজেদের পুরোহিতগণ ধোপা, নাপিত, মালি, ভুঁইমালি † দোকানদার, পোদ্দার প্রভৃতি পৌরজন ও সিকদারদিগকে লইয়া ইহা একটি স্বতন্ত্রগ্রাম স্বরূপ অবস্থিত ছিল। সিকদারগণ তাৎকালিক গৃহরক্ষক সৈন্যের কার্য্য করিত। এমন কি অন্তঃপুরে শয়ন করিতে ও সিকদারদিগের মনোনীত গৃহ ব্যতীত কর্ত্তা কি

* সাড়ে সাত হাতে ১ নল। ২৪ নল দীর্ঘ ও ২০ নল প্রস্থ জমী ১ কালী। ১৬ কালীতে ১ দ্রোণ।

† ভুঁই মালি=ভুমিমুন্দর জাতি—রাস্তা, ঘাট, বাড়ীর প্রাঙ্গণাদি পরিষ্কার রাখা ইহাদের কার্য্য।

কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অপর গৃহে শয়ন করিতে পারিতেন না। ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের খনিত নড়িয়ার দিঘী এখনও কোনমতে বর্ত্তমান আছে। ইহার বর্গ পরিমাণ প্রায় ৪ কালী হইবে। এই দিঘীর মধ্যে এখন দুইটী বড় পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে ও অবশিষ্ট অনেক স্থল জঙ্গলে পূর্ণ রহিয়াছে। এই দিঘীর দক্ষিণ পারে দোলমঞ্চ ও তাহার প্রায় ২০০ শত হস্ত দক্ষিণে অপর একটী পানীয় জলের পুষ্করিণী; এতদুভয়ের মধ্য দিয়া বাড়ীর বাহির রাস্তা। ইহাই পুরপ্রবেশের একমাত্র পন্থা। এই পথ বাড়ীর পূর্ব্ব দিকের পথ। ইহার উভয় পার্শ্বে কদম্ব পলাশ ও বকুল প্রভৃতি ফুলের ও আম, কাঁটাল, নারিকেল ও খেজুর ইত্যাদি ফলের গাছ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই সমুদয় বৃক্ষের কোনও চিহ্ন মাত্র নাই। প্রায় ১৫ বৎসর অতীত হইল অতীতের শেষ সাক্ষীস্বরূপ প্রাচীন পলাশবৃক্ষ ভগ্ন ও ছেদিত হইয়াছে। এই প্রাচীন পলাশ বহু গোলাগুলির আঘাত সহ্য করিয়া বহুকাল জীবিত ছিল কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের তাড়নে ভূতলশায়ী হইয়াছে। এই গড়ের অভ্যন্তরে ইচ্ছা করিলে প্রায় ছয়মাস কাল বাহিরের কোনও সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া বাস করিতে পারা যাইত।

ইন্দ্রনারায়ণের চারি পুত্র রমানাথ, সুধীরাম, অনিরুদ্ধ ও পরশুরাম ক্রমে ধনৈশ্বর্য্যে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। সেই সময়ে বঙ্গের নবাবগণ হীনবল হইয়া পড়াতে এই ঘটক চৌধুরিগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে ও নবাব সরকারে বার্ষিক দেয় সদর খাজানা বন্ধ করিয়া দেয়। মুরাদ নগরের ফৌজদারী সৈন্য এই অবিমৃশ্যকারিতার প্রতিশোধ লইতে ইহা-দিগের বাসস্থান আক্রমণ করে ও পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যায়। এই জয়ে ঘটকগণের গর্ব্বের মাত্রা একটু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ফৌজ-দারের সৈন্য পরাজিত হইয়া গেলে ইঁহারাও এদিকে নবাব সৈন্যের আক্রমণ অপেক্ষা করিতে ছিলেন ও তদুপযুক্ত রসদ, অস্ত্র শস্ত্র এবং পাইক সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ওদিকে ফৌজদারি সিপাহির পরাজয়

সংবাদ নবাব সরকারে পঁহুছিলে পর মুর্শিদাবাদ হইতে ৫০০ শত সৈন্য প্রেরিত হয়। এই সৈন্যগণ আসিবার সময়ে পথে কুত্রাপি কখনও কোন বাধা পায় নাই। তাহারা অনায়াসে আসিয়া পুরাক্রমণ করে ও অবরোধ করিয়া থাকে। তখন অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগ নবাব সৈন্যে জ্বর ও উদরাময় রোগের আবির্ভাব হওয়াতে, তাহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। এদিকে নবাব-সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ১৯ দিন পর্য্যন্ত গড়ের ভিতরে থাকিয়া তীর ও গুলিদ্বারা যুদ্ধ চলিতে থাকে। এদিগে রোগাক্রান্ত নবাব-সৈন্য স্থানত্যাগের জন্য বিশেষ লালায়িত অপর পক্ষে ঘটক-চৌধুরীদিগেরও সমস্ত গোলা নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা বিশেষ বিপন্ন। এই সময়ে কোনও বিশ্বাস ঘাতক ভৃত্য উঁহাদের গোলার অভাবের কথা নবাব-সৈন্যে প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে তাহারা উৎসাহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করে। ঘটক চৌধুরিগণ নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় আরও তিন দিন পর্য্যন্ত শিক্কা টাকা কামানে (দমকা) পুরিয়া গোলার কার্য্য করে। অবশেষে এক-বিংশতি দিবস রাত্রে ৺গোপাল-বিগ্রহ এবং স্ত্রী-পরিবারাদি লইয়া পলায়ন করে। পরদিন নবাব-সৈন্য পুরদখল করতঃ গৃহাদি ভূমিসাৎ ও ভস্মসাৎ করিয়া দেয় ও সামান্য মাত্র ত্যক্তধন লুণ্ঠন করিয়া লয়। নিরক্ষর গ্রাম্য কবির গীতে এই ঘটনা বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের স্মৃতিপথে জাগরিত ছিল। অনেকদিন পূর্ব্বে আমি এই কবিতার কিয়দংশ আমার খুল্ল পিতামহ ৺শিবচন্দ্র রায় ঘটক-চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। তাহারও অতি সামান্য আমার স্মরণ আছে ; তখন এই সমুদয় গ্রাম্য গীতের মধ্যে যে আবশ্যকীয় কিছু আছে, তাহা ভাবিতাম না ও এই সকল পৌরাণিক কথা বৃদ্ধাদের সময় কর্ত্তনের একমাত্র উপায় বলিয়া তাচ্ছিল্য করিতাম ; কিন্তু আমার স্বর্গীয় পিতামহ এই সমুদয় পৌরাণিক-কথা

কহিতে কহিতে সেই ১০০ বৎসর বয়সেও যুবকের উদ্যমে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিতেন এবং আমাদিগকে পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মবিশ্বাস, গৌরব ও কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য কত উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার সেই উৎসাহপূর্ণ বাক্যের স্বর যেন এখনও কানের ভিতর বাজিতেছে বলিয়া মনে হয়।

কবিতাটী আমার যতদূর স্মরণ আছে তাহা এই—

"তীর পরে ঝাকে ঝাকে গুলি পরে রৈয়া
নৈরায় ঘটক যুদ্ধ করে কচুবনে বইয়া ২।

*   *   *   *

ঘটক পালাইলারে নৈরায় সোনারপুরি কারে দিলারে॥ ধুয়া।

*   *

দিন নাই ক্ষণ নাই রাত্রি অন্ধকার
২১ দিনে সোনার লঙ্কা * হৈল ছারখার
ও ঘটক পালাইলারে——ইত্যাদি।

*

তেতৈলের পাতে
রঘুঘটক তীর ছাড়ে ডাইন হাতে বাও হাতে

ও ঘটক—— ধুয়া।

*   *   *   *

লক্ষ্মীকান্ত ঠাকুর লৈয়া ফিরেন বাড়ী বাড়ী।

ধুয়া।

রৈয়া = রহিয়া রহিয়া। ২ বইয়া = বসিয়া। * নৈরা পাঠান্তর।

গোপালের বালাখানা করল চুরমার

ধুয়া।

এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পরে অনেক সুপারিসের পর ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের তৃতীয় পুত্র পরশুরাম রায় ঘটক-চৌধুরীর নামে জমীদারীর বন্দোবস্ত লয়েন। সেই জমীদারী অবশেষে আত্মকলহে হস্তান্তরিত হইয়া পড়ে। এখন এই বংশের কাহারও হাতে এই জমীদারীর কোনও স্বত্ব নাই। পরস্পরের বিবাদের ফলে যাহা হইয়া থাকে, ইহাদেরও তাহাই হইয়াছে। নবাবের সহিত যুদ্ধ সময়ে যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল তন্মধ্যে কয়েকটি দমকা (কামান), তরবার, বর্শা ও ঢাল ইত্যাদির জীর্ণাবশেষ এখন পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহারই একটি কামান (দমকা) সাহিত্য-পরিষদের প্রদর্শনীর জন্য প্রদত্ত হইল। ইহার কাষ্ঠনির্ম্মিত ফ্রেম ইহারই সহিত সংলগ্ন ছিল কালক্রমে সেই সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে এখন কেবলমাত্র উহার লৌহনালটী অবশিষ্ট আছে। আর তরবার ও বর্শা ইত্যাদির যাহা যাহা অপব্যবহারে ক্ষয়িত হইয়া কোনও প্রকারে অস্তিত্বের সাক্ষী দিতে ছিল, তাহাও বিগত দুই বৎসর সরকার বাহাদুরের খানাতল্লাসীর উপদ্রবের ভয়ে কীর্ত্তিনাশার গর্ভস্থ হৃতপূর্ব্ব ভূসম্পত্তির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পরশুরাম রায় চৌধুরীর নামে জমিদারী গৃহীত হইলে পর তাঁহারা সেই স্থানেই আবার নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতে থাকেন ও গোপালের জন্য "ঝিকটী ঘর" নামে পূর্ব্ব প্রচলিত দোতালা ঘরের মত ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর

নির্ম্মাণ করান। সেই গৃহের কয়েক খানি ইষ্টকও এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।

এই বংশের একখানি বংশ পত্রিকা এতৎসঙ্গে প্রদত্ত হইল।

(খ) শাখা।

অনিরুদ্ধ রায় ঘটক-চৌধুরী।

ইঁহার বংশধরগণ ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচগাও গ্রামে আছেন। নরিহাতে নাই বলিয়া তাঁহাদের বংশাবলী এখানে সন্নিবিষ্ট হইল না। যে হেতু ইহা কেবল নরিহার বর্ত্তমান ঘটক-চৌধুরী বংশেরই জন্য লিখিত।

শ্রীচিন্তাচরণ ঘটকচৌধুরী।

কোরাণ সরিফ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

অধ্যায়ের প্রারম্ভে আল, ফলাম্, মিম্ অর্থাৎ অ, ল, ম প্রভৃতি বর্ণমালার প্রয়োগ।—কোরাণ সরিফের উনত্রিশটী অধ্যায়ের মধ্যে, এইরূপ অসাধারণত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা বর্ণমালার কতিপয় নির্দ্দিষ্ট অক্ষরের সহিত আরম্ভ হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি একটী এবং অপরগুলি কয়েকটী অক্ষর লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, এই অক্ষর সকল কোরাণ সরিফের বিশেষ লক্ষণ বা চিহ্ন। কতিপয় সুগভীর গূঢ়-রহস্য গোপন রাখিবার জন্য, উহার অর্থ ভবিষ্যদ্বক্তা ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি য়িহুদীরা যাহাকে 'নোটারিকন্' বলিয়া থাকেন, সেই জাতীয় কোব্বলো অবলম্বন করিয়া, কেহ কেহ এই সকল অক্ষরের অর্থ ব্যুৎপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন এবং অনুমান করেন যে, ঈশ্বরের নাম, গুণ, আদেশ ও নিয়োগাবলী-প্রকাশক শব্দ সকলের স্থলে ঐ সকল অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে। এইজন্য বোধ হয়, এই সকল রহস্যময় অক্ষর এবং কবিতাকলাপ কোরাণ-সরিফের চিহ্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ য়িহুদিগণের 'জেমাত্রিয়া' নাম্নী অপর জাতীয়া এক কোব্বালা অনুসারে এই সকলের অর্থ উহাদিগের প্রকৃতি বা উচ্চার্য্য স্থান বা ইন্দ্রিয় অথবা উহাদিগের গণনাঙ্কের গুরুত্ব হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু মতবৈষম্য হইতেই এই সকল কল্পনার ভ্রমপ্রমাদ সহজেই প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ যথা—কোরাণ সরিফের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ন্যায় পাঁচ অধ্যায় 'আ' 'ল' 'ম' এই

তিনটী অক্ষর অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই তিনটী অক্ষর 'আল্লা লাতিফ মা'জিদ' এই তিনটী শব্দের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। [illegible] অর্থ, 'পরমেশ্বর দয়াবান্ এবং প্রগাঢ় সম্মানার্হ' অথবা "আনা মি মিন্নি" অর্থাৎ "আমাতে বা আমা হইতে" অর্থাৎ "আমাতে সমস্ত পূর্ণতা বিদ্যমান এবং আমা হইতে সমস্ত কল্যাণ নিঃসৃত হইতেছে।" আবার কেহ কেহ বলেন, "আনা, আল্লা, আলাম" অর্থাৎ "আমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময় ঈশ্বর।" এই তিনটী পদের প্রথমের আগ্যক্ষর, দ্বিতীয়ের [illegible] এবং তৃতীয়ের শেষাক্ষর গ্রহণ করিয়া উক্ত অক্ষরত্রয় [illegible] হইয়াছে। আবার কেহ [illegible] [illegible] এর" অর্থাৎ কোরাণ সরিফের "সৃষ্টি-কর্ত্তা প্র[illegible] ও বক্তা" [illegible] শব্দের প্রথম ও তৃতীয়ের আদি এবং [illegible] শেষাক্ষর লইয়া, পূর্ব্বোক্ত তিনটী অক্ষর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 'আ' অক্ষরটী কণ্ঠের নিম্নভাগ অর্থাৎ প্রথম বাগিন্দ্রিয়, 'ল' জিহ্বামূল অথবা মধ্য বাগিন্দ্রিয় এবং 'ম' ওষ্ঠ অর্থাৎ শেষ বাগিন্দ্রিয় হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া, উহাদের অর্থ, "ঈশ্বর আদি, মধ্য ও অন্ত" অর্থাৎ আমাদিগের সকল বাক্য ও সকল কার্য্যের আদি, মধ্য ও অন্তভাগে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আবার পূর্ব্বোক্ত তিনটী অক্ষরের সংখ্যানুযায়ী গুরুত্ব পরিমাণ যেমন ৭১ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে [illegible] ধর্ম্ম ৭১ বৎসরের মধ্যে স[illegible] [illegible]ব, কেহ কেহ এইরূপ অনুমানও করিয়া থা[illegible]।

আপামর সাধারণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভিন্ন ভিন্ন আরবজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও সুসভ্য কোরিস জাতির অতীব বিশুদ্ধ ও সুললিত ভাষায় কোরাণ সরিফ রচিত—অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার কদাচিৎ সংস্রব আছে। ইহাই আরবিক ভাষার অভ্রান্ত

মৌলিক আদর্শ। আবার কোন কোন সমতপ্রধান মুসলমানও বলিয়া থাকেন যে, ইহার অনুকরণ নরলোকের অসাধ্য। সেইজন্য তাঁহারা ইহাকে মৃতকে উত্থাপিত করা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠতর দৈববল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং ইহা স্বর্গ-সম্ভব বলিয়া সমস্ত জগৎকে অনুবোধিত করিতে অগ্রসর হন।

মুসলমান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদও এই দৈববলের ভাণ করিয়া, আরব-দেশের প্রধান প্রধান বাগ্মিশারদ পণ্ডিতগণের প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং কোরাণ যে ঈশ্বর-প্রেরিত, তাহাও অবিবাদে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। মহম্মদের সময়ে আরবদেশ সহস্র সহস্র কীর্ত্তিমান্ বিদ্বন্মণ্ডলীতে পরিব্যাপ্ত ছিল। কোরাণের রচনাপ্রণালী এবং অলোকসাধারণসৌন্দর্য্যের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য, তাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার একটী অধ্যায়েরও অনুরূপ কোন প্রবন্ধ লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যে, আমরা এস্থলে একটী বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। তাহা দেখিয়াই পাঠকগণ অনায়াসে উপলব্ধি করিবেন যে, আরবের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও কোরাণ সরিফ পাঠ করিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে শত শত বার ইহার সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। মহম্মদের সময়ে, ল্যাবিদ্ ইবন্ র‍্যাবিয়া নামক অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন জনৈক আরবিক কবি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। মক্কা মসজিদের দ্বারদেশে তাঁহার এক কবিতা সন্নিবদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে আরবদেশে এই কবিতা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম কবিতা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইত না। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই, কোরাণ সরিফের দ্বিতীয় অধ্যায় উক্ত কবিতার পার্শ্বদেশে সন্নিবদ্ধ হয়। এই সময়ে ল্যাবিদ্ পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি এই কবিতার প্রথম দুই চরণ পাঠ করিয়া এককালে বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন—ঈশ্বরোদ্বোধিত

ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই এরূপ পদবিন্যাস করিতে পারে না। এই বলিয়া, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। অবশেষে, যখন নাস্তিকগণের সহিত মহম্মদের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং যখন তাহারা সহস্র সহস্র ব্যঙ্গোক্তি ও ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়া, মহম্মদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, সেই সময়েই এই মহাত্মা তাহাদিগকে, বিশেষতঃ "অল মোল্লাকাৎ" নাম্নী কবিতার প্রণয়নকর্ত্তা আসাদ জাতির অধীশ্বর, আম্রি অল কায়িস নামক ব্যক্তির বিরুদ্ধে শত শত প্রস্তাব লিখিয়া, মহম্মদ ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করেন।

কোরাণ সরিফের রচনাপ্রণালী সচরাচর প্রাঞ্জল ও ওজোগুণ-সম্পন্ন। বিশেষতঃ, ইহা যে সকল স্থলে অন্যান্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের অথবা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুকরণ করিয়াছেন, সেই সকল স্থলে পূর্ব্বোক্ত গুণ সকলের পরিচয় আরও অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সংক্ষেপে বর্ণিত, প্রায়ই অস্ফুট, পূর্ব্বদেশীয় রীত্যনুযায়ী সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে ভূষিত, সুকুমার ও অল্প কথায় দীর্ঘভাবব্যঞ্জক এবং অনেক স্থলে, প্রধানতঃ যেখানে ঈশ্বরের গুণ ও অলৌকিক কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে সমুন্নত ও গৌরব-পূর্ণ।

কোরাণ সরিফ পদ্যে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাক্যাবলী সুদীর্ঘ ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ। সেইজন্য ইহার অনেক স্থলে ভাববিপর্য্যয় এবং অনাবশ্যক দ্বিরুক্তি দোষ সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু আরবজাতি এরূপ এই দোষ-প্রিয়, যে উহারা স্ব স্ব রচিত বাক্যাবলীর মধ্যেও উহার অজস্র প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কোরাণ সরিফ লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। বহুজনাকীর্ণ আরবদেশের মধ্যে তিন প্রধান ধর্ম্মাবলম্বী লোক বিদ্যমান ছিল। (১) পৌত্তলিক (২) য়িহুদী (৩) খৃষ্টান। এই অধিবাসিত্রয় প্রধানতঃ সকলে সম্মিলিত ও নায়কবিরহিত

হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ পৌত্তলিক, অবশিষ্ট যিহুদা ও খৃষ্টান। এই অধিবাসীদিগের অধিকাংশই ভ্রমসঙ্কুল-মত-বিরোধী বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিল। তাহারা এক অনন্ত অদৃশ্য ঈশ্বরের উপাসনা ও পূজা করিত। তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে সমস্ত জগৎ এবং যাঁহারা ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন অথচ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি-পালন ও বিচার কর্ত্তা নহেন, এমন কতকগুলি পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিত। এই তিন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে একত্রীকরণ; কতকগুলি উৎসবের বাহ্যিক লক্ষণ ও ঐহিক ও পার-লৌকিক দণ্ডপুরস্কারের আশ্বাসে আশ্বাসিত করিয়া, উহাদিগকে কতিপয় প্রাচীন ও অভিনব নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত করণ; এবং মহম্মদ ভবিষ্যদ্বক্তা ও ঈশ্বরের দূত—তিনি প্রাচীন কালের পুনরুক্ত উপদেশমালা, অঙ্গীকার ও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া, অবশেষে বলপূর্ব্বক যে ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবেন, তাহাতে সম্পূর্ণশ্রদ্ধাবান্ হইয়া এবং তাঁহাকে ধর্ম্ম জীবনের ত্রাণকর্ত্তা ও ইহ সংসারের অদ্বিতীয় অধিপতি ভাবিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার বশীভূত হওয়া; কোরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

তদনুসারে, একেশ্বরবাদই কোরাণ সরিফের সর্ব্বোচ্চ নীতি। এই নীতি পুনঃ স্থাপন করিবার জন্যই, মহম্মদ ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, স্পষ্টাক্ষরে এই কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অনাদি অনন্ত কাল হইতে ইহ সংসারে এক ভিন্ন দুই সত্য ধর্ম্ম অবস্থিতি করে নাই এবং করিতেও পারে না, ইহাও তাহার অকাট্য মত। কারণ, যদিও কতক-গুলি বিশেষ বিধি ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া, শুদ্ধ কয়েক দিনের জন্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্বর্গীয় নিয়োগানুসারে পরিবর্ত্তন পরতন্ত্র হইয়া থাকে, তথাপি উহাদিগের সারাংশ অনন্ত সত্যস্বরূপ বলিয়া কদাপি পরিবর্ত্তনশীল নহে; প্রত্যুত, অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবে। অধিকন্তু, মহম্মদ শিষ্যগণকে এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন

যে, যে সময়ে এই ধর্ম্ম অনজ্ঞাত অথবা মৌলিক সত্য হইতে অপভ্রংশ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময়েই জগৎ পাতা জগদীশ্বর মহান অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক, বহুসংখ্যক ভাবিষ্যদ্বক্তা দ্বারা তদ্বিষয় মনুষ্যবর্গকে পুনরায় অবগত ও শিক্ষা প্রদান করাইয়াছেন। ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-সংস্থাপকগণের সময় হইতে মহম্মদের সময় পর্য্যন্ত, মোজেস্ ও যিশু সর্ব্বপ্রধান। তৎপরে মহাপুরুষ মহম্মদের আবির্ভাব হইয়াছে। উক্ত মহাত্মাই সকলের শেষ ধর্ম্মসংস্থাপক। ইহার পরে আর কাহারও আবির্ভাবের আশা নাই। যে নারকীগণ, পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসংস্থাপকগণের অবমাননা ও বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের নিকট বিষম শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, মহম্মদ কোরাণ সরিফের অনেক স্থলে, তাহাদিগের ভীষণ দণ্ডের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, স্বীয় বাক্যে সাধারণের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উহাদিগের মধ্যে তিনি কতকগুলি গল্প বা কতিপয় ঘটনা ওল্ড এবং নিউ টেষ্টামেণ্ট এবং অপরগুলি য়িহুদীদিগের কিংবদন্তী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উহাই কোরাণ সরিফে সন্নিবেশিত করিয়া, খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অলীকতা সপ্রমাণ করিয়া মতারোল সমানয়ন করিয়াছেন।

কোরাণ সরিফের অপরাংশে আবশ্যক নিয়ম ও বিধি; নৈতিক ও ঐশ্বরিক ধর্ম্মের অনবচ্ছিন্ন উপদেশ; এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর একমাত্র অনন্ত অনাদি ঈশ্বরের আরাধনা ও পূজা এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে সমুজ্জ্বল কৌস্তুভ মণির স্থায় এমন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় সকলও নিহিত রহিয়াছে যে, সেই সমস্ত কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ সকলেরই পরম হিতকর এবং ধর্ম্মজীবনের দেবদুর্লভ অমূল্য রত্ন।

এতদ্ব্যতীত, কোরাণ সরিফে বাক্য সকলও বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া সেই সমুদয় বর্ণিত

হইয়াছে। কারণ, যে সময়েই হউক না কেন, যখন মহম্মদ কোনও বিষয়ের নিমিত্ত বিরক্ত ও উদ্বেজিত হইয়াছেন এবং যখন কোন ক্রমেই তাহাতে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তখনই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি ঈশ্বরের এক অভিনব আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন এবং তথাবিধ অনুষ্ঠানে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে আশু প্রতীকার লাভ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। বস্তুতঃ মহম্মদ অন্যান্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের ন্যায়, এক কালে সমগ্র কোরাণ সরিফ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; প্রত্যুত, ঈশ্বর যখন নরলোকের শিক্ষা বিধানের উপযুক্ত অবসর বোধ করিয়াছেন, তখনই তিনি কোরাণ সরিফের কিয়দংশ খণ্ডাকারে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহম্মদ অন্যান্য ভবিষ্যদ্বক্তাগণের ন্যায় সমগ্র কোরাণ সরিফ এইরূপ প্রকাশ করিয়া অতি সুবুদ্ধি ও প্রশংসার কার্য্য করিয়াছেন। কারণ, যদি উহা এককালে প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে বহুবিধ আপত্তি উত্থাপিত হইত ; সেই সকল আপত্তি খণ্ডন করা অসম্ভব না হইলেও, অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু তিনি উহা খণ্ড খণ্ড সময়ে সময়ে প্রকাশিত বলিয়া স্বীকার করাতে, তিনি এক পক্ষে যেমন সকল বিঘ্ন বিপদ হইতে অনায়াসে ও নিরঙ্কুশভাবে সবিশেষ মর্য্যাদা ও [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছেন, [illegible] কোরাণ সরিফের [illegible] রক্ষা করিতেও সমর্থ হইয়াছেন।

এদিকে মুসলমানেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, কোরাণ সরিফ কস্মিন্ কালেও মহম্মদ বা তৎস্থানীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত বা লিখিত হয় নাই। উহাদিগের অন্ধ বিশ্বাস এই যে, কোরাণ সরিফ অনাদি, অনন্ত, ও ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বরের সিংহাসনের পুরোভাগে যে বিশাল বেদী আছে, উহার এক খণ্ড তাহার উপর অনাদি অনন্ত কাল হইতে স্থাপিত রহিয়াছে। সেই বেদীর উপরি

অতীত ও ভবিষ্যতের স্বর্গীয় নিদেশবাক্যগুলিও অনন্তকাল হইতে সংগৃহীত আছে। উক্ত কোরাণ সরিফের একখানি আদর্শলিপি স্বর্গীয় দূত গ্যাব-রীয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় রোমজান মাসে শক্তির রজনীতে মর্ত্ত্যভূমিতে প্রেরিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় দূত গ্যাবরীল উহাই কার্য্যের আবশ্যকতানুসারে তেইশ বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কখন মক্কা নগরীতে কখন বা মদিনাতে খণ্ডে খণ্ডে মহম্মদের নিকট প্রকাশ করেন এবং প্রতিবর্ষে এক-বার করিয়া, সমগ্র কোরাণ সরিফ মহম্মদের নেত্রগোচর করাইবেন এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু কথিত আছে, মহম্মদের জীবিতকালের শেষ বর্ষে তিনি এই কোরাণ সরিফ মহম্মদকে দুইবার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন যে, গ্যাবরীলের নিকট কোরাণ সরিফের যে আদর্শলিপি ছিল, তাহা পট্টবসনে মণ্ডিত ও মণিমুক্তাদি-খচিত। উঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, কোরাণ সরিফের কতিপয় অধ্যায়মাত্র মহম্মদের নিকট সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; অপরগুলি স্বর্গীয় দূতের আদেশানুসারে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়া ভবিষ্যদ্বক্তার নিয়োজিত কোনও লেখক দ্বারা সময়ে সময়ে লিখিত হইয়াছিল। সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ষন্নবতি অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটী কবিতা সর্ব্বাগ্রে মহম্মদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ষন্নবতি অধ্যায়।

ঘনীভূত রক্তনামে, অভিহিত—মক্কা নগরে প্রকাশিত

পরম দয়াবান্ ঈশ্বরের নামে।

যিনি সকল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার সেই প্রভুর নামে পাঠ কর; যিনি মনুষ্যকে ঘনীভূত রক্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

তোমার পরম উপকারী প্রভুর দ্বারা পাঠ কর;

যিনি লেখনীর ব্যবহার শিখাইয়াছেন;

মনুষ্য যাহা জানে না, তাহাই যিনি মনুষ্যকে শিখাইয়াছেন।

ভবিষ্যদ্বক্তার মুখনিঃসৃত নবপ্রকাশিত বাক্য-পরম্পরা তদীয় লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইলে, ঐ সমস্ত তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে প্রচারিত হইত। কেহ কেহ উহাদিগের নিজ ব্যবহারের জন্য ঐ সমস্ত বাক্যের অনুলিপি প্রস্তুত করিত, কিন্তু অধিকাংশ শিষ্যই সেই সকল এককালে মুখে মুখে অভ্যাস করিয়া ফেলিত। তৎপরে আদিম আদর্শ মহম্মদের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইত। এবং একটী সিন্দুকের মধ্যে স্তূপাকারে রক্ষিত হইত। কোন্ সময়ে কোন্টী আসিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা থাকিত না। এই কারণ বশতঃই, কোন্ সময়ে কোরাণ সরিফের কোন্ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না।

আজ কাল যেরূপ শ্রেণিবদ্ধভাবে কোরাণ সরিফের অংশ সকল একত্র সংগৃহীত হইয়াছে, মহম্মদের মৃত্যুকালে সেরূপ হইত না। মহম্মদের উত্তরাধিকারী আবু বেকার এই কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি দেখিলেন, মহম্মদের শিষ্যবর্গের মুখে মুখে কোরাণ সরিফের অধিকাংশ প্রচলিত রহিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে শায়িত হইয়াছে ও হইতেছে; সুতরাং তিনি কোরাণ সরিফের সমস্ত অংশ একত্র সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সেই আদেশক্রমে শুদ্ধ তালপত্রে ও চর্ম্মে লিখিত অংশ সকল একত্র সংগৃহীত হইল এমন নহে, মুখে মুখে যে অংশ প্রচারিত হইয়াছিল; তাহাও সংগৃহীত হইল। এইরূপে সমস্ত অংশ একত্রীভূত হইলে, তিনি সেই লিখিত পুস্তকখানি কাসিম ওমরের দুহিতা হাফসা নাম্নী মহম্মদের অন্যতমা বিধবা পত্নীর নিকট রক্ষা করিলেন।

এই সম্বন্ধ হইতেই সচরাচর সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন যে, আবুবেকার কোরাণ সরিফের সংগ্রাহক এবং তিনিই কোরাণ সরিফকে বর্ত্তমান বিভাগের ন্যায় অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। বস্তুতঃ কোরাণ

সারিফের যে যে অংশ যে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সেই অংশ সেই সময়ের ক্রমানুসারে বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; পরন্তু অধ্যায়ের দীর্ঘতানুসারে অধ্যায় সকল বিনিবেশিত হইয়াছিল বলিয়া, সহজেই প্রতীতি হয়।

হিজিরার ত্রিংশৎ বর্ষে যখন কালিফা ওটম্যান মুসলমান শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, সেই সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কোরাণ সরিফে বিষম অনৈক্য দেখিতে পান। উহার উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, সেই সময়ে আইরাক্ প্রদেশের অধিবাসিগণ আবু মুসা অল অসারি এবং সিরিয়াবাসিগণ ম্যাকদাদ এবন্ আসওয়াদের লিখিত কোরাণ সরিফ পাঠ করিতেন। কালিফ ওটমান নিজ অনুচরবর্গের পরামর্শানুসারে হাফ্সার নিকট রক্ষিত আবুবেকারের সংগৃহীত কোরাণ সরিফের অনুলিপি জিদ এবন্ থ্যাবেট, আবদুল্লা এবন্ জোবেয়ার, সৈয়দ এবন্ অল অস্, মাক্‌ঝুমাইৎ সম্প্রদায় ভুক্ত আবদুল রহমন এবন অল্ হারেথ প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং আদেশ করিয়াছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন কোরাণ সরিফের মধ্যে যদি কোন শব্দের বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে উহা কোরিস্ ভাষায় লিখিত মূল কোরাণ সরিফের অনুকরণে লিখাইয়া দিবেন। এই সকল কোরাণ সরিফের অনুলিপি প্রস্তুত হইলে, কালিফা ওট্ম্যান সেই সমস্ত স্বকীয় সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া দেন এবং পুরাতন গ্রন্থগুলি এক কালে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। পূর্ব্বকথিত তত্ত্বাবধায়কগণ হাফ্সার নিকট রক্ষিত কোরাণ সরিফেরও অনেক স্থল সংশোধন করিয়াছিলেন বটে, তথাপি আজিও উহাতে কতিপয় বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ব-বর্ণিত বিষয় সকল দেখিয়া পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিবেন যে, কোরাণ সরিফ মুসলমানগণের অতীব ভক্তির পদার্থ। উহারা হস্তপদাদি প্রক্ষালন না করিয়া এবং বিধি পূর্ব্বক স্নাত ও পবিত্র

না হইয়া, এই স্বর্গীয় কোরাণ সরিফ স্পর্শ করিতে সাহসী হয় না। পাছে, তাঁহারা অনবধান বশতঃ অকস্মাৎ এই কর্ম্ম করিয়া ফেলেন এই ভয়ে, তাঁহারা কোরাণ সরিফের উপরে বৃহদক্ষরে লিখিয়া রাখেন যে, যাহারা অপবিত্র ও অসংস্কৃত তাঁহারা যেন এই কোরাণ সরিফ স্পর্শ না করেন। মুসলমানগণ এই গ্রন্থখানি অতীব যত্ন ও সম্মান সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন; এমন কি অপবিত্র হইবার ভয়ে উহাকে কটিদেশের নিম্নে আনয়ন বা ধারণ করেন না; উঁহারা ইহা স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া থাকেন; গুরুতর ঘটনাতে ইহার ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করেন; যুদ্ধস্থলে ইহাকে সঙ্গে লইয়া যান; পতাকার উপর ইহার বাক্য সকল লিখিয়া রাখেন; ইহাকে স্বুবর্ণ ও মণিমুক্তাদিতে ভূষিত করেন এবং কস্মিনকালেও বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের অধিকারে রাখিতে চাহেন না।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কোরাণসরিফ অনুবাদিত হইলেও অপবিত্র ও অসংস্কৃত হয়; কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কতকগুলি মুসলমান শুদ্ধ পারশী ভাষায় কোরাণ সরিফ অনুবাদ করা দূরে থাকুক, অন্যান্য বহুবিধ ভাষাতে বিশেষতঃ যাবা ও মালয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। যদিও উহারা আরবী ভাষায় লিখিত মূল কোরাণ সরিফের সমকক্ষ নহে, তথাপি সেই সেই কোরাণ সরিফ মূলের ফলানুসারী।

ফলতঃ সংক্ষেপে, কোরাণ সরিফ স্বর্গীয় ঘোষণাগ্রন্থ। মুসলমানধর্ম্মানুসারে এই পুস্তক সৃষ্টির আদিকাল হইতে সপ্তম স্বর্গে রক্ষিত ও সঞ্চিত রহিয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের অখিল নিদেশ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের যাবতীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্বর্গীয় দূত জীবরীল স্বর্গীয় নির্দ্দেশাত্মক এই পরম পবিত্র ঘোষণাবলীর অনুলিপি মর্ত্ত্যধামে আনয়ন করেন এবং কোনও ঘটনা বা কোনও গুরুতর

কার্য্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে খণ্ডাকারে মহম্মদের মুখনির্গলিত বাক্য দ্বারা জগতীতলে ঘোষণা করেন। স্বয়ং ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া ঐ সমস্ত ঘোষণাতে প্রথম পুরুষ প্রযুক্ত হইয়াছে। যে প্রকারে এই ঘোষণা-বাক্যগুলি আচার্য্য বা শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা রক্ষিত ও মহম্মদের পর-লোকান্তে আবু বেকার কর্তৃক সঙ্কলিত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ফলতঃ কি ধর্ম্মনীতি কি দণ্ডনীতি, কি দায়ভাগ সকল বিষয়েই ইহাই প্রধান শাস্ত্র এবং মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বিগণের অতীব শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। যাঁহারা ইহার এক একখানি অনুলিপি অতীব সমৃদ্ধি সহকারে আবদ্ধ ও ভূষিত করিয়া রাখিয়া থাকেন, তাঁহারা আপনাদিগকে মহা গৌরববান জ্ঞান করিয়া থাকেন। অপবিত্র হস্তে এই গ্রন্থ স্পর্শ করা অতীব দূষনীয় এবং ইহাকে কটিতটের নিম্নদেশে রাখিয়া পাঠ করা এক কালে অবৈধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মুসলমানগণ এই গ্রন্থ স্পর্শ করিয়া শপথ করেন এবং ইহার কোন এক স্থল উদ্‌ঘাটন করিয়া নিজ নিজ শুভাশুভ দেখিয়া লন। ফলতঃ ইহাতে যেরূপ প্রগাঢ় ধীশক্তি, ঈশ্বরপ্রেম, নির্জ্জন-চিন্তার অবাধ স্রোত এবং আরবিক ভাষার অপরিসীম মহত্ত্ব প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে ইহা তত্ত্ববিদ্যার প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ, বিশেষতঃ মহম্মদের ন্যায় নিরক্ষর লোকের পক্ষে, উহা নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক বলের অভাবনীয় উদ্বোধন বলিয়া সহজে প্রতীত হয়।

কোরাণ সরিফ অথবা এই লিখিত শাস্ত্র ব্যতীত, অপর কতকগুলি গল্প ও ব্যবস্থাবলী মহম্মদের মুখ হইতে সময়ে সময়ে প্রবাদরূপে নিঃসৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া একখানি পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হয়। মুসলমানগণ উহাকে সুন্না অর্থাৎ মহম্মদের বাক্যের ও কার্য্যের নৈতিক প্রবাদাবলী-সঙ্কলিত মৌখিক শাস্ত্র বলিয়া থাকে। উহা কোরাণ সরিফের পরিশিষ্ট বিশেষ।

কোরাণ সরিফে যে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছিল। নামতঃ ও কার্য্যতঃ উহা য়িহুদীগণের "মিশনা" গ্রন্থের অনুরূপ। ফলতঃ কোরাণ সরিফ আপামর সাধারণ মুসলমান মাত্রেরই অতীব শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। সোন্না, তুরস্কবাসিগণ অতীব শ্রদ্ধা সহকারে সমাদর করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, ইমাম নামেও মহম্মদীয়গণের অপর একখানি গ্রন্থ আছে, পারশীকগণ পরম-ভক্তি-সহকারে এই গ্রন্থের অনুশাসন সমস্তের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাবাখেলার ইতিহাস

অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে দাবাখেলা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষ, পারস্য, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জারমন, ডেনমার্ক ও ইতালী প্রভৃতি দেশ সমূহে দাবাখেলা অতিশয় আদরণীয়, বিশেষতঃ ইতালীবাসীরা দাবাখেলায় এত পারদর্শী যে, সমগ্র ইউরোপের অন্য কোন জাতি এই খেলায় তাহাদের সমকক্ষ নহে। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর-প্রাপ্ত ইতালীয় বৃদ্ধদিগের সময় অতিবাহিত করিবার দাবাখেলা প্রধান সহায়।

ভারতবর্ষেও এই খেলা বহু দিবস হইতে প্রচলিত রহিয়াছে এবং বঙ্গদেশে পল্লী ও নগর সমূহে বৃদ্ধদিগের মধ্যে দাবাখেলার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু কোন দেশ হইতে ইহা প্রথম অবিষ্কৃত হয় এবং কে যে ইহার আবিষ্কার কর্ত্তা, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন। বহু অনুসন্ধান দ্বারাও, এই খেলার ইতিহাস অবগত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ পৃথিবীর সকল জাতিই দাবাখেলার প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া দাবী করে।

চীনের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দাবাখেলা প্রথমে চীন হইতে আবিষ্কৃত হয়, খৃঃ ১৫০ পূর্ব্বে জনৈক চীন সেনানী সৈন্যগণের সমর প্রতিভা উদ্দীপ্ত করিবার মানসে তাহার শীতাবাসে এই খেলা প্রথম আবিষ্কার করেন এবং ঐতিহাসিকব্যারিংটনও (Barrington) এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) বলেন যে, এই বিখ্যাত খেলার আবিষ্কারের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকেই সম্মান দেওয়া উচিত কারণ তাঁহারাই প্রথমে দাবাখেলা আবিষ্কার করেন এবং তৎকালীন রাজপরিবারভুক্ত অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের চিত্ত-বিনোদন হেতু ক্রীড়াচ্ছলে সরল প্রণালীতে সমরচিত্র প্রদর্শন করাইতেন।

পারস্যবাসীরাও স্বীকার করেন যে, তাঁহারা খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দাবাখেলা ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করেন এবং এই খেলার নিয়মাবলী সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে দাবাখেলার আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে প্রথমটি এই :—

খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে জনৈক বিরহ-বিধুরা রাজকন্যার বিষাদ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত একজন ব্রাহ্মণ দাবাখেলা প্রবর্ত্তন করেন। দ্বিতীয় প্রবাদটী এই :—

জনৈক রাজা নানারূপ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যখন জীবনের শেষ সময়ে উপনীত হইলেন ও বয়োবৃদ্ধি হেতু শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল তখন তাঁহার চিত্তবিনোদন এবং সময় অতিবাহিত করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ দাবাখেলার আবিষ্কার করিলেন। কথিত আছে যে, রাজা এই খেলা দেখিয়া এত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, তিনি আবিষ্কারকর্ত্তাকে স্বেচ্ছানুযায়ী পুরস্কার মনোনীত করিতে বলিয়াছিলেন; পার্থিব-সম্পদ-লোভবিহীন ব্রাহ্মণ রাজাকে পরীক্ষা করিবার মানসে বলিয়াছিলেন যে, দাবার ছকের অন্তর্ভূত প্রথম ঘরের

জন্য একটি যবের শীষ, দ্বিতীয় ঘরের জন্য দুইটি শীষ, তৃতীয় ঘরের জন্য চারিটি, চতুর্থ ঘরের জন্য আটটি এইরূপ ক্রমাগত প্রতি ঘরের জন্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘরের দ্বিগুণ সংখ্যা করিয়া ক্রমান্বয় ৬৪ ঘরের জন্য পুরস্কার স্বরূপ যথাসংখ্যা যবের শীষ প্রদান করিতে হইবে। রাজা প্রথমতঃ ইহা অতি সামান্য পুরস্কার মনে করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহার মনে হইয়াছিল যে হয়ত ব্রাহ্মণ নানাপ্রকার ধন-রত্ন মনোনীত করিবে। যাহাহউক তন্মুহূর্ত্তে রাজা ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য ধনাধ্যক্ষকে অনুমতি করিয়াছিলেন। রাজার এইপ্রকার অনুমতি শুনিয়া ধনাধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে প্রমাণ করিলেন যে, তাঁহার অধীনস্থ সমগ্র দেশে এত পরিমাণ যব উৎপন্ন হয় না. সুতরাং এই মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় পূর্ণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। রাজা পুনরায় ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি অন্য কোন প্রকার পুরস্কার মনোনীত করুন, যে হেতু এত পরিমাণ যব তাঁহার রাজ্য মধ্যে উৎপন্ন হয় না। ব্রাহ্মণ অন্য কোন প্রকার পুরস্কার মনোনীত না করিয়া কেবল মাত্র রাজাকে বলিলেন যে, আমি কোন প্রকার পুরস্কারের প্রার্থী নহি, তবে আপনার ন্যায় ব্যক্তির এই প্রকার অবিবেচকের মত প্রতিজ্ঞা করা অতি বিপদ্‌জনক,—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তৃতীয় প্রবাদটী এইরূপ :—

লঙ্কাধিপতি রাবণ-মহিষী মন্দোদরী দ্বারা দাবাখেলা প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু ইহা গ্রাম্য প্রবাদ মাত্র। ইহার মূলে যে কোন সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, ট্রয়-নগরী-অবরোধ কালে গ্রীকগণ পারস্যবাসীদের নিকট হইতে দাবাখেলা শিক্ষা করিয়া অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে এই খেলা প্রচার করেন। হয় গ্রীকগণ

ভারতবর্ষ হইতে দাবাখেলা শিক্ষা করিয়াছিল নতুবা ভারত হইতে শিক্ষিত পারস্যবাসীদের নিকট হইতে তাহারা শিক্ষা করিয়াছিল।

আবার অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে. আলেকজাণ্ডারের সময় ভারতবর্ষে দাবাখেলার হয়ত প্রচলন ছিল না, কারণ সেই সময় যদি এই খেলার প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আলেকজাণ্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

এই প্রকার উক্তি আদৌ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়না, কারণ আলেকজাণ্ডার ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সামাজিক আচার-ব্যবহার দেখিবার জন্য ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন নাই, কিংবা ভারতবাসীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতেও আসেন নাই, তিনি তরবারি হস্তে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তরবারি হস্তেই ভারতবাসী সমরক্ষেত্রে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। সমর অবসানে যে কয়েকদিন অবসর পাইয়াছিলেন সেই কয়েকদিন, বিজিত দেশ-সমূহের সহিত বাণিজ্য-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। মোটকথা এই যে, মেসিদোনীয়ান বীরের বিলোল কটাক্ষ এই বিশাল স্বর্ণপ্রসূ ভারতের উপর পড়িয়াছিল, ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহার তুলনায় অতি নগণ্য দাবার ছক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই বলিয়া যে, সেই সময় এদেশে দাবাখেলা প্রচলিত ছিল না এ প্রকার সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

যদিও স্বীকার করা যায় যে, আলেকজাণ্ডারের সময় দাবাখেলা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিলনা, তথাপি মেগাস্থিনিসের সমভিব্যাহারী গ্রীকগণ পঞ্চনদ প্রদেশে দাবাখেলা প্রথম শিক্ষা করেন এইরূপ প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুতরাং ২৯৪ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দাবাখেলা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই অর্থাৎ চীনে দাবাখেলা আবিষ্কৃত হইবার ১৪৪ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দাবাখেলা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

যদিও কথিত আছে যে, ডেনমার্কে প্রাচীন কাল হইতে দাবাখেলা প্রচলিত আছে, তথাপি ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহা গ্রীস ব্যতীত ইউরোপের অন্য কোন দেশে প্রচলিত ছিল না। আরবেরা এই খেলা ইউরোপীয় তুরস্কদিগকে শিক্ষা দেয় এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা তুরস্ক হইতে এই খেলা শিক্ষা করে। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ডেনমার্ক, আয়রলাণ্ড প্রভৃতি দেশে যে খেলা প্রচলিত ছিল তাহা প্রকৃত দাবাখেলা নহে। ইহা রোমানদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত "এলিয়া তেসিরা" নামক খেলা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রকৃত দাবাখেলা প্রথম ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়, ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্যাক্সটন্ নামক মুদ্রা যন্ত্রে দাবার ছক প্রথম মুদ্রিত হইয়া সাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত হয়। তখন চতুর্থ এডোয়ার্ড ইংলণ্ডে রাজা। প্রথম চার্লস্ও দাবাখেলায় অতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, এই খেলা মার্জ্জিতরুচি সম্পন্ন আমোদ এবং ইহাতে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইটালীতে দাবাখেলা প্রবর্ত্তিত হয়, এবং ইটালীবাসীরা এই খেলায় নিপুণতার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, প্রায় তিন শত বর্ষ পর্য্যন্ত ইউরোপের অন্য কোন জাতি তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। দাবাখেলায় তাহাদের অতি আশ্চর্য্যজনক ধৈর্য্য—একটী মাত্র চাল দিবার জন্য তাহারা এত তন্ময় হইয়া ভাবিত যে, রাত্রি প্রভাত হইয়া পুনরায় সূর্য্যোদয় হইলেও চাল স্থির হইত না। এই প্রকারে একবার মাত্র খেলা শেষ করিতে দিনের পর দিন গত হইয়া সপ্তাহ আসিত, সপ্তাহ আবার মাসে পরিণত হইত—এক মাস, দুই মাসেও খেলা শেষ হইত না—বর্ষ আসিল তবুও খেলা শেষ হইত না। একজন এক মাস ভাবিয়া একটি চাল দিল, বিপক্ষ তিন মাস ভাবিয়া একটি চাল দিল, এইরূপে তাহাদের জীবন শেষ হইতে চলিল তথাপি খেলা শেষ হইল না; অবশেষে পুরুষানুক্রমে

খেলা চলিত; কারণ অন্যান্য বিষয়-বৈভবের ন্যায় অসম্পূর্ণ খেলাও মৃত্যুকালে উইল করিয়া যাইত। সুইডেনাধিপতি দ্বাদশ চার্লস্ দাবা খেলিতে ভাল বাসিতেন, তাঁহার সভাসদ ও সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মধ্যে প্রতিদিন এক একজনকে তাঁহার সহিত খেলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইত। ফ্রান্স ও জার্মানে এই সময়েই দাবা খেলা প্রচলিত হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কোহিনূর।

ভারতের চির-গৌরব, মহামূল্য কোহিনূরের নাম শুনেন নাই, এমন লোক অতি বিরল। এই মহোজ্জ্বল রত্ন এখন ভারত-সম্রাটের সম্পত্তি এবং তাঁহার শিরোভূষণ। কোহিনূর ভারতের প্রাচীন সম্পত্তি হইলেও, পূর্ব্বকালে ইহা কি নামে পরিচিত ছিল জানা যায় না। পারস্যদেশীয় ভাষায় 'কো' শব্দের অর্থ 'পর্ব্বত,' এবং নূর শব্দের অর্থ "আলোক বা দীপ্তি," সুতরাং বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে, "আলোক-গিরি" এরূপ একটা নাম দিতে হয়।

কোহিনূর প্রথমে কোথায় ছিল, কিরূপেই বা মনুষ্যের হস্তগত হইল, কিছুই নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। এই মহামূল্য হীরক খণ্ড সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইতিহাসানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এতদূর সাহসী যে, তাহারা ইহাকে ইন্দ্রের কৌস্তুভমণি বলিতে সঙ্কুচিত নহে। তাহারা বলে—ইন্দ্রের নিকট হইতে—হস্ত হইতে হস্তান্তরে গিয়া অবশেষে ইহা রাজা নহুষের হস্তে পতিত হয়। প্রচলিত মতানুসারে, এই অমূল্য হীরক-খণ্ড স্নিগ্ধতোয়া কৃষ্ণার নিকটবর্ত্তী

গোলকুণ্ডার এক আকরে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ষষ্টি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গোদাবরীতীরস্থ বালুকারাশির মধ্য হইতে এই কোহিনূর আবিষ্কৃত হয়। অন্যে মনে করেন, মহাভারতের খ্যাতযশা, অঙ্গাধিপ মহাবীর কর্ণের যে মূল্যবান্ এক খণ্ড হীরক ছিল, তাহাই এই কোহিনূর।

অপর একদল লোক এই সকল জল্পনা-কল্পনা প্রমাণাসিদ্ধ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন কোহিনূর, মধ্যভারতের সমৃদ্ধিশালী রাজা বিক্রমাদিত্যের অপরিমেয় ধন-ভাণ্ডারের অন্যতম রত্ন। তাঁহার রাজ্যাবসানে, ইহা মালব রাজগণের অধিকারে আইসে। তাঁহাদের হস্তে ইহা প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল। তৎপরে দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দিন মালবদেশ অধিকার করিয়া, কোহিনূর হস্তগত করেন। যাহা হউক বাবরের সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোহিনূর সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস-যোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে বাবর তৎকালীন পাঠান-বংশধরকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং ভারতবর্ষে বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান।

ঠিক ঐ সময়ে গোয়ালিয়রে বিক্রমজিৎ নামে একজন হিন্দু রাজা ছিলেন। দিল্লীর অধীশ্বর পাঠান বংশের শেষ নৃপতি ইব্রাহিম লোদির সহিত পাণিপথে মোগল-কুলগৌরব বাবরের ভীষণ সংগ্রাম হয়। বিক্রমজিৎ পাঠানপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হয়েন। পাণিপথের এই যুদ্ধের বার দিন পরে, অর্থাৎ ১৫২৬ খৃঃ অব্দে ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে সম্রাট বাবর যে রোজনামচা লিখিয়া যান, তাহাতে একটী মহামূল্য হীরকের উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন, এই হীরকই আমাদের চির আদরের কোহিনূর। বাবর লিখিয়াছেন—"এই সময়ে বিক্রমজিৎ তাঁহার পরিবারমণ্ডলীসহ সদলে আগ্রা অবস্থিতি

করিতেছিলেন। হুমায়ুন তথায় পৌঁছিলে, বিক্রমজিতের সঙ্গীরা পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের গতিবিধি পরিলক্ষ্য করিবার জন্য, হুমায়ুন পূর্ব্ব হইতেই একদল লোক নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। উহারা অবসর বুঝিয়া তাহাদিগকে আটক করিয়া ফেলিল। কিন্তু হুমায়ুন তাহাদিগের ধনরত্ন-লুণ্ঠনের আজ্ঞা প্রদান করেন নাই, পরন্তু নিহত শত্রু-পরিবারের প্রতি অতিশয় সৎ ব্যবহার করেন। তাঁহারা হুমায়ুনের সৌজন্যে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আপন ইচ্ছাবশতঃই তাঁহার নিকটে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বহুমূল্য প্রস্তর ও রত্নরাজি "পেষ-কুস" অর্থাৎ উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। উহার মধ্যে একখণ্ড হীরক ছিল, তাহা (মালব বিজয়-কালে) আলাউদ্দীনের হস্তগত হয়। একজন বিখ্যাত জহুরী অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার মূল্য পৃথিবীস্থ সমগ্র দেশ-সমূহের একদিবসের আয়ের অর্দ্ধেকেরও অধিক হইবে। ইহার ওজন প্রায় আট মিষথাল ছিল। *

আবার অনেকেই বলেন যে, বিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক ট্যাভার্নিয়র যে হীরকখানি মোগল বাদসাহের দরবারে দেখিয়া উহার নাম The great Moghul দিয়াছিলেন কোহিনূরই তাহার অন্য নাম। কিন্তু এই মত বিশ্বাস করিবার কোন উপযুক্ত কারণ না থাকায়, আমরা ইহা সমর্থন করিতে সাহসী নহি।

বাবরের সময় হইতেই কোহিনূর দিল্লীর রাজপরিবারের অধিকারে থাকে। বহুকাল পরে আওরঙ্গজেব পিতাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া নিজে ভারতের সিংহাসনারূঢ় হয়েন। একটা প্রবাদ আছে যে, আওরঙ্গজেব পিতার মৃত্যু যাহাতে সত্বর সংঘটিত হয় তজ্জন্য তাঁহার আহার্য্য বস্তু

* Babor's Diary, and "The Land of the Five Rivers and Scinde" by David Rorss. C. I. E. P. 132.

হইতে পানীয় দ্রব্য একেবারে রহিত করিয়া দেন। ইহার ফলে সাহাজান অতি সত্বরই দুর্ব্বল ও অবশাঙ্গ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। পিপাসাক্লিষ্ট সম্রাট মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ সকল উপস্থিত দেখিয়া ক্রোধান্বিত অবস্থায় রাজকোষের সমগ্র মণি, মুক্তা, জহরৎ প্রভৃতি নষ্ট করিতে আদেশ দেন। যেন কিছুই আওরঙ্গজেব হস্তগত করিতে না পারে। জাহানারা নামে বাদসাহের রাজকার্য্যে পরামর্শদাত্রী বিদুষী এক চিরকুমারী দুহিতা ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা হেতু অন্ধকারময় ভবিষ্যতের মধ্যদিয়া তিনি সকলই দেখিতে পাইলেন। এমন একটি মহামূল্য রত্ন চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইবে, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া, পিতাকে অনেক বুঝাইয়া তিনি ঐ রত্নরাজি রক্ষা করেন।

পিতার মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া আওরঙ্গজেব ক্ষিপ্রতার সহিত আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া, প্রথমেই তিনি জাহানারার সহিত সাক্ষাৎ করেন। জাহানারাও উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া, ভারতের ভাবী সম্রাটের হস্তে বিবিধ রত্ন-পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণভাণ্ড প্রদান করেন। উহারই মধ্যে অন্যান্য জহরতের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় কোহিনূর পাওয়া গেল।

অনেকে বলেন যে, সাহজাহান ময়ুর-সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া, ময়ূরের চক্ষুর তারকার স্থলে কোহিনূর প্রোথিত করিয়া যান। দিল্লী লুণ্ঠন কালে উহা নাদির সাহের হস্তগত হয়, এবং তিনি উহা নিজদেশে লইয়া যান। এইরূপে ভারতের চির-রক্ষিত ধন পারস্যবাসী যবনের হস্তগত হয়। কিন্তু ময়ূর সিংহাসন যতই মূল্যবান্ হউক না কেন, একখানা বসিবার আসনের জন্য যে এই বহুমূল্য হীরকখণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল, একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না।

নাদির শাহ অন্য উপায়ে কোহিনূর লাভ করেন। ১৭১৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এক প্রকার শান্তিতে মহম্মদ সাহ দিল্লীর সিংহাসন ভোগ

করেন। কিন্তু পর বৎসরই বিখ্যাত পারস্যজয়ী নাদির ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। নাদির ক্রমে দিল্লী দখল করিয়া বসিলেন; ৫৮ দিন পর্য্যন্ত দিল্লীর ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, জনস্রোত-পরিপূর্ণ মহানগরী অল্প সময়ের মধ্যেই এক মহাশ্মশানে পরিণত হইল। নাদির রাজ-কোষ দখল করিলেন। বড় সাধের ময়ূর-সিংহাসন তাঁহার হস্তগত হইল; মূল্যবান্ বলিতে যাহা কিছু ছিল, সকলই বাহকের পৃষ্ঠে পারস্য দেশে প্রেরিত হইল। কিন্তু নাদিরের চিরবাঞ্ছিত কোহিনূর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কোহিনূরের নাম দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং কোহিনূর লাভ করিবার জন্য নাদির উন্মাদ-প্রায় হইয়া উঠিলেন। হীরকখণ্ড যখন কোথাও পাওয়া গেল না, তখন নাদির শাহ হতাশ হইয়া পড়িলেন। কারণ পূর্ব্ব হইতেই ইহার অন্বেষণার্থে কয়েকজন গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন খোজার সাহায্যে অন্দর মহলের বাদশাহ-পরিবারস্থ জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল। অবসর বুঝিয়া, ধূর্ত্ত নাদির আহম্মদকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি বিজিত সম্রাটকে বলিলেন "আসুন আমরা উভয়ে আমাদের উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করি। অনিচ্ছায় সম্রাট এরূপ মিত্রতা স্থাপনে বাধ্য হইলেন। স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া নাদির মহম্মদের রাজমুকুট খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। অমনিই তন্মধ্য হইতে অমূল্যধন কোহিনূর—হীরকখণ্ড নাদিরের দৃষ্টিপটে পতিত হইল। হীরক খণ্ডের উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিয়া নাদির উহার কোহিনূর বা আলোক-গিরি নাম দিলেন। ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাগমন কালে এই মণি তাঁহার বিপুল লুণ্ঠন মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হয়।

নাদিরের মৃত্যুর পর চারিদিকে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল, এবং নাদিরের সুবিশাল রাজত্ব, যে যেরূপে পারিল অধিকার করিয়া লইল। তিনি ভারতবর্ষ হইতে যে পনের কোটি টাকা মূল্যের রত্নরাজি লইয়া-

ছিলেন, তাহা চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নাদিরের পুত্র (পৌত্র) সাহরুখ কোহিনূর ও অন্যান্য বহুমূল্য প্রস্তর নিজ দখলে রাখিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন। বিজেতৃগণ তাঁহার উপর অসহ্য অত্যাচার করিতে লাগিল কিন্তু তিনি কিছুতেই কোহিনূর ছাড়িলেন না। যখন কোহিনূর বাহির হইল না, তখন দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল এবং তিনি মেসেদ নগরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মেসেদে ইম্‌মরেজার একটী দরগা ছিল। তথায় সিয়া ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানগণ তীর্থ-যাত্রার জন্য গমন করিত। কৌইন দেশের নেতা আগা মহম্মদ সাহরুখের একজন চিরশত্রু। কোহিনূর লাভ করিবার আশায় মেসেদ নগরে যাইয়া সাহরুখের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আগা মহম্মদ বহুসংখ্যক সৈন্য ও অনুচর লইয়া দরগার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন; এবং একদিন গুপ্তবেশে দরগায় যাইয়া উপনীত হইলেন। সাহরুখও ঐ দিবস তথায় ছিল, ইহা জানিতে পারিয়া অনুচরদিগকে আজ্ঞা প্রদান করায় তাহারা সাহরুখকে বন্দী করিল। বন্দীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের হুকুম জারি হইল। অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিলে সাহরুখ কতকগুলি স্বল্প মূল্যের প্রস্তর বাহির করিয়া দেন; ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আগা মহম্মদ অত্যাচার বৃদ্ধির আদেশ দেন। কিন্তু এত করিয়াও তাহার অভীষ্ট কোহিনূর ও অন্য একটী বহুমূল্য পদ্মরাগ মণি বাহির করিতে পারিলেন না।

অতঃপর আগামহম্মদ একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি সাহরুখের মস্তক মুণ্ডনের আদেশ দিলেন; মস্তকের উপর উত্তপ্ত তৈল রাখিবার জন্য গমের আটার দ্বারা প্রস্তুত একটী পাত্রের ন্যায় স্থান প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিলেন; আদেশ-বাহকেরা অগ্নিময় উত্তপ্ত তৈলরাশি তথায় ঢালিয়া দিল। অসহ্য বেদনায় সাহরুখ ভীষণ চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়াও যখন দেখিলেন যন্ত্রণার

অবসান হইতেছে না, তখন বিজেতার তুষ্টির জন্য আওরঙ্গজীবের বড় আদরের সামগ্রী পূর্ব্বকথিত পদ্মরাগমণিটি দান করিলেন। কিন্তু তাহাতেও পাষণ্ডেরা তাহাকে মুক্তি দিল না। অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে আগা মহম্মদ তাহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিবার আদেশ দিলেন। হায় বিশ্ববিজয়ী নাদিরের পুত্রের অবশেষে এই পরিণাম হইল! কিন্তু ইহাতেও তিনি কোহিনুরের প্রকৃত কথা কাহাকেও জানিতে দিলেন না।

এই অত্যাচারের কথা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আফগানিস্থানের আহম্মদ সাহ দোরনী এই অবসর বুঝিয়া সাহরূখের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পদদালিত সাহরূখের পক্ষ অবলম্বন করায়, আগা মাহম্মদের সহিত তাহার ভীষণ সংগ্রাম হয়, যুদ্ধে আগা মহম্মদ নিহত হন তিনি সারূখ্য মির্জ্জাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিতে এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তৈমুরের সহিত সারুখ মির্জ্জার কন্যাকে বিবাহ দিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সাহরূথ তাহার উদ্ধার কর্ত্তাকে কোহিনুর প্রদান করেন। কারণ তাহার অন্ধ নয়নদ্বয় আর কোহিনুরের হৃদয় তৃপ্তিকর দীপ্তিরাশি দেখিতে পাইবে না। অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়া, অবর্ণনীয় ক্লেশ পাইয়া যে জিনিস, আগা মহম্মদকে দেন নাই, আজ সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি উহা দোরাণীকে দান করিলেন। ইহার পরেই, সাহরূথ পীড়ত হয়েন, এবং রাজ্য হইতে বিতাড়িত অবস্থায় নানা ক্লেশ সহিয়া জীবন লীলা সংবরণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক চিত্র।

লক্ষ্মণসেন ও বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গলাজয়।

মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে গোবিন্দপাল দেব যে মগধের একাংশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপাদমন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বা তন্নিকট-বর্ত্তী কালে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন; * কারণ তাঁহার চতুর্দ্দশ রাজ্যাব্দ ১২৩২ বিক্রমসম্বতের সঙ্গে সমান। গোবিন্দপাল দেবের এই উৎকীর্ণ লিপিতেও "গতে" শব্দ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত লিপিগুলির সহিত ইহা মিলাইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে গয়ায় তাঁহার শাসনের কথা অতীত ঘটনায় সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাঁহার তখনও মৃত্যু হয় নাই, তাহা আমরা পরে দেখাইব। তাঁহার শাসনকালের প্রথমভাগে নালন্দা তাঁহার রাজত্বের সীমাভুক্ত ছিল; কারণ লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংগৃহীত একখানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতা" পুঁথির পুষ্পিকায় আমরা দেখিতে পাই যে, উহা গোবিন্দপাল দেবের শাসনকালের চতুর্থ বৎসরে লিখিত হইয়াছিল। + গয়ার উৎ-

* A. S. R. Vol. III, pt. XXXVIII, No. 18. Kielhorn's No 116.

+ ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্রের "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" গ্রন্থের XXII. পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কীর্ণ লিপি দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, এক সময়ে গয়া গোবিন্দপাল দেবের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই সময়টি লইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গেশ্বর কোন সেন নরপতিই তাঁহার নিকট হইতে গয়া জয় করিয়া লইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি স্বয়ং লক্ষ্মণসেন ৫১ লক্ষ্মণ সম্বতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়া-লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে গয়াপ্রদেশ সেন নরপতিদিগের অধিকারে ছিল; কারণ যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে অশোকচল্ল দেবের ন্যায় একজন বিদেশী সে সময়ে বঙ্গেশ্বর সেন নরপতিগণের অব্দ ব্যবহার করিতেন না। ৭৪ লক্ষ্মণ সম্বতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়ার লিপি হইতেও দেখা গিয়াছে যে, তখনও গয়া-প্রদেশ বঙ্গেশ্বর সেন নরপতির অধিকারেই আছে এবং "গতে" শব্দ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সেন নরপতির অধিকার এই সময়ে অবিচ্ছিন্নই ছিল।

পূর্ব্বভারতের পাল নৃপতিগণের রাজ্য কিরূপে ধ্বংস হইল, তাহারা নিশ্চিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। পালবংশের শেষ রাজার নাম এপর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা 'মদনপাল 'দেব'। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থানুসারে এই মদনপাল দেব মহোদয় বা কনোজা-ধিপতি চন্দ্রদেবের সমসাময়িক,—

কমলা-বিকাশ-ভেষজ-ভিষজা চন্দ্রেণ বন্ধুনোহংপেতাম্

চণ্ডীচরণ সরো(জ)-প্রসন্ন সম্পন্ন বিগ্রহশ্রীকং

ন খলু মদনং সাঙ্গেশমীশমগাদ জগদ্বিজয়লক্ষ্মীঃ। *

এতদনুসারে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বৈদ্যদেব প্রদত্ত কমৌলি তাম্রশাসনের যে সময় মিঃ ভেনিস্ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা একবারে ভুল। † উহার যথার্থ সময় ১০২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯০

* সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিত—Memoirs A. S. B. Vol. II.
† Epi. Ind. Vol. II.

খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে পড়িবে। সারনাথে প্রাপ্ত মহীপাল-লিপির তারিখ ১০২৬ খৃষ্টাব্দ * এবং চন্দ্রদেবের চন্দ্রাবতী-শাসনের তারিখ ১০৯০ খৃষ্টাব্দ। † খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ৬০ বৎসরের মধ্যে পাল-রাজগণের কোন বিবরণ জানা যায় না। গোবিন্দপাল দেব ১১৬১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। সাধারণতঃ বিশ্বাস এই যে, গোবিন্দপাল দেব পালরাজবংশেরই কেহ হইবেন ; কিন্তু তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজিও পাওয়া যায় নাই। দুইটি ব্যাপারে কিন্তু এই অনুমান কতকটা সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ তাঁহার নামের শেষে 'পাল' শব্দ আছে এবং দ্বিতীয়তঃ তিনিও পালরাজগণের ন্যায় বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ধ্বংসের পরও বৌদ্ধলিপিকারেরা কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহারই নামে পুথির পুষ্পিকায় লিপির তারিখ উল্লেখ করিবার প্রথা বজায় রাখিয়া-ছিলেন। ‡ তাঁহার রাজত্বও যে কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা জানা যায় না। তবে যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি মগধ বা দক্ষিণ বিহারের কতকাংশে রাজত্ব করিতেন এবং বঙ্গেশ্বর সেন নরপতি-গণের সহিত যুদ্ধে সেই রাজ্যেরও কতকাংশ ক্রমশঃ হারাইয়াছিলেন। তিনি ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তবকত-ই-নাসিরিতে যে বিহার নগরীকে তাঁহার শেষ আশ্রয়দুর্গ বলা হইয়াছে, তাহাতে হয় ত সত্য থাকিতে পারে। § তিনি তাঁহার রাজত্বকালের ৩৮ বৎসরে মুসল-মানদিগের সহিত যুদ্ধে ধ্বংস প্রাপ্ত হন, (১১৬১ + ৩৮ = ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ) একজন বৌদ্ধলিপিকার সদুঃখে এই ঘটনা একখানি পুথির পুষ্পিকায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,—

* Annual Report of Arch. Survey of India, 1903-4.

† Epi. Ind. Vol, IX, p. 302.

‡ Bendall's Catalogue of Sans. Mss, in the University Library, Cambridge,—Buddhist Sanskrit Manuseripts.

§ Raverty's Tabaqat-i-Nasiri (Bib. Ind.)

"পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালদেবানাম্ বিনষ্টরাজ্যে অষ্টাত্রিংশৎ সম্বৎ সরেঽভিলিখ্যমানে।" *

রামচরিতে মদনপালকে 'অঙ্গেশ' অর্থাৎ অঙ্গদেশপতি বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সময়ে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ সেনরাজগণের অধীনে স্বাধীন রাজ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেনরাজগণ প্রবল হইয়া পালরাজগণ হইতে দেশের পর দেশ কাড়িয়া লইতেছিলেন এবং সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের সময় কেবল বিহার ও রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশটুকু গোবিন্দ-পাল দেবের অধিকারে ছিল। বিহারের অবশিষ্টাংশ এবং সমগ্র বঙ্গ সেন-রাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ৬০ বৎসরে পালরাজত্বের অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশী রাজগণের আক্রমণেও বিশেষ উপদ্রুত হইতেছিল।

কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রদেবও ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মগধ আক্রমণ করেন এবং মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গোরক্ষ-পুর জেলায় লারগ্রাম হইতে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রদেবের একখানি তাম্র-শাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি মুঙ্গেরে অবস্থানকালে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন গঙ্গাস্নান করিয়া গোরক্ষপুরের অন্তর্গত কোন গ্রাম এক ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন। † কানোজাধিপতি যে বন্ধুতাসূত্রে বা তীর্থস্নানের জন্য ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই, বরং তখনকার দুর্ব্বল মগধরাজ্যে আপতিত হওয়াই বেশী সম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহার ২৫ বৎসর পরে দেখা যাইতেছে, গয়াপ্রদেশে বঙ্গেশ্বর সেন নরপতিগণের অধিকারভুক্ত হই-য়াছে। মগধের প্রান্ত প্রদেশের অধিকার লইয়া এই সময়ে যে পাল-

* Bendall's Catalogue of Sans. Mss. in the university Library of Cambridge.—Buddhist Sanskrit Mss. P. iii.

† Epi. Ind. Vol, p. 99.

রাজগণ ও সেন রাজগণের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অন্তর্বিদ্রোহ শেষে মুসলমানের আগমনে মিটিয়া যায়। তুর্কীরা আসিয়া উভয় রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে। বঙ্গেশ্বর সেন রাজগণ নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং মগধরাজ গোবিন্দপাল নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন। এই ধর্ম্মমতের অসাদৃশ্য হইতেই হয় ত বা উভয় রাজ্যে চিরবিবাদের সূত্র-পাত হইয়াছিল। ধর্ম্মগত এই বিবাদের কথার ইঙ্গিত একখানি বাঙ্গলা প্রাচীন কাব্য হইতেও পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ধর্ম্মপূজার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের পূজক-সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থ "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলে" এই ইঙ্গিত দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তক আবিষ্কার করেন ; এবং ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, বৌদ্ধেরা মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিল। ইহাতে কথিত হইয়াছে, ধর্ম্ম যবনরূপী (মুসলমান) হইয়া কৃষ্ণবর্ণের টুপি মাথায় দিয়া বৌদ্ধদিগের [পরিত্রাণহেতু] আসিয়া উপস্থিত হইলেন।* ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মগধে পার্শ্ববর্ত্তী ভূপালেরা আপতিত হইতেছিলেন। সেন-রাজগণের সঙ্গেই পালরাজগণের বিবাদ একপ্রকার চিরস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছিল ; কাজেই যখন কানোজের রাঠোররাজ উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন কেহই ভাল করিয়া তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে পারিলেন না ; তিনি স্বচ্ছন্দে মুঙ্গের পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িলেন। এই সুযোগ দেখিয়াই মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজি বিহার নগর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সাহসী হন। পালরাজগণ তখন অতি দুর্ব্বল। তাঁহারা এই বিদেশীয় আক্রমণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। বঙ্গেশ্বর

* The discovery of Living Buddhism in Bengal by Mahamahopadhyaya H. P. Shastri.

সেনরাজও তখন এই বিদেশী শত্রুকে বাধা দিবার অবসর পান নাই তাঁহাকেও তখন স্বীয় গৃহবিবাদে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে আমরা দেখিতে পাই লক্ষ্মণ সেনের পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন রাজা হন। তাম্রশাসন হইতেই এই দুই নৃপতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আইন-ই আকবরীতে কেশবসেনের উল্লেখ আছে। কর্ণেল জ্যারেট অনুবাদকালে 'কেশুসেন' নাম পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কোশোয়া অর্থাৎ 'কেশব' হইবে। * ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ্ কেশবসেন দেবের একখানি তাম্রশাসন প্রকাশিত করেন। † তিনি রাজার নামটি যাহা পাঠ করিয়াছিলেন তাহা শুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইল না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, উক্ত শাসনের রাজনাম বিশ্বরূপসেন বলিয়া পঠিত হইলে শুদ্ধ হইবে। ‡ নগেন্দ্রবাবুর মতই ডাঃ কীলহর্ণ্ স্বীকার করিয়া তাঁহার সংগৃহীত উত্তর ভারতীয় উৎকীর্ণলিপির তালিকায় উহাকে বিশ্বরূপসেনের শাসন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ¶ নগেন্দ্র বাবু তাম্রশাসনখানির ১০ম কবিতায় ১৭শ পংক্তিটি সংশোধন করিয়াছেন। এই কবিতার শেষাংশের কথা কয়টির পাঠ তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ বিশুদ্ধ; কিন্তু তিনি শেষ কবিতাংশে যে রাজনাম আছে, তাহা মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। উহা 'কেশবসেন'। দাতার নামস্থলেও যে সেই নামটি আছে, তাহা ৪০—৪৩ পংক্তি মিলাইয়া দেখিলেই হইবে। লিপিখানির প্রকৃত পাঠ এই,—

"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানুধ্যাত সমস্তসুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি-গজপতি-

* Jarrett's Ain-i-Akbary (Bib. Ind.) II. Vol., p. 126.

† J. A. S. B. Vol. VII., pt. I., p. 44.—1838.

‡ J. A. S. B. Vol. pt. I.—1895.

¶ Epi. Ind : Vol. V. Appendix p. 43, No. 549.

নরপতিরাজত্রয়াধিপতি সোমকুলবিকাশভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্নকর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগতবজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ অসহ্যশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ কেশবসেনদেবপাদাবিজয়িনঃ"—তর্পণ দীঘী * ও আনুলিয়ায় † প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের শাসনে "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব কুশলী"—এবং বিশ্বরূপসেনের মদনপ্রাপ্ত শাসনে ‡ শ্রীবিশ্বরূপসেনদেবপাদা বিজয়িনঃ"—এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। যদি বাকরগঞ্জ শাসনখানি বিশ্বরূপসেনের প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে দাতার নামস্থলে উহাতে আমরা অন্যের নাম কেন দেখিতে পাইতেছি? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ইদিলপুরে প্রাপ্ত শাসনখানির নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি সংশোধনকালে

(পংক্তি ১৭)......"তস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূবৈধব্যবদ্ধব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যোনৃপঃ" ইত্যাদি স্থলে তস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূ-বৈধব্যবদ্ধব্রতো বিখ্যাতক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বরূপো নৃপঃ ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন।

এই সংশোধিত পাঠে নির্ভর করিয়া নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, ইদিলপুরের শাসনখানিও বিশ্বরূপসেনদেবের প্রদত্ত এবং কেশব সেনের নহে। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু বিশ্বরূপ শব্দটিকে একটি স্বতন্ত্র নাম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্বরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, লক্ষ্মণসেনকে করা হয় নাই। আর তাহা হইলে, তাড়াদেবী(?)কে বিশ্বরূপের মহিষী বলিয়াই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; লক্ষ্মণসেনের মহিষী বলিতে পারা যাইবে না। অবশেষে

* J. A. S. B. pt. I—1875, p. 1.
† Ibid 1900 pt. I.
‡ J. A. S. B. 1896 pt. I p. 9.

ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বরূপসেন রাজা বিশ্বরূপের ঔরসে মহিষী তাড়াদেবীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!!!

প্রকৃত প্রস্তাবে ইদিলপুরের শাসনখানি কেশবসেনেরই প্রদত্ত। তিনি লক্ষ্মণসেনের জনৈক পুত্র, তাঁহার—"অরিরাজ অসহ্যশঙ্কর গৌড়েশ্বর" ইত্যভিধেয় বিরুদ (রাজোপাধি) ছিল। এইরূপে লক্ষ্মণসেনের দুইটি পুত্রের বর্ত্তমানতা তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেশবসেন প্রদত্ত ইদিলপুরের শাসনে মদনপাড়-শাসনের সমস্ত শ্লোকই আছে, এবং তদতিরিক্ত আরও কয়েকটি শ্লোক অধিক আছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান হয় যে, বিশ্বরূপ কেশবসেনের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। ইদিলপুর শাসনে কেশবসেনের নাম দুই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক স্থানেই দেখা যায় যে, কোন একটি নাম চাঁচিয়া ফেলিয়া কেশবসেনের নাম পুনরায় খুদিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে স্থানে এইরূপ করা হইয়াছে, সেখানে নূতন নামটি ধরিবার কোন কষ্ট হয় নাই। মদনপাড়-শাসনেও ঐরূপ বিশ্বরূপ নামটি দুইবার আছে এবং প্রত্যেক স্থানেই শিল্পীকে স্থানের অসচ্ছলতায় নামের অক্ষরগুলি অত্যন্ত ঘন করিয়া খুদিয়া দিতে হইয়াছে। ইহাতে 'বিশ্বরূপ' নামের এই চারিটি অক্ষর সেই পংক্তির অপরাপর অক্ষর হইতে ছোট হইয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব যে কোন একটি তিন অক্ষরের নাম চাঁচিয়া 'বিশ্বরূপ' এই চারি অক্ষরের নাম সেই স্থানে বসান হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে লক্ষ্মণসেনের পর মধুসেন নামে একটি রাজনাম পাওয়া যায়। এই নামটি অন্যায়রূপে অক্ষরান্তরিত হইয়াছে,—ইহা 'মাধবসেন' হইবে। যদি এট্‌কিনসনের উক্তি সত্য হয়, তবে বলিতে হয় মাধবসেনেরও একখানি দলীল পাওয়া গিয়াছে,* কিন্তু তাহার পাঠোদ্ধার আজিও হয় নাই, এখন যদি আমরা ধরিয়া

* Atkinson's Kumaun. p. 10.

লই যে মদনপাড়-শাসনে এই মাধবের নাম চাঁচিয়া বিশ্বরূপের নাম বসান হইয়াছে, তাহা হইলে বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের বংশলতা এইরূপ হয়,—

মাধবসেন (?) বিশ্বরূপসেন কেশবসেন

বাঙ্গালার কুলাচার্য্যগণের বংশলতা হইতেও জানা যায় যে, কেশবসেনই গৌড় ত্যাগ করেন। * কুলাচার্য্যগণের এই সকল কুলগ্রন্থ ঐতিহাসিক সাবধানতাসহকারে লিখিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, এবং সে জন্য প্রসিদ্ধও নহে। কিন্তু এস্থলে এই সমানোল্লেখ অনেকটা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। লক্ষ্মণসেনের পর দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার দুই বা তিন পুত্রই তাঁহার পর প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শেষ রাজা কেশবসেনই মুসলমান কর্ত্তৃক গৌড় হইতে বিতাড়িত এবং কোন পূর্ব্ব রাজ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই পূর্ব্বদেশাধিপতির নাম জানা নাই, তবে নগেন্দ্র বাবু

* J. A. S. B. Vol. LXV (1896), pt. I. p. 24.

এড়ুমিশ্রের যে কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি গৌড়েশ্বর সেনদিগের কোন সামন্ত নৃপতি নহেন।

সংক্ষেপতঃ মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে বাঙ্গালা ও বিহারের অবস্থা বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। মগধের শেষ বৌদ্ধ নৃপতি কয়েক মাইল মাত্র রাজত্বের অধিপতি ছিলেন। তাহাও আবার অন্তর্বিপ্লবে হিন্দুবৌদ্ধসংঘর্ষে—পালরাজ ও সেনরাজগণের পরস্পর আক্রমণে উদ্বাস্ত হইতেছিল। প্রবলপরাক্রান্ত কনোজরাজ গোবিন্দচন্দ্র যখন এই সংঘর্ষের মধ্যে আপতিত হইয়াছিলেন, তখনও বঙ্গবিহারের চৈতন্য হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ তখন খুব সম্ভবতঃ কোনও বিদ্রোহীর অধীনে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সেনরাজবংশীয়েরা তখন আত্মকলহে মত্ত হইয়াছিলেন কি না তাহা আজিও জানা যায় নাই; কিন্তু এই সময়ে মাধবসেনের কতিপয় অনুচর যে গঢ়োয়াল প্রদেশে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে হিন্দু-রাজগণের মধ্যে যে কোন না কোন উৎপাত চলিতে-ছিল, তাহা স্পষ্ট সূচিত হয়, নতুবা মাধবসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের অধিকারী ব্রাহ্মণ বিষয়সম্পত্তি ও রাজ-অনুগ্রহ ত্যাগ করিয়া ওরূপ দূরদেশে নিজ দলীলদস্তাবেজ লইয়া গিয়া বাস করিবে কেন? ইহা হইতে প্রতীত হয়, সেনরাজপুত্রগণও পরস্পর বিবাদে মত্ত হইয়া-ছিলেন এবং পরাভূত রাজকুমার অনুচরবর্গ সহ গঢ়োয়ালে পলাইয়া গিয়াছিলেন। একবারে অত দূরদেশে পলায়নেরও একটা হেতু অনুমান করা যাইতে পারে। অশোকচল্লদেব বা তাঁহার ভ্রাতা দশরথ যখন বুদ্ধগয়া দর্শনে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন হয়ত এই সেনরাজপুত্রের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইয়া থাকিবে। এক্ষণে বিপৎকালে সেই দূরগত বন্ধুর আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই ঘটনা কনোজধ্বংসের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল, কারণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশ বৎসরে সমস্ত উত্তর ভারতই অত্যন্ত

উপদ্রব—অশান্তিতে ডুবিয়া ছিল। তুর্কীগণের উৎপাতই তাহার মধ্যে প্রধান।

৩০ বৎসর মধ্যে তিনজন সেন-রাজপুত্রই একে একে সিংহাসনারোহণ করেন। ইহা এক এক তাম্রশাসনে পুরাতন দাতার নাম চাঁছা ও পুনরায় তাহাতে নূতন রাজনাম বসাইবার ব্যাপার হইতে পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাও অল্প অশান্তির পরিচায়ক নহে। এইরূপ অবস্থার সুযোগে যখন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার বিহারে আসিয়া পড়িলেন, তখন দুর্ব্বল মগধরাজের বাধা দিবার কোন ক্ষমতা ছিল না এবং বঙ্গের হিন্দুরাজও নিজরাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলের সামন্ত ও শাসনকর্ত্তৃগণের বিদ্রোহ এবং ভ্রাতৃবিদ্রোহ লইয়া অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণও বোধ হয় তাদৃশ বলশালী ছিলেন না, কাজেই মহম্মদ বখ্‌তিয়ার ক্রমশঃ সাহসী হইয়া শোণ-গঙ্গাসঙ্গমস্থলে মানের পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িলেন। শোণ পার হইতেও কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না এবং বিহার নগরের বৌদ্ধবিহার আক্রমণ করিলেও তাঁহাকে এখানে দাঙ্গা ব্যতীত যুদ্ধই করিতে হইল না; কারণ মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের একটু ভুল হইয়াছিল। পর্ব্বতশীর্ষে এই সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় বিহারটিকে তিনি নিম্ন ও দূরভূমি হইতে সুদৃঢ় পার্ব্বত্য দুর্গ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। দেশের কৃষকসম্প্রদায় ও নিরীহ যাজকসম্প্রদায় আপনাদের দেবস্থান, ধর্ম্মভবন রক্ষার জন্য লাঠিঠেঙা লইয়া আসিয়া তুর্কীসৈন্যকে যতটা পারিল বাধা দিতে গেল, কোন ফল হইল না। যিনি রাজা, তিনি তখন বৃদ্ধ এবং তাঁহার সৈন্যবলও সামান্য; কাজেই তাহা দ্বারাও কোন প্রতিকারের আশা ছিল না। দেশের লোকে বহুকালাবধি এরূপ বিদেশী শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই। যে হূনেরা ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে গুপ্তরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল; তাহাদের পর এদেশে আর বিদেশী শত্রুর আক্রমণ ঘটে নাই; কাজেই দেশের সাধারণ লোকে তুর্কীদিগের আক্রমণে একবারে

ভয়ে অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই মুসলমানবিজয় অতি সহজে সুসিদ্ধ হইয়া গেল গজনীর মামুদ যে কয়বার ভারত আক্রমণ করেন, সে কেবল লুঠের উদ্দেশ্যে, এ দেশের কোন রাজ্যাধিকারের আশায় নহে। কাজেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সে উৎপাত চুকিয়া গিয়াছিল।

বিহারের বৌদ্ধবিহার ধ্বংস গোবিন্দপালদেবের রাজত্বের অষ্টাত্রিংশংবর্ষে অর্থাৎ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণিত করিয়াছি। সুতরাং এখন আমরা রেভার্টি * ও ব্লকম্যান † সাহেবের নির্দ্দিষ্ট মুসলমানকর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময় সচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারি। তবকাত-ই-নাসিরিকে যদি এজন্য আমাদের কোন মূল্য দিতে হয়, সে কেবল ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাবিজয় হইয়াছিল, ওই ঘটনাটুকু প্রকাশের জন্য। উহার গ্রন্থকার প্রায় তৎকালবর্ত্তী লোক; সুতরাং তাঁহার লিখিত বিবরণকে আমরা অনেকটা বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বঙ্গবিজয়ের ৪২ বৎসর পরে তিনি এদেশে আসেন ‡ এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন সৈনিকদিগের মুখে শুনিয়া বঙ্গবিজয়বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। § পরবর্ত্তীকালের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা উহা হইতে বঙ্গবিজয়বিবরণ নকল করিয়া সারিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের গ্রন্থে আর বেশী কিছু নাই। তাঁহারা বরং এই ঘটনাটিকে বিজেতার অসীম পরাক্রমের ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক অসম্ভব ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। রেভার্টি তবকাত-ই নাসিরির অনুবাদ কালে

* J. A. S. B. 1876, Pt. 1, p. 331--32.

† J. A. S. B. 1875, pt I. p. 276 শ্রীযুক্ত মনোমোহন-চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত J. & P. A. S. B. Vol. V, p. 51.

‡ Tabaqat-i-Nasiri—Raverty, p. 663.

§ ঐ p. 553.

এই সকল ঐতিহাসিকের প্রতি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। *

তবকাত-ই-নাসিরির মতে গৌড়বিহারবিজেতা মহম্মদ বখ্‌তিয়ার গোর-প্রদেশের অধিবাসী। তিনি ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসিয়া অযোধ্যায় মালিক হুসামুদ্দীন অগলবকের নিকট অবস্থান করেন ও তাঁহার কাছে আশানুরূপ স্থান প্রাপ্ত হন। এই স্থান হইতে বখ্‌তিয়ার মধ্যে মধ্যে সৈন্য-সামন্ত লইয়া দক্ষিণ বিহারে লুঠপাট করিতে আসিতেন। ক্রমশঃ সাহস বাড়িয়া গেলে, তিনি ক্রমশঃ বিহারের সকল প্রদেশেই প্রবেশ করিতে থাকেন। ক্রমে জয়রাম লুঠের ব্যাপার ঘটে। ইহাকেই যদি তাঁহার বীরত্বের পরিচয় বলিতে হয়, তবে দস্যুতা আর কাহার নাম! ইহার পর তাঁহার ধনগৌরবে প্রলুব্ধ হইয়া, তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার চতুর্দ্দিকে জমিতে থাকে; এবং তাঁহাদিগকে লইয়াই তিনি ১২০০ খৃষ্টাব্দে বিহার জয় করিয়া পশ্চিম বাঙ্গলা আক্রমণ করেন।

ইহার পর হইতে তবকাত-ই-নাসিরিতে যে বর্ণনা আছে, তাহাতে লোকে কোন সাহায্য না পাইয়া আরও গোলমালে পড়িয়া যায়। বঙ্গের মুসলমান-বিজয়ের সময়ে লক্ষ্মণসেনকে তাঁহার অধীশ্বর বলিয়া উল্লেখ ও তাঁহার রাজ্যত্যাগের যে বিবরণ তবকাতে আছে, তাহাই তাহার প্রথম এবং মহাভুল। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে যে, ঐ সময়ে কেশবসেন বঙ্গ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন; এবং লক্ষ্মণসেন তখন কেন, তাহার অনেক পূর্ব্বে (১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে) রাজ্যের শাসনভার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পরের ভ্রম—নদীয়া আক্রমণের উল্লেখ। এই যুদ্ধযাত্রার বিবরণ অতিমাত্র তুচ্ছ এবং বোধ হয় অতি ব্যস্ততার সহিত লিখিত। মিনহাজ যাহার নিকট শুনিয়া এই বিবরণ সংগ্রহ করেন, হয় সেই ব্যক্তি স্পষ্ট

* Tabaqat-i-Nasiri—Ravtrty, p. 558

করিয়া সকল কথা বলে নাই বা মিনহাজ সকল কথা মনোযোগ করিয়া শুনেন নাই। মিনহাজ বঙ্গজয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই —"তাহার পর বৎসর মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিহার হইতে যাত্রা করিলেন এবং এরূপ বেগে হঠাৎ নদীয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন যে, সতেরজনের অধিক অশ্বারোহী তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে নাই।"—এই বর্ণনা অতি সরল এবং কেহই সেই জন্য একাল পর্য্যন্ত ইহার যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে উৎসুক হন নাই।

বিহার হইতে নদীয়ায় যাইতে হইলে, তিনটি রাস্তা ধরিয়া যাওয়া যাইত;—(১) বিহার হইতে ভাগলপুর বা মুঙ্গের হইয়া, গঙ্গাপার হইয়া গৌড়ে যাইতে হয়, তৎপরে পুনরায় ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে উত্তীর্ণ হইয়া নদীয়ায় পৌঁছিতে হয়। (২) ছোটনাগপুর ও বীরভূমের পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া অর্থাৎ প্রায় বর্ত্তমান রেল লাইনের ধার দিয়া নদীয়ায় যাওয়া যায় এবং (৩) সাহেবগঞ্জের পথ দিয়া গঙ্গার দক্ষিণকূলে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় ভাগীরথী বাহিয়া উহার পশ্চিম তীরে নদীয়ায় উত্তরণ করিতে পারা যায়।

বখ্‌তিয়ার কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, মিনহাজ তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বলার রীতি হইতে বুঝা যায় যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাও বড় সামান্য। তিনটির মধ্যে শেষটিই সহজ এবং অশ্বারোহী সৈন্যের পক্ষে সুগম। প্রথমটিতে দুইবার গঙ্গা পার হইতে হয়; ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা বড় সামান্য কথা ছিল না। দ্বিতীয় পথটি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম উহাতে পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতে হয় এবং উহার চারিদিকে স্বাধীন বন্যজাতির নিবাস। তখনকার কালের মল্লভূমির স্বাধীন সাঁওতাল সর্দ্দারেরা বখ্‌তিয়ারের মত বিজয়কামী অনুচরবর্গকে ধ্বংস করিতে অতি স্বচ্ছন্দে সক্ষম হইত। বাঙ্গালা-জয়-কর্ত্তারা সকলেই তৃতীয় পথ ধরিয়াই জয় করিয়াছেন, এবং প্রথম মুসলমান-বিজেতাও

সম্ভবতঃ এই পথেই আসিয়াছিলেন। অতিমাত্র ব্যস্ততাসহকারে সতের-জনমাত্র অশ্বারোহীকে লইয়া নদীয়া জয়ের গল্পের কোন ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যকতা নাই। এই ঘটনায় বর্ণনাত্মক যে সকল উপাদান মিনহাজ শুনিয়াছিলেন, তাহা তাড়াতাড়িতে গুছাইয়া লিখিতে না পারায় ঐরূপ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রথম কথা এই,—নদীয়া বা নবদ্বীপে যে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে লক্ষণসেনের সময়ে বিজয়পুর নামক নগরে রাজধানী ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই বিজয়পুর সুহ্মদেশে অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী নদীয়ার সহিত বিজয়পুরের অভেদত্ব নির্ণয় করেন, কিন্তু ইহার প্রমাণের জন্য কিছুই বলিবার নাই। এই অতিরঞ্জিত নদীয়া-আক্রমণের ব্যাপারটিকে বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালার বহু-স্থান আক্রমণের মধ্যে একতম বলিয়া বোধ হয়। তিনি হঠাৎ একটি তীর্থস্থান আক্রমণ ও বশীভূত করেন। লক্ষণসেনের পলায়ন ব্যাপারটি নব্য ইতিহাসের একটি অতিমাত্র অতিশয়োক্তির নিদর্শন। সম্ভবতঃ সিংহাসনস্থ কেশবসেনই পলাইয়া থাকিবেন। বঙ্গের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে তখন কি সেনরাজ কি তাঁহার সামন্তরাজগণ, কেহই এই সকল মুসলমান আক্রমণের প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার বিহার ও গৌড়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ তাঁহার জীবদ্দশায় জয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জয়ের দক্ষিণ সীমা গৌড় বা লখ্‌নৌতি বা লখ্‌নৌর বা লখ্‌নোর। এই সহর বর্ত্তমান বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। নদীয়া আক্রমণে বিহার হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত যে জয় হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহার প্রতিপক্ষে অতি স্পষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। প্রকৃতপক্ষে মুঘিসুদ্দীন উজবকের সময়ের পূর্ব্বে নদীয়া বিজিত হয় নাই। মিনহাজও বলিয়াছেন,—"মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার সেই প্রদেশ (রায় লখমণিয়ার রাজ্য)

অধিকার করিয়া, নদীয়া নগরকে জনশূন্য করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং এখন যাহার নাম লক্ষ্মণাবতী, তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। * মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নদীয়া ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় জয় করেন। যাজনগরের (উড়িষ্যার) রাজা ১২৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তখনও লখ্‌নৌর বাঙ্গালার মুসলমানদিগের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণবর্ত্তী প্রান্ত দুর্গ ছিল। এতদ্ভিন্ন মুঘিসুদ্দীন উজবকের যে রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহা হইতে জানা যায় যে, ৬৫৩ হিজিরায় বা ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। † এই মুদ্রাটির লিপির ব্যাখ্যা যে আর কিছু হইতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। ঐ মুদ্রার লিপির পাঠ এইরূপ, "হজরবো বলকনৌতী মিন-খিরাজ গরমদর্ন ও নুদিয়া ফি: সনাহ সলসা ও খমসিন ও সিত্তামেয়াৎ।"

"৬৫৩ সালে গরমদর্ন ও নুদিয়ার রাজস্বের জন্য লকনৌতী নগরে ইহা মুদ্রিত হইল।"

গড়বর্দ্ধন শব্দে বর্দ্ধনকুটিরই উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ মুদ্রা এখনও আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় নাই। হর্ণ্‌লে ইহার আর একটি দেখিয়াছেন বলেন। ‡ আলতামশের একটি রৌপ্যমুদ্রার লিপির সহিত এই মুদ্রার লিপির মিল আছে। সেই মুদ্রাটি কনোজ-জয়ের সূচনার্থ মুদ্রিত বলিয়া অনুমিত। § এই ধরণের আরও একটি কামরূপ মুদ্রা আছে। উহা বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর বিন্‌ ইলিয়াসের রাজত্বকালে মুদ্রিত। উহাতে তাঁহার আসামজয় সূচিত হইয়া থাকে।

* Tabaqat-i-Nasiri.

† Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II. pt. II. p. 146.

‡ J. A. S, B. 1881.

§ Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II.

আলতামশের কনোজ-মুদ্রার ভাষা পর্য্যন্ত মুযিসুদ্দীনের মুদ্রার ভাষার সঙ্গে এক। নবাবিষ্কৃতের প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে জয়চন্দ্রের মুসলমানযুদ্ধে এটাওয়াতে মৃত্যু হইলে, গহড়বাল প্রদেশ তাঁহার অধিকারচ্যুত হয়। অনুমান হয় মুসলমানেরা গঙ্গার দক্ষিণ কূলে কূলেই আক্রমণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। গঙ্গাযমুনার অন্তর্গত দোলায় প্রদেশ ও অযোধ্যা জয়চন্দ্রের পুত্রের হস্তেই ছিল। মিনহাজের পুস্তকে অযোধ্যাজয়ের কথা যাহা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা এই অনুমান হয় যে, মুসলমানেরা উহার অতি সামান্য অংশই অধিকার করিতে পারিয়াছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের (জয়চন্দ্রের পুত্রের) মছলিসহরের তাম্রশাসনখানি ১২৫৭ বিক্রমসংবতে (১২০০ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত।* উহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তখনও জয়চন্দ্রপুত্র স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই শাসনখানির আবিষ্কারে আরও প্রমাণিত হইতেছে যে; জয়চন্দ্রের মৃত্যুর অন্ততঃ দশ বৎসর পরে কনোজ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছিল। কাজেই নদীয়ার শেষ বিজয় ১২৫৫ খৃষ্টাব্দেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। বল্‌বনের বংশধরেরা যখন ৪০ বৎসর পরে বাঙ্গালায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল, তখনই বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশ জয়ের ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গালার প্রধান বন্দর সপ্তগ্রাম ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। তিনিই ইহার প্রথম শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

যতটা দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ অতি অল্প। উহা উত্তরে দেবীকোট বা দেওকোট; দক্ষিণে রাঢ়ের অন্তর্গত লখ্‌নোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। † পূর্ব্বসীমা ঠিক

* Annual Report, Arch. Survey of India, N. Circle, for 1908.

† রেভাটির অনূদিত তবকাত-ই-নাসিরি, ৫৮৫ পৃষ্ঠা। পুনর্ভবা নদীতীরবর্ত্তী দিনাজপুরের অন্তর্গত দমদমা নামক স্থান।

নির্দ্দিষ্ট ছিল না। মুসলমানের বাঙ্গলা-জয়ের ব্যাপারে গৌড়-আক্রমণ ও অধিকারের বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়; কিন্তু সে সম্বন্ধে কেহই একটি কথাও বলেন নাই, সকলেই বিনাবাক্যে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বিজেতা মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে দিল্লীর সুলতান কুতবুদ্দীন আইবকের সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, (১)—"সুলতান এই ব্যাপার (বাঙ্গালাজয়) শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন এবং তাঁহাকে "বাঙ্গালা" দেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।" * (২)—"বাঙ্গলারাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ কুতবুদ্দীনের হস্তে প্রদত্ত হইল। সুলতান কুতুবুদ্দীন মালিক ইক্‌তিয়ার-উদ্দীন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজির হস্তে বিহার ও লক্ষ্মণাবতী প্রদেশের প্রতিনিধি-শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিলেন।" † —এইরূপ ভাবের উল্লেখ নানা গ্রন্থে আছে। তবকাত-ই-নাসিরিই এই সকল ঐতিহাসিকের নিকট এই সময়ের ইতিহাসের জন্য একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল, তাহাতে কিন্তু ঐরূপ কোন কথার বাষ্পও নাই! মহম্মদ বখ্‌তিয়ার একজন ভাগ্যান্বেষী পুরুষ। অধ্যবসায় ও দুর্দ্দান্ত সাহসের বলে দেশের বিশৃঙ্খলার সুযোগে নিজের একটা রাজত্ব গুছাইয়া লইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি যদি সুশৃঙ্খলে কোন যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার উত্তর বাঙ্গলা ও আসামের পর্ব্বতনিম্নস্থ প্রদেশ জয়ের চেষ্টা, আর তাহাতে তিনি বিফল হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য সমস্ত যুদ্ধোদ্যোগ দস্যুর দেশাক্রমণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঘোররাজ্যের সহিত বা তাঁহার প্রতিনিধি দিল্লীপতির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না। তাঁহার সমধর্ম্মিগণ তাঁহাকে একজন সকল্পসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া স্বীকার

* । মাঙ্কিনের অনুদিত মুন্তখবুত্তয়ারিখ প্রথমখণ্ড ৮২।৮৩ পৃঃ।

† । মৌঃ আবদস্‌সলামের অনুদিত রিয়াজুস্‌সলাতিন, ৫৯পৃঃ।

করেন। সারাবকের রাজা ধ্রুবকেও বোধ হয় ইংরাজেরা এই ভাবেই দেখেন। *

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোহিনূর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আহমদ সাহ দোরাণীর মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র তিমুর সাহ কিছুদিন এই অমূল্য হীরক খণ্ড নিজ অধিকারে রাখেন। কিন্তু কেহই চিরকাল বাঁচিবার জন্য এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। ১৭৯৩ সালে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার পর কোহিনূর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (কেহ কেহ বলেন পঞ্চম পুত্র) সাহ জামানের হস্তে পড়িল। তিনি তাঁহার রাজধানী কান্দাহার হইতে কাবুলে তুলিয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাহসুজার ঈর্ষাদৃষ্টি এড়াইতে পারিলেন না। সুজা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন,তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করিলেন এবং এক নিভৃত কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যে আশায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি এত করিলেন, তাহাতে কোন ফল হইল না। অনেক অনুসন্ধান হইল কিন্তু কোহিনূর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন সকলেই মনে করিল হয়ত সাহজামান হীরকখানি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, নতুবা পৃথিবী হইতে কোহিনূর এইবার চিরকালের জন্য অপসৃত হইল। আর তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশা নাই।

*। এই প্রবন্ধটি ইংরাজীতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ মহাশয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির "মিমরার" নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহে আমরা ইহা প্রাপ্ত হইয়া "ঐতিহাসিক চিত্রের" পাঠকবর্গের জন্য অনুবাদ করাইয়া দিলাম।

সাহাজামান যে নিভৃত কারাগৃহে আবদ্ধ ছিলেন, কারাধ্যক্ষ একদিন সেই কারাবাস পর্য্যবেক্ষণ করিতে যান। প্রাচীরে হস্ত লাগায়, চর্ম্ম কাটিয়া অবিরল ধারায় রক্ত পতিত হইতে থাকে। হস্তক্ষত হইবার কারণ কি, ভালরূপে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখিতে পান, প্রাচীরে অতি তীক্ষ্ণ ও সূচ্যগ্র উজ্জ্বল কোনও দ্রব্য রহিয়াছে। উহা প্রথমে তাহার ভগ্ন সুধার প্রস্তরখণ্ড বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু সামান্য প্রস্তর খণ্ড অত দীপ্তিবিশিষ্ট নহে, বিবেচনা করিয়া তিনি প্রাচীর খনন করিতে লাগিলেন। যাহা তিনি প্রথমে সামান্য ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাই শেষে মহামূল্য কোহিনুর বলিয়া প্রমাণিত হইল। কোহিনুর সাহ সুজার হস্তে পতিত না হয়, এজন্য সাহ জামান উহা গুপ্তভাবে প্রাচীরে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক সাহ সুজা ঐ অমূল্য রত্নের অধীশ্বর হওয়া অবধি প্রতি-দিন, কি রাজ দরবারে * কি ভ্রমণ সময়ে, সর্ব্বত্র সকল সময়েই বক্ষো-পরি ধারণ করিতেন। কিন্তু মনুষ্যের চিরদিন সমান যায় না, তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া, তৎকনিষ্ঠ শাহ মাহমুদ তাহাকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং অন্ধ অবস্থায় বন্দী করিয়া রাখেন। কোন প্রকারে সাহ সুজা পলা-য়ন করিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লইলেন †। ১৮১২ খৃঃ অব্দে সাহ সুজা সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া পেশওয়ার ও মুলতান অধিকার করিতে যাইয়া, বন্দী অবস্থায় তত্রত্য শাসক আটা মহম্মদের নিকট প্রেরিত হইলেন।

এই সময়ে বীরকেশরী রণজিৎসিংহ পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেছিলেন অনন্যোপায় হইয়া সাহ সুজার পরিবারবর্গ রণজিতের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রণজিত সিংহ সাদরে এই পরিবারমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা

* Elphinstone

† Sleeman's Rambles and Recollections of an Indian Official.

করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কাবুলের মন্ত্রী ফতে খাঁন কাশ্মীর অধিকার ও আটা মহম্মদকে সমুচিত দণ্ড দিবার মানসে, রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রণজিৎ সিংহ তদনুসারে সাহসী সুদক্ষ সেনাপতি মাখন চাঁদের অধীন বহুল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে সাহ সুজার পত্নী অকুবেগম রণজিৎকে বলিলেন যে, তাহার স্বামীকে কাশ্মীর হইতে কারামুক্ত করিয়া আনিলে, তাঁহাকে কোহিনুর প্রদান করিবেন। ১৮১৩ খৃঃ অব্দেঃ ফেব্রুয়ারি মাসে কাশ্মীর অধিকৃত ও আটা মহম্মদ বিদূরিত হইল। মাখন চাঁদ এই বিজয়ের পর সাহ সুজাকে কারামুক্ত করিয়া, পত্নীর সহিত তাহাকে লাহোরে লইয়া আসিলেন। সাহ সুজা আনীত হইলে রণজিৎ সিংহ দেওয়ান মতিরাম, ফকির আজিজ উদ্দিন প্রভৃতি বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারিগণকে অকু বেগমের নিকট প্রেরণ করিলেন। সাহ সুজা বিপদ মুক্ত হইয়া কোহিনুর দিতে ইচ্ছা করিলেন না তিনি ইহাঁদের হস্তে পীতবর্ণের এক বৃহৎ পৃথুরাজ মণি দিয়া বলিলেন, ইহাই কোহিনুর। তাহারা এই মণি রণজিত সিংহের নিকট আনয়ন করিল, রণজিৎ রত্নকারগণের নিকট ইহা প্রকৃত কোহিনূর নহে জ্ঞাত হইয়া, সাহ সুজার—আচরণে অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তিনি এই পৃথুরাজ মণি হস্তগত করিয়া, সাহসুজার নিকট হইতে কোহিনুর আদায় করিতে যত্নবান্ হইলেন। যদিও সাহ সুজা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তগত ছিলেন, তথাপি তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাইবার নিমিত্ত, কোন প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করিলেন না।* প্রাসাদ মধ্যে কেবলমাত্র প্রহরী রক্ষিত এক কক্ষ সাহ সুজার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

সাহ সুজার নিকট কোহিনুর না পাওয়ায় পুনরায় অকু বেগমের

* M' Gregor's History of the Sikhs Vol. I, p.p. 169—170 and 281.

নিকট লোক প্রেরণ করা হইল। তিনি বলিলেন, কোহিনুর কোথায় আছে কিছুই জানেন না। কিন্তু রণজিৎ সিংহ সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে নানা প্রকার অত্যাচার ও অব-মাননায় ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সকল সংবাদ সাহ সুজার কর্ণে পৌছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ কারাগারে সাক্ষাৎ করিলে সাহ সুজা তাঁহাকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পূর্ব্ব বন্ধুতা আরও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইল; এবং উহার চিহ্নস্বরূপ উভয়ে উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিলেন। সাহ সুজা রণজিতের হস্তে কোহিনুর অর্পণ করিলেন। রণজিৎ সাহ সুজার ভরণপোষণার্থ, পঞ্জাবে তাঁহাকে বাৎসরিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা আয়ের জাইগীর প্রদান করিলেন, এবং কাবুল অধিকার করিতে সুজার সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।*

রণজিৎ সিংহ এই মহামূল্য রত্ন অধিকার করিয়া, ইহার প্রকৃত মূল্য নিশ্চয়ভাবে জানিবার জন্ম অকু বেগমের নিকট লোক প্রেরণ করেন। বেগম উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন যে, উহার মূল্য এক প্রকার নহে। উহা বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইতে পারে। এই মণির মূল্য সম্বন্ধে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের মুখে এইরূপ শুনিয়াছিলেন। কোন বলবান যুবক, পাঁচখানি প্রস্তর লইয়া, ঊর্দ্ধে ও চতুষ্পার্শে নিক্ষেপ করিলে উহা যতখানি জায়গা জুড়িয়া পড়িবে, তৎস্থানব্যাপী, আসরফি, জহরৎ ও মণিমাণিক্যের স্তূপই উহার প্রকৃত মূল্য। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহাও এই মণির প্রকৃত মূল্য নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জনৈক বিখ্যাত জহরীর মত যে, ইহার মূল্য পৃথিবীস্থ দেশ সমূহের একদিনের ব্যয়ের অর্দ্ধেকেরও অধিক। কিন্তু তাহার মতে ইহার যথার্থ মূল্য "পাঁচ-জুতি" অর্থাৎ বলবানের নিকট দুর্ব্বলের বশ্যতা স্বীকার। এই মূল্যেই

† Shah shooja's Antobiography, Chapt. XXV.

ঐ মণি আফগানগণের হস্তগত হয়, এবং এই মূল্যেই উহা পরিশেষে, মহারাজের হস্তগত হইয়াছে।*

শিখ নরপতির অধিকারে আসিয়া এই হীরকখণ্ড প্রথমতঃ তাঁহার বাহুতে বাজুস্বরূপ ব্যবহৃত হইল। চারি পাঁচ বৎসর এইরূপ ব্যবহৃত হইবার পর, ইহা মহারাজের উষ্ণীষের শিরপেচে নিবিষ্ট হইল। এক বৎসর কাল পরে রণজিৎসিংহ পুনরায় ইহা বাজুরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ১৮০৮ খৃঃ অঃ মাননীয় অসবরণ সাহেব রণজিৎ সিংহের নিকট কোহিনূর দেখিয়া, উহার আকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। "এই অতি সুন্দর হীরকখণ্ড দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চি, প্রস্থে এক ইঞ্চির উপর, এবং গভীরতায় অর্দ্ধ ইঞ্চি হইবে। ইহার গঠন ডিম্বের ন্যায়; ইহা বাজুতে সন্নিবিষ্ট ও ইহার দুই পার্শ্বে আরও দুইখানি হীরক আছে। তাহাদের পরিমাণ ইহার অর্দ্ধেক হইবে। কোহিনূরের মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা; ইহা অতি উজ্জ্বল এবং কোন প্রকার দোষযুক্ত নহে।" †

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাঁহার অমাত্যবর্গ হীরকখণ্ড ৺জগন্নাথ দেবের শ্রীপাদপদ্মে দান করিতে পরামর্শ দেন। কারণ তাহা হইলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করিবেন এবং দীর্ঘজীবন দান করিবেন। এ জীবনে যদিও তিনি কোন পার্থিব ইষ্ট লাভ না করেন, তথাপি দেবোদ্দেশ্যে দানহেতু, তাঁহার পরলোকের উপকার হইবে এবং ইষ্টদেবতা তাঁহার এই বিশাল রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। রণজিতের মৃত্যু সময় উপস্থিত; তিনি কিছুই স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র একটু শির নত করিলেন। তাহা হইতে বুঝা গেল যে, রণজিৎ সম্মতি দান করিলেন

* Ross' Land of the Five Rivers and Scinde p. 132.

† The Court and Camp of Ranjit Sing p. 132.

কিন্তু তদীয় কোষাধ্যক্ষ, রাজার লিখিত আজ্ঞা না পাওয়ায়, কোহিনূর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। লিখিত আজ্ঞা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই, রণজিৎ সিংহ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। সুতরাং কোহিনূর আর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পাঠান হইল না, রাজকীয় ধনাগারে রক্ষিত হইল। *

লর্ড হার্ডিঞ্জ শেরাওয়ানে শিখগণকে পরাজিত করিয়া নগরে অবস্থান কালীন, এই মণি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পারিষদবর্গ ও কর্ম্মচারীগণ এই হীরকখণ্ড সবিস্ময়ে দেখিলে পর, মহামনা হার্ডিঞ্জ দলিপের হস্তে নিজে পরাইয়া দেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী অভিভাবক কোহিনূর খানি এই রক্ষাধীন বালকের হস্তগত করেন। †

ইহার কিছুদিন পরেই শিখ ও ইংরাজ সেনার ভয়ানক সঙ্ঘর্ষ হয়। যুদ্ধাবসানে দলিপ সিংহ পঞ্জাবের অধীশ্বর বলিয়া স্থির হইল। তিনি কোহিনূর খানি, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। লর্ড ডালহৌসী এই বহুমূল্য হীরকখণ্ড, দুইজন বিশ্বস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট বিলাতে পাঠাইয়া দেন। এতকাল পরে ভারতের চির-গৌরব রাজলক্ষ্মী ভারতের অঙ্ক ছাড়িয়া শ্বেতদ্বীপের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চলিল।

মহারাজ দলীপ সিংহের ইংলণ্ড বাস কালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট একদা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার শিক্ষক লেগিন সাহেবের পত্নী এই সময়ে একদিন বকিংহাম প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। রাণী ভিক্টোরিয়া লেডি লেগিনকে নিভৃতে

* এই সময়ের জুলাই মাসের Friend of India বলেন যে, রণজিতের নিজের ইচ্ছা থাকা সত্বেও তাঁহার পুত্র ও অমাত্য বর্গ তাঁহাকে উহা ৺জগন্নাথ দেবকে দান করিতে দেন নাই।

† Daleep Singh and the Government p. 2

জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ কি কোহিনূর সম্বন্ধে কখন কোন কথা উত্থাপন বা ইহার নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।" ভারতেশ্বরী তাহার পর বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং এখন এ বিষয় দলিপের নিকট উত্থাপন করেন নাই।

দলিপসিংহ ও কোহিনূর।

এবং দলিপের সম্মুখে এই হীরক-ভূষিত হইতেও তিনি লজ্জাবোধ করেন। বিবি লেগিন বলিলেন যে, বিলাতে আগমন অবধি মহারাজ কখন এ বিষয়ের কথা উত্থাপন করেন নাই। ভারতবর্ষে এ বিষয়ের পুনঃ পুনঃ তিনি আন্দোলন করিতেন। ইহা শুনিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিবি লেগিনকে বলিলেন, "এইবারে দলীপের প্রাসাদে আসিবার পূর্ব্বে—তিনি যেন অনুসন্ধান করেন, মহারাজ কোহিনূর দেখিতে অভিলাষী কি না।" আরও বলিলেন "এসম্বন্ধে মহারাজ—যাহা বলেন তৎসমুদায় স্মরণ রাখিয়া আমায় বলিও।" বিবি লেগিন ইংলণ্ডেশ্বরীর এই আদেশে আনন্দিত হইলেন না। কারণ বিবি লেগিন ও তাঁহার স্বামী কোহিনূর সম্বন্ধে দলিপের মনোভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। দলিপ এ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কিছুই গোপন করেন নাই। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, মহারাজ দলিপ সিংহ কোহিনূরকে, কেবল এক অমূল্যরত্ন বলিয়া বহুমান্য করিতেন এরূপ নহে, কিন্তু তাহার অপরাপর ভারতীয় গণের ন্যায় এই ধারণা ছিল যে, কোহিনূর যাহার অধিকারে থাকে সেই ব্যক্তিই ভারতীয় নরপতি গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দলিপ এই মণি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় যে কতদূর দুঃখিত ছিলেন তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সেই নিমিত্ত বিবি লেগিন এ সম্বন্ধে মহারাজকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। আর ইংলণ্ডেশ্বরীর আদেশানুসারে দলিপ সিংহ এ সম্বন্ধে যাহা বলিবেন—তৎসমুদায় তাঁহার সমীপে জ্ঞাত করিতে হইবে এনিমিত্ত বিবি লেগিন আরও শঙ্কিত হইলেন। সে যাহা হউক

রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে। সুযোগমত দলিপের নিকট এবিষয়ের প্রস্তাবনা করিতে বিবি লেগিন কৃতসংকল্প হইলেন। রাজ-প্রাসাদে যাইবার পূর্ব্বদিবসে দলিপ ও বিবি লেগিন রিচমণ্ড পার্কে অশ্বারোহণে পর্য্যটন করিতেছেন, এমন সময়ে বিবি লেগিন দলিপকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি কোহিনুর পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করেন?" সোৎকণ্ঠে বিবি লেগিন প্রশ্নের প্রত্যুত্তর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দলিপসিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি পুনরায় একবার হস্তে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি। যখন সন্ধির বিধানানুসারে এই হীরক ইংলণ্ডেশ্বরীকে অর্পণ করা হয়, তখন আমি শিশু ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে যাহা করিতেছি তাহা বুঝিবার আমার বয়স হইয়াছে।" দলিপের এই উত্তর শ্রবণে লেডি লেগিন নিশ্চিন্ত হইলেন।*

পর দিবস দলিপ ও লেডি লেগিন ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রাসাদে গমন করিলেন। চিত্রকর দলিপকে লইয়া রাজগৃহের এক পার্শ্বে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, এমন সময়ে ইংলণ্ডেশ্বরী লেডি লেগিনের মুখে দলিপের কোহিনুর সম্বন্ধে অভিমত আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কোহিনুর আনয়নে আদেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে দ্বারদেশে বহুল রক্ষক কোহিনুর সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইল। দলিপ সিংহ ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি সুবৃহৎ রাজগৃহের অপর পার্শ্বে চিত্রকরের সন্নিধানে অন্য মনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। এদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোহিনুর হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে দলিপ সিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন, দলিপ সিংহ আশ্চর্য্যান্বিত ও চমকিত হইয়া কোহিনুর হস্তে লইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী দলিপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে বিবেচনা করিতেছেন, ইহা কি আপনি চিনিতে পারেন?"

* Sir John Lagin and Maharaja Daleep Singh p.p.336-7

পরিবর্ত্তিত আকারে খোদিত কোহিনূর দেখিবামাত্র চেনা, দলিপের পক্ষে অসম্ভব ছিল বটে, কিন্তু ইহার সূর্য্যপ্রভ জ্যোতিঃ দেখিয়া বোধ হইল যে, "আলোক গিরি" ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। দলিপ সোৎসুকে ও সোৎকণ্ঠে বহুকালের পর তাঁহার এই রত্ন দেখিয়া, উহা উত্তমরূপ দেখিবার নিমিত্ত গবাক্ষের নিকট আলোকে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই, দলিপের তৎকালীন অন্তর্গূঢ় মনোভাব, তাঁহার আননে প্রতিফলিত দেখিল। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দলিপ বলিলেন, "পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত ও আয়তন ন্যূন হইয়াছে।" এবং ইংলণ্ডেশ্বরীকে অভিবাদন করতঃ নম্রভাবে তাঁহার করে উহা প্রত্যর্পণ করিয়া, শান্তভাবে চিত্রকরের সম্মুখে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। *

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ১৮৫০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট বাহাদুর কোহিনূর মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার স্বরূপ দান করেন, এবং লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক উহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। ইংলণ্ডে পৌঁছিলে দেখা গেল উহার ওজন ১৮৬ ক্যারেট অর্থাৎ ৩৭৪ রতি। ১৮৫১ খৃঃ অঃ প্যারী নগরে যে একটি বিশ্বদর্শিনী মেলা হয় তাহাতেও কোহিনূর প্রদর্শিত হইয়াছিল তখনও উহার ঐরূপ ওজন ছিল। বাবর বলিয়াছেন যে,ইহার ওজন ৮ মিষ্‌খাল। কিন্তু আওরঙ্গজেব হীরক খণ্ডকে সমআয়তন ও সুদৃশ্য করিবার জন্য জহুরীদের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহাদের অজ্ঞতাবশতঃ হউক অথবা, অসৎ অভিপ্রায়ের দরুণই হউক কোহিনূরের আয়তন অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী Prince Consort Albert কোহিনূরের অসমানতা দূরীকরণার্থ Sir David Brewster এর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন কোহিনূরের আয়তন হ্রাস না করিয়া কোন

* Lt. General Fytche's Burma Past and Present Vol. I. p. 19

প্রকারেই উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে। Messrs Coster of Amsterdom এই দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। চতুরশ্ব ক্ষমতা-যুক্ত কোন বিশাল শাণ যন্ত্র এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল হইল কোহিনূরের কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া বরং উহার আয়তন হ্রাস হইয়া গেল। এই কার্য্যে প্রায় ১২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। কোহিনূরের বর্ত্তমান ওজন ১০৬ ক্যারাট, কোহিনূর এখন windsor castle এ রক্ষিত আছে, এবং ইহার প্রতিকৃতি কলিকাতার যাদুঘরে (museum) দেখিতে পাওয়া যায়।

ফরাসী পরিব্রাজক Travernier ইহার যে আকৃতি দেখিয়া বিবরণ লিখিয়া যান, তাহা কোহিনূর অপেক্ষা আয়তনে অত্যন্ত ভারী। এজন্য অনেকে বিশ্বাস করেন যে, কোহিনূর দুইখানি, একখানি নহে।

এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবার অন্য কারণ এই যে, কোহিনূরের সমতল নিম্নভাগ দেখিলেই বোধ হয়, ইহা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং অনেকের ধারণা যে, orloff Diamond নামে যে সুবিখ্যাত মণি রুষিয়ার সম্রাটের কিরীটে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা কোহিনূরের অপর অর্দ্ধ, অধুনা অর্লফই পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক; ইহার ওজন ১৯৪$\frac{3}{4}$ ক্যারাট। এই মণির নিম্নভাগও সমতল, ও দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এজন্য সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই দুইখণ্ড হীরক কোন দেবমূর্ত্তির চক্ষুতে প্রোথিত ছিল। হিন্দুজাতি যাহা মূল্যবান্, এবং যাহা সুন্দর সকলই দেবোদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকে। সুতরাং এই ধারণা একবারে অলীক বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রবাদ যে, একজন ফরাসী ইহা অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। অন্য মতে ইহা নাদির সাহের হস্তগত হয়। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর একজন আর্ম্মেনিয়া দেশীয় বণিক উহা লাভ করেন। উক্ত বণিক আমষ্টারডাম্ গমন করিলে ১৭৭২ খৃঃ অঃ এই মণি কোণ্ট অর্লফ ক্রয় করিয়া রুষিয়ার বিখ্যাত সাম্রাজ্ঞী ক্যাথরিণকে

৯০,০০০ পৌণ্ডে বিক্রয় করেন। * জহুরীগণ অনুমান করেন যে orloff আর কোহিনুর একখানি হীরকের বিভিন্ন অংশ মাত্র।

সে যাহা হউক, কোহিনূরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে,ভারত-রাজলক্ষ্মী যখনই যাহার অঙ্কশায়িনী হয়েন কোহিনূরও তাহার আয়ত্ত হয়। বাবর, নাদির শাহ, রণজিৎ সিংহ, সকলে এই প্রকারে কোহিনূরের অধীশ্বর হইয়াছেন। কোহিনূরের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের চির-সম্বন্ধ। এখন কোহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরের সম্পত্তি। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন পুরুষানুক্রমে এই অমূল্য রত্ন ধারণ করিয়া নিজের ও ভারতের গরিমা বৃদ্ধি করিতে পারেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান।

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক চিত্র-সম্পাদক মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে পক্ষ সমর্থনের দোষটাও দেখা যাইতেছে। তাঁহারা স্বাধীন মত প্রকাশের সময় আপন পক্ষ সমর্থনে এরূপ ব্যগ্র হন যে, তাহাতে অনেক স্থলে সত্যের গোপন ঘটিতেছে। আমাদের মতে নিরপেক্ষতায়ই ঐতিহাসিকের ধর্ম্ম। ভাব-প্রবণতায় অভিভূত হইলে ঐতিহাসিক আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। সেইজন্য ঐতিহাসিকগণের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে যদি স্বাধীন মত প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মত আদরণীয় হইবে।" † দৃষ্টান্ত স্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান লইয়া যে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহার

* Encyclopœdia Brittanica.

† ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৭; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহারা মালদহের পাণ্ডুয়াকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলেন, তাঁহারা 'জবরদস্তি' করিয়াই বলেন - কোন প্রমাণ তাঁহারা দিতে পারেন না! এইরূপ জেদের বশে সত্যের অপলাপ করিলে, কেবল ইতিহাসের নহে—মাতৃভূমির যে কি ক্ষতি করা হয়, স্থির চিত্তে তাঁহাদিগকে ইহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আমাদের মতে বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থানই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত যে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিত হইতেছে। এক্ষণে তত্ত্বানুসন্ধায়ী সুধী পাঠকবৃন্দ সত্যাসত্য বিচার করিবেন।

করতোয়া মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

"করতোয়ে সদা নীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় পৌণ্ড্রক্ষেত্র করতোয়া তটে অবস্থিত। এবং প্রধানতঃ পৌণ্ড্রগণ করতোয়া তটেই বাস করিত।

আবার,—

"বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে যৎপুণ্যং রাহুদর্শনে।
শিলাদ্বীপং সমাসাদ্য তচ্চ কোটিগুণং ভবেৎ॥৩৫।
পৌষে বা মাঘমাসে বা যদি সোমযুতা কুহূঃ।
ব্যতিপাতেন যোগেন কোটি কোটি গুণং ভবেৎ॥ ৩৬।
চাপার্কে মূলসংযুক্তে যদি সোমযুতা কুহূঃ।
নারায়ণীতি বিখ্যাতা ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ॥

এই শিলাদ্বীপ যেখানে ও পৌষ-নারায়ণী স্নান যেখানে হইয়া থাকে, সেই স্থানকেই হিন্দুগণ পৌণ্ড্রক্ষেত্র বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য, বগুড়া জেলার করতোয়া-তীরবর্ত্তী মহাস্থান-নামক স্থানেই বিখ্যাত পৌষনারায়ণী স্নান হইয়া আসিতেছে। পৌষনারায়ণী যোগের সময়

বিভিন্ন স্থানের লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া মহাস্থানের স্কন্দ গোবিন্দের মধ্যবর্ত্তী শিলা দ্বীপে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া যান, ইহা সর্ব্বজন বিদিত।

এই স্কন্দ গোবিন্দের মধ্যবর্ত্তী শিলাদ্বীপকে মুক্তিক্ষেত্র এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলা হইয়াছে। যথা,—

"স্কন্দগোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে ভূমিঃ সংস্কৃতবেদিকা।

*　　*　　*　　*

বেদীমধ্যেঽর্পিতো যূপঃ সংশ্লেষাৎ বর্দ্ধতে নৃণাম্।
গোবিন্দমণ্ডপাৎ পূর্ব্বং কুণ্ডং বিষ্ণুবিনির্ম্মিতং॥
স্কন্দমণ্ডপ বায়ব্যে সভা রামস্য চাদ্ভুতা।

*　　*　　*　　*

আস্তং ভুবো ভবনং লক্ষ্য সপাদ বিপ্রৈঃ স্কন্দাদিদেবতা।
বিষ্ণুবলভদ্রশিবাদিদেবৈরধ্যাসিতং করজলাম্বু বিষ্ণু
পাপং শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন পুরং শিরসা নমামি॥"

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের 'মহাস্থান' নাম কেন হইল করতোয়া—মাহাত্ম্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

"স্কন্দগোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে গুপ্তা বারাণসী পুরী।
তত্রারোহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ॥
পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমন্তাৎ পরিকীর্ত্তিতং।
তদন্তর্গতমেতত্তু ক্রোশ মাত্রং মহেশ্বরী।
অতিগুহ্যতমং ক্ষেত্রং যত্রাস্তে ভার্গবো মুনিঃ॥
পশোর্জ্জানং কথয়তি গৃহস্তদ্‌গৃহে তত্র চূড়ো—
দৈর্ঘ্যৈর্হেমো শটিতমুরভির্যষ্টিবৃদ্ধিঃ শিলাস্থিঃ।
থেবুস্যত্র নক্ষণতি ফণী দিম্বরো জীবলোকঃ।
কূপো দ্বীপঃ কনকপত্তনং পৌণ্ড্রক্ষেত্রে হবৃত্তেঃ।
প্রোচ্চা ভূমির্ভবতি তরুণঃ স্নানতঃ কামাকুণ্ডে

ভোগো যজ্ঞো ভ্রমণ নটনং তত্র বাক্যং হি বেদঃ
ইত্থং রামো রচয়তি পদং লক্ষণান্যুনবিংশ স্তস্মাৎ
সকল জগতাং শ্রীমহাস্থানমেতৎ ॥

পরশুরাম এই ঊনবিংশ লক্ষণ রচনা করিয়াছেন ;—সেই জন্যই জগৎ মধ্যে ঐ স্থান মহাস্থান নামে খ্যাত ও শ্রেষ্ঠ।

ফল কথা করতোয়া মাহাত্ম্য পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বগুড়া জেলার করতোয়া তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান মহাস্থানই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

শাস্ত্র ব্যতীত আমাদের অন্য কি প্রমাণ আছে দেখা যাউক। অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙ্, খৃষ্টীয় ৬২৯ হইতে ৫৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত ভারত পর্য্যটন করেন। ইনি চম্পা বা ভাগলপুর হইতে অন্যূন চারি শত লি পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া কজঙ্গলা (বৌদ্ধ পালি গ্রন্থোল্লিখিত এতৎসন্নিকটবর্ত্তী একটি স্থান। J. R. A. S. 1904, pp.86-88) নামক স্থানে উপস্থিত হন। কজঙ্গলা এক্ষণে রাজমহল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই কজঙ্গলা হইতে পূর্ব্ব দিকে গিয়া ও গঙ্গা পার হইয়া প্রায় ছয় শত লি গমন করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপনীত হন।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব বিদ্ ক্যানিংহাম Archalogical suevey of India গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "এই বিবরণ রাজমহল হইতে মহাস্থানের দূরত্বের সহিত ঠিক্ মিলিয়া যায়।

অন্-য়ুয়ন্ চয়ঙের বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের দুই ক্রোশ পশ্চিমে "গগনস্পর্শী চূড়া বিলম্বিত 'পো-শি-পো' সঙ্ঘারামের নিকট অশোক রাজ নির্ম্মিত স্তূপ ও সুবৃহৎ বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি সমন্বিত একটি বৌদ্ধবিহার দর্শন করিয়াছিলেন।" মহাস্থানের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত 'বিহার' নামক স্থানে এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ক্যানিংহাম অনুমান করেন। ক্যানিংহাম বলেন, "বিহারে ৭০০ ফিট দীর্ঘ ও ৬০০ ফিট প্রশস্ত একটি প্রকাণ্ড ভগ্ন ইষ্টকের স্তূপ দৃষ্ট হয়।

কিঞ্চিৎ উত্তর পূর্ব্বে প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরে ‘বিহার’ গ্রাম অবস্থিত। এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে ‘ভাসুবিহার’ গ্রাম। এই গ্রামের সম্মুখে এবং ইহার পশ্চিমে ত্রিশ ফিট উচ্চ অত্যন্ত নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ একটি প্রকাণ্ড স্তূপ আছে। গ্রাম্য লোকের সহায়তায় আমি এই স্তূপে উঠিয়াছিলাম এবং উঠিয়া দেখিলাম যে, ইহা একটি বৃহৎ ইষ্টকের স্তূপ। ইহার অনতিদূরে উত্তর দিকে একটী দ্বিতীয় স্তূপ লক্ষিত হয়। এই স্তূপ-টির উপরে খোদিত ইষ্টকে নির্ম্মিত একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। আরও উত্তরে গেলে এক অতি নির্ম্মল তড়াগে উপনীত হওয়া যায়। ইহার নাম “শোশঙ্গ দীঘী” বা রাজা শশাঙ্কের দীঘী। অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙ্-বর্ণিত প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্বেষণে আমার প্রাগুক্ত প্রদেশ দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মহাস্থান শব্দের তাৎপর্য্যার্থ ‘রাজধানী।’ উক্ত অর্থ বিচারে মহাস্থানই যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ইহা আমি মনে মনে একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। বিশেষ অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙ্ উক্ত রাজধানীর চারি মাইল দূরে অবস্থিত ‘পো-শি-পো’ নামে একটি মঠের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মহাস্থান হইতে বিহারের ব্যবধানও ঠিক্ এই চারি মাইল। কিন্তু যখন বিহার গ্রামে পঁহুছিয়া ‘ভাসুবিহার’ গ্রামের নাম শুনিলাম, উক্ত গ্রামকে পরিব্রাজক বর্ণিত পো-শি-পো বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে এখন আর আমার কোন দ্বিধা থাকিল না। এই চীন আখ্যাটিকে জুলিয়ন ‘বাষ্প’রূপে অনুবাদ করেন। বাষ্পের সাধারণ অর্থ ব্যতিরেকে উক্ত শব্দে লৌহও বুঝাইতে পারে; কিন্তু আমার ধারণা নামটির ‘ভাসু’ অর্থাৎ সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ আছে, এবং ভাসু বলিতে সমুজ্জ্বল অর্থাৎ সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত মঠ ইহাই বুঝায়। ভাসু শব্দটি ভাস্বত শব্দকেও হ্রস্ব করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সংস্কৃত ভাস্বত শব্দের অর্থ উজ্জ্বল, চাকচিক্যশালী। * * *

এখানে পরিব্রাজক অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙ্ অতি উচ্চ ভিত্তির উপরে স্থাপিত

এবং গগনস্পর্শী চূড়া-সমন্বিত বিরাট বিহার বা মঠ দেখিয়াছিলেন। সেই সময় উক্ত মঠ অন্যূন সাতশত ভিক্ষু কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা 'মহায়ন' গ্রন্থ পাঠে রত থাকিতেন এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডলী পূর্ব্বাঞ্চল হইতে অনুক্ষণ এই মঠে শাস্ত্রালোচনার নিমিত্ত আগমন করিতেন। বর্ণিত মঠের কিয়দ্দূরেই মহারাজ অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ বর্ত্তমান আছে। ইহার পার্শ্বেই বুদ্ধদেব দেবগণের নিকট শাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বুদ্ধের চারিজন শেষ অবতার এই স্থানেই বুদ্ধের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করেন। ইঁহাদিগের পদচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া পৌণ্ড্রখণ্ডে বৌদ্ধের প্রাধান্য বিঘোষণ করিতেছে শেষোক্ত স্থান হইতে কিঞ্চিৎদূরে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি সমন্বিত একটি মন্দির ছিল।

এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত প্রত্যেকটি হর্ম্ম্যের প্রতিভূ-স্বরূপ কিছু না কিছু ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও বিহারে বর্ত্তমান আছে। বিহার গ্রামের বৃহৎ স্তূপটিকেই আমি পরিব্রাজক বর্ণিত বৃহৎ মঠ বলিয়া সেনাক্ত করিতে চাই। ইহার দক্ষিণাংশ উত্তরাংশ হইতে অনেক উচ্চ এবং এই দক্ষিণাংশেই আমি মঠ স্থাপিত করিব। ইষ্টকের প্রাচীরগুলি জমিদারের আবাস নির্ম্মাণের জন্য খনন করিয়া লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে সে সমস্ত খাত পড়িয়া আছে, তদ্দৃষ্টে উক্ত প্রাচীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এই ইষ্টকে আর একটি পুরাতন্ বাড়ী এবং দুইটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুত। * * *

ভাসুবিহারে অদ্যাপিও ৩০ ফিট উচ্চ পাকা গাঁথনির স্তূপটিকে আমি অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ বলিয়া অবধারিত করিতে চাহি। * * * স্তূপের পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। স্তূপের উত্তরে যে ভগ্ন মন্দিরটি আছে, সেইটিই অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। ইহার অভ্যন্তরটি অতি ক্ষুদ্র ১৩´×১১´ কিন্তু ইহার প্রাচীর গুলির ঘনতায় ৪ ফিট এবং

এতদুপরি উত্তর দক্ষিণে ১০৪ ফিট দীর্ঘ এবং ৬৪ ফিট প্রস্থ একটি প্রকাণ্ড বেষ্টনী আছে। স্তূপের দক্ষিণ দিক্ দিয়া এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। * * *

পাঠক! লক্ষ্য করিবেন, ক্যানিং হামের Archaeological survey of India গ্রন্থে করতোয়া মাহাত্ম্যের নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। ইহাতে অনুমান হয় তিনি ঐ গ্রন্থ দেখিতে পান নাই, অথচ করতোয়া মাহাত্ম্যোক্ত বচনের সহিত উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুমান বেশ মিলিয়া গিয়াছে। তিনি কেবল অন্-য়ুয়ন্-চয়ঙের বর্ণনার সহিত স্থান মিলাইতে গিয়াই মহাস্থানকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন।

অন্-য়ুয়ন-চয়ঙ্ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে 'ক-লো-তু' নামে একটি বিশাল নদী পার হইয়া কামরূপে গমন করেন। ক-লো-তু যে করতোয়া সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি আছে? *

তারপর তঙ্-সুব (Tang-shu) মতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন কামরূপ হইতে ১২০০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। তঙ্-সু কথিত এই দূরত্ব কামরূপ হইতে মহাস্থানের সহিত মিলিয়া যায়।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড় ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন। তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনস্থ কার্ত্তিকেয়-মন্দিরে দেবনর্ত্তকী কমলার নৃত্যকলা দর্শনে মুগ্ধ এবং তাঁহার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই কার্ত্তিকেয়-মন্দিরই যে মহাস্থান-স্থিত এবং করতোয়া-মাহাত্ম্যোক্ত স্কন্দদেবের মন্দির তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাস্থানে স্কন্দ ও গোবিন্দের স্থান দুইটি, দুইটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দ্বারা অদ্যাপিও চিহ্নিত হইয়া আছে। অল্পদিন হইল মহাস্থানের সেই স্কন্দনামে খ্যাত স্তূপ

* রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম বর্ষে লেখক কর্ত্তৃক করতোয়ার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

খনন করায় করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রস্তর সোপান এবং মন্দির-ভিত্তি বহির্গত হইয়াছে। এবং কারুকার্য্য-খচিত বহু প্রস্তর খণ্ড করতোয়া তীরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে।

লঘু ভারতে লিখিত আছে যে, মানসিংহ কামরূপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় স্কন্দ ও গোবিন্দ তীর্থ দর্শন করিয়া যান। কথিত আছে, তিনি মহাস্থানের অনেক লুপ্ততীর্থ আবিষ্কার করিয়া ছিলেন।

"সাহ সুলতানের সমকালীয় মুসলমানগণ দ্বারা যাবতীয় দেবদেবীগণ বিনষ্ট হওয়ায় এইক্ষণ পৌষনারায়ণী যোগে ঐ সকল দেবদেবীর আসন অতি ক্লেশে যাত্রীগণ নির্ণয় করিয়া লইয়া পূজাদি করিয়া থাকে।"

রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে যে, জয়াদিত্য গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হন। এই জয়াদিত্যের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আগমন বার্ত্তা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর কেহই জানিতে পারে নাই। পরিশেষে জয়াদিত্যের নামাঙ্কিত পতিত কেযূর দৃষ্টে সকলেই কাশ্মীরাধিপের আগমন বার্ত্তা জানিয়াছিলেন।

গঙ্গা নদী যদি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে অপর একজন স্বাধীন রাজার সৈন্যসামন্ত রাজধানীর এত নিকটে আসিল ও বিদায় হইয়া গেল, অথচ নগরবাসী কেহই জানিল না, ইহাও কি সম্ভবে? ইহাতে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর গঙ্গাতীর হইতে দূরে ছিল; সুতরাং দূরত্ব নিবন্ধন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী কাহারও জয়াদিত্যের আগমন জানিবার সুবিধা হয় নাই। গঙ্গা নাকি পূর্ব্বে মালদহ পাণ্ডুয়ার অতি নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। সুতরাং ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাণ্ডুয়ার না হইয়া কিছু দূরে স্থিত মহাস্থানই হওয়া সুসঙ্গত।

মহাস্থান যে পরগণার অন্তর্গত, সে পরগণাটির নাম "শীলবর্ষ" চলিত

কথায় 'শেলবর্ষ' বলে। করতোয়া মাহাত্ম্যের শীলদ্বীপই বর্ত্তমানে শীলবর্ষ নামে অভিহিত হইতেছে বোধ হয়।

কোন অপরিজ্ঞাত বা সমভূমি প্রান্তরে আমরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের স্থান নির্দ্দেশ করিলেও সন্দেহের কারণ থাকিত বটে, কিন্তু প্রমাণগুলি ব্যতীত মহাস্থানে যে সকল ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলেই বিশ্বাস হইবে যে, মহাস্থান কি প্রাচীনত্বে, কি বিশালতায়, কি সমৃদ্ধিতে কিরূপ অলঙ্কৃত ছিল! মহাস্থানের সেই পাহাড় সদৃশ উচ্চ এবং পরিখা-বেষ্টিত গড়, ৫।৬ মাইল ব্যাপী অসংখ্য অট্টালিকার ভগ্ন ইষ্টকগ্রথিত রাজপথ, নগর-বেষ্টনীবৎ৮ মাইল দীর্ঘ এবং উচ্চ জাঙ্গাল (লোকে সচরাচর ভীমের জাঙ্গাল বলে) এই সকল দেখিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়। হায়! ইহা কতকালের কোন্ বিশাল রমণীয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ; না জানি ইহা কতই সৌন্দর্য্যের আগার ছিল!

করতোয়া-মাহাত্ম্য, ক্যানিংহাম ব্যতীত সেতিহাস বগুড়া বৃত্তান্ত, নব্য ভারত, এবং গ্রাম্য প্রাচীন কবিতা প্রভৃতি স্থানীয় ইতিহাস গুলিতেও মহাস্থানকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি আমরা বাল্যকাল হইতেই মহাস্থান যে পৌণ্ড্রক্ষেত্র তাহা বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়া আসিতেছি। সুতরাং মহাস্থানকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা এক্ষণে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার বিচার করুন। এই প্রার্থনা।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

ইশাখাঁ ও সোণাবিবি

ইশাখাঁ। আজ আমার "অনন্ত মুহূর্ত্ত"। কখনও ভাবি নাই যে জীবনে এমন দুরাশার স্বপ্ন সফল হইবে। জানিতাম না যে, সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়া অন্তরের একাগ্র সাধনা পূর্ণ করে। ভক্তের ব্যাকুল পূজায় ইষ্টদেবী আপনি আসিয়া বরপ্রদা হন, হিন্দুর এ কথায় আজ প্রত্যয় হয়।

সোণামণি। আমি আপনার বন্দিনী মাত্র।

ইশা। তবে তাই হউক। আজ আপন সৌভাগ্যদেবীকে গোলাপ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছি। এই গর্ব্ব এই সুখ রাখিবার স্থান নাই। জানিনা আমার মত কোন সম্রাট সৌভাগ্যশালী? এস তবে চিত্রিতা-হরিণি, এই প্রেমোদ্যান অপেক্ষা করিতেছে?

সোণা। আপনার ভাষা মার্জ্জিত বটে।

ইশা। না দেবি, আমার অন্তরের কথা জানাইবার শক্তি নাই। বোধ হয় হৃদয়ের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিবার মানবেরই ভাষা নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য কবিহৃদয়ের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। গিরিকন্দর-বদ্ধ, চন্দ্রকরোচ্ছ্বাসিত জলরাশির ন্যায় হৃদয়ের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস যেন সীমাবদ্ধ ভাষায় আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারে না। তার চিরনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যেই থাকিতে হয়। গভীরতার ভাষা বুঝি নীরবতা। তোমার নিষ্ঠুর আবরণ মুক্ত কর, আর মেঘলুক্কায়িত পূর্ণ শশীর ন্যায় হৃদয় আবৃত করিও না। একবার পুষ্পমণ্ডিতা ঊষার মুক্ত গগনতলে আপনার নন্দনরশ্মি স্ফুরিত কর। অন্ধকার প্রাসাদ ঐরূপ জ্যোতিতে জ্বলিয়া উঠুক। প্রতি বৃক্ষলতা তার পুষ্প-পাত্র শিশির-সুরায় ভরিয়া তোমাকে উপহার দিবে। বিহঙ্গম কমকণ্ঠে মঙ্গলারতি বাজাইয়া তোমারই অভ্যর্থনা করিবে। এস দেবি, এই স্বর্ণরাজ্য ঐ সুবর্ণপ্রতিমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সোণা। আমি কাফের।

ইশা। বেশ, তা আর থাকিবে না, পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম তোমার জন্য প্রসারিত আছে, সে কাহাকেও গ্রহণ করিতে ঘৃণা করে না। মোস্‌লেমের হৃদয় হিন্দুর ন্যায় সঙ্কীর্ণ নহে, সে বিধর্ম্মীকে প্রেমভরে আপন সম্প্রদায়ে টানিয়া লইতে পারে। তার বিদ্বেষ আছে সত্য, কিন্তু যে মহম্মদের পবিত্র নাম স্মরণ করে, সে মোস্‌লেমের প্রেমের পাত্র। হিন্দুর ন্যায় সে আপন ধর্ম্ম-লিপ্সু অভ্যাগতকে ঘৃণায় সমাজের একপ্রান্তে ফেলিয়া রাখে না। আর বুঝিনা, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে এমন ঘৃণার চক্ষে কেন দেখে? একই মানুষ, একই ঈশ্বর, একই ভক্তি, কেবল পন্থা বিভিন্ন মাত্র।

সোণা। হইতে পারে, কিন্তু আমি বিধবা। যদিচ আমার বিবাহিত জীবনের কথা বহুকালের দৃষ্ট স্বপ্নের ছায়ার মত মনে পড়ে, তথাপি আমি হিন্দু, তথাপি বিধবা! বোধ হয় এই দুই শব্দই আমার মুখে উচ্চারিত হইয়া তীব্র উপহাসের ধ্বনিত হইতেছে।

ইশা। বুঝিনা, দেবি, এই অনুতাপের কি কারণ? ইস্‌লাম ধর্ম্মে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। মোস্‌লেম বুঝিতে পারে না যে, দৈব-বিড়ম্বনায় একবার দুর্দ্দশা ঘটিলে মানুষ কেন তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে না। একটী দুর্ঘটনাকেই কেন চিরদিন অদৃষ্টের অভিশাপ বলিয়া গ্রহণ করিবে? সে বুঝিতে পারে না যে, জোর করিয়া একটী জীবন নিস্ফল করিলে, কি নৈতিক উন্নতি বা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধিত হয়? চরিত্র-গৌরব বা পবিত্রতা স্বাধীন প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, লোক-শাসনের মুখাপেক্ষী নয়। তবে স্বেচ্ছাচারিতা ও অমঙ্গল নিবারণের জন্যে দণ্ডের আবশ্যক, কিন্তু এক্ষেত্রেও কি প্রয়োজন? বিধবা বিবাহ কি এমন অমঙ্গলকর? বালিকা বিধবা হইয়াছে বলিয়া তার আশা না থাকিতে পারে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাও কি ফুরাইয়াছে? তার কি রক্তমাংসের দুর্ব্বলতা

নাই? তবে যে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে তার অন্য কথা। বৃদ্ধ বিপত্নীক বিবাহ করিতে পারে, বিধবা বালিকার বিবাহ পাপ? সে নারী হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়াই তার যত অপরাধ? এ তোমাদের কি শাস্ত্র?

সোণা। বোধ হয় পুরুষ উহার রচয়িতা তাই। কিম্বা হয়তো পূর্ব্বের জন্মের কর্ম্মফল নতুবা কোন পাপে এ দণ্ড?

ইশা। এ সান্ত্বনা দুর্ব্বল-চেতার। মানুষ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের যন্ত্রচালিত পুতুল নয়, তবে তার ভাল মন্দ, পাপ পুণ্যের প্রশংসা বা নিন্দা থাকিত না। মানুষ স্বাধীন তবে প্রকৃতির অনন্ত নিয়মাধীন। মানুষ চিরদিনই প্রকৃতির কোপ কটাক্ষ হতে আপনাকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত, কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দু উদাসীন কেন?

সোণা। জানি না। শুনিয়াছি বিধবাবিবাহ হিন্দুর শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, তবে সমাজ বিরুদ্ধ বটে। বোধ হয় অমঙ্গলাকর বলিয়াই নিষিদ্ধ।

ইশা। হইতে পারে এই প্রথায় বহু বালিকা চিরকুমারী থাকিবে, হয়ত খাদ্য অপেক্ষা লোক সংখ্যা বাড়িতে পারে, কিন্তু সকলেরই বিবাহ করিতে হইবে এ নিয়ম কেন? যে জীবনযুদ্ধে উপযুক্ত, তারই সন্ততি থাকা আবশ্যক, আর তারই সন্ততি থাকে। অন্ধ, মূক বা রোগাক্রান্তা কুমারী অপেক্ষা আমার মতে স্বাস্থ্য শক্তিশালী বিধবার বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য।

সোণা। আমি অত কথা বুঝিনা, আমি ব্রহ্মচর্য্য কি তাও জানিনা। শৈশবাবধি ভোগ বিলাসের মধ্যেই শিক্ষা পাইয়াছি, এক দিনে সে শিক্ষা ভুলিতে পারি না। আর যখন শুনিলাম আমার জীবন চিরদিনের জন্য নিষ্ফল হইয়াছে, তখন হইতে এ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে বিলাসের চিত্রই দেখিয়াছি। লজ্জাহীনার অপরাধ ক্ষমা করুন।

মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সম্রাট্ সাহাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে সুলতান সুজাই সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সুলতান সুজা ঐশ্বর্য্যশালিনী ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্না বঙ্গভূমির অধিপতি হইয়া যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি? এদিকে তাঁহার লোকবলেরও অভাব ছিল না। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সম্রাট্ সকাশে পারস্য দেশবাসী অমাত্যবর্গের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সুজা স্বীয় ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করায় এই সকল অমাত্যবর্গ সমধর্ম্মাবলম্বী সুজাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। ধনজন-গর্ব্বিত সুলতান সুজাও ইহাদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রবল উদ্যমে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও চতুর্দ্দিকে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে, সম্রাট্ সাহাজাহান দারা কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন বলিয়া তিনি তাহার প্রতিবিধানার্থ রাজধানীতে গমন করিতেছেন।

সুজার আগ্রা যাত্রা।

ক্রমে এ সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। তিনি দারার অভিপ্রায় অনুসারে সুলতান সুজার গতি রোধার্থে তাঁহাকে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। কথিত আছে বৃদ্ধ বাদসাহ উক্ত পত্রে তাঁহার শরীরের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সুজা কিন্তু তাঁহার আগ্রাস্থিত বন্ধুবান্ধব-গণের প্রেরিত গুপ্তচর প্রমুখাৎ সম্রাটের প্রকৃত শারীরিক অবস্থা অবগত হওতঃ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইয়া তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে লিপি প্রেরণ করিলেন যে, তিনি সম্রাট এখনও জীবিত আছেন

সুজার নিকট সাহা-জাহানের পত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর।

কি না ও প্রেরিত পত্র তাঁহারই স্বহস্ত লিখিত কিনা সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ আছে। এমতাবস্থায় তিনি আগ্রা আগমন পূর্ব্বক সম্রাটের পদ-চুম্বন ও স্বকর্ণে তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।

ঔরঙ্গজেবের সমরসজ্জা ও মুরাদের নিকট পত্র প্রেরণ।

এদিকে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে সমর-সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুজার ন্যায় তিনি অতুল ধনশালী বা অসাধারণ জনবলে বলীয়ান না হইলেও তাঁহার অসামান্য তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধি তাঁহার অভীষ্টলাভের সাহায্য করিয়াছিল। তিনি ভ্রাতা মুরাদ বক্‌সের অতুল সাহস ও তাহার প্রকৃত বীর্য্যবত্তার বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য সবিশেষ যত্নবান হইলেন। তজ্জন্য ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার বিষয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও প্রবঞ্চনার পরিচয় পাওয়া গেলেও সরল-বুদ্ধি মুরাদ সে পত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইলেন না। মুরাদ বুঝিলেন—ঔরঙ্গজেবের লিপি-কথা যথার্থ। যথার্থই বুঝি ফকির ঔরঙ্গজেবের বিষয়-লালসা নাই, মুরাদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসাই তাঁহাকে মুরাদের জন্য অসিধারণে উদ্যত করাইয়াছে। তিনি পত্র পাঠে আরও অবগত হইলেন যে, দারা বিধর্ম্মী, সুজা ধর্ম্মত্যাগী, পবিত্র মোগল-সিংহাসনে ইহারা কেহ আরোহণ করেন ধর্ম্মাত্মা ঔরঙ্গজেবের ইহা অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ মুরাদের অদম্য সাহস সর্ব্বজন-বিদিত। সমস্ত ভারতবর্ষ তজ্জন্য তাঁহার পক্ষপাতী, মোগল দরবার তাঁহার দিকে আশার নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। তাই ঔরঙ্গজেব তাঁহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ও তাঁহার অধীনস্থ সৈনিক বৃন্দ দ্বারা তাঁকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। তিনি একবার সিংহাসনে উপবেশন করিলেই, ঔরঙ্গজেবের আনন্দের সীমা থাকিবে না, তিনি তখন অনায়াসে কোন নির্জ্জন প্রদেশে গমন

করিয়া ভগবানের আরাধনায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রবঞ্চক ঔরঙ্গজেব শুধু এইরূপ পত্র প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না। মুরাদের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পত্রসহ লক্ষাধিক মুদ্রা তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন ও সত্বর সুরাট দুর্গ আক্রমণ করিয়া তথাকার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। মূর্খ মুরাদ "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" ভ্রাতার এই চাতুরী জালে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

মুরাদকে অর্থ প্রদান।

ঔরঙ্গজেবের এই সুদীর্ঘ পত্র ও তাঁহার প্রেরিত অর্থের সংবাদ কতক পরিমাণে মুরাদের উপকার সাধন করিয়াছিল। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার এইরূপ সম্মিলনের সংবাদ অবগত হইয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ মুরাদের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। ধনকুবের বণিকগণ তাঁহাকে আর অর্থ সাহায্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন না। তিনিও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও পক্ষাশ্রিত ব্যক্তিগণকে নানারূপ ভবিষ্যৎ আশার বাণীতে উৎসাহান্বিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার যে অর্থ ও সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল, তিনি তন্মধ্য হইতে ত্রিসহস্র সৈন্য, আব্বাস নামক জনৈক সমর-নিপুণ কর্ম্মচারীর অধিনায়কত্বে সুরাট দুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইল। তিনি মুরাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন।

সুরাট দুর্গ অধিকারার্থে লোক প্রেরণ।

অতঃপর তিনি তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ মীরজুমলার হৃদয় অধিকার করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন। পাঠক অবগত আছেন মীরজুমলা সম্রাট্ সাহাজাহানের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, সুচতুর ঔরঙ্গ-

মীরজুমলার নিকট ঔরঙ্গজেবের দুই পুত্রের গমন।

জেবের সহিত মিলিত হইবেন না এবং তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীপুত্র যুবরাজ দারার নিকট আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁহার পুত্র সুলতান মহম্মদকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মীরজুমলা দারার ভয়ে ভীত এবং স্ত্রীপুত্রগণের অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া ঔরঙ্গজেবের সহিত সম্মিলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ঔরঙ্গজেব কোন বিষয়ে নিরুদ্যম হইবার লোক ছিলেন না। তিনি পুনরায় তাঁহার ২য় পুত্র সুলতান মজমকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মজম পিতৃপ্রদত্ত পত্র মীরজুমলার হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রে কত মাধুর্য্য, কত প্রেম, কত প্রণয়-সম্ভাষণ ছিল। মীরজুমলা অচিরে আসিয়া সুহৃদ ঔরঙ্গজেবের সহিত সসৈন্যে দৌলতাবাদে সাক্ষাৎ করিলেন। ঔরঙ্গজেবও তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতে ক্রটী প্রদর্শন করিলেন না বরং পিতৃ সম্বোধনে ও গাঢ় আলিঙ্গনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন।

এইরূপে কতক সময় অতিবাহিত হইলে পর, ঔরঙ্গজেব এক নির্জ্জন কক্ষে যাইয়া মীরজুমলার নিকট যাহা প্রস্তাব করিলেন তাহাতে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে ঔরঙ্গজেবের ১ম ও ২য় পুত্র সশস্ত্রে মীরজুমলার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁহাদের ভীষণ ভ্রূকুটী দর্শনে মীরজুমলার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি বুঝিলেন স্বেচ্ছায় ঔরঙ্গজেবের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তাঁহার প্রতি বল প্রয়োগেও ইহাঁরা কুণ্ঠিত হইবেন না। তিনি কতক ভয়ে কতক ঔরঙ্গজেবের ভবিষ্যত আশার বাণীতে মুগ্ধ হইয়া কতকটা স্ত্রীপুত্রের উদ্ধার মানসে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ঔরঙ্গজেবের হস্তে তাঁহাকে বন্দী হইতে হইল। তিনি সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া দৌলতাবাদ দুর্গে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার ধন দৌলত, যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী ঔরঙ্গজেবের হস্তগত হইল। সুলতান মহম্মদ ও

মীরজুমলা বন্দী।

সুলতান মজ্জম তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে- দারার হস্তে মীরজুমলার স্ত্রীপুত্রগণের নিপীড়ন আশঙ্কাতেই ঔরঙ্গজেব এই অভিনয় করিয়াছিলেন।

মীরজুমলার সৈন্যগণের বিদ্রোহিতা ও বশ্যতা।

মুহূর্ত্তমধ্যে মীরজুমলার এই অবরোধ বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মীরজুমলার সৈন্যগণ ক্ষোভে, দুঃখে অধীর হইয়া উঠিল। তাঁহারা দুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক মীরজুমলা উদ্ধার সাধনে কৃতসংকল্প হইল। ঔরঙ্গজেব প্রমাদ গণিলেন তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণ মীরজুমলার সৈন্যের তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিরুপায় হইয়া স্বয়ং পুত্রগণ সহ তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে নানারূপ প্রলোভন ও উপঢৌকনাদি দ্বারা বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। মীরজুমলার অধীনস্থ সম্রাটের প্রেরিত সৈন্যগণ পূর্ব্বেই সম্রাটের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল এক্ষণে তাহাদের এই অধিনায়কের অভাবেও চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তাহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। অবশেষে ঔরঙ্গজেবের সস্নেহ ব্যবহারে ও তাঁহার প্রদত্ত উৎকোচ ও অগ্রিম বেতনে তাঁহারই অনুগত হইয়া পড়িল।

এই সময়ে মুরাদ বক্স কর্ত্তৃক সুরাট দুর্গের অধিকার সংবাদে ঔরঙ্গজেব আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তিনি তাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতি ও

সুরাট দুর্গ অধিকার।

মীর জুমলার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া আগ্রার পথে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে উপদেশ দিলেন।

দুর্গাধিকার হেতু মুরাদের যশোবিস্তৃতি।

মুরাদ অক্লান্ত পরিশ্রমে সুরাট দুর্গ অধিকার করিয়াও আশানুরূপ অর্থলাভে সমর্থ হইলেন না। সম্ভবতঃ দুর্গাধিপতি তৎপূর্ব্বেই ইহার অধিকাংশ অপসারিত করিয়াছিলেন। মুরাদের সৈন্যগণ ধনলোভে সুরাট দুর্গ অধিকারে আগমন করিয়াছিল। তাহাদের পরিতুষ্টির নিমিত্ত দুর্গাভ্যন্তরে

প্রাপ্ত তাঁহার সমস্ত ধনরাশি ব্যয়িত হইয়া গেল। তিনি বহু পরিশ্রমে দীর্ঘকালের চেষ্টায় দুর্গ অধিকার করিয়া আর্থিক লাভবান না হইলেও তাঁহার যশঃপ্রভা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার ওলন্দাজ সৈন্যগণ দুর্গের প্রাচীর ও তাহার নিকটবর্ত্তী একটী খনি উড়াইয়া দেওয়ায় সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। *

সাহা আব্বাসের পরামর্শ।

মুরাদের সেনাপতি সাহা আব্বাস তাঁহাকে এই সময়ে সুরাট পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"সুচতুর ঔরঙ্গজেবের প্রস্তাবে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, তাঁহাকে প্রীতিবাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সম্রাটের মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত দুর্গে অবস্থান করতঃ দাক্ষিণাত্যের প্রবেশ দ্বার ব্রমপুর অধিকার † করিয়া লওয়াই সঙ্গত। পরে ঔরঙ্গজেব আগ্রা পৌঁছিলে চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সিংহাসন লাভে যত্নবান হওয়া সঙ্গত হইবে।" কিন্তু মুরাদ ঔরঙ্গজেবের চাতুরীতে এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি সাহা আব্বাসের প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া, বনপথে সত্বর ঔরঙ্গজেবের সহিত আমাদাবাদে সম্মিলিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি যথোপযুক্ত শিষ্ট-ব্যবহার করিয়া উভয়ের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনরায় তাঁহাকে আশার বাণী শ্রবণ করাইলেন,

মুরাদের প্রতি ঔরঙ্গজেবের কপট সৌজন্য প্রকাশ।

পুনরায় তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে মুরাদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার বস্তুতই শঠতাপূর্ণ ছিল। তিনি কি সজনে কি নির্জ্জনে সর্ব্বত্রই মুরাদকে সম্রাটোচিত সম্মানপ্রদর্শন

* বার্ণিয়ার বলেন-ভারতবর্ষ, দুর্গ বা দুর্গপ্রাচীর উড়াইয়া দিবার পদ্ধতি অবগত না থাকায়, জনসাধারণ এইরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

† বরমপুর হইতে সুরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড তৎকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং ঐ সকল স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিলে তাহা অধিকার করা শত্রুগণের পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য হইত।

ও হজরত (প্রভু) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। গর্ব্বিত মুরাদ গোলকুণ্ডাধিপতির প্রতি ঔরঙ্গজেবের কপট ব্যবহারের বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন। ঔরঙ্গজেবের এই ব্যবহারে সামান্য মাত্রও কপটতা নাই। হায়! লোভ ও স্বার্থ মানবের চক্ষুকে এইরূপেই অন্ধ করিয়া দেয়। মুরাদ বুঝিতে পারিলেন না যে, একটা সামান্য দুর্গ অধিকারের জন্য যিনি অতটা ব্যগ্র হইতে পারেন, অতটা কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, এতবড় সাম্রাজ্যের লোভ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব এবং তিনি নিশ্চয়ই ফকিরি গ্রহণ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

সাহাজাহানের পত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর।

উভয়ের মিলিত সৈন্য প্রবল উৎসাহে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্রাট সাহাজাহান ও দারা একান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ সাহাজাহান জানিতেন মুরাদের বীরত্ব ও ঔরঙ্গজেবের চতুরতার একত্র সম্মিলন হইলে, যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে, তাহা নির্ব্বাপিত করিবার ক্ষমতা মোগলসাম্রাজ্যে কাহারও নাই। তিনি উভয় পুত্রকে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য বার বার পত্র লিখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবার ভরসা দিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাঁহারা সে আদেশে কর্ণপাতও করিলেন না বরং সুজার ন্যায় তাঁহার জীবনে সন্দেহ প্রকাশ পূর্ব্বক পত্রগুলি কৃত্রিম ও দারার চতুরতামূলক বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং সন্দেহ ভঞ্জনার্থ সম্রাটের পদচুম্বন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিলেন।

হতভাগ্য বৃদ্ধ সম্রাটের হৃদয়ের অবস্থা এই সময় কি শোচনীয়! তিনি স্বয়ং পীড়িত, পুত্রগণ দুর্বিনীত ও অবাধ্য, তাহাদের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতে তাঁহার হৃদয়ে যেন সূচীবিদ্ধবৎ বোধ হইতেছিল

কিন্তু কি করিবেন! জ্যেষ্ঠপুত্র দারা সহোদরদিগকে শাস্তি বিধানের জন্য কৃত-সংকল্প। সমস্ত সাম্রাজ্য এক্ষণে তাঁহারই হস্তে, তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা; বাধ্য হইয়া সম্রাটকে যুদ্ধে অনুমোদন করিতে হইল। ভারত-বর্ষের ইতিহাসে নূতন এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।

সাজালালের দরগা।
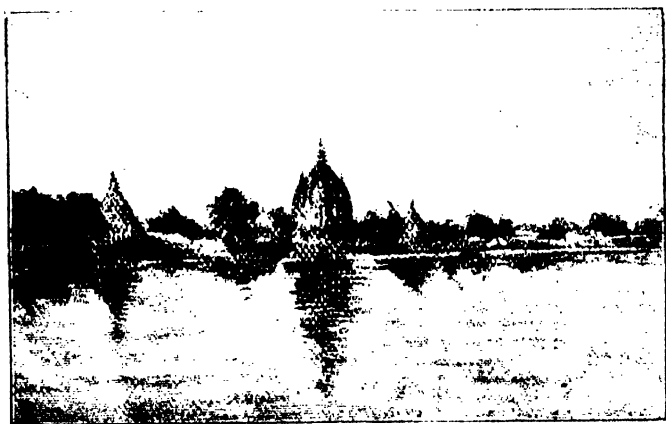
রাণী জয়মতীর দীঘী।

ঐতিহাসিক চিত্র।

ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ

সাধারণ পাঠকেরা অনেক সময়েই ভুলিয়া যান যে, ইতিহাস—ইতিহাস, তাহা পুরাণ-কথা বা ভক্তি-তত্ত্ব নহে। ভক্তি একটি সুন্দর ভাব। সকল কার্য্যের আদিতে এই মহাভাব বিশেষরূপেই বিরাজমান। কোন বিষয়ে ভক্তি হইলে, তবে তাহাতে হস্তক্ষেপণ করা যায়। যাহাতে ভক্তি নাই, তেমন কার্য্যে প্রবৃত্তি কাহারও কোন কালেই হয় না। ভক্তি মানবকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে ও নিরত রাখে,—জ্ঞান তাহাকে চালনা করে। ভক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যেই কর্ম্ম সার্থক ও সুষ্ঠু হইয়া উঠে। সুতরাং একথা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ যে, কর্ম্ম কেবল ভক্তিতত্ত্ব নহে; তাহা জ্ঞান দ্বারাও নিয়মিত। কর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিলে, অপর দুইটি ভাবই দেখা যায়

ইতিহাস আলোচনা ভক্তি-তত্ত্বালোচনার ন্যায় সরল ও সহজ নহে। এখানে অন্ধবিশ্বাস স্থান পায় না। যখনই ঐতিহাসিক কোন বিষয়েরই প্রতি অতিমাত্র ভক্তিমান্ হইয়া উঠেন, তখনই তাঁহার রচনা অতি সন্তর্পণে গড়িতে হয়, অতি সাবধানে আলোচনা করিতে হয়; কারণ, পক্ষপাতিতা এরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক হইয়া উঠে। ভক্তিরও যেমন একটা উদ্দেশ্য আছে, ইতিহাসেরও তেমনি একটা

বিশিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। ভক্তির পাত্রকে বড় করিয়া দেখা ভক্তের কাজ, শুধু কাজ নহে কর্ত্তব্য। বর্ণয়িতব্য বিষয়টিকে নিখুঁতভাবে পরিদর্শন করা, তাহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়া, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করাই ঐতিহাসিকের কাজ। ঐতিহাসিক গবেষণার মূলে ভক্তির ভাব থাকিলেও তিনি সাধারণ ভক্তশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না। কারণ, জ্ঞান তাঁহার কর্ম্মের নিয়ামক। ভক্তি একটা ভাব। সেই একমাত্র ভাবের আলোচনা করাই ভক্তের কাজ। কিন্তু ঐতিহাসিক ত সেইরূপ এক পক্ষাবলম্বী হইতে পারেন না, কারণ তাহাতে সত্যান্বেষণের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়া থাকে। ভক্তিকে জ্ঞানের সাহায্যে শোধন করিয়া তিনি আপনার মনের সংগঠন করেন। ভক্তও যেমন পূজ্য, ঐতিহাসিকও তদ্রূপ। আমার মতে, উভয়ের বিরোধের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ উভয়ের ক্ষেত্র বিভিন্ন।

ভক্তির পাত্রকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরবৎ অভ্রান্ত ভাবিতে পারিলে, ভক্তের যেমন আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। ঐতিহাসিক কিন্তু কোন মহাত্মাকেই ঈশ্বর ভাবিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বদা মনে রাখেন, ঐ মহাত্মা ঈশ্বর-সৃষ্ট মানবমাত্র। মানুষ যখন স্বভাবতঃই ভ্রমশীল তখন উনিও তদ্রূপ ভ্রমশীল এবং আমাদের মত একজন জীব। তাঁহার আচরণে যতই অলৌকিকত্ব থাকুক, আমি যখন তাঁহারই মত মানুষ, তখন তাঁহার কার্য্য-প্রণালী বিচার করা আমার উন্নতির জন্য, আমার জাতির উন্নতির জন্য, আমার দেশের উন্নতির জন্য, এবং বিশ্ব সংসারের মঙ্গলের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য আমাকে যত দূর কঠোর হইতে হয়, তাহাও হইতে হইবে। ভক্তের হস্তস্থিত তুলিকা তাঁহাকে যতই দিব্যমূর্ত্তিতে গঠন করুক, ঐতিহাসিক স্বকীয় হস্তস্থিত সূক্ষ্ম সূচিকা দ্বারা তাহার অভ্যন্তর ভাগ বিদারিত করিয়া, সত্যটা প্রকট করিয়া তুলিবেন, সাধারণের চক্ষের সমক্ষে তাঁহার দোষ, গুণ, পাপ, পুণ্য এবং অন্যান্য সকল প্রকার বিরোধী ভাবই স্পষ্ট

ভাবে ধরিয়া দিবেন। তিনি তাঁহার মানুষী মূর্ত্তিটাই আমাদের চক্ষের নিকট ধরিয়া বুঝাইয়া দিবেন; আমরাও যেমন মানুষ,তিনিও তদ্রূপ মানুষ হইয়াও এরূপ অপূর্ব্ব কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানী ও দেবশ্রেষ্ঠ হইতে পারিয়াছিলেন।

বেদ অভ্রান্ত কি না সে বিচার ভক্তের নহে; আমাদের নিত্য-পাঠ্য পূজ্য রামায়ণ ও মহাভারত মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের রচনা কি না, ভক্তের তাহা জানিবার আবশ্যক নাই; শ্রীশঙ্করাচার্য্য কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ কোন্ ভাব ও অবস্থা দ্বারা তাঁহার কার্য্যাবলী নিয়মিত হইয়াছিল, তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন ভক্তের নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের মধুমাখা অমৃতবাণী দেশের লোকে কেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা জানিবার অবকাশও ভক্তের না থাকিতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, বেদের রচনা মানব-সভ্যতার কোন্ অবস্থায় রচিত, তাহা কোন্ সময়ে বিধিবদ্ধ ও কোন্ কোন্ মহাত্মা কর্তৃক রচিত। ঐতিহাসিক কিন্তু ভক্তের মনঃক্লেশের সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্বীকার করিবেন, বেদ মানবেরই রচনা। তোমার আমার ন্যায় মানুষেরই কৃতিত্ব। ভক্ত বেদকে দেব-রচিত মনে করিয়া, বেদোক্ত মন্ত্র মাত্রকেই অভ্রান্ত বলিয়া অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিক—কঠোর-প্রকৃত ঐতিহাসিক ঐ বেদের মন্ত্রগুলির বিশ্লেষণ করিয়া, তৎকালীন মানবের সভ্যতা কত দূর ছিল, তখনকার মানুষেরা কিরূপ অবস্থায় দিনযাপন করিত, কি প্রকারে তাহারা চিন্তা করিত, কি করিয়া অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিত, তাহাদের হৃদয়ে কতটুকু বিশ্বজনীন ভাব, আর কতখানি আত্মপরতা ছিল, তাহারা আপনাদিগকে কতটা গৌরবান্বিত, কতটা শ্রেষ্ঠ, আর পরকে কতটা হেয় ও হীন মনে করিত, তাই কঠোরস্বরে বলিয়া দিবেন। বলিবার সময় ভক্তের মুখের পানে একবারও তাকাইবেন না।

সেইরূপ মহাভারতও যে এক সময়ের—এক জনের লেখা নহে, বহু সময়ে, বহুলোকের লেখনী দ্বারা গঠিত, তাহা কেবল বলিবার সাহস এক ঐতিহাসিকেরই আছে। রামায়ণ যে অবয়বে আজ আমাদের নিকট বিদ্যমান, তাহার সে অবয়ব যে অতি আধুনিক এবং বৌদ্ধযুগের শেষাশেষি অবস্থায় রচিত, তাহাও ঐতিহাসিকের কথা। তারপর শ্রীশঙ্কর আজিকালিকার ন্যায়ই সাধু ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মের জন্য—কর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। আজ-কালিকার দিনে তাঁহার মত ঋষি কয়জন মিলে? তথাপি তাঁহাকে আমরা অভ্রান্ত ভাবিনা। তাঁহার অনেক মতই ভ্রান্ত ছিল, একথা বলিলে যে, তাঁহার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করা হয়, কিংবা তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করা হয় তাহা নহে; তাঁহার ভ্রান্ততায় সম্যক্ বিশ্বাসী হইয়াও আমরা প্রকৃতভক্তের মতই তাঁহাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, পূজা করি। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মহৎ হইতে চেষ্টা করি।

ঋষি শ্রীশঙ্করাচার্য্য মানুষ ছিলেন—বিবেকানন্দেরই মত মানুষ ছিলেন। তাঁহার বিচার-প্রণালীতে কোন ভুল থকিতে পারে না তাঁহার মতে কোন দোষ থাকিতে পারে না, তিনি যাহা করিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অভ্রান্ত; সুতরাং শ্রদ্ধেয়, একথা ঐতিহাসিকের মুখে সাজে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐতিহাসিক মাত্র। ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি বিষয় গুলির আলোচনা করিয়াছেন ঐতিহাসিকের ন্যায় নিরপেক্ষ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বিচারে কোন দোষ আছে কিনা, তাহা না দেখাইয়া, কেবল ভক্তির দোহাই দিয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করিলে বা কটূক্তি বর্ষণ করিলে, কোন উপকারই দর্শিবে না। বিদ্যারত্ন মহাশয় অতিভক্তির গোঁড়ামীতে ভয় পাইবার লোক নহেন। আর যদি বাস্তবিকই ভয় পাইয়া, তিনি আপনার

গন্তব্য পথ পরিহার করেন, তবে তিনি ঐতিহাসিক হইবার উপযুক্ত নহেন। *

অতিমাত্র ভক্তির আবেশে অন্ধপ্রায় ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীচৈতন্যকে ভ্রান্ত মানুষ না ভাবিতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক জানেন, তাঁহারা আমাদেরই মত দ্বিহস্ত ও দ্বিপদ বিশিষ্ট জীবমাত্র। তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই লোকের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে অথবা হইতে বাধ্য, একথা ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। তাঁহাদের কথায় ও কার্য্যের সহিত তাৎকালীন দেশবাসীদের মনোভাব ও চিন্তাপ্রণালী বিচার করিয়া ঐতিহাসিক জানেন যে, দেশের লোকে তাঁহাদের প্রচারিত সত্যটাকে সমগ্র হৃদয় দিয়া, সম্যক্ বিশ্বাস দিয়া, গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা সেই সত্যকে আপনাদের উপযোগী করিয়া লইতে যাইয়া কিরূপ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাও ঐতিহাসিকের বর্ণয়িতব্য বিষয়।

এই সকল গূঢ় তত্ত্ব জানিবার সাহস, শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য অতিভক্তের না থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি দেশের কথা—জাতির কথা, সত্যভাবে জানিতে ও সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে চান, তিনি অবশ্যই চপলতা পরিহার করিবেন। চপলতা সকল শিক্ষার ও উন্নতির পক্ষে বিষম অন্তরায়।

প্রকৃত ভক্তের সহিত ঐতিহাসিকের কোন বিরোধই নাই। উভয়েই মহাভাবের ভাবুক। উভয়েই পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ। ভক্ত আপনার ভক্তি দিয়া ভক্তির পাত্রকে বড় করিয়া দেখিবেন ও তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিবেন, আর ঐতিহাসিক দেশের ও দশের মঙ্গলের কথা ভাবিয়া পূর্ব্ববর্ত্তিগণের কার্য্যাবলীর নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা

* ১৩১৬ সালের পৌষের ঐতিহাসিক চিত্রে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিত।

আমাদের উন্নতির পথ সরল করিয়া দিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তীরা যে ভুলটি ধরিতে না পারায়, ক্ষতি হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে, আমাদের উপকার ব্যতীত কোন অপকারই নাই। তাঁহারা কোন্ কোন্ গুণের আশ্রয় লইয়া, কোন্ ভাবের ভাবুক হইয়া, আপনাদের কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও অবিকৃত ভাবে জানা আমাদের আবশ্যক। সুতরাং ঐতিহাসিকের কার্য্য সহজ ও সরল নহে; তাহা অতি কুটিল ও বন্ধুর। সেরূপ কঠিন কার্য্য অতি অল্পই আছে। কোন ভাব-বিশেষের দোহাই দিয়া, সেই মহাকার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইলে, কেবল নিজের ক্ষতি করা নহে,—জাতির, দেশের ও বিশ্বজগতের ক্ষতিকরা হয়। ভরসা করি, অতঃপর পাঠকেরা ঐতিহাসিক আলোচনা পাঠের সময় এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া, আপনাদের ভাববিশেষকে দমন করত স্ব স্ব মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুসঙ্গে রাজ্যস্থাপন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জে সোমেশ্বর পাঠক নামক একজন সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, বলিষ্ঠ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সাংসারিক কার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকার্য্য ও তীর্থাদি পরিভ্রমণেই তাঁহার সমধিক আসক্তি ছিল। সোমেশ্বর পাঠক নানা-তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গীয় ৬৮৭ সালে (১২৮০ খ্রীঃ অঃ) কামরূপ ও চন্দ্রনাথ তীর্থ পরিভ্রমণ জন্য কতিপয় অনুচর সহ বঙ্গদেশে উপনীত হয়েন। সেই সময়ে কামরূপ প্রদেশ নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। যাতায়াতের পথ ভাল ছিল না। সেই বিপদ-সঙ্কুল পথে লোকের গমনাগমন বিরল ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট পথের বিভীষিকা

গণনীয় নহে। সোমেশ্বর পাঠক কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কামাখ্যা-দেবীর পূজা করিয়া পার্ব্বত্যপথে দেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিছু দূর আসিয়া তাঁহার চিত্তের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। গারো পর্ব্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদৃষ্টে ঐ স্থান ঈশ্বর-সাধনার উপযুক্ত বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মে এবং তথায় বাস করিবার বাসনা তাঁহার বলবতী হইয়া উঠে। তদনুসারে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। দেব-প্রকৃতি সোমেশ্বর পাঠকের অবস্থান হেতু ঐ স্থান দেওশীল (দেও—দেবতা, শীল—প্রস্তর) নামে অভিহিত হইয়াছে।

এক্ষণে যেখানে দুর্গাপুর রাজধানী অবস্থিত, ঐ সময় ঐ স্থান এবং তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ নিবিড় অরণ্যানী সমাকীর্ণ ও বিবিধ হিংস্র পশুর বিচরণ-ক্ষেত্র ছিল। ঐ অরণ্যের বহির্ভাগে কতিপয় মাত্র অসভ্য কোচ, ম্যাচ ও গারো প্রভৃতি মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবরের বাস ছিল। ইহারা অসভ্য হইলেও বহুকাল হইতে পাহাড়ের নিম্ন স্থানে বাস করা হেতু অনেকটা সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। এই ধীবরগণ প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাস হইতে বর্ষারম্ভের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত দল-বদ্ধ হইয়া বন-মধ্যস্থ নির্ঝরিণী ও পল্বলাদিতে মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। যে বৎসর সোমেশ্বর পাঠক দেওশীলে উপনিবিষ্ট হন, ঐ বৎসর মাঘমাসে ধীবরগণ তথায় যাইয়া সোমেশ্বর পাঠককে দেখিতে পায়। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও অলৌকিক যোগবলের পরিচয় পাইয়া, ধীবরগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া এবং দেবতাজ্ঞানে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া উঠে। ধীবরগণের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিনয় মিনতিতে বাধ্য হইয়া সোমেশ্বর ঠাকুর সদলবলে ধীবরগণ সহ তাহাদের বাসস্থানে যাইতে স্বীকৃত হন। ধীবরগণ মহাসমারোহে নৌকাযোগে তাঁহাকে পাহাড় হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে সমতলক্ষেত্রে আনিয়া আপনাদের বাসস্থানের সন্নিকটে একটি অশোক বৃক্ষের মূলে স্থাপিত করে। ধীবরগণ সপরিবারে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার সেবা করিত,

সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিত এবং সর্ব্ববিধ অভাব নিবারণের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ও প্রস্তুত থাকিত। সোমেশ্বর পাঠক যে অশোক বৃক্ষ মূলে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমান দুর্গাপুর রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। সোমেশ্বর পাঠকের নিকট দুর্গাদেবীর এক মূর্ত্তি ছিল, ঐ দেবীর নামানুসারেই রাজধানীর নাম 'দুর্গাপুর' হইয়াছিল। ঐ দেবী দুর্গাপুরের অধিষ্ঠাত্রীরূপে এখনও বিরাজিতা আছেন। সোমেশ্বর পাঠকের আশ্রমস্থিত অশোক বৃক্ষটি বহুকাল পর্য্যন্ত অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ বৃক্ষটি বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ অশোক বৃক্ষের বিলোপের সঙ্গে একটুকু রহস্য জড়িত আছে, তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

সোমেশ্বর পাঠক যে সময় অশোক বৃক্ষমূলে উপনিবিষ্ট হন, ঐ সময় নেতাই হইতে মহিষখোলা পর্য্যন্ত সমস্ত বনভূমি বৈশ্য নামক একজন পরাক্রান্ত গারোর অধিকারভুক্ত ছিল। অসভ্য পার্ব্বত্য-জাতি স্বভাবতঃই দুর্দ্ধর্ষ ও অত্যাচারী। ধীবরগণ তাহার অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইত। অতি সামান্য কারণেই লুণ্ঠন, গৃহ-দাহ, নরহত্যা প্রভৃতি উৎকট অত্যাচার হইত। সেইজন্য দুর্ব্বল ধীবরগণ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, সোমেশ্বর পাঠকের শরণাপন্ন হইল এবং দুর্দ্দান্ত বৈশ্য গারো রাজার অমানুষিক অত্যাচার হইতে মুক্তির উপায় করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। এই সময় একদল সন্ন্যাসী আসিয়া সোমেশ্বর পাঠকের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সন্ন্যাসী দলের গুরুস্থানীয় এক বর্ষীয়ান্ সন্ন্যাসী সোমেশ্বর পাঠককে বলিলেন,—"তোমার শরীরে অনেক রাজলক্ষণ দেখা যাইতেছে, তুমি সন্ন্যাসী হইবে ইহা ভগবানের ইচ্ছা নহে, এই অরণ্য ভূমি অধিকার করিয়া তুমি একটি রাজ্য স্থাপন কর, তাহাতেই তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি ও প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত তোমার আশ্রয়ীভূত অশোক বৃক্ষটি জীবিত থাকিবে,

ততদিন পর্য্যন্ত তোমার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের উন্নতি ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ইহার বিলোপে রাজশ্রীরও অধঃপতন হইবে।" ফলতঃ এই ভবিষ্যদ্‌বাণী যেন যথার্থই ফলিয়াছে। অশোক বৃক্ষটি লুপ্ত হইবার পর হইতেই সুসঙ্গ রাজবংশীয়দের অবনতি ঘটিয়াছে।

বৈশ্য গারোর লোমহর্ষণ অত্যাচারে উৎপীড়িত ধীবরগণের কাতর-ক্রন্দনে সোমেশ্বর পাঠকের করুণ হৃদয় পূর্ব্বেই বিগলিত হইয়াছিল, এক্ষণে বাক্‌সিদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া, নূতন উৎসাহের আলোকে তাঁহার বীর হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গারোগণের বাহুবল আছে, কিন্তু নীতিজ্ঞান নাই; বিক্রম আছে, কৌশল নাই; জন-বাহুল্য আছে, শৃঙ্খলা নাই; সুতরাং সেই পশু-প্রকৃতিক অসভ্যগণ যতই দুর্দ্ধর্ষ হউক না কেন, তাহাদিগকে আয়ত্ত করা যে অনায়াস-সাধ্য, তাহা সোমেশ্বর পাঠকের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বৈশ্য গারোকে পরাজিত ও বশীভূত করিবার জন্য তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে সুযোগের অভাব হয় না। সোমেশ্বর পাঠক সহায়-সম্পত্তিহীন হইলেও অদৃষ্টগুণে বুদ্ধিবলে উপযুক্ত সহায়তা লাভ করিলেন।

যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী সোমেশ্বর পাঠকের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি বৈশ্যের অত্যাচারের বিবরণ জলন্ত ভাষায় বিবৃত করিয়া, স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। বৈশ্য গারোর অত্যাচারে উৎপীড়িত ধীবর ও অন্যান্য কোচ ও ম্যাচ্‌গণ প্রাণপণে তাঁহার অভীষ্ট সাধন জন্য প্রস্তুত হইল। স্বীয় বাসস্থান কান্যকুব্জ হইতে বহু-সংখ্যক বিশ্বাসী বলিষ্ঠ লোক সংগৃহীত হইল এবং অবশিষ্ট গারো ও ম্যাচ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল জনবলের অধিনায়ক হইয়া, তিনি বৈশ্য গারোর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। এই যুদ্ধে বৈশ্য গারো নিহত হইল। তাহার অনুচরগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন

করিল।* অন্যান্য গারো দলপতিগণ সোমেশ্বর পাঠকের শক্তি, সাহস ও কান্তি দর্শনে তাঁহাকে দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া সহজেই বিশ্বাস করিল এবং তাঁহার সরল, মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া অকপটে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। অতি অল্পায়াসেই গারো পর্ব্বতে সোমেশ্বর পাঠকের প্রাধান্য ও প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।*

এই সময় পাঠান সম্রাটের প্রেরিত শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ বা স্বাধীনভাবে লক্ষ্ণৌতিতে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন কিন্তু কেহই পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা লোপ করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই পাঠান সম্রাটের আধিপত্য এই সুদূর পর্ব্বত প্রান্ত পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত হয় নাই, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং সোমেশ্বর পাঠক স্বীয় ভুজ-বলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনা করিলেও তৎপ্রতি বঙ্গের শাসনকর্ত্তাদের দৃষ্টি পতিত হয় নাই তিনি নির্ব্বিবাদে অনন্তপ্রতাপে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ ও আভ্যন্তরীণ উন্নতির ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধুর পরামর্শে ও সৎপ্রকৃতিক ব্যক্তিগণের সহায়তায় এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহার নাম 'সুসঙ্গ' হইল।

শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

* At the commencement of thefourteenth century, Shomeshar Thakur, the progenator of this ancient family, established himself as an independent ruler of Susung and the Garo Hill by dispossing Baisa Garo.

The modern History of the Indian chief Rajas, Zamindars etc. By S. N. Ghosh.

প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চ্চা

থেলস্ (Thales.)

থেলস্ ৬৪০ খ্রীঃ পূঃ—থেলস্ গ্রীসের সপ্ত জ্ঞানীর মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। ইনি মিলেটাস্ নগরে খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। থেলস্ মিসর দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তদ্দেশবাসীদিগের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তৎপরে নিজদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

জীবন বৃত্তান্ত

প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করিতেন—(১) পৃথিবী থালার ন্যায় চেপ্টা ও জলের উপর ভাসমান। (২) সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাসমুদায় দেবতা (৩) বৎসর দুইভাগে বিভক্ত = শীত ও গ্রীষ্ম।

তৎসমসাময়িক বিজ্ঞান।

থেলস্ সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিয়া বৎসরকে চারি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করেন। তিনিই গ্রীসবাসীদিগের মধ্যে প্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনিই বৎসরকে নিম্নলিখিত চারিটী বিশেষ ভাবে বিভক্ত করেন।

বিজ্ঞান ভাণ্ডারে তাঁহার দান।
(ক) জ্যোতিষ
(১) বৎসর চারি ভাগে বিভক্ত।

প্রথম বিভাগ—২১ শে ডিসেম্বর হইতে ২১ শে মার্চ্চ। ২১ শে ডিসেম্বর দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। ঐ দিন দ্বিপ্রহর সময়ে সূর্য্য ঠিক মস্তকোপরি আইসে না। (২৩°, ২৮′ দক্ষিণে) সুতরাং উহার রশ্মি বক্র গতিতে পৃথিবীতে পড়ে। বিশেষতঃ সূর্য্য ঐ সময় খুব অল্প কালই আকাশে থাকে; সুতরাং আমরা ইহার উত্তাপ অধিক পাই না। এজন্যই

প্রথম বিভাগ।

এ সময় শীতকাল হয়। ২১ শে ডিসেম্বরের পর হইতে দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সূর্য্যও ক্রমশঃ দ্বিপ্রহর সময়ে মস্তকোপরি উঠিতে থাকে এবং তিন মাস পরে ২১ মার্চ্চ দিন রাত্রি সমান হয়।

দ্বিতীয় বিভাগ।

দ্বিতীয় বিভাগ—২১ শে মার্চ্চ হইতে ২১ শে জুন। ২১ শে মার্চ্চের পর হইতে দিন ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। রাত্রি ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে। পুনরায় তিন মাস পরে ২১ শে জুন দিন সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়। সূর্য্য তখন অধিক সময় পৃথিবীতে থাকে ও ঠিক মস্তকোপরি (২৩°-২৮ উত্তরে) থাকে বলিয়া, উহার রশ্মি লম্বভাবে আমাদের নিকট আসে, এ জন্ম আমরা উহার উত্তাপ অধিক পাই। এ জন্যই এ সময় গ্রীষ্মকাল হয়।

তৃতীয় বিভাগ।

তৃতীয় বিভাগ—২১ শে জুন হইতে ২৭ শে সেপ্টেম্বর। ২১ শে জুনের পর হইতে দিন পুনরায় ছোট হইতে থাকে। তিন মাসের পর ২৭শে সেপ্টেম্বর পুনরায় দিন রাত্রি সমান হয়।

চতুর্থ বিভাগ।

চতুর্থ বিভাগ—২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ২১ ডিসেম্বর। ২৭শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে রাত্রি দিন অপেক্ষা ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে ও পুনরায় তিন মাস পরে ২১ ডিসেম্বর রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হইয়া পুনরায় শীতকাল হয়।

(২) বিভিন্ন ক্রান্তিপাতে ইংরাজী নামকরণ।

থেলস্ সূর্য্যের গতি ও দিনরাত্রি ভেদ লক্ষ্য করতঃ বৎসরকে যে চারিটী ভাগ করিয়া ইংরাজী নাম করণ করিয়াছিলেন [(১) Vernal Equinox (বাসন্তী ক্রান্তিপাত) (২) autumn Equinox (শারদীয় ক্রান্তিপাত) (৩) Summar and (৪) winter solastices (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভের কাল)] আজকালও সেই সমুদায় নামই ব্যবহৃত হইতেছে।

থেলস্ মনে করিতেন সূর্য্য ও তারাসমুদায় দেবতা নহে। কোন ... । পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত এবং চন্দ্র, দর্পণের ন্যায়, সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত করে।

(৩) সূর্য্য, চন্দ্র, ও তারাসমুদায়।

তিনি গ্রহণের বিষয়ও প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু থেলস্ নিজ দেশবাসীদিগের ন্যায় পৃথিবী চেপ্টা ও জলের উপর ভাসমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

(৪) গ্রহণ।

তিনি গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং কতকগুলি প্রতিজ্ঞার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে আজ কাল ঐ সকল প্রতিজ্ঞা পাওয়া যায়।

(৫) গণিত।

এনাক্সিমেণ্ডার (Anaximander of Mitetus.)

এনাক্সিমেণ্ডার,—৬১০ খৃঃ পূঃ—থেলসের বন্ধু ও তৎপরবর্ত্তী গ্রীক আবিষ্কারক। তিনি কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন।

তিনি ধাতু-নির্ম্মিত একটী ফলার কেন্দ্রস্থান একটী (ঘড়ীর) কাঁটা বা গোঁজ পুতিয়া সূর্য্যের রশ্মি উহার উপর পতিত হইলে, কখন কোন ছায়া পড়িবে, উহা নির্দ্দেশ করিয়া একটী সূর্য্যঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁহার দান।

(১) জ্যোতিষ

(ক) সূর্য্যঘড়ী।

প্রাতঃকালে সূর্য্য অনেক নীচে থাকে। পরে ক্রমশঃ যখন মস্তকের উপরে উঠিতে থাকে, ঘড়ীর কাঁটার ছায়াও বিভিন্ন সময়ে অন্য দিকে অন্য আকার ধারণ করিতে থাকে। এইরূপে এনাক্সিমেণ্ডার গ্রীক-দিগকে দৈনিক সময় নিরূপণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তিনিই জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মধ্যে চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি বা উহার আকার অর্দ্ধচন্দ্র হইতে কিরূপে পূর্ণচন্দ্র হয় ও পূর্ণ-চন্দ্র হইতে কিরূপেই বা পুনরায় উহার আকার ক্রমশঃ কমিতে থাকে, প্রথমে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(খ) চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি

ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। চন্দ্র প্রতিমাসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে একবার প্রদক্ষিণ করে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

(গ) চন্দ্রের মাসিক গতি।

চন্দ্রের আকার কিরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে ও হ্রাস হইতে থাকে, সূর্য্য ও আমাদের মস্তকের মধ্যস্থানে কোন একটী গোলাকার বস্তু ধরিয়া ক্রমশঃ সরাইতে আরম্ভ করিলেই আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

গোলাকার বস্তুটী আমাদের মস্তকের ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে থাকিলে আমরা উহার অন্ধকার দিকটাই দেখিতে পাই। কিন্তু ক্রমশঃ উহাকে আমাদের মস্তক কেন্দ্র করিয়া, বৃত্তাকারে সরাইতে আরম্ভ করিলে, আমরা ক্রমে উহার উজ্জ্বল অংশ দেখিতে থাকিব। এইরূপ যতই উহাকে সরান হইবে, আমরা ততই উহার উজ্জ্বল অংশ দেখিব। ক্রমে যখন উহা আমাদের পায়ের দিকে অর্থাৎ সূর্য্যের ঠিক বিপরীত দিকে আসিবে, আমরা তখন উহাকে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল দেখিব। এইরূপে চন্দ্র যখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যের ঠিক বিপরীত দিকে আইসে, আমরা তখন উহাকে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল দেখি, ইহাকেই আমরা পূর্ণচন্দ্র বলি।

তৎপরে ক্রমে চন্দ্র যখন পুনরায় সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আইসে, তখন আমরা উহার যে উজ্জ্বল অংশ দেখিতে পাইয়াছিলাম, ক্রমে উহার হ্রাস হইয়া পুনরায় সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ইহাকেই আমরা অমাবস্যা বলিয়া থাকি।

এনাক্সিমেণ্ডার চন্দ্রকলার এইরূপ মাসিক হ্রাস বৃদ্ধি সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন।

প্রাচীন গ্রীকগণ সেই সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে অংশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এনাক্সিমেণ্ডার তাহার একটী মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া যান।

(২) ভূগোল, পৃথিবীর মানচিত্র।

পিথ্যাগোরাস্ (Pythagoras)।

পিথ্যাগোরাস্ একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ও আবির্ভাব কাল প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে তিনি ৫৬৬ খৃঃ পূঃ হইতে ৪৭০ খৃঃ পূঃ মধ্যে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

জীবন বৃত্তান্ত।

তিনি মিসর দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ও পরে ইতালির অন্তর্গত টেরেণ্টাম নগরে বসতি নির্ম্মাণ করিয়া পিথ্যাগোরিয়ান্ নামক সম্প্রদায় স্থাপন করেন।

তিনি দর্শনশাস্ত্রে অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। আমরা তাঁহাকেই প্রথম তত্ত্বজ্ঞান-সন্ধিৎসু বলিতে পারি। কিন্তু এখানে আমরা তাঁহার দার্শনিক মতের অবতারণা করিব না; তিনি আমাদিগের বিজ্ঞান ভাণ্ডারে যে সমস্ত রত্ন দান করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহারই বর্ণনা করিব।

পৃথিবী সচল ও শূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে ইহা পরিভ্রমণ করিতেছে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

বিজ্ঞান ভাণ্ডারে তাঁহার দান। (১) জ্যোতিষ (ক) পৃথিবীর গতি।

একই তারা প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি ইহার যে ইংরাজী নামকরণ করিয়াছিলেন (Phospherous) আজ কাল তাহা প্রচলিত নাই। আরও

(খ) প্রভাত ও প্রদোষ তারা।

কতক দিন পরে উহা আধুনিক আখ্যা (Venus) নাম প্রাপ্ত হয়।

২। ভূতত্ত্ব।

তিনি ভূতত্ত্ব বিষয়ের কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সত্য আবিষ্কার করেন। তিনি সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল সমুদায় গভীর মৃত্তিকাগর্ভে ও সাগর হইতে বহু দূরে দেখিতে পাইয়া এককালে এই সমুদায় মৃত্তিকা সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল বলিয়া অনুমান করেন। মৃত্তিকার যত নিম্নস্তরে ঐ সমুদায় কঙ্কাল পাওয়া যায় তত নিম্নস্তরে মনুষ্যের দ্বারা উহা নীত হওয়া অসম্ভব তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন।

পৃথিবীর রূপান্তর।

নদীর বেগ কর্দ্দম ইত্যাদি বহিয়া আনিয়া মোহনায় বদ্বীপ নূতন স্থান নির্ম্মাণ করিতেছে ও সমুদ্রতীর ক্রমে ক্রমে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, তিনি রূপান্তর সম্বন্ধীয় যে কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উল্লেখ করিতেছি।

রূপান্তর বিষয়ক আটটী সত্য।

১ম। স্থল সাগরে পরিবর্ত্তিত হয়।

২য়। সমুদ্র স্থলে পরিণত হয়।

৩য়। উপত্যকাতে জল প্রবাহিত হইয়া উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও জল-প্রবাহ নদীরূপ ধারণ করে। এবং বন্যা পর্ব্বত সমুদায় নষ্ট করিয়া সমুদ্রে মৃত্তিকা আনয়ন করে।

৪র্থ। ব দ্বীপ প্রভৃতি নূতন চড়া পড়িয়া দ্বীপ সমুদায় মহাপ্রদেশের সহিত মিলিত হয়।

৫ম। উপদ্বীপ মহাপ্রদেশের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপ রূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

৬ষ্ঠ। ভূমিকম্পে স্থল সমুদায় প্রোথিত হইয়া জলমগ্ন হয়।

৭ম। অনেক নদীর পদার্থকে প্রস্তরীভূত করিবার ক্ষমতা আছে তাহাতে বস্তু সমুদায় শৈলাকার প্রাপ্ত হয়।

৮ম। আগ্নেয়গিরির উদ্গমন স্থান একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া যাইতে পারে। পিথ্যাগোরাস্ ও তাঁহার ছাত্রগণ এই সমুদায় ভূতত্ত্ব বিশেষ গবেষণা পূর্ব্বক আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তিনি শব্দ বিদ্যা সম্বন্ধেও কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একতারা যন্ত্র (Monocord) তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। একটী তারে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে বিভিন্নরূপ স্বর উৎপাদন করে, ইহা তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন।

৩। পদার্থ বিজ্ঞান।

তদবলম্বনে গ্রীক বাদ্যকরগণ একই তারে নানারূপ সুর উৎপাদন করিতে পারিতেন!

একতারা যন্ত্র।

খৃঃ পূঃ (৪৯৯—৩২২)

এনাক্সগোরাস—হিপোক্রেটস্—ইউডক্সাস্—ডিমোক্রেটাস্—
এরিস্টট্‌ল—থিওফে্‌টাস।

এনাক্সগোরাস।

এনাক্সগোরাস খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ৪৯৯ বৎসর পূর্ব্বে আইওনিয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তিনি এথেন্স নগরে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

জীবন বৃত্তান্ত।

তিনি প্রকৃতিতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে বিশেষ ভালবাসিতেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সত্য আবিষ্কার করিয়া প্রচার করায় তিনিই প্রথম রাজদণ্ডবিধানে ধৃত ও লাঞ্ছিত হন।

বিশেষ ঘটনা।

(১) সত্যপ্রচারের জন্য প্রথম লাঞ্ছিতব্যক্তি।

সূর্য্য দেবতা নহে, এ সত্য প্রচার করায় গ্রীকগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এথেন্স নগরের রাজদ্বারে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন; তাহার বিচারে তিনি বৃদ্ধকালে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত

হন। কিন্তু তাঁহার বন্ধু পেরিক্লিস্ (Pericles) তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করায় তিনি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে অর্থদণ্ড ভোগ করিয়া পরিশেষে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। তদবধি তিনি ল্যেম্পসেকাস্ (Lampsacus) নগরে বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। এনাক্সগোরাস, সমস্ত জীবের এক অধিপতি, ঈশ্বর এক, দুই বা ততোধিক নহে—এই সত্য প্রথম প্রচার করেন। এ জন্য গ্রীকগণ তাঁহাকে একেশ্বরবাদী নাস্তিক বলিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন।

(২)প্রথম একেশ্বরবাদী

তৎকালে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত না হইলেও তিনি চন্দ্রের মধ্যে পর্ব্বত, সমতল, উপত্যকা প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উহা মনুষ্যবাসোপযোগী দ্বিতীয় পৃথিবী বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্য প্রভৃতি জীববাসের প্রধান উপকরণ বায়ু যে, উহাতে নাই, তাহা বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডল এক একটি উজ্জ্বল প্রস্তর বিশেষ, তন্মধ্যে সূর্য্য একটী বৃহৎ উজ্জ্বল প্রস্তরমূর্ত্তি বলিয়া তিনি মনে করিতেন। পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইলে চন্দ্রগ্রহণ এবং চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইলে সূর্য্যগ্রহণ হয়—ইহা তিনি উদ্ভাবন করিয়াছেন। * বৃহস্পতি, শনি, শুক্র, রবি ও মঙ্গল গ্রহাদি যে শূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং নক্ষত্ররাজি যে স্থির ও নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে—তাহা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া যান।

জ্যোতিষ।
(১)চন্দ্রের প্রাকৃতিকঅবস্থা
(২) সূর্য্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল।
(৩) চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ।
(৪) গ্রহগণের পরিভ্রমণ।
(৫) নক্ষত্র নিশ্চল।

* গ্রহাদির আকার অনুযায়ী নাম প্রদান করা হইয়াছে। বৃহস্পতি ইহাদের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ, তৎপর শনি, ইত্যাদি।

হিপোক্রেটস্ ৪২০ খৃঃ পূঃ।

হিপোক্রেটস্ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৪২০ অব্দে কস্ দ্বীপে পুরোহিত ও চিকিৎসক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

রোগের কারণ সম্বন্ধে প্রাথমিক মত ও জীবন বৃত্তান্ত।

এনাক্সগোরাস্ যে সময়ে নভোমণ্ডলে জ্যোতিষ্কাদি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, হিপোক্রেটস্ ঠিক সেই সময়েই শরীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া, কিসে মানবের সুখ-সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কেনই বা শরীরে ব্যাধি উৎপন্ন হয়—এই সকল স্বাস্থ্যতত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই সময় গ্রীকগণ রোগের নানারূপ ব্যাখ্যা করিতেন। ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য ব্যাধি প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন: এজন্য তাঁহারা পীড়িত হইলেই Asculapins)।* দেবের মন্দিরে ভোগ প্রদান করিয়া, ঐ দেবতার পূজক পুরোহিতের নিকট রোগ উপশম করিতে যাইতেন।

বিজ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার দান।

হিপোক্রেটস্ এই পুরোহিত বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই এই পৈতৃক ব্যবসায় (পৌরোহিত্য) পরিত্যাগ করিয়া রোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

(১) রোগের কারণ ও তাহার চিকিৎসা।

শরীরের প্রতি অযত্ন করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়—ইহা গ্রীকগণ উপলব্ধি করিতেন না। হিপোক্রেটস্ শরীরের উপর শীত গ্রীষ্মে কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া পীড়িত, অবস্থায় শরীরের খাদ্যদ্রব্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে চিকিৎসকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

* হিন্দুদিগের ধন্বন্তরি দেবের ন্যায় প্রাচীন গ্রীকগণ ইহাকে ঔষধাদির দেবতা বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করিয়া যান। হিপোক্রেটসকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের স্থাপন-কর্ত্তা বলা হয়।

(২) শরীরতত্ত্ব।

ইউডক্সাস্ ৪০৬ খৃঃ পূঃ

ইউডক্সাস্ ৪০৬ খৃঃ পূর্ব্বে এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত স্নিডস্ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তথায় একটী মানমন্দির বা গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটী উচ্চ স্থান নির্ম্মাণ করিয়া, তৎসমকালীন পর্য্যন্ত যে সমস্ত নক্ষত্রাদি আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহাদের একটী মান-চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান, তিনি বৃহস্পতি-আদি গ্রহ-গণের গতি বিশদরূপে বিবৃত করিয়া পুনর্ব্বার ঐ স্থানে তাহাদের আগমন কাল প্রথম নির্ণয় করেন।

জ্যোতিষ।
(১) প্রথম মানমন্দির
(২) নক্ষত্রাদির মানচিত্র
(৩) গ্রহগণের গতি ও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুনরাগমের কাল।

ডিমোক্রিটাস্ ৪৫৯ খৃঃ পূঃ

ডিমোক্রিটাস্ এবডোরা নগরে ৪৫৯ খৃঃ পূঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এনাক্সগোরাসের সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। আমরা প্রত্যহ আকাশমার্গে তারকামণ্ডলিত নভো-মণ্ডলকে দ্বিখণ্ড করিয়া উত্তর পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপৃত যে উজ্জ্বল মহা-পথ দেখিতে পাই অর্থাৎ যাহাকে "ছায়াপথ" বলিয়া থাকি, তাহা কোটী কোটী নক্ষত্ররাজি ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া, তিনিই প্রথম সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

'ছায়াপথ'

এরিস্‌টট্‌ল্ ৩৮৪ খৃঃ পূঃ।

এরিস্‌টট্‌ল্ থ্রেইসের অন্তর্গত ষ্টেগিরা নগরে খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩৮৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রীস-দেশের একজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও

জীবন বৃত্তান্ত।

প্রকৃতিতত্ত্বানুসন্ধানকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এথেন্স নগরে দার্শনিক প্লেটোর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তৎপরে মহাবীর আলেকজেণ্ডারের শিক্ষকপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞান ভাণ্ডারে তাঁহার দান।

(১) জ্যোতিষ।

এরিস্‌টটলের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীকগণ জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে যে সমস্ত আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

(ক) লিপি সংগ্রহ

(খ) মঙ্গলপ্রভৃতগ্রহাদির চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ

চন্দ্র ও মঙ্গল শূন্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্র যখন সূর্য্য ও মঙ্গলের ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থানে আইসে বা মঙ্গল যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী হয় তখনই মঙ্গলের সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ হয়। ইহা তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন।

(২) ভুগোল—পৃথিবী গোলাকার।

পৃথিবী গোলাকার বলিয়া তিনিই প্রথম স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া প্রচার করেন।

কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য্যসমুদায়ের মধ্যে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণাতেই তিনি অধিক যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনি প্রাণী সমুদায়ের

প্রাণিতত্ত্ববিজ্ঞান।

নমুনা (specismen) সংগ্রহ করিয়া, এথেন্স নগরে প্রেরণ করিবার জন্য গ্রীসের অধিপতি মহাবীর আলেকজেণ্ডারকে অনুরোধ করিয়া এসিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বহু শত লোক নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। তদনুসারে প্রাণিসমূহ

বিভাগ।

এথেন্স নগরে নীত হইলে এরিস্‌টট্‌ল তাহাদিগের শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাদি ও তৎসমুদায়ের পরিচালনের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

এরিস্‌টট্‌ল প্রাণী সকলকে যেরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যান। আজ কালও ঐরূপ শ্রেণী বিভাগ ব্যবহৃত হইতেছে সুতরাং আমরা তাঁহাকেই "প্রাণিবিজ্ঞানের স্থাপনকর্ত্তা" বলিতে পারি।

এক শ্রেণীর প্রাণী অন্য শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা অতি অল্পমাত্র বিভিন্ন সুতরাং অতি বৃহৎ প্রাণী হইতে নিম্নতম উদ্ভিদের মধ্যে কি করিয়া সামঞ্জস্য দেখান যাইতে পারে, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করিয়া যান। কোথায় প্রাণিজগতের শেষ এবং কোথায়ই বা উদ্ভিদ্-জগতের প্রারম্ভ, তাহা প্রকৃত নির্ণয় করা যায় না। কারণ এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহাদিগকে আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ই বলিতে পারি, প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগতের মধ্যে কোথায় যে, বিশেষ বিভিন্নতা আছে, তাহা আমরা আজ পর্য্যন্তও লক্ষ্য করিতে পারি নাই, প্রাণিগণের প্রাণ অপেক্ষা উদ্ভিদের প্রাণ অনেক নিকৃষ্ট। কেন না কোন একটী উদ্ভিদকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেও উহার প্রাণহানির বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকে না সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্ভিদের জীবযন্ত্র সমুদায় অতি সরল, একে অপরের উপর অধিক নির্ভর করে না, কিন্তু একটী উচ্চশ্রেণীয় প্রাণী অত্যন্ত জটিল জীবযন্ত্রে নির্ম্মিত। যেহেতু, ঐ জীবের কোন একটী প্রধান যন্ত্র কোনরূপ আঘাত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সেই প্রাণী অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবং শরীরের কোন একটী অংশ কোনরূপে অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবামাত্রই উহা নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ও এতদ্ভিন্ন আরও সুন্দর হৃদয়গ্রাহী তত্ত্ব সমুদায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া এরিস্টট্‌ল্ তাঁহার প্রাকৃতিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

(১) উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-জগতের সামঞ্জস্য।

(২) বিভিন্নতা কোথায়?

(গ) জীবযন্ত্র।

(১) উদ্ভিদ্।

(২) প্রাণী।

দার্শনিক গবেষণার ফলে তিনি সমুদায় অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান, এই প্রাকৃতিক ইতিহাস তাহার অন্যতম।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

মাহুয়ান লিখিত বঙ্গরাজ্যের বিবরণ।

ফা হিয়েন ও অন্‌-য়ুয়ন-চয়ন প্রভৃতি চৈন পরিব্রাজকগণের বিবরণ হইতে আমরা ভারতীয় ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিতে যাইয়া, চীনের সহিত ভারতের অতীত সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইবার জন্য যে একটা ঐকান্তিকী অনুসন্ধিৎসা অনুভব করি, ইহা গোপন করিবার জন্য কোন প্রয়োজন নাই। কি করিয়া কবে, কোন সূত্রে এই দুই ভূখণ্ড পরস্পরের নিকট পরিচিত হইয়াছিল; কোন উপায়ে চীনবাসী অপার অম্বুরাশি মথিত করিয়া ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং ভারতবাসী তাঁহাদিগকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বহু-প্রশ্নে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরা অত্রকার প্রবন্ধে মাহুয়ানের বাংলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে এই জাতীয় দুই একটী প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

অনেকের ধারণা চীনবাসিগণ কখন নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে নাই। তাহারা অর্ণবপোতের আদৌ ব্যবহার জানিত না। পূর্ব্বকাল হইতেই আরবগণ নৌ-বিদ্যায় সুদক্ষ, একথা সত্যবটে, কিন্তু ভারতবাসী ও চীনবাসীও যে, নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাহারও যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

প্রথমতঃ ভারতের কথাই বলি। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী যে, স্বরচিত জাহাজে আরোহণ করিয়া সুদূর চীনরাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা প্রমাণিত হইয়াগিয়াছে (J. R. A. S.)। তারপর বহুবৎসরাবধি ভারতীয় অর্ণবপোত সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিয়া সে সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছিল। উদাহরণের অভাব নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে উপনীত হন। ৪১৩ খৃষ্টাব্দে

লঙ্কা দ্বীপ হইতে ভারতীয় জাহাজে স্বদেশে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহাতেই অনুমিত হয় যে, ভারতবাসী সে সময়েই বহুদূরদেশে নৌ-চালনায় নিশ্চেষ্ট ছিল না।

চীনেও অতি পূর্ব্বে জাহাজ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয় যে, প্রচারিত হইয়াছিল ইহারও নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। চীনভাষায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত-গণের ধারণা যে, ৬১৪—৯০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত চীনের নাবিকগণ ভারতের বহুস্থানের সহিত পরিচিত ছিল। তাঁহারা নানা স্থানের বিবরণ ও সমুদ্র-ঘটিত বহু উপদেশ ঐ সময়ের চীনদেশীয় গ্রন্থ সমূহে পাঠ করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। Dr. Spence কর্ত্তৃক অনুবাদি "Historical Encyclopidia" গ্রন্থে এইরূপ বহু বিষয় পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, এককালে কান্টন ও বশোরার মধ্যস্থিত ভূভাগ সমূহে চীনগণ অবাধে যাতায়াত করিত। সমুদ্রবক্ষে ভ্রাম্যমাণ নাবিকগণকে এলোরার জলমগ্ন শৈলশিখর হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান "Light house" র ন্যায় একপ্রকার আগ্নেয় সঙ্কেতের উল্লেখ চীনগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সমুদ্রবক্ষে কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত করিয়া, রাত্রিকালে তদুপরি অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত। দূর হইতে এই অগ্নি লক্ষ্য করিয়া, নাবিকগণ পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতেন। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, চীনবাসী নৌ-বিদ্যায় একান্ত অজ্ঞ ছিল না।

চীনের কোন বন্দর হইতে এই সমুদায় অর্ণবযান সুদূর ভূভাগ সমূহে যাত্রা করিত, ইহা অবগত হইবার জন্য স্বতঃই ইচ্ছা হয়। খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে দক্ষিণরাজ্যে কান্টন প্রধান বন্দর রূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। অনেক বিদেশীয় জাহাজ প্রাতিনিয়তই কান্টন উপকূলে অবস্থান করিত। চীনের জাহাজও বিদেশে যাত্রা করিবার জন্য দ্রব্যসম্ভার মস্তকে ধরিয়া কান্টন বন্দর হইতে চীনের তটভূমি পরিত্যাগ করিত। এতদ্ব্যতীত চিলচু আর একটি বন্দর। সুদূর ফু-কি-ন্ রাজ্য হইতে

কাণ্টন বন্দরে আসিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় এই বন্দরটী খোলা হয়। ১০৮৬ খৃঃ এই বন্দর হইতে কতিপয় সওদাগরী জাহাজ চীনরাজ্য ত্যাগ করে। কিন্তু ঐ সময়েই কাণ্টন বন্দরের একজন পরিদর্শক "কস্‌টম্‌" (Costom) আদায় করিবার জন্য নূতন বন্দরে অবস্থান করিত, এবং কাণ্টনই প্রধান বন্দর বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার কিছুদিন পরেই বর্ত্তমান "আময়ের" নিকটে আর একটী বন্দরের সৃষ্টি হয়। এই সময় বহির্বাণিজ্য সাহায্যে ধনলাভ করিবার জন্য চীনবাসীদিগের মধ্যে একটা উদ্দাম চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। চীনবাসিগণ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিল। ধনীর ধন ও নির্ধনের পরিশ্রমে সমুদায় চীনরাজ্য যেন কর্ম্মমুখরিত হইয়া উঠিল।

এই নূতন বন্দরটীর নাম "কে-ক-ন"। ১০৮৬ খৃঃ হইতে ১৫৬৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহার খুব নাম ডাক ছিল। এক্ষণে ইহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত। ইহার ব্যবসা আময়ের অন্তর্গত। ১৫৬১ খৃঃ জাপানীদিগের আক্রমণে এই বন্দর একপ্রকার নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পাঁচ বৎসর পরে ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায়।

এইবার আমরা আমাদিগের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিব।—

খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, চৈন পরিব্রাজক চীন সম্রাট কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত চীনদেশীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটী অবান্তর কথার প্রয়োজন, তাহা এই :—

সম্রাট ই-রাংটো চীনের পূর্ব্বতন সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনি রাজদণ্ড ধারণ করেণ। সিংহাসন পাইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সন্দিগ্ধ চিত্তের ব্যাকুলতা নিবৃত্ত হইল না। পাপ করিয়া কে কবে সুস্থির হইতে পারিয়াছে! তাঁহার কেবলই সন্দেহ হইতে লাগিল যে,

ই-য়াং-চি নিকটবর্ত্তী কোন সাম্রাজ্যে আশ্রয় লইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি দিবারাত্রি দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর স্থির হইল যে, ছদ্মবেশী সম্রাটকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। কি উপায়ে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই বিষয় লইয়া বিস্তর বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, বিভিন্নদেশে চীনদূত সৈন্য-সমভিব্যাহারে প্রেরিত হউক। তাহাতে ইয়াং-চুর অনুসন্ধানও হইবে, অধিকন্তু সীমান্ত প্রদেশ-সমূহে ও বিভিন্নরাজ্যে চীনের শক্তি ও সৈন্য বলের একটা সুস্পষ্ট ধারণা প্রচার করা হইবে।

এই উদ্দেশ্যে ১৪০৫ খৃঃ জুনমাসে সম্রাট কর্ত্তৃক নিয়োজিত চিন্‌হো, ও-য়াং-চি ন্‌-প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্বর্ণ, ও রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্য সম্ভার ও ৩০,০০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া চীনের ধূসর তটভূমি পরিত্যাগ করতঃ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে। তাহাদিগের সহিত ৪৫০ ফিট্ লম্বা ও ১৮০ ফিট্ প্রশস্ত ৩২ খানি অর্ণবপোত সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিয়া অগ্রসর হয়। মাংফাট্ নদীর মোহানা য়ুসুন নিকটস্থ লিউকি কিং হইতে যাত্রা করিয়া, এই বিপুলবাহিনী কোচিন চায়না অতিক্রম করতঃ ভারতে উপনীত হয়।

মাহুয়ান এই সমুদয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া, লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বাইশটী রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বঙ্গদেশের বিবরণ অন্যতম।

নিম্নে মাহুয়ান লিখিত বাংলার বিবরণের অনুবাদ দেওয়া গেল।

"সুমেনট্রোলা হইতে জাহাজে চড়িয়া মুমান (আরাচেন নিকটবর্ত্তী দ্বীপ) ও ইসুলান দ্বীপ * গুলিকে অতিক্রম করতঃ অপার অম্বুরাশির

* ইসুলান অর্থাৎ নিকোবর। চৈন পরিব্রাজক নিকোবরকে যে কেন ইসুলান

উপর অর্ণবপোত নাচিতে নাচিতে উত্তর পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং বায়ু অনুকূলে প্রবাহিত হইলে, জাহাজ ২১ দিনে চেটি-গনে (চট্টগ্রাম) উপনীত হয়। এই স্থানে আসিয়া জাহাজ নঙ্গর করে। যাত্রিগণ সমুদ্রপথ ছাড়িয়া এইবার স্থলপথে অগ্রসর হয়। নদীতে ছোট ছোট নৌকা থাকে তাহার সাহায্যে যাত্রিগণ জাহাজ ছাড়িয়া ৫০০ লি অতিক্রম করতঃ সোনারগঙে উপনীত হয় *। এই স্থানে অবতরণ করিয়া ৩৫ ষ্টেজ্ বা ১০০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম যাত্রা করিলে, বাংলার রাজধানীতে উপনীত হওয়া যায়। এই রাজধানী চতুর্দ্দিকে প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত এবং রাজা পাত্রমিত্র সহ বাস করেন। ইহা বিস্তৃত

নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। তবে ইসুলান যে, নিকোবর সে বিষয়ে কোন সংশয় মাত্র থাকিতে পারে না। মাহুয়ানের সঙ্কলিত সিংহলের বিবরণ পাঠে ইসুলানের উল্লেখ দেখা যায় এবং সেই বিবরণ পাঠে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, এই ইসুলান দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে মারলিং দ্বীপই সর্ব্ব-প্রধান। মারলিং যে মামরি লংয়েরই অপভ্রংশ ইহা সহজে অনুমিত হয় Milburne এর oriental commerce Vol II হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই মামরিলিংই সর্ব্ববৃহৎ। সুতরাং চীন-পরিব্রাজক নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এইরূপে অনুমান করি। আরও এক কারণে এই অনুমানই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। চৈন নাবিকগণ এই দ্বীপপুঞ্জকে "লোহিন্‌কো" অথবা উলঙ্গ জাতির রাজ্য বলিয়া বহুবার অভিহিত করিয়াছেন, যাঁহারা পুরাতন নাবিকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই আখ্যা নিকোবরবাসিগণের সম্যক্ উপযুক্ত। নিকোবরবাসিগণ অদ্যাপি প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বাস করিতেছে।

* সোনার গঙ্—অনেকে অনুমান করেন যে, সোনার গঙ্ বাঙ্লার পুরাতন রাজধানী সুবর্ণগ্রাম। মধ্যযুগে সুবর্ণগ্রাম বাঙ্লার রাজধানী ছিল। ইব্‌ন বটুটার বর্ণনায় ইহার উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু মাহুয়ানের সোনারগঙ্, বাংলার রাজধানী সুবর্ণগ্রাম নহে। এই সন্দেহ তাঁহার পরবর্ত্তী মন্তব্য হইতে মনে দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। জহন বীমস্ বলেন, ইহা সুবর্ণগ্রাম নহে, ইহা সুবর্ণবণিক গ্রাম। ইহা মেঘনা নদীর উপকূলে ঢাকা হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত, কিন্তু এক কালে ইহা সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। Dr. Wise লিখিত প্রবন্ধ হইতে ইহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়। (Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. XLIII.)

—লেখক

এবং উৎপন্ন শস্যে স্বচ্ছন্দে প্রজাগণের কালাতিপাত হয়। ইহা বহু জনাকীর্ণ এবং নগরের অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান। তাহারা সরল ও স্পষ্টবাদী। নগরের অধিবাসিগণ বাণিজ্য সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ নয়। তাহারা সকলে স্বনির্ম্মিত জাহাজে চড়িয়া, বাণিজ্য দ্রব্য দেশান্তরে প্রেরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহারা কৃষ্ণকায়। কদাচিৎ দুই একজন গৌরবর্ণ পুরুষ তাহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাহারা অনাবৃত মস্তকে ও নগরের মধ্যে যাতায়াত করে, কিন্তু প্রায়ই তাহারা মস্তকে সাদা পাগড়ী পরিধান করে। পরিধান তাহাদিগের একপ্রকার ঢলঢলে পায়জামা, তাহাই চারিদিকে ফেরতা দিয়া পরে ও কোমরের নীচেতে রুমাল দিয়া আঁটিয়া রাখে। তাহাদিগের পায়ে চামড়ার জুতা। রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ মুসলমানদিগের ন্যায় বসনে ও ভূষণে আপনাদিগকে সজ্জিত করে। বাংলাই জাতীয় ভাষা; নানাস্থানে পারসিকও ব্যবহার হয়।" পাঠকের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানিতে উৎসুক হইয়াছেন যে, ইহা বাংলা-দেশের কোন স্থানের বিবরণ। আমরা সংক্ষেপে ইহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

চীন পরিব্রাজক বলেন যে, সোনারগঙ্ হইতে একশত পাঁচ মাইল দূরে বাংলার রাজধানী। রাজধানীর নাম দেন নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই যে সুবর্ণগঙ্ ঢাকার নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সুবর্ণবণিক্-গ্রাম ইহা ঠিক করিয়াছি, সুতরাং এই স্থান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে ১০৫ মাইল অগ্রসর হইলে, আমরা আমাদিগের সম্মুখস্থ মানচিত্রে দেখিতে পাইতেছি যে, আমরা বাংলার সপ্তগ্রামে আসিয়া উপনীত হই। এই সময় সপ্তগ্রাম একটী সরকার। বোধহয়, মাহুয়ান সপ্তগ্রামকেই উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তগ্রাম যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে কখন বাংলার রাজধানী বলিয়া গণ্য হয় নাই; তথাপি আইনী-আকবরীতে দেখিতে পাই যে, ইহা

একটী প্রধান সরকার এবং ধনসম্পদে ইহা রাজধানীর সমতুল্য। ইহা বহুকাল ধরিয়া বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দররূপে দেশ বিদেশে পূজিত হইয়াছে। এই সপ্তগ্রামের বৈভব গৌরব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে দুই একটী কথা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে, অপ্রীতিকর হইবে না বলিয়া বিশ্বাস।

১। লং সাহেব বলেন, প্লিনির সময় হইতে পর্ত্তুগীজগণের আগমন কাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম রাজকীয় বন্দর ছিল।

২। উইলফোর্ড বলেন, সপ্তগ্রাম তীর্থরূপে গণ্য ছিল। বহু রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। ইহার পরিমাণ অতি বিস্তৃত ছিল।

৩। ঐতিহাসিক ডিবারো বলেন যে, সপ্তগ্রাম বন্দর খুব বৃহৎ ও নগর সুন্দর।

৪। পার্থাস ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন।

এক সময় বিভিন্নদেশ হইতে আগত পণ্যবাহী বিশাল বাণিজ্য-তরী-সমূহ নদীবক্ষে শ্রেণীবদ্ধ পল্লীর ন্যায় বিরাজ করিত। সুতরাং অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রাচীন সপ্তগ্রাম অতীব সমৃদ্ধশালী ছিল। তবে, চীন-পরিব্রাজক বলিয়াছেন যে, অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান, ইহা ভ্রমাত্মক। রাজকর্ম্মচারী ও প্রধান ব্যক্তিগণ যে মুসলমান ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই (I. R. A. S. 1895.) দ্রষ্টব্য।

আগামীবারে আমরা মাহুয়ান কর্ত্তৃক সঙ্কলিত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কোন অনিবার্য্য কারণে প্রবন্ধ অতি ব্যস্ততার সহিত লিখিত বলিয়া, স্থানে স্থানে বহুবিষয় সরল করিবার অবসর পাই নাই। প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

রমণী-মেলা

খসরোজ দিল্লীশ্বর আকবর সাহের প্রতিষ্ঠিত একটী আনন্দ উৎসব। ইহা প্রতি বৎসর নৌরোজার শেষ দিন সম্পাদিত হইত। মুসলমানেরা নববর্ষ অর্থাৎ সূর্য্য যে সময় মেষ রাশিতে পদার্পণ করেন সেই সময়কে বৎসরের প্রথম দিন ধরিয়া তাঁহারা একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। য়ুরোপীয়দের New year's dayর ন্যায় সে উৎসবও মহাসমারোহ ও আমোদ আহ্লাদের সহিত সম্পাদিত হইত। সেই উৎসব স্রোত ক্রমাগত নয়দিবস চলিত।

নৌরোজার শেষ দিবসে আকবরসাহ তাঁহার অন্তঃপুরাভ্যন্তরে একটী রমণীর হাট বসাইতেন। ইহাই খোসরোজ বা রমণী-মেলা। আকবর সাহই এই অভিনব মেলার প্রবর্ত্তক। প্রকৃত প্রস্তাবে পবিত্র নৌরোজা উৎসবের সহিত ইহার কোন সংস্রব ছিল না।

মোগল-কুলতিলক মহামতি আকবর, যিনি খ্যাতিপ্রতিপত্তি, অমিত বিক্রম ও চরিত্রবলে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মহা-মহিমাময়, দেবোপম, উদারহৃদয় আকবরসাহ কেন যে, এই কলঙ্কময় পাপ "মেলার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া বলিব?

মহামতি আকবর কোন কূট অভিসন্ধির মূলেই ঐ খোসরোজের সৃষ্টি করেন, কি কোন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই ইহার অবতারণা করেন তাহা কে বলিতে পারে?

এতৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যেও বিষম মতভেদ।

আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুলফজলের উক্তি সমধিক প্রামাণ্য হইলেও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ আবুলফজলের ঘাড়ে "স্বজাতি

বাৎসল্যে''র দোষ চাপাইয়া, তাহার মত অগ্রাহ্য করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

আবুলফজলের মতে মহামনা আকবর সাহের নৌরোজা উপলক্ষে "মহিলা-মেলা" প্রতিষ্ঠা—মহিলা সমাজের সূক্ষ্মশিল্পের উন্নতি-বিধান ও তদুপলক্ষে বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের মানসিক ভাব ও রাজ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়াই, মূল কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

আকবরের কলঙ্কমোচন করিতে, তিনি যত সমর্থনই করিয়া থাকুন না কেন, এই খোসরোজ ব্যাপারের ইতিহাস পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে তাহার উক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত ও ভিত্তিমূলক বলিয়া মনে করিবার আমরা অণুমাত্রও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

খোসরোজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে প্রতি নববর্ষের প্রারম্ভের পূর্ব্বেই চতুর্দ্দিকে খোসরোজের পরওয়ানা জারি হইত। মোগল-সিংহাসনের অধীন যত মহারাণা, রাণা, সামন্ত, আমির, উমরাও প্রত্যেকের নিকট খোসরোজের সাদর নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইত। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা তাঁহাদিগের বিবাহিত অবিবাহিত স্ত্রীকন্যা-ভগিনী বধূদিগকে সম্রাট প্রাসাদে প্রেরণ করিতেন।

আগ্রায় মোগল অন্তঃপুরের একটী নির্জ্জন সুসজ্জিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এই রূপের হাট—আকবরের সুখের মেলা, বসিয়া যাইত। এই স্থানে আকবরের বিমল চরিত্র দুরপনেয় কলঙ্ককালিমায় কলুষিত হইয়াছিল; আকবর যথেষ্ট শিক্ষাও পাইয়াছিলেন।

সম্রাটান্তঃপুরের বেগমগণ ও অন্যান্য রমণীগণ এই হাটে খরিদ বিক্রি করিতেন। পুরুষ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না, কেবল সম্রাট ছদ্মবেশে যাইয়া তাহাতে ভ্রমণ করিতেন, কোন কুমারীকে দেখিয়া অনিমিষ লোচনে চাহিয়া থাকিতেন, কখন বা কোন যুবতীর সহিত একটু রসিকতা করিয়া চিত্তে বিমল (!) আনন্দ উপভোগ করিতেন।

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া যিনি সর্ব্বত্র পূজিত, যাঁহার উজ্জ্বল যশঃপ্রভা মধ্যাহ্ন-মরীচিবৎ আসিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র আহিমাদ্রি-কুমারিকা পরিব্যাপ্ত, আবাল-বৃদ্ধবনিতার নিকট যিনি একমাত্র আদর্শ সম্রাট বলিয়া পূজিত, সেই ভুবন-বিখ্যাত মোগল-কুলতিলক মহামতি আকবরের কি এই কার্য্য! তাঁহার চিত্তে বিমল আনন্দ অনুভূতির কি অন্য উপায় ছিল না?

দিল্লীশ্বর আকবর—আমরা আর তাঁহাকে মহামতি বলিতে ইচ্ছা করি না, যে ইষ্ট (?) সংসাধনার্থেই এই রূপের হাটরূপ জ্বলন্ত মহাপাতকের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহার সে অভিসন্ধি সংসাধিত হয় নাই। পরন্তু সেই মহানরক হইতেই, তিনি তাঁহার অমূল্য চরিত্ররত্ন, মহান্ তেজোগর্ব্বভাব, হৃদয়ের অসীম নির্ভরতা, জগৎ জোড়া নাম একাধারে সকলি হারাইয়াছিলেন।

আকবর যে, কেবল ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়াই এবং যুবতী ও কুমারীগণের রূপলাবণ্য পরিদর্শন করিয়া, তাহাদের সহিত দুইটা হাস্য-পরিহাসচ্ছলে রসিকতা করিয়াই যে, স্বীয় অনুষ্ঠিত কাজের সফলতায় পঁহুছিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিতেন তাহা নহে। এই "মোহিনী-মেলা" তাঁহাকে পদে পদে স্খলিত করিয়া, স্বর্গের আসন হইতে নরকে লইয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহারও দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ঐতিহাসিক আবুলফজল যেমন আকবরের সমসাময়িক, বিকানীর-রাজকুমার কবি পৃথ্বীরাজও সেই একই সময়েরই। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া, শিশোদীয়-কুলতিলক মহারাণা প্রতাপসিংহ যখন পদস্খলিত হইতে বসিয়াছিলেন, তখন বিকানীর-রাজকুমার পৃথ্বীরাজ মর্ম্মাহত হইয়া, তাঁহাকে যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আকবরের নৌরোজার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"* * * * প্রকৃত রাজপুত হইয়া কে নৌরোজার জন্য আপনার কুলসম্ভ্রম ত্যাগ করিতে পারে? তথাপি কত

লোকেই তাহা করিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া চিতোরও কি এই হাটে আসিবে। * * *" (১)

ঘটনাস্রোতে পৃথ্বীরাজ আকবরের এই পাপ নৌরোজার উদ্দেশ্য অবগত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায়সিংহের পত্নী খোসরোজে পণ্য বিকাইতে যাইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট রাজপুত রমণীর অমূল্য পণ্য সতীত্ব-রত্ন বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই খোসরোজের এই পণ্যশালায় যোধপুর-রাজকুমারীর অলক্তক-রঞ্জিত চরণতলে সাহানসা বাদশাহ আকবরশাহ তাঁহার অকলঙ্ক রাজমুকুট বিকাইয়াছিলেন। বিকানির রাজের নিকট তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না।

পৃথ্বীরাজ এপাপ কার্য্যের পক্ষপাতী না হইলেও পৃথ্বীরাজপত্নীকেও একসময় খোসরোজে মেলায় উপস্থিত হইতে হইয়াছিল—সে সময় পৃথ্বীরাজ সপরিবারে মোগলদুর্গে বন্দী।

যে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর আকবরকে দেবোপম চরিত্র-রত্নে ভূষিত করিয়াছিলেন, আবার যাঁহার ঘূর্ণিত চক্রে আকবর নরকের কীট হইতেও অধম হইতে চলিয়াছিল। সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণায় আজ আকবর সেই খোসরোজে যে শিক্ষা লাভ করিলেন, সে শিক্ষা তাঁহার জীবনের এক মহা-পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সেই শেষ খোসরোজের শেষ মুহূর্ত্তে রাজপুতরমণী-কুলমণি পৃথ্বীরাজ-পত্নীর তীক্ষ্ণ ছুরিকার মধ্যে যে ভয় ও বিভীষিকার মূর্ত্তি বিরাজিত দেখিয়াছিলেন, একাধারে তাহাতে যে সতীত্বের উজ্জ্বল কিরণ নরকের ভীষণ ছায়া পরিদর্শন করিয়াছিলেন, ইহাতেই আকবরকে খোসরোজের পাপ অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছিল।* শুনা যায় ইহার পর আর আকবর নৌরোজা উপলক্ষে সে খোসরোজের নামও লইতেন না।

(১) রাজস্থান ; মিবার দশম অধ্যায়।

* আকবর সাহ একবার খোসরোজের মেলায় পৃথ্বীরাজ-পত্নীর রূপ-লাবণ্য পরিদর্শন

এই খোসরোজ প্রবর্ত্তিত করিয়া আকবর যে কেবল নিজেই কলুষিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার ভবিষ্যত বংশধরগণেরও অধঃপতনের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর দিল্লীতে তাহার উদ্ধার সাধন ও সংস্কার করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময়ই সাহজাহান এই "খোসরোজ"-রূপ রূপসমুদ্রের মন্থন হইতে মোহিনী স্বরূপ ভুবন-বিখ্যাত রূপললামভূতা তাজবিবিকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। †

তাহার পর সাহজাহানও পিতৃপিতামহ-প্রচলিত কার্য্যটা ত্যাগ করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। সুজার সময়ে বাঙ্গলা পর্য্যন্তও সেটা সংক্রামিত হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের সময়ে সে স্রোত আরও খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। সে সকল পৈশাচিক কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত

করিয়া তাহাকে হস্তগত করিয়া দুর্দ্দমনীয় পাপলালসা চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তদনুসারে মেলাভঙ্গের পর তাঁহাকে কোন গুপ্তগৃহে আবদ্ধ করেন ও সম্রাট তথায় উপস্থিত হইলে পৃথ্বীরাজপত্নী শাণিত তরবারি সাহায্যে সতীত্বের যে ভীষণ চিত্র সাহান্ সা আকবরের সম্মুখে প্রদর্শন করেন, তাহাতে সম্রাট চিরজীবনের জন্য খোসরোজে বিমল আরাম উপভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

† তাজ ওরফে অর্জ্জমন্দবানু জামাল খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মোগল ওমরাওয়ের বিবাহিতা পত্নী। খোসরোজ উপলক্ষে একবার মোগল অন্তঃপুরের পণ্যবীথিকায় যাইয়া, কুমার খরমের (সাহজাহান) লোলুপনেত্রে পতিত হন। খরম মেলাভঙ্গের পর তাঁহাকে তাঁহার প্রকোষ্ঠে আমন্ত্রণ করেন। অর্জ্জমন্দ যুবরাজের প্রার্থনা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। সেখানে নৃত্যগীত পান আহারাদি আমোদ আহ্লাদের পর অর্জ্জমন্দ যখন স্বামিগৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন জামাল খাঁ তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এই ব্যাপারে অর্জ্জমন্দের কোন দোষ ছিল কিনা, সে বিচার যখন জামাল খাঁই করিলেন না, তখন আমরাও করিতে চাই না। অর্জ্জমন্দ জামাল খাঁ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন শুনিয়া, সাহজাহান তাহাকে আশ্রয় দিলেন ও জামাল খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। অর্জ্জমন্দের অনুরোধে জামালের প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আর অর্জ্জমন্দকে গ্রহণ না করিয়া দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্যক্ত অর্জ্জমন্দকে কুমার খরম যথাবিধানে গ্রহণ করিলেন। সেই সৌভাগ্যশালিনী অর্জ্জমন্দই ভুবন-বিখ্যাত মমতাজমহল নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

করিতে আপাততঃ ইচ্ছা করি না। আকবরসাহ নাই, কিন্তু তাঁহার খোসরোজের সেই নির্জ্জন প্রশস্ত চত্বর আজও দর্শকের হৃদয়ে তাঁহার পাপ-প্রবৃত্তির নিদর্শন ঘোষণা করিতেছে। কালে ইহাও ধূলিসাৎ হইবে, কিন্তু ইতিহাসের বক্ষ হইতে আকবরের এ অপযশ,—এ কলঙ্ক-কীর্ত্তি কখনও অপসারিত হইবে না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্নেহালিঙ্গন।

কি চিত্র চমকপ্রদ!—মরি, মরি, অহো!—
কে যায় ছুটিয়া ওই দ্রুত তুরঙ্গমে!
আরোহি বিমানমার্গে পবন-বাহনে
ধাইছে ধবলকান্তি ঘনবর যেন!
অথবা অনন্তাকাশে জ্যোতিপিণ্ড কোন
কক্ষ্যচ্যুত, লক্ষ্যহীন, মহাশূন্য পথে
হ'য়েছে ধাবিত দ্রুত। কি দৃশ্যমোহন!
অশ্বখুরক্ষেপে ঘন পাষাণ শরীরে
উঠিছে অনলকণা; নবোদ্গত আহা,
হৃদয়ে কুসুমকলি—কোমলা লতিকা,
তরুশিশু সুকুমার; অঙ্কুর নবীন,
হ'তেছে দলিত হত; স্থানচ্যুত কত
ছুটিছে উপলখণ্ড। কন্দরে কন্দরে
উঠিতেছে প্রতিধ্বনি প্রতি পাদক্ষেপে।
আকর্ষিত রশ্মিযোগে, গ্রীবাভঙ্গী করি,

কভু বা সরলগতি, বক্রগতি কভু,
আলোড়িয়া বায়ুসিন্ধু, সন্তরিয়া যেন,
চলিয়াছে অশ্ববর অবলীলাক্রমে।
নিষ্কম্প, নীরব, স্থির, গম্ভীর-বদন,
করিয়া আসন বীর পৃষ্ঠদেশে তার
উন্নত, বিস্তৃত, দৃঢ়, শৃঙ্গবর যেন
গিরিশিরে, দুই করে রজ্জু আকর্ষিয়া
করিছে চালিত তারে যথেচ্ছ-প্রদেশে ;
বদ্ধ কটী কন্ধে অসি, ফলক পৃষ্ঠেতে
হইতেছে আন্দোলিত, আহত বর্ম্মেতে ;
উঠিছে ঝন্ ঝন্ শব্দ, শুদ্ধ দিগ্‌দেশে।
ভাবিয়া শমনাগত সহসা, সভয়ে
পশুপক্ষি জীবজন্তু বনচরগণ
পশিছে গভীর বনে, শূন্যমার্গে কেহ
উড়িতেছে সবিলাপে—চিৎকারি সঘনে।
স্বেদস্নাত বীরবর ; স্নাত তুরঙ্গম
সফেন-বদন ; ঘন নিশ্বাস নাসায়
বহিতেছে উভয়ের অবসন্ন-প্রায়।

কে ওই দেবেন্দ্রকান্ত বীরেন্দ্রকেশরী ?
চলেছে কোথায় এবে কাহার উদ্দেশে
হেন বেশে ? পলাতক শত্রু দুরাসদ,—
অনুসরি তারে কি গো এ দুর্গমদেশে
চলিয়াছে বীরবর, ছিন্ন শির তার
করিতে পাতিত ভূমে অব্যর্থসন্ধানে
ওই কাল কৃপাণের, শাস্তি' সমুচিত ?

হা অদৃষ্ট!—নহে তাহা! দৈব-দুর্ব্বিপাকে
বিপরীত আজি তার; শত্রু-অনুসৃত
পতিত সঙ্কটে মহা হায়, শূরবর
চলিয়াছে আত্মপ্রাণ রক্ষিতে এক্ষণে!
ভ্রাতৃঘাতী মাতৃহন্তা পাপাত্মা মানেরে
অক্ষম দানিতে শাস্তি, ক্ষোভিত-হৃদয়,
ব্যর্থমনোরথ হায়, রণক্লান্ত অতি,
রাজপুত-কুল-কেতু বীর-কুল-মণি
নৃমণি-ভূষণ রাণা, রণাঙ্গনে ঘোর
দেখাইয়ে রণক্রীড়া জগতবিস্ময়,
যুঝি বেগে শতগুণ অরিসৈন্য সনে,
পরিহরি রণভূমি, আরোহি চৈতকে—
মেঘবর্ণ অশ্ববর ইতিহাস-খ্যাত—
করিছে প্রস্থান আজি। পার্ব্বত্য প্রদেশে
চলেছে একাকী বীর।* পশ্চাতে তাহার,

* বর্ষাকাল—১৬৩২ সম্বতে (১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসের সপ্ত দিবসে হল্দিঘাটে যে বিশ্ববিখ্যাত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাহাতে মিবারপতি মহারাণা প্রতাপসিংহ অল্পসংখ্যক (২২০০০) রাজপুত সৈন্য লইয়া, সেলিম (আকবর পুত্র) ও মানসিংহ-পরিচালিত শতগুণ অধিক মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হন। এই অন্যায় যুদ্ধে, তিনি অত্যদ্ভুত শত্রু-ভয়ঙ্কর রণক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া, শত শত যবনের মুণ্ডপাত করিয়া, বহুক্ষণ পরে, শত্রু অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত ও রণক্লান্ত হইয়া পড়েন; এবং ঝালাপতি বীরশ্রেষ্ঠ মান্নার হস্তে যুদ্ধভার সমর্পণ করিয়া, তাঁহার বিখ্যাত চৈতক-নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া একাকী রণস্থল পরিত্যাগ করেন। তুচ্ছ আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী, দেশদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী, মহাপাপ মানসিংহই এই প্রলয় কাণ্ডের সংঘটনকর্ত্তা। মোগল-সৈন্যের সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত, এবং অধিকন্তু, তাহারা আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত থাকায়, এই যুদ্ধে তাহারাই জয়লাভ করিয়াছিল। এই মহাসমরে মিবারের সমস্ত রাজবংশই এক প্রকার বীরশূন্য হইয়াছিল। সহস্র সহস্র রাজপুত ভীমবিক্রমে সম্মুখ সমরে স্বর্গগামী হইয়াছিলেন।

হের ওই,- অতি বেগে তুরঙ্গযুগল,
যুগল আরোহী সহ, আশুগতি-গতি
আসিছে ছুটিয়া, তীব্র তীরদ্বয় যেন!
হেরি দূর হতে তাঁরে ত্যজিতে সমর,
যবন যুগল ওই, অলক্ষিতে তাঁর
হইয়াছে অনুগামী, আক্রমি সহসা
সংহারিতে অর্দ্ধপথে ; ঊর্দ্ধ কর-দ্বয়ে
আস্ফালি উলঙ্গ অসি, উন্মত্তের প্রায়,
আসিতেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। মুহূর্ত্তে প্রত্যেক
হইতেছে গাঢ়তর সঙ্কট বীরের ;
আসিছে ঘনায়ে মৃত্যু। না চাহি পশ্চাতে
চলিয়াছে রথিবর। প্রাণপণ করি
লইতে প্রভুরে ত্বরা নিরাপদ স্থানে,
রক্ষিতে জীবন তাঁর অমূল্য জগতে,
চলেছে চৈতক ; ক্ষুদ্র পলক মধ্যেতে,
লঙ্ঘিয়া সহস্র বাধা বিঘ্ন দুর্নিবার,
অতিক্রমি দুরারোহ বন্ধুর প্রদেশ
মৃত্যুপূর্ণ ভয়ঙ্কর, দূর দুরান্তর
লইছে তাঁহারে ত্বরা। বিস্ময়ে অপার,
হেরি অল্প ব্যবধান, দ্বিগুণপ্রমাণ
প্রতিক্ষণে, প্রাণপণে সৈনিক-যুগল
করিছে চালিত অশ্ব দ্বিগুণ বিক্রমে।
ওই সমীপস্থ শত্রু! এই ধরা যায়,--
বসে শিরে যুগপৎ যুগল কৃপাণ।
হয় সিদ্ধকাম দোঁহে!—কি আশ্চর্য্য হায়,

নাহি দেখা যায় আর, চক্ষের পলকে,
অতিদূরে অশ্ববর আরোহীর সহ
বিরাজিছে বিন্দুসম!
নাহি আশা আর;
বিষাদে নিশ্বাস ত্যজি, তথাপি আবার,
ধাইছে যবনদ্বয়; আরক্ত বদনে
উঠিছে ফুটিয়া যেন বিন্দু শোণিতের;
আসিছে বাহির হ'য়ে অক্ষিপিণ্ডচয়
জ্বলিয়া জ্বলিয়া যেন; স্নাত স্বেদজলে।
নাহিক ভ্রূক্ষেপ কিন্তু, কোন দিকে কারো;
লক্ষিয়া একাগ্রমনে দূরগত বীরে,
করিয়া প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সংহারে তাহার,
চলিয়াছে অনিবার যবন-দ্বিতয়
নির্ভয় নিঃশঙ্ক অতি।
সহসা পশ্চাতে,
চমকি শুনিল দোঁহে বীর-সিংহ-নাদ—
"সাবধান দুষ্টগণ!"—অশনি-গর্জ্জন!
না ফিরাতে নেত্র হায়, সচকিতে দোঁহে
হেরিল সম্মুখে, মরি, সাক্ষাৎ শমন,
ভীমমূর্ত্তি অশ্বারোহী রাজপুত এক,
করি নিষ্কোষিত অসি, বজ্রসম বেগে,
হ'য়ে অগ্রগামী, পুনঃ ফিরি চক্রাকারে
আক্রমিল দুইজনে! অতি অল্পক্ষণে,
ক্ষুদ্র সংঘর্ষণ শেষে, রাজপুত বীর
করিয়া দ্বিখণ্ড দোঁহে ফেলিলা ভূতলে!

করি অসি রক্তস্নাত, কোষবদ্ধ দ্রুত,
না করি বিলম্ব ক্ষণ, বিদ্যুত-গতিতে
হইলা ধাবিত পুনঃ লক্ষ্য দূরগত
অশ্বারোহী বীরবরে।

অহো, সর্ব্বনাশ!
এ যে সেই শক্তসিংহ ভ্রাতৃদ্রোহী, পাপী,
মহাশত্রু প্রতাপের!—দিয়া জলাঞ্জলি
ভ্রাতৃপ্রেমে, দলি পদে স্বজাতি-কল্যাণ,
বিসর্জ্জিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম, যে দুর্ম্মতি হায়,
হীন-স্বার্থ-প্রণোদিত, লয়েছে আশ্রয়
মোগল-পতাকা-মূলে—শত্রু-পদ-তলে;
অতি হীন প্রতিহিংসা পোষিয়া হৃদয়ে,
(কুসন্তান জননীর, কলঙ্ক কুলের!)
ভুলিয়া স্বনাম, পূত স্ববংশ-গৌরব,
হয়ে আর্য্যসুত হায়, ক্ষত্রিয়সন্তান,
করিয়াছে আত্মদান দাসত্বে পরের;
তুলেছে অবাধ অসি প্রকাশ্যসমরে
করিতে শোণিত পান সোদর ভ্রাতার!*

* শক্তসিংহ, উদয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। একদিন, শক্ত ও প্রতাপ মৃগয়া করিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, একটি লক্ষ্যভেদ লইয়া উভয় ভ্রাতায় ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। এই বাগ্‌যুদ্ধ ক্রমশঃ চরমে উঠিয়া, প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, উভয় ভ্রাতাই পরস্পরের প্রতি আপনাপন ভীম অস্ত্র উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের অনুচর ও অন্যান্য যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা কেহই ইহাদিগকে এই আত্মবিনাশকর কুৎসিত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। অদূরে গিহ্লোটকুলের কুলপুরোহিত দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন—সর্ব্বনাশ উপস্থিত! দুই মহাবল মহাসিংহ, পরস্পর পরস্পরের প্রাণ-সংহারে কৃত-সঙ্কল্প। তিনি "মহারাজ! ক্ষান্ত হউন—ক্ষান্ত হউন," বলিতে বলিতে

কেন হেরি পুনর্ব্বার এ প্রদেশে তারে?
নিরখি কেনবা হেন ভাবান্তর তার?
করিয়া সংহার ওই স্বপক্ষীয় গণে,
করিছে গমন দ্রুত প্রতাপের প্রতি?
নাশি প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়ে, লভিতে একাকী
কীর্ত্তির কনকমাল্য শক্র-নিধনের
দুর্জ্জয় দুর্ম্মদ, হায়, সেই সনে আর,
সোদর-শোণিতে কর করিয়া রঞ্জিত,
লিখিতে অনল-বর্ণে ইতিহাস-বুকে
'ভ্রাতৃহন্তা' নাম, চলেছে কি কুলধ্বজ?
ধিক্ শক্ত, শক্তসিংহ!—কি বলিব আর?
কুক্ষণে প্রসূতি তব, সিন্ধু রত্নপ্রসূ
উগরিলা কালান্তক কালকূট যথা,
করিলা প্রসব তোমা! পূত ক্ষত্র-কুলে
জনম কুক্ষণে তব! ক্ষত্রিয়-কৃপাণ—
ধর্ম্মের রক্ষক নিত্য অরি অধর্ম্মের—

তাঁহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বিবিধ অনুনয়-বাক্যে তাঁহাদিগকে শান্ত ভাব ধারণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, সকলই ব্যর্থ হইল! ক্রোধান্ধ ভ্রাতৃদ্বয় কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কেহই উদ্যত অস্ত্র প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না। অবশেষে, উপায়ান্তর না দেখিয়া, তাঁহাদের সেই পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মত্যাগী, পুরোত্তম কুলপুরোহিত, স্বহস্তে স্বীয় বক্ষে শাণিত ছুরিকা প্রোথিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এতক্ষণে প্রতাপের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহাদের অবিমৃষ্যকারিতা ও অতিক্রোধপরবশতার জন্য, তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হইল! প্রতাপ অস্ত্র সম্বরণ করিয়া, শক্তকে মিবার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। মহাতেজা শক্তও অগ্রজকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। বলবতী জিঘাংসা শক্তের হৃদয় অধিকার করিল। তিনি প্রতাপকে এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং তৎসুযোগ প্রাপ্তির জন্য প্রতাপশত্রু আকবরের পক্ষাবলম্বন করিলেন।

কলুষিত, তব করে উঠিয়া কুক্ষণে!
কিন্তু, ভ্রান্ত, বৃথা তোমা করি তিরস্কার;
নহ দোষী একা তুমি। চির-অভাগিনী
ভারতজননী তব! ভাগ্যদোষে তাঁরি,
ভ্রাতৃদ্রোহী দেশদ্রোহী তব সম কত,
কালে কালে, কলঙ্কের গাঢ় মসি ঢালি
রেখেছে আবৃত করি পুরাবৃত্ত তাঁর!
তাদেরি অক্ষয় কীর্ত্তি, এই গুরুভার
চরণে শৃঙ্খল তাঁর দুশ্চেছ্য কঠিন!

হা প্রতাপ—জননীর সুযোগ্য সন্তান!
বীর-কুল-শিরোমণি! মাতৃগতপ্রাণ!
হয় বুঝি অবসান আজি লীলা তব!
অপূর্ণ বাসনা তব রহিল জীবনে,—
হলোনা হলোনা হায়, পাপের নিধন
হলোনা ধর্ম্মের ত্রাণ! হলোনা উদ্ধার
স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি মা'র!
ধরিয়া সংহার-অস্ত্র. কৃতান্তের প্রায়,
হা ধিক্—সোদর তব, হের ওই, বীর,
আসিছে সমীরবেগে!—হা অদৃষ্ট, অহো!—
ছিল শ্রেয়ঃ শতগুণ এর চেয়ে হায়,
সমর-প্রাঙ্গণে তব প্রাণ বিসর্জ্জন
করিয়া নিধন শত্রু।—সাবধান সাধু,
সমীপস্থ ওই দস্যু, ধর তরবার!

"হো নীল ঘোড়াকা সওয়ার!"—বজ্রনাদে
ডাকিল পশ্চাতে শক্ত, সমীপস্থ প্রায়।
তুলি প্রতিধ্বনি ঘোর প্রশান্ত প্রদেশে
শব্দহীন, স্থিরনীরে তরঙ্গ যেমন
উঠে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে, অনন্ত গগনে

মিশিল সে মহানাদ। গণিয়া প্রমাদ,
আকর্ষিয়া হয়-রশ্মি, ঘুরায়ে মস্তক,
সচকিতে শূরবর চাহিলা পশ্চাতে,
ক্লান্ত অতি রণশ্রমে, পথ-শ্রমে পুনঃ ;
ঝরিল কয়টি মুক্তা তরল উজ্জ্বল
ললাটফলক হ'তে, হিমবিন্দুসম
শোভিল শ্যামল তৃণে ধরণী উপরে—
জননী অঞ্চলে যেন সুনীল-বসনা।
জিঘাংসা, দারুণ রোষে আপাদমস্তক
উঠিল জ্বলিয়া ক্ষণে, দৃষ্টিমাত্র মরি,
সেই মূর্ত্তি—সেই মুখ চির-পরিচিত,
কলঙ্কিত হায়, এবে ; মুহূর্ত্তের তরে
শিহরিলা মহারাণা, হারাইলা জ্ঞান ;
সম্বরি হৃদয়বেগ পরক্ষণে পুনঃ,
ফিরাইয়ে অশ্বমুখ ক্ষিপ্রকরে অতি,
রাখি রশ্মি বাম-করে, চকিতে অমনি,
করি মুক্ত অর্দ্ধ অসি কোষ-গর্ভ হ'তে
ধরি অন্য করে দৃঢ়, অটল অচল
দাঁড়াইলা ; হেরি দূরে গজেন্দ্রে যেমতি
হর্য্যক্ষ জ্বলন্ত আঁখি, গর্জ্জিয়া সরোষে,
চাহে তার প্রতি,—স্থির আয়তনয়নে
অগ্নিময়, নিরখিয়া শক্তসিংহ-প্রতি
রহিলা মিবারপতি। "নাহিক সন্দেহ,"-
বিস্ময়ে, ঘৃণায়, রোষে, দুঃখে নিদারুণ,
ভাবিলা ধীমান,—"অহো, হেরি অসময়,
এসেছে নিশ্চয় শক্ত, সুচির-সঞ্চিত,
করিতে পূরণ আজি, প্রসুপ্ত বাসনা
পাপপূর্ণ হৃদয়ের ; প্রাণপাতকারী

করিতে নির্ব্বাণ ভ্রাতৃ-শোণিত পিপাসা।
হায়, মাতঃ বসুন্ধরে, যা মা রসাতলে,
প্রলয়-পয়োধি-জলে কর্ মা ক্ষালন
এ কলঙ্ক সুবিষম! বহিস্ না আর
এই গুরু পাপভার!—ধিক্ রে মানবে
মোহান্ধ ভ্রমান্ধ সদা! হীন স্বার্থ তরে
না পারে জগতে কার্য্য কি আছে তাহার?
কি আছে অধর্ম্ম হেন, মহাপাপ ভবে,
নাহি পারে আচরিতে?—ধিক্ শত তারে!
আয় শক্তসিংহ,—সাঙ্গ আজি এইস্থলে
জীব-লীলা মহীতলে নিশ্চয় একের!"
ত্যজি সিংহনাদ ঘন, মৃগেন্দ্র যেমতি
বাণবিদ্ধ, কোষমুক্ত সম্পূর্ণ এবার
তুলিলা প্রচণ্ড খড়্গ ক্রোধান্ধ প্রতাপ।
তুলি অগ্র-পদদ্বয়, করি হ্রেষাধ্বনি,
উপযুক্ত রণীন্দ্রের বীরেন্দ্র চৈতক
আহ্বানিল প্রতিপক্ষে সম্মুখ সমরে।
কিন্তু, এ কি?—এ কি ভাব শক্তসিংহ তব?
কি কর সন্দেহ আর? কি ভয় তোমার?
রণ-শ্রমে—পথশ্রমে ক্লান্ত অতি রাণা;
হেরহ শিথিল ওই ভুজমুষ্টি তাঁর;
বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গে * ওই রক্ত শতধারে
বহিয়া, করিছে ক্ষণে ক্ষীণতর তাঁরে;
অতি ক্লান্ত অশ্ববর, প্রাণবায়ু তার
অনন্ত বায়ুসাগরে মিশিবে অচিরে;—

* যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রতাপ শক্র-নিক্ষিপ্ত ভল্ল হইতে তিনটি, গুলী হইতে একটি এবং তরবারী হইতে তিনটি, সর্ব্বসমেত সাতটি আঘাত চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন।

উপযুক্ত অবসর এই তো তোমার
করিতে সংহার অরি—কণ্টক বক্ষের!
ধর—ধর তরবার! দেখিবে না কেহ আর
এ নির্জ্জন দেশে, ঘোষিতে জগতে নাম
'ভ্রাতৃহন্তা' তব, ফিরাতে ঘৃণায় মুখ
হেরি তব কলঙ্কিত দগধ বদন!
কেন দ্বিধা?—কি আশ্চর্য্য, একি ভাবোদয়!
নিরখি নয়নদ্বয় অশ্রুময় এ যে!
হয়েছে আরক্ত মুখ, লজ্জায় যেমন,
অবনত! হইতেছে কম্পিত অধর!
একি বীরবর? পাষাণ অন্তর তব
দ্রবীভূত দয়াবশে হয়েছে কি আজি?
হেরি ভ্রাতা প্রাণোপম পতিত বিপদে
কেঁদেছে কি আজি প্রাণ—হয়েছে কাতর?
ভাবিয়া কুকার্য্য নিজ এতদিন পরে
জ্বলেছে হৃদয়ে কিহে অনুতাপানল?
বিনষ্ট সে ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃভক্তি আদি
স্বর্গীয় অমূল্য নিধি, এত দিনান্তরে
হয়েছে অন্তরে কি হে নব সঞ্জীবিত?
বিগত কি মহামোহ? হৃদয়বিকার
হয়েছে কি অপনীত?—কি সৌভাগ্য অহো!
সমুদিত কি সুদিন রাজস্থানে আজি!
ধন্য, ধন্য, শক্তসিংহ!—সাধু মতি তব!
সম্বর, সম্বর অসি,—কি কর প্রতাপ?
অনুতপ্ত ভ্রাতা তব হের পদতলে;
লহ তারে কোলে তুলে; সরল-অন্তরে
কর ক্ষমা সংখ্যাতীত অপরাধ তার;
হও মগ্ন ভ্রাতৃপ্রেম-পীযুষ সাগরে।

"রাণা!—রাণা!———
ত্যজি অশ্ব শক্তসিংহ, অবনত-শিরে
কম্পিত চরণে ধীরে হয়ে অগ্রসর,
জোড় করি কর যুগ,—বাষ্পরুদ্ধস্বরে *
সম্বোধি রাণায় আহা, পড়িলা ভূতলে।
ঢালিয়া সমগ্র নীর সপ্ত সাগরের,
বিশ্বনাশী সেই মহা উগ্র ক্রোধানল
করিল নির্ব্বাণ মরি, কে যেন নিমেষে,
উথলি হৃদয় ক্ষণে, নয়নযুগল
ভাসাইয়ে প্রতাপের, অজস্র ধারায়
বহি অশ্রু দর দর, বক্ষ সুবিশাল
করিল প্লাবিত দ্রুত; করচ্যুত হয়ে,
অজ্ঞাতে, পড়িল অসি সশব্দে ভূতলে।
অবতরি অশ্বহতে, ঊর্দ্ধ-বাহু রাণা
ধাইলা শক্তের প্রতি, হৃদয়-আবেগে;
বসি ভূমে নতজানু, ধরি দুই করে
তুলিলা সাদরে তারে; ভুলিয়া সকল
স্নেহ-আলিঙ্গনে গাঢ়, হৃদয়ে হৃদয়,
করিলা আবদ্ধ; আহা, রঘুকুলমণি
যেমতি রাঘব দূর দণ্ডক-কাননে
গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলা ভরতে
আগত উদ্দেশে তাঁর!—কি শান্তি অপার!
কিবা প্রেম-পারাবার হৃদয়ে দোঁহার!
হৃদয়ে হৃদয়, মরি, নয়নে নয়ন,

* "বাষ্পৈঃ পিহিতকণ্ঠশ্চ........।
আর্য্যেত্যেবাভিসংক্রুশ্য ব্যাহর্ত্তুং নাশকৎ ততঃ॥"

বাঃ রামায়ণম্।

কি ভাষে নীরব নর-কল্পনা অতীত
সীমাতীত, কত কথা—কত ব্যথা হায়,
করিল প্রকাশ। (নর-রসনা-নিঃসৃত
সীমাবদ্ধ বর্ণহারে গ্রথিত বচন
তুরবল, নহে কভু কার্য্যকর হেথা।)
বহিল প্লাবিয়া বিশ্ব কি স্রোত সুধার
কিন্তু, আহা, দুনিবার বিধির বিধান
সহসা গরল দান করিল তাহাতে।
সরাইয়ে হরষের প্রশান্ত পয়োধি,
মাথা তুলি, বিষাদের গিরিশৃঙ্গ এক
হইল উত্থিত ত্বরা। সুখের তরণী
হ'লো অবরুদ্ধ হায়! অতিরিক্ত শ্রমে,
শোণিত-নিঃস্রাবে পুনঃ ক্ষত-স্থান হতে,
বাত্যাহত শৃঙ্গচ্যুত মহাদ্রুম সম
পড়িল চৈতক ভূমে। প্রভুকার্য্য সাধি,
রক্ষিয়া জীবন তাঁর আত্মপ্রাণ-দানে,
হেরি সুখ-সম্মিলন ভ্রাতায় ভ্রাতায়,
মহাসুখে অশ্ববর মুদিল নয়ন,
জন্মের মতন হায়। হৃদয়ে দারুণ
দিয়া শেল-ব্যথা, তাঁর আজি প্রতাপের
প্রিয়তম সঙ্গী এক, শকতি অর্দ্ধেক,
চিরবন্ধু বিপদের, বিজয় সংগ্রামে,
হরিল করাল কাল। মহাশোকে রাণা
হইলা কাতর অতি; আনন্দ-অশ্রুতে
বহিল বিষাদ-নীর; বিলাপিলা বহু
স্মরি গুণাবলী তার দুর্ল্লভ মানবে,
প্রভুভক্তি, আত্মত্যাগ, সাহস, বিক্রম,
সমর-কৌশল আদি।

গত বহুক্ষণ ;
উৎকণ্ঠিত এবে শক্ত সেলিমের ডরে * ;
না সহে বিলম্ব আর ; ব্যথিত-হৃদয়ে
প্রদানি সান্ত্বনা শোক-কাতর ভ্রাতায়,
করি মুক্ত সাশ্রু নেত্রে বাহুপাশ ত্বরা,
দিয়া নিজ অশ্ব তাঁরে, লইলা বিদায় ;
যাচি ক্ষমা পুনঃ পুনঃ পাদপদ্মে তাঁর,
বন্দিয়া চরণযুগ, প্রথম সুযোগে
মিলিতে অচিরে তাঁর সিংহাসন-মূলে-
করিয়া প্রতিজ্ঞা, শক্ত করিলা প্রস্থান।
তুষি মিষ্টভাষে বহু বিবিধবিধানে,
দানিলা বিদায় তারে অতি ক্লেশে রাণা।
হরিষ বিষাদে মগ্ন শূরবর এবে
করি অশ্রুপাত বহু অশ্বের শরীরে,
রাখি অর্দ্ধ প্রাণ তথা, অনিচ্ছায় অতি
আরোহি দ্বিতীয় অশ্বে, মন্থর গতিতে
করিলা প্রস্থান ধীরে স্বস্থান-উদ্দেশে।
প্রাণশূন্য অশ্ববর রহিল পতিত।†

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

* ইনি সেলিম-পরিচালিত সৈন্যদলভুক্ত হইয়া হলদিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রতাপকে রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিতে এবং দুইটি যবন অশ্বারোহীকে তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া, তিনি প্রতাপের প্রতি বৈরিভাব পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য, সেনাপতির (সেলিমের) বিনানুমতিতে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতঃ তাঁহার অনুসরণ করেন।

† অচিরেই, তাঁহার আদেশে, এইস্থলে চৈতককে কবরিত করিয়া তদুপরি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। এই স্তম্ভের নাম—"চৈতকা চাবুত্রা"।

সম্পূর্ণ।

ঐতিহাসিক চিত্র।

কামতাপুর।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখনও ভারতে হিন্দুরাজ্য সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। তখনও যে কৃষ্ণ মেঘখণ্ড দেখিতে দেখিতে আকাশ-পটলকে জলদজালে আচ্ছন্ন করিয়া, এক ঘোর দারুণ দুর্য্যোগের সৃষ্টি করিয়াছিল, সে উৎপাতের চিহ্নমাত্র সূচিত হয় নাই। ভারতের সেই গৌরবের দিনে, কামতাপুর ধনধান্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর বহুশত বৎসর * অতীত হইয়াছে। ভারত অনবরত বহু বিপ্লবে পিষ্ট হইয়াছে; অশনিসম্পাতে তাহার রত্নমুকুট খসিয়া পড়িয়াছে। বিস্মৃতির অতলস্পর্শে প্রাচীন ভারত ডুবিয়া গিয়াছে। আজ আর তাহার লহরীমালা মথিত করিয়া, কে লুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করিবে?

কামতাপুরের চিহ্নমাত্র আছে, সম্পদ নাই। কোথায় কোন সুদূর অতীতে বিস্মৃতির রাজ্যে বসিয়া, একদিন কোন ভারতবাসী আপনার সমস্ত বুদ্ধি দাসত্বে উৎসর্গ না করিয়া, জননী জন্মভূমির সম্পদ ও রাজশ্রী বর্দ্ধিত করিবার জন্য সমস্তটুকু জননীর সেবায় নিঃশেষ করিয়াছে, তাহার অস্পষ্ট স্মৃতি আছে, ইতিহাস নাই! নিথর রজনীতে দূরাগত অস্পষ্ট

* ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ ১২৫০—৬০ শকাব্দে নীলধ্বজ কর্ত্তৃক কামতাপুর স্থাপিত হয়।

সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনার ন্যায়, প্রান্তরোপান্তে স্তিমিত দীপালোকের ক্ষীণ আলোক-রশ্মির ন্যায় সে স্মৃতি আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে মাত্র।

কামতাপুর এক সময় রাজধানী ছিল। তখন 'করতোয়ার' প্রবল জলোচ্ছ্বাস পশ্চিমে কামরূপ রাজ্যের পাদদেশ চুম্বন করিয়া প্রবাহিত। সে সময় কামতাপুরের উন্নতিকাল। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, সরোবর, উদ্যান, দেবালয় প্রভৃতি যাহা কিছু শোভা ও সম্পদের আকর, কামতাপুরের তখন তাহা সমস্তই ছিল। আর আজ? সে কামতাপুর নাই। একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম অপেক্ষাও হীনাবস্থ।

কামতাপুর কামরূপের কামপীঠে অবস্থিত। কোলাহলময় বিচিত্র সৌধমালা-পরিশোভিত নগরী আজ অরণ্যসঙ্কুল চিরহরিতের অসীম সমুদ্র; চতুঃপার্শ্বে দিগন্ত-প্রসারিত অনন্ত নিস্তব্ধতা।

তাহার মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে ও আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় অতীত নগরের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ কালের এমনই প্রতাপ! যাহা ছিল তাহা নাই; যাহা আছে তাহাও থাকিবে না। ইহা অতি সত্য। কিন্তু মন বুঝে কই? এই প্রাচীন ভূখণ্ডের সমাধি ক্ষেত্রের ধূলিরাশির উপর দাঁড়াইয়া, যে অতীত মহাত্মগণের কররেখার দ্বারা আমাদিগকে অনন্তকালের সহিত বাঁধা দেখিয়া গৌরব বোধ করি, সেই ধ্বংসস্তূপের উপর অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারি কই?

রাজপ্রাসাদ, রাজদুর্গ, সরোবর প্রভৃতি বহু ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান। এই সব হইতে হয়ত আজিও বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু হায়! বিগত-বিভব রুক্ষভাবাবিষ্ট কামতাপুর কাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে? একদিন ছিল যখন তাহার সৌভাগ্যে লোক আকৃষ্ট হইত; সে দিন আজ অতীতের মহাগর্ভে বিলীন। আজ তাহার সম্পদ উপহসিত। আজ আর সেই "হাসিরাশি-

উচ্ছ্বসিত উৎসের মতন" রাজধানী বর্ত্তমান নাই। আজ তাহার পরিবর্ত্তে সে

"......বসে আছে চির-একাকিনী
চির মৌন ব্রতা।

রবিশশী শিরোপরি
উঠে যুগযুগান্তর
চেয়ে শুধু চলে যায়
নাহি কয় কথা।"

তাই বুঝি তাহার বেদনা-ক্ষুব্ধ চিত্তকে সুস্থির করিবার জন্য প্রকৃতি আপনার শ্যামল উত্তরীয়ের নিম্নে তাহাকে সস্নেহে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন।

জনশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে কামতাপুর ধবলা নদীর পশ্চিম-তটে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান কামতাপুরের মধ্য দিয়া আর একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত; ইহার নাম "শিঙ্গীমারী"। * এই ক্ষুদ্র নদীর দ্বারা প্রাচীন নগরটী পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত; পূর্ব্বভাগ অপেক্ষা পশ্চিম ভাগ ক্ষুদ্র। শিঙ্গীমারী প্রবেশ ও নির্গমের পথে একটানা স্রোতে অনেকাংশ ভূমিখণ্ড বিনষ্ট করিয়াছে।

কামতাপুর নগরটী প্রায় ৬০০ বৎসরের পুরাতন। নগরটি অনেকটা আয়তাকার, পরিধি প্রায় ১৯ মাইল। পূর্ব্বদিকে "ধবলা"র প্রবল জলোচ্ছ্বাস; অপর তিন দিকে খাদ ও মৃন্ময় প্রাকার বেষ্টিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দুইটী খাদ—একটী নগর পরিখা অপরটী নগরাভ্যন্তরস্থ দুর্গ-পরিখা। নগর-পরিখার পরই অপর তিন দিকে নগর রক্ষার্থ

* অনেকে অনুমান করেন শৃঙ্গী (সিঙি) মৎস্য হইতে উক্ত নদীর নামকরণ হইয়াছে। আবার অনেকের বিশ্বাস শিঙ্গীমারী সিংহমারীরই অপভ্রংশ মাত্র।

মুখচার ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান। নগরের চারিটি তোরণের মধ্যে তিনটী তোরণ অদ্যাপি বর্ত্তমান। কেবল শিঙ্গীমারীর পশ্চিম উপকূলে যে তোরণদ্বার দিয়া মুসলমানের বিজয়বাহিনী নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে তোরণটী সর্ব্ববিধ্বংসী কালের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, আপনার জরাজীর্ণ মস্তক ধরিত্রীর বিস্তৃত অঙ্কে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে।

কোষাগার ভগ্ন অট্টালিকার পাদদেশ হইতে ঈষৎ বাঁকিয়া দক্ষিণ মুখে যে প্রশস্ত রাজপথ ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই পথের উভয়পার্শ্বে কয়েকটী ভগ্নাবশেষ অট্টালিকা কালের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া আজিও দণ্ডায়মান। নগর হইতে সৌজিন দীঘী পর্য্যন্ত রাস্তা প্রায় তিন মাইল। হিন্দু রাজত্বের সময় এই স্থানে বিস্তর অট্টালিকা ছিল; এই নগরের অবরোধকালে মুসলমানগণ এই সমুদায় অট্টালিকায় বহু দিবসাবধি আশ্রয় পাইয়াছিল। সে কথা বলিতেছি। শিঙ্গীমারীর তীরে যে ভগ্নপ্রায় তোরণদ্বারের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভাদি ছিল বলিয়া, ইহার নাম শিলাদ্বার। শিলাদ্বারের দুই মাইল পশ্চিমে আর একটী তোরণ আছে; ইহার শিরোদেশে একটি সিংহ-মূর্ত্তি ছিল, এই জন্য ইহার নাম সিংহদ্বার। এতদ্ব্যতীত নগরের উত্তরাংশে "হোকোদ্বার * নামক আর একটী তোরণ দৃষ্ট হয়। এই তিনটী তোরণই ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং ইহাদিগের নিকটে যে সকল রক্ষণোপযোগী উপায় ছিল, সে সমুদায়ের ভগ্নাবশেষ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। হোকোদ্বারের বহির্দ্দেশে রাস্তার বামপার্শ্বে একটী দুর্গ প্রায় ১ মাইল জমীর উপর গঠিত। এই দুর্গ "পাত্রের গড়" নামে প্রসিদ্ধ। কথিত

* কামরূপ জেলায় যে সকল অসভ্য জাতির নাম শুনা যায়, তন্মধ্যে "হোকো" কোন অসভ্য জাতি হইবে। তাহাদিগেরই নামানুসারে উক্ত তোরণের নামকরণ।

আছে এই দুর্গে পাত্র অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বাস করিতেন, এই জন্য ইহার নাম পাত্রগড়। এই দুর্গের আরও উত্তরে বর্ত্তমান একটী ক্ষেত্রের মধ্যে স্নানাগার ছিল। এই জন্য এই স্থানকে আজিও "শীতলবাস" বলে। কিন্তু এই স্থানে এখন আর কোন অট্টালিকার চিহ্ন নাই। গগনস্পর্শী অট্টালিকার পরিবর্ত্তে ইহার চারিদিকে তামাকুর চাষ দেখিয়া বার বার বলিতে ইচ্ছা হয় "হায়! কালের কুটিলা গতি।" এই স্থান পরিদর্শন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, "স্নানাগার" একটি সুন্দর ছায়াশীতল বৃক্ষ-বাটিকার মধ্যে অবস্থিত ছিল, কালক্রমে উদ্যানের বৃক্ষাদি নষ্ট হওয়ায় বৃক্ষাদি কাটিয়া ফেলিয়া সমগ্র ভূভাগ আবাদ করা হইয়াছে।

নগরীর মধ্যে প্রধান স্থান দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ। দুর্গ পশ্চিম দিকে ১৮৬০ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮৮০ ফুট বিস্তৃত। তার পর দুর্গের চারিদিকে ৬০ ফুট বিস্তৃত পরিখা ও পরিখার অভ্যন্তরে ইষ্টক-প্রাচীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পরিখার তীর হইতেই এক প্রাচীর গাঁথা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রাচীরের কোলে প্রশস্ত ঢালু পোস্তা। অতএব দেখা যাইতেছে যিনি এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বাংশে ইহাকে সুরক্ষিত করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ নিয়তির দাস। অদৃষ্ট-পুরুষ কোন অজ্ঞানিত রাজ্যে বসিয়া কেমন করিয়া ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তিকে বিপর্য্যস্ত ও আমাদিগের বুদ্ধিকে প্রতিপদে পরাস্ত করিয়া, আপনার ইচ্ছাকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, ভ্রান্ত মানুষ তাহা ভুলিয়া যায়, আর তাহাতেই মোহ-বশে সেই বিশ্ববিজয়িনী শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইয়া, বায়ুমুখে তাড়িত তৃণ-খণ্ডের ন্যায় অবস্থা ও ইচ্ছার প্রতিকূলে চালিত হইয়া বুঝিতে পারে যে, সেই অদৃষ্ট শক্তির হস্তে মানুষ কন্দুক মাত্র। কামতাপুর-প্রতিষ্ঠাতা যে সময় প্রাণপণ পরিশ্রমের দ্বারা নগরটীকে সুরক্ষিত করিয়া তুলিতেছিলেন, সে সময় তিনি স্বপনেও ভাবেন নাই, এই শত্রুশক্তি-

লাঞ্ছিত দুর্গ শিবাকুলের আবাস স্থলে পরিণত হইবে। এ সংসারে সমস্তই নশ্বর; ইহা বুঝি, কিন্তু বুঝার মত বুঝিনা। তথাপি ইহা অপেক্ষা দৈনন্দিন ঘটনা আর কি হইতে পারে? বিশাল অম্বুরাশির পর-পার হইতে আমাদের গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত সর্ব্ব বিষয় সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্য দিয়া আমাদিগের কর্ণ-পটহে যে এক মহতী বাণী প্রতিনিয়তই ধ্বনিয়া তুলিতেছে, তাহা কবি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

Think, in this batter'd Caravanserai
Whose Partals are altrenate night day.
How Sultan after Sultan with his Po mp
Abode his destined Hour, and went his way.

কামতাপুরের প্রাচীন ইতিহাস? ইহা অতি ক্ষুদ্র কিন্তু বড় করুন। তাহা এক চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফল কাহিনী। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় যে উজ্জ্বল বীর্য্যগরিমায় ভারত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটী ক্ষীণ রশ্মির বিকাশ কামতাপুরে। কিন্তু তাহার পরিণতি কি মর্ম্মভেদী! একদিন পুণ্য-প্রভাতের যে এক মহৎ চিত্ত স্বজাতি প্রেমের আস্বাদনে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাল উপেক্ষাভরে তাহার আজন্মসাধনার অসিদ্ধতার ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন লোক-সমাজে ঘোষণা করিবার জন্যই এই ধ্বংসস্তূপ আজিও পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্বযত্নে রক্ষা করিতেছে। সে ধ্বংসস্তূপ যেন আমার কর্ণে কবির কথাই বার বার ধ্বনিয়া তুলিয়াছিল:—"ব্যর্থ হয়েছি। পাল্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে।" ইহাই কামতাপুরের ইতিহাস, ইহাই সমস্ত হিন্দুস্থানের ইতিহাস।

তখনও মহম্মদ টোগলক দিল্লীর সম্রাট। ভারত তখনও নিষ্পেষণে সম্পূর্ণ নির্জীব হয় নাই। এই সময় একদিন ছায়া-নিবড় গ্রাম গুলিতে হঠাৎ বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। অলস-মন্থর-গমনে

ভূমিকর্ষণরত কৃষক সংযত-হল হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নীলধ্বজ রাজটীকা ললাটে ধারণ করিয়া নগরের সংস্কারসাধন করত রাজধানী স্থাপন করেন। আনুমানিক খৃঃ ১৩৩৮ এই ঘটনা ঘটে।

নীলধ্বজ কে? ১৪শ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বগুড়া জেলার এক ব্রাহ্মণের এক গোরক্ষক ছিল। দুষ্ট-প্রকৃতি গোরক্ষক পরের অনিষ্ট সাধনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিত। সে প্রতিদিন অপরের ক্ষেত্রে গোপাল ছাড়িয়া দিয়া সুখে নিদ্রা যাইত। প্রতিদিন এইরূপে শস্যহানি দেখিয়া সকলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার ভৃত্যের দুর্ব্যবহারের কথা জানাইল। ব্রাহ্মণ একদিন স্বয়ং এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মাঠে গিয়া দেখেন যে, তাঁহার গোরক্ষক বিরামদায়িনী নিদ্রার অঙ্কে শায়িত। বৃক্ষাভ্যন্তরস্থ সূর্য্যকিরণ বালকের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে আর আশ্চর্য্যের বিষয় একটি কৃষ্ণসর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহার মুখের রৌদ্র নিবারণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন যে, মানুষ যেরূপ কোন দিক হইতে কখন বায়ু প্রবাহিত হয় ইহা বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কোন সুযোগ অবলম্বন করিয়া, কখন মানুষের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ব্রাহ্মণের ধারণা ঠিক হইল। এই গোরক্ষক একদিন হঠাৎ সাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, কামরূপ রাজ্যের ধর্ম্মপালের তদানীন্তন দুর্ব্বল বংশধরকে বিনষ্ট করিয়া "ব্রাহ্মণ রাজ্য" স্থাপন করিলেন। ইনিই নীলধ্বজ আর ব্রাহ্মণ এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। ব্রাহ্মণের কার্য্য কুশলতায় কামতাপুরের একদিন সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল।

তারপর একদিন হঠাৎ এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিল। তখনও কামতাপুরবাসী ভাবে নাই যে, সে মেঘের পশ্চাতে প্রলয়ের সংহার-মূর্ত্তি লুক্কায়িত আছে। সে সময় নীলধ্বজের পৌত্র নীলাম্বর কামতা-পুরের রাজা। তিনি সমরকুশল ও সাহসী। নিশা সমাগমে দিনমণির

প্রভা যেরূপ হ্রাস পাইতে থাকে; সেইরূপ এ মুসলমানগণের পদার্পণে ভারতে হিন্দুগরিমা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া পড়িতেছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া, নীলাম্বর নগরের দুর্গ ও পরিখা ও ঘোড়াঘাটের গড় প্রভৃতি নগর-রক্ষার যাবতীয় উপায় উদ্ভাবন করিতে স্থির-সঙ্কল্প হয়েন। কিন্তু নির্য়তি বিরলে বসিয়া ভারতের যে ভাবী ইতিহাস রচনা করিতে ছিল, ক্ষুদ্র নীলাম্বরের কি সাধ্য যে, সে ইতিহাস উল্টাইয়া দিবে? একদা রাজা শুনিলেন যে, মন্ত্রিপুত্র রাণীর প্রতি আসক্ত। ইহা অবগত হইয়া রাজা ক্রোধে অন্ধ হইলেন। রাজা তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস রাঁধাইয়া মন্ত্রীকে খাইতে দেন। পরে মন্ত্রী সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া গঙ্গাস্নানছলে কামতাপুর ত্যাগ করতঃ প্রতি-শোধ লইবার জন্য গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের নিকট সাহায্য পাইবার আশায় গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হয়েন। নবাব প্রার্থনামত বহু সৈন্য লইয়া কামতাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। সেইদিন হইতে কামতা-পুরের সুখসূর্য্য অস্তমিত হয়।

সমুদ্র-সৈকতে বালুকারাশির গণনাও সম্ভব পর হইতে পারে, কিন্তু গৌড় নরপতির সৈন্ত সংখ্যা কে গণনা করিবে? পঙ্গপালের দলের ন্যায় সে বৃহতী বাহিনী পথ ঘাট মাঠ ছাইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু তখনকার ভারতবাসীও দুর্ব্বলহস্তে অসি চালনা করিতেন না। কামতা-পুরেশ্বর ঘোরতর যুদ্ধের পরও পরাজিত হইলেন না। কাজেই নবাব নগর অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই অব-রোধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। মুসলমানগণ দীর্ঘ অবরোধে ক্লান্ত নগরের বহির্ভাগে পরিত্যক্ত অট্টালিকা সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু নগরে প্রবেশের কোন সুযোগই উপস্থিত হইল না। অবশেষে মুসলমানেরা কৌশল অবলম্বন করিল। রাজাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, মুসলমানেরা অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া

যাইবে, যাইবার পূর্ব্বে মুসলমান রমণীগণ একবার রাণীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। নীলাম্বর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু মুসলমানেরা দোলায় স্ত্রীলোক না পাঠাইয়া সশস্ত্র ছদ্মবেশী যোদ্ধা পাঠাইল। তাহারা নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার ও রাজাকে বন্দী করিল। যে নগর বার বৎসর মুসলমান অবরোধ অনায়াসে সহ্য করিয়াছিল, তাহা শত্রুপদতলে লুণ্ঠিত হইল। দুর্গের উপর বিজয় পতাকা পাঠানের জয় ঘোষণা করিল। সেই দিন হইতেই কামতাপুরের পতন।

বিদেশের ইতিহাস লেখকেরা "ভীরু" বলিয়া আমাদিগের ললাটে যে দুরপনেয় কলঙ্করেখা টানিয়া দিয়াছিলেন, যে, বীর ১২ বৎসর ব্যাপী সংগ্রামে আপনার মস্তক উন্নত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস আলোচনায় হয়ত সে কলঙ্করেখা আংশিক অপনোদিত হইতে পারিত। আলোচনার অভাবে যেমন অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তি বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, নীলাম্বরও সেই পথে গমন করিয়াছেন তাহাতে আর দুঃখ কি ? নীলাম্বরের বীরত্ব-কাহিনী বিলুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার বীরকীর্ত্তির শেষচিহ্ন এই ছয় শত বৎসরেও বিলুপ্ত হয় নাই। কামতাপুরের দুর্গ পরিখা জলশূন্য ও শুষ্কক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু এখনও স্থানে স্থানে তাহার সীমা-চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সিংহদ্বার জরাজীর্ণ হইয়াছে ; রাজপুরী শ্বাপদের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে ; দেবালয়ের উচ্চচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ;—কিন্তু কেমন করিয়া একজন সামান্য ভূস্বামী দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বীর-বিক্রমে বলদর্পিত নবাবের বিপুল বাহিনীকে প্রতিহত করিয়াছিল, তাহার শেষ নিদর্শন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় নাই। তাহা দেখিবার জন্য কি আমাদিগের হৃদয়ে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইবে না ?

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির।

ঐতিহাসিক চিত্রের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক ও বিক্রমপুরের ইতিহাস-লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩১৬ সালের মাঘের "চিত্রে" 'কয়েকটি কথা'-শীর্ষক প্রবন্ধে দিনাজপুরের কান্তনগরের মন্দির ও কান্তজি-বিগ্রহ-সম্পর্কিত জনপ্রবাদ এবং প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া একটী বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়া, পাঠাইবার জন্য ঐতিহাসিক চিত্রের দিনাজপুরবাসী গ্রাহকবর্গকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। সে আজ ৭।৮ মাসের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও দিনাজপুরবাসী কোন সাহিত্য-সেবকই যোগেন্দ্র বাবুর এ আহ্বানে কর্ণপাত করেন নাই কিংবা কর্ণপাত করিয়াও হয়ত বা প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে এ পর্য্যন্ত বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন নাই। আমরা কান্তজির সম্পর্কীয় বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য বাস্তবিকই বড় উৎসুক হইয়াছি। আশা করি শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক দিনাজপুরবাসী কোনও উদ্যমশীল সাহিত্যসেবক একটী বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া, আমাদের সে ঔৎসুক্য নিবারণ করিবেন। দিনাজপুরবাসিগণ উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকুন; তবে সে সময়টা ভিন্নজেলাবাসী আমরা একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এবং জনশ্রুতি হইতে মন্দির সম্পর্কে যে বিবরণ টুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এস্থলে সেটুকু প্রকাশ করিলাম।

কান্তজির মন্দির উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার সদরষ্টেশন হইতে ৬ ক্রোশ দূরস্থিত কান্তনগর নামক গণ্ডগ্রামে অবস্থিত। এটি নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটি আগাগোড়া ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহাতে পাথর কিংবা লৌহের কোন সম্পর্ক নাই। মন্দির-গাত্রে ইষ্টক খোদিয়া বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি সমূহ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও

শিল্পীর কৌশলে ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির অবস্থান ও বস্ত্র সংস্থান নিবিষ্টভাবে দৃষ্টি করিলেই, আমরা মুসলমান আমলে বাঙ্গালাদেশে লোকের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও পরিধেয় বস্ত্রাদি কিরূপ ছিল, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ইষ্টকনির্ম্মিত ইষ্টকক্ষোদিত এমন নিখুঁত সুন্দর, এমন বিচিত্র, এমন কারু কার্য্যময় মন্দির বাঙ্গালা দেশে—শুধু বাঙ্গালা দেশেই বা বলি কেন—জগতে আর কোথায়ও নাই। কি দেশের কি বিদেশের সকলেরই ধারণা, সকলেরই বিশ্বাস আমাদের যত কিছু উন্নতি, শিল্প-বিজ্ঞান সাহিত্যে যত কিছু জ্ঞান, দেশে ইংরাজ আগমনের পরই তাহার সূচনা—তাহার অভ্যুত্থান। কিন্তু দুইশত বৎসরের প্রাচীন—দেশ ইংরাজ শাসনাধীনে আসিবার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের নির্ম্মিত বাঙ্গালী শিল্পিগণের এই বিরাট বিশাল স্থাপত্য ও শিল্পকীর্ত্তির জলন্ত নিদর্শন—দেখিয়াও আত্মজ্ঞান সম্পন্ন কোন বাঙ্গালী-সন্তান আর সে ভ্রান্ত ধারণায়, সে অন্ধ বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিতে চাহিবে? আমাদের কথা নয়—যাহাদের কথায় আমরা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বেদ-বাক্যবৎ বিশ্বাস করি, সেই জাতীয় Dr. Francis Benham বলেন, কান্তজির মন্দিরের তুল্য সুন্দর মন্দির তিনি আর দেখেন নাই। সেই জাতীয় বিখ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিৎ কাউসনের মতে, এই মন্দির 'is of a pleasing Picturesque design.' এইরূপ বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্যের পর বোধ হয় মন্দিরের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ করিবার সাহস হইবে না।

এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন রাজা প্রাণনাথ—ইনি দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুদত্তের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং উক্ত বংশের বর্ত্তমান সুসন্তান অনারেবল মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ। প্রাণনাথের পিতা রাজা শুকদেবের দুই

বিবাহ। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব এবং কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে প্রাণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০১ শকে রাজা শুকদেবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেব রাজা হয়েন; কিন্তু তিনি তিন বৎসরের অধিক রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর জয়দেব সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু ভগবানের এমনই বিধান যে, জয়দেবও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামদেবের ন্যায় ঠিক তিন বৎসর পরেই ১৬০৯ শকে মানব-লীলা সংবরণ করিলেন। রামদেব কিংবা জয়দেবের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। তাই পারিবারিক প্রথা অনুসারে প্রাণনাথই বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃত্যক্ত রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন। সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানেই ভালমন্দ উভয় জাতীয় লোকই দেখা যায়। ভাল যাহারা—তাহারা পরের দুঃখে সমবেদনা ও সুখে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে—আর যাহারা মন্দ, তাহারা পরের দুঃখ দেখিলে উৎফুল্ল হয়—পরের উন্নতি দেখিলে ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে এবং কায়মনোবাক্যে তাহাদের মন্দ চেষ্টা করিতে থাকে। সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রাণনাথের রাজ্য প্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের অকাল মৃত্যুতে তাঁহাকে রাজ্যলাভ করিতে দেখিয়া, মন্দ লোকে ঈর্ষাজর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইল। রামদেব ও জয়দেব উভয় ভ্রাতাই রাজ্যলাভ করিবার পর ঠিক তিন তিন বৎসর অন্তর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, প্রাণনাথের শত্রুবর্গ তাঁহার নামে দিল্লীর দরবারে এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিল। আলমগীর তখন দিল্লীর সম্রাট। তিনি প্রাণনাথকে তলব দিয়া পাঠাইলেন। শত বাধা বিঘ্ন, শত অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া, শতকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণনাথ বাদশাহের দরবারে হাজির হইলেন।

কি সেকাল কি একাল, কি হিন্দু রাজত্বে কি মুসলমান রাজত্বে, কি ইংরাজ রাজত্বে মোকদ্দমা সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক আসামী

হইলেই যে কোন ভাবেই হউক, তাহাকে রাজদ্বারে কিছু না কিছু দিতেই হইবে। সুতরাং আসামী প্রাণনাথকেও দরবারে যথেষ্ট অর্থ দিতে হইয়াছিল। অর্থে কি না হয়? অর্থবলে প্রাণনাথ মিথ্যা অভিযোগের দায় হইতে ত মুক্ত হইলেনই; অধিকন্তু বাদশাহ তাঁহাকে রাজোপাধি সহ দিনাজপুর রাজ্যের উপর এক ফরমান দিয়া অভিনন্দিত করিলেন। রাজোপাধি ও রাজত্বের ফরমান সহ বাদশাহের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, ১৬১৬ শকে প্রাণনাথ বিজয়ী বীরের ন্যায় দেশাভিমুখে রওনা হইলেন। এই সময়েই তিনি কান্তজি বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। দিল্লীতে অবস্থান কালে, প্রাণনাথ একজন প্রধান হিন্দু-রাজকর্ম্মচারীর আশ্রয়ে ছিলেন। এই রাজকর্ম্মচারীর গৃহেই 'কান্তজি' প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিগ্রহের নয়নাভিরাম সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা প্রাণনাথ বিশেষ আগ্রহ-সহকারে আশ্রয়-দাতার নিকট উহা প্রার্থনা করেন। আশ্রয়-দাতা রাজার প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিগ্রহটি তাঁহাকে দান করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তাহা নয়,—দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে বৃন্দাবন ধামে পূত-সলিলা যমুনা-জলে স্নান করিবার সময় প্রাণনাথ নদীগর্ভে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত প্রবাদদ্বয়ের কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা, এখন তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে, দিল্লী হইতে দেশে ফিরিবার সময়েই বিগ্রহটি সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মত দ্বৈধ নাই।

দেশে পৌঁছিয়াই, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা প্রাণনাথ 'কান্তজির' জন্য উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশের লোকে তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতার স্বাদ পায় নাই। সেকালে রাজরাজড়া ও জমীদারবর্গ একালের রাজ্যহীন রাজা ও শূন্যগর্ভ রায় বাহাদুরগণের ন্যায় উপাধি-ব্যাধি ক্রয় করিবার আশায় রাজ-কর্ম্মচারি-

বর্গের অনুষ্ঠিত বা প্রস্তাবিত, কার্য্য সমূহের ব্যয় সংকুলান কিংবা নিজ পরিজনবর্গের বিলাস ব্যসনাদির উপযোগী উপকরণাদি ক্রয় করিয়াই জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না। তাঁহারা 'পর-পীড়নেই পাপ—পরোপকারেই পুণ্য'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া, দেবায়তন গঠন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন ও রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও অতিথিশালা স্থাপন প্রভৃতি বিশেষ সদনুষ্ঠান দ্বারা দেশের, দশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া, ইহলোকে বিমল যশঃ ও পরলোকে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী হইতেন। ধর্ম্মপ্রাণ প্রাণনাথ সেকালের লোক ছিলেন। তিনি মন্দির গঠন করিয়া 'কান্তজির' প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিলেন। রাজধানী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে মন্দিরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজার যত্ন, চেষ্টা, ও অর্থব্যয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগৃহীত হইতে লাগিল। অবশেষে ১৬২৬ শকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের ভিত্তি প্রোথিত হইল। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ণ অষ্টাদশ বৎসরের বিপুল পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টায় ১৬৪৪ শকে—১৭২২ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাণনাথ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই—১৬৪১ শকে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

রাজা প্রাণনাথের কোন সন্তানসন্ততি না থাকায় তিনি এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তকপুত্রের নাম রামনাথ। পিতার মৃত্যুর পর, রাজা রামনাথ পিতার আরব্ধ ও সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিয়া ১৬৪৪শকে বহু অর্থব্যয়ে, বিপুল সমারোহে এই মন্দিরে 'কান্তজি'-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতঃ বিগ্রহের সেবা পূজা ও ভোগ অর্চ্চনা প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বহু সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া দিয়া পিতার সঙ্কল্পসিদ্ধি করিয়া প্রকৃত পুত্রের কার্য্য করিয়াছেন।

মন্দির-গাত্রে একখানি শিলালিপিতে মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাল, নির্ম্মাণ-কর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ক্ষোদিত আছে :——

"শাকে বেদাব্ধি-কালক্ষিতি-পরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ
প্রাসাদঞ্চাতিরম্যং সুরচিত নবরত্নাখ্যমস্মিন্ন কার্ষীৎ।
রুক্মিণ্যাঃ কান্ত তুষ্ট্যৈ সমুচিত-মনসা রামনাথেন রাজ্ঞা
দত্তঃ কান্তায় কান্তস্ত তু নিজনগরে তাত-সঙ্কল্পসিদ্ধ্যৈ॥"

এই বিগ্রহের নাম হইতেই কালে মন্দির কান্তজির মন্দির ও স্থান কান্তনগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কান্তজি অতি জাগ্রত দেবতা। প্রতিনিয়ত অখণ্ড বঙ্গের নানাস্থান হইতে বিগ্রহের পূজা অর্চ্চনা ও মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অগণন ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। মন্দির শুধু ইষ্টক-নির্ম্মিত হইলেও এই দীর্ঘকাল ধরিয়া—দুইশত বৎসরের জলবায়ুর অত্যাচার, উল্কাপাত ও বজ্রাঘাত সহিয়া, এখনও অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অধম বাঙ্গালী জাতির স্থাপত্য-গৌরব ও শিল্পকলা-কৌশলসহ একের বিশাল ধর্ম্মপ্রাণতা—ও অন্যের অকৃত্রিম পিতৃভক্তির জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মন্দির-নির্ম্মাণকারী সেই বাঙ্গালী শিল্পিগণ, রাজা প্রাণনাথ, রাজা রামনাথ অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছেন--তাঁহাদের ভৌতিক দেহ অণুপরমাণুতে লয় পাইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান। মানুষ যায় কীর্ত্তি থাকে—আবার যাহার কীর্ত্তি থাকে, তাহার মৃত্যু নাই। তাই কবি গাহিয়াছেন——

"মরণ পরেও ততকাল ধ'রে
হেথা নর বেঁচে রয়।
যতকাল ধরে কীর্ত্তিগাথা তার
লোকমুখে গীত হয়।"

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র।

(১)

প্রতীচ্য ভূখণ্ড পোর্ত্তুগালে ও প্রাচ্য মহাদেশের মহাসাম্রাজ্য মহাচীনে যেরূপে অভিনব রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দুর মনে প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্র-বিষয়ক প্রশ্ন স্বতঃই সমুদিত হয়। প্রাচীন ভারতের পল্লীসমাজ ও পঞ্চায়েৎসমূহ বহু পরিমাণে বর্ত্তমান কালের প্রজাতন্ত্র পদ্ধতির অনুরূপ ছিল, একথা অনেকেই অবগত আছেন,—অনেক পাশ্চত্য লেখকও সেকথা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পল্লীসমাজের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক রাষ্ট্রতন্ত্রের বিশাল পরিসরে পদার্পণ করিলেও যে. নরপতির নির্ব্বাচন ও রাজকার্য্য-পরিচালন ব্যাপারে প্রকৃতিপুঞ্জের মতেরই প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়, এ কথা অনেকেই অবগত নহেন। পুরাণাদি গ্রন্থে বহুসংখ্যক প্রজাপালক ধার্ম্মিক নরপতির পরিচয় আছে, স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও রাজশক্তিকে ব্যবস্থাপ্রণয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নরপতিগণের যথেচ্ছাচারের পথে কণ্টকারোপ করিয়াছিলেন, দেখা যায়, কিন্তু চীনে ও পোর্ত্তুগালে প্রকৃতিপুঞ্জ যেরূপ নির্ব্বাচনাধিকার লাভ করিয়াছে, প্রাচীন ভারতে সেরূপ অধিকার প্রজাকুলের কখনও ছিল কিনা, ইহা জানিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে।

যাঁহারা East is East and West is West তন্ত্রের প্রচারক, প্রাচ্য প্রকৃতি ও প্রতীচ্য প্রকৃতির চিরন্তন স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রচার করিয়া রাজতন্ত্রবিষয়ে পাশ্চাত্য প্রকৃতির বিশেষত্ব প্রদর্শনে উৎসাহসম্পন্ন, তাঁহারা অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ন্যায় প্রাচ্যদেশে রাজ্যশাসন ব্যাপারে প্রকৃতিপুঞ্জের মতামতের কখনই সবিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হইত না।—পার্লামেণ্টের ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি সভার

বা ফ্রান্সের স্থায় প্রজাতন্ত্রসভার উদ্ভাবন-বিষয়ে পাশ্চত্যগণই অদ্বিতীয়; —সেরূপ সভার কথা প্রাচ্যদেশে কখনও পরিকল্পিত হয় নাই—হইতে পারে না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশ লোকেরই ঐরূপ ধারণা, প্রাচীন শাস্ত্রে দৃষ্টির অভাব ও স্বাধীন চিন্তায় অনভ্যাসই শিক্ষিত ভারতবাসীর ঐরূপ ধারণার প্রধান কারণ।

যাঁহারা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় দেখিয়াছেন যে, গ্রীকরাজদূত ম্যাগেস্থিনীসের গ্রন্থে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র শাসন পদ্ধতির উল্লেখ আছে। ম্যাগেস্থিনীস বর্ত্তমান সময়ের ২২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বা খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাটলিপুত্রের (বর্ত্তমান পাটনার) রাজসভায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভারত-বিষয়ক গ্রন্থে এদেশের লোকের রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই উপাদেয় গ্রন্থ অধুনা আর সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না—বোধ হয় উহা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার গ্রন্থ হইতে পরবর্ত্তী কালের গ্রীকলেখকগণ যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আলোচ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এরিয়ান নামক গ্রীকলেখক ম্যাগেস্থিনীসের গ্রন্থ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর পর হইতে চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত ভারতে তিনবার "প্রজাতন্ত্রমূলক" শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় বারে তিনশত বর্ষকাল ও তৃতীয় বারে ১২০ বৎসর ঐরূপ শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন কিরূপ ছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। ম্যাগেস্থিনীসের মূল গ্রন্থে হয় ত সে বিবরণ ছিল—কিন্তু মূল গ্রন্থের অভাবে সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই বলা যায় না।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদে লিখিত

আছে যে, অতি পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে রাজা ও রাজত্ব ছিল না। মনুষ্যেরা ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইবার পর তাহারা পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। কারণ ঐ সময়ে মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। ফলে মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভ-পরতন্ত্র ও কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-শূন্য হইয়া উঠিল। তখন দেবগণের অনুরোধে ভগবান্ বিরজা নামক এক পুরুষকে উৎপাদন করিয়া জনসমাজের রাজা করিয়া দিলেন।

অথর্ব্ববেদে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। যথা:—

বিরাড্ বা ইদমগ্র আসীৎ।
তস্যা জাতায়া সর্ব্বমবিভেৎ।
ইয়মেবেদং ভবিষ্যতীতি ॥ ১।১০

অর্থাৎ প্রথমে এই জগৎ বিরাট্ বা রাজশূন্য (Kingless) ছিল। তাহা দেখিয়া সকলেই ভীত হইল। সর্ব্বত্র এইরূপ বিরাজকতা হইবে ভাবিয়া তাহারা ভীত হইল। অতঃপর

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদঃ
তপোদীক্ষামুপসেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং।
তদস্মৈ দেবা উপসংনমন্তু ॥ ১৯।৪১।১

ঋষিগণ জনসাধারণের কল্যাণকামী হইয়া দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে রাষ্ট্র, বল ও ওজঃ প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। এই কারণে দৈবী সম্পত্তিযুক্ত রাজাকে লোকের নমস্কার করা উচিত।

এইরূপে ঋষিগণের চেষ্টায় শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের উদয় হইল। জনসাধারণের শক্তিও এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল না। সেই অরাজকতা বা বিরাজকতাকালে জানপদীয়া শক্তিরও বিকাশ অভিনব রাজতন্ত্রের গঠনে অত্যন্ত সহায়তা করিয়াছিল। শ্রুতি বলিতেছেন,—

সা উদক্রামৎ। সা সভায়াং ন্যক্রামৎ। ৮
যন্ত্যস্য সভাং সভ্যো ভবতি য এবং বেদ। ৯
সোদক্রামৎ, সা সমিতৌ ন্যক্রামৎ। ১০
যন্ত্যস্য সমিতিং সামিত্যো ভবতি।
য এবং বেদ। ১২
সোদক্রামৎ সামন্ত্রেণ ন্যক্রামৎ। ১২
যন্ত্যস্যা মন্ত্রণাং, আমন্ত্রণীয়ো ভবতি।
য এবং বেদ। ১৩

অথর্ববেদ ৮.১০

অর্থাৎ সেই জানপদায় শক্তির উৎক্রমণ বা অভিব্যক্তি হইল ও তাহা সভায় পরিণত হইল। যিনি ইহা জানেন, তিনি সভ্য বা সভার যোগ্য হন। সেই শক্তির আবার উৎক্রমণ হইল ও তাহা সমিতিতে পরিণত হইল। যে (রাজা) ইহা জানেন, তিনি সমিতির যোগ্য হন, তাঁহার সমিতিতে লোকে গমন করে। সেই শক্তি আবার উৎক্রান্ত হইল, তাহাতে মন্ত্রণাসভার সৃষ্টি হইল। যিনি ইহা জানেন, তিনি আমন্ত্রণীয় হন, তাঁহার মন্ত্রণা সভায় লোকে গমন করে।

বৈদিককালে ভারতীয় আর্য্য সমাজে কিরূপ শাসন-তন্ত্র ছিল, তাহার আভাস এই সকল শ্রুতি-বচনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে তিনটি সভার—সমিতি, সভা ও মন্ত্রণা-সভার ও সদস্যদিগের উল্লেখ পাওয়া গেল। তাহার পর রাজার প্রার্থনা শ্রবণ করুন ;—

রাজানো রাজকৃতঃ সূতা গ্রামণ্যশ্চ যে।
উপস্তীন্ পর্ণমহ্যং ত্বং সর্ব্বান্ কৃণ্বভিতো জনান্।

অথর্ব্ব ৩।৫।৭

"সামন্ত নরপতিগণ, রাজনির্ব্বাচকগণ (the kingmakers), সূত ও সেনানায়কগণ, ও সকল লোকই যেন আমার অধীন হয়।" এই

মন্ত্রের রাজকৃতঃ পদটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও রাজ্যাভিষেক প্রসঙ্গে "রাজকর্ত্তা" ও "রাজকৃৎ" পদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকারেরা ঐ শব্দের অর্থ "রাজার আত্মীয়গণ বা সচিবগণ"—এইরূপ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে সে অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বরং রাজা যে প্রজাগণের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইতেন. ঐ পদে ইহাই বুঝায়। রাজা যে নির্ব্বাচিত হইতেন, ইহা নিম্ন লিখিত মন্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—

হ্বয়ন্তু ত্বা প্রতিজনঃ প্রতিমিত্রা অবৃষত।
ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বেদেবাঃ তে বিশিক্ষেমদাধরন্॥

অথর্ব্ব ৩।৩।৬

হে রাজা! তোমার বিরুদ্ধপক্ষীয় লোকেরা তোমায় পুনরায় আহ্বান বা সহায়তা করুক। তোমার মিত্রগণ তোমায় পুনরায় নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, ও অন্য দেবগণ প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে তোমার গৃহরচনা করিয়াছেন।" অন্যত্রও দৃষ্ট হয়, শ্রুতি বলিতেছেন—

"বিশি রাজা প্রতিষ্ঠিতঃ।"

প্রজাপুঞ্জই রাজার প্রতিষ্ঠার কারণ,

স বিশো অনুব্যচলৎ। ১।
তং সভাচ সমিতিশ্চ
সেনাচ সুরা চানুব্যচলন্। ২।
সভায়াশ্চ বৈ স সমিতেশ্চ।
সেনায়াশ্চ সুরায়াশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি
য[illegible]র চেষ্টায় শক্তি

অথর্ব্ববেদ। ১৫।৯

এ বিষয়ে নি[illegible]

যে রাজা প্রজ[illegible]সরণ করেন, সভা, সমিতি সেনা ও সুর (ঐশ্বর্য্য) তাঁহার অনুগমন করে। যিনি এই রাজনীতি জানেন, সেই

রাজা সভা, সমিতি সেনা ও সুরার প্রিয় আশ্রয় লইতে সমর্থ হন। এক্ষণে রাজার আর একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন—

"সভ্য! সভা মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদাঃ"।

অথর্ব্ব ১৫।৫৫

অর্থাৎ হে সভ্য সভাসদগণ! আপনারা আমার এই সহায়তা করুন।

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং
প্রজাপতে দুহিতরৌ সবিদানে
যে না সঙ্গচ্ছা উপ মা স শিক্ষৎ
চারুবদানি পিতরঃ সঙ্গতেষু॥

অথর্ব্ব ৭।১২।১

সভা ও সমিতি উভয়েই আমায় রক্ষা করুন। এই দুই সভা রাজার নিকট হইতে দূরে থাকিয়াও রাজাকে উপদেশ দান করেন। যে সকল সভাসদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহারা যেন আমায় উপদেশ দান করেন। হে আমার পালক বা পিতৃস্থানীয় সভাসদ্গণ! আমি সভামধ্যে নিয়ত ন্যায়সঙ্গত কথাই বলিব। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য "সমিতি" শব্দে "সাংগ্রামীণ সভা" অর্থ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সেকালে যে তিনটি সভা ছিল ও রাজাকে সেই সভার মতানুসারে চলিতে হইত, এমন কি প্রজার দ্বারাই রাজার নির্ব্বাচন হইত—এ সকল কথার স্পষ্ট আভাস এক্ষণে আমরা পাইতেছি।

ঋগ্বেদেও এইরূপ প্রতিনিধি-সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সকল অংশের ইংরাজী পদ্যানুবাদকালে অনুবাদক গ্রিফিথ সাহেব এক স্থলে বলিয়াছেন,—

This Samiti appears to have been a general assembly of the people on some important occasion such as the election of a king.

পরিশেষে অথর্ব্ববেদের "হ্বয়ন্ত ত্বা প্রতিজনঃ" প্রভৃতি মন্ত্রের টীকায় তিনি বলিয়াছেন—

Other passages also in the Atharva Veda show that the kingship was sometimes elective.

অর্থাৎ বৈদিক কালে রাজারা অনেক সময় প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। রাজার নির্ব্বাচনের জন্য প্রজাপুঞ্জের প্রকাশ্য সভা হইত। ফলকথা, যেখানে প্রজার দ্বারা রাজা নির্ব্বাচিত হন—রাজাকে প্রজাসমূহের প্রতিনিধি সভার মতানুসারে চলিতে হয়, সেখানকার রাজতন্ত্রকে বর্ত্তমান সময়ে পার্লামেণ্ট সভার সহায়তায় পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা কোনও অংশে সবিশেষ হীন মনে করিবার কি কোন কারণ আছে?

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সিন্ধু প্রদেশ।

লক্ষ্ণৌ নগরের একটী রাজকীয় পুস্তকাগারে একখানি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে। ইহাতে প্রথমতঃ মুসলমান রাজত্বের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েকখানি মানচিত্র ও কয়েকটী প্রদেশের ভৌগোলিক বিবরণও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ১১৯৩ খ্রীঃ লিখিত; সুতরাং ইহা যথেষ্ট প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে। ইহার প্রথম পাতটী ছিঁড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানি উপক্রমণিকা বলিয়া তাহাতে পুস্তকের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপে ভূমিকায় গ্রন্থের বিবরণ স্বয়ং দিয়াছেন—

পৃথিবীর তাবৎ চিত্রই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে সমুদায় প্রদেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচলিত, বিশেষ যত্নের সহিত আমি সেই সব দেশের আকার, প্রধান নগরের নাম, তাহাদিগের সীমান্ত-প্রদেশ ও অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি ইস্‌লাম-প্রধান দেশসমূহকে ২০টী ভাগে ভাগ করিয়াছি। প্রথমতঃ আরেবিয়ার কথাই বলিব। কারণ এই প্রদেশেই পবিত্র কাবা ও মেক্কা নগরীদ্বয় অবস্থিত। ইহার পর বোদনের কথা বলিব, তারপর পারসিন গাল্‌ফ, মাসরিব ইজিপ্ট, সিরিয়া, ভূমধ্য-সাগর-উপকূলে স্থিত প্রদেশ, মাসপোটামিয়া ইরাক, খুজিস্‌টান কার, কিরনান মানসুরা, (ও ইহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ যথা,—সিন্ধু ও ভারত) জিবাল, প্রভৃতি বহুস্থানের বিবরণ বিবৃত করিব।" বোধ হয় ঐ উক্ত ২০টী বর্ণিত স্থানের একটী করিয়া পুস্তকে ২০ খানি সুন্দর মানচিত্র ছিল। কিন্তু কালসংহারে কতিপয় চিত্র নষ্ট হইয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে সিন্ধুপ্রদেশের বিবরণ দেওয়া গেল।

মাসুরা একটী নগর। ইহা দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থে এক মাইল। ইহা একটী দ্বীপের ন্যায়। ইহা মুসলমান শাসনাধীন। জলবায়ু স্বাস্থ্যজনক। এখানে খর্জ্জুর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কান্দাহারে এই স্থানের মুদ্রা প্রস্তুত হয়। মুলতান আর একটী নগর। আয়তনে ইহা পূর্ব্বনগরের সমতুল্য। এখানে একটী হিন্দু-দেবপ্রতিমূর্ত্তি আছে, হিন্দুরা তাহাকে বড়ই ভক্তির চক্ষে দেখে। বৎসরে বৎসরে বহু দূরদেশ হইতে অগণ্য যাত্রীর সমাবেশ হয়। তাহারা প্রচুর অর্থে দেবপ্রসাদ ক্রয় করিতে চেষ্টা করে। মন্দিরে বহুশত সন্ন্যাসীর বাস। তাহারা ঈশ্বর আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করে; এবং যাত্রিগণের অর্থে নিরুদ্বেগে তাহাদিগের জীবনযাত্রা সম্পন্ন হয়। মন্দিরটির গাঁথুনী খুব মজবুদ। ইহা জনাকীর্ণ নগরের মধ্যস্থলে

অবস্থিত। ইহার নিকটেই মুলতানের বাজার। অসংখ্য ব্যাপারী হস্তিদন্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য মন্দিরের নিকট প্রতিনিয়ত বিক্রয় করিতেছে। মূর্ত্তি মন্দিরের মধ্যস্থলে বেদীর উপর স্থাপিত। যাজকগণ মন্দিরের মধ্যে অথবা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করে। মুলতানে হিন্দু ও পারসিকগণ কেহই মূর্ত্তিপূজা করে না; কিন্তু এই মূর্ত্তির সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। প্রতিমূর্ত্তির আকার মনুষ্যের ন্যায় এবং পা মুড়িয়া সমচতুষ্কোণ হইয়া উপবিষ্ট। ইহার আসন ইষ্টকনির্ম্মিত। সমস্ত দেহ লাল এবং চক্ষু ব্যতীত ইহার আবৃত দেহের আর কোন অংশই দর্শকের দৃষ্টি গোচর হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রতিমার দেহ দারু-নির্ম্মিত। কিন্তু আবার অনেকেই এ মতের পোষকতা করেন না। ফলতঃ ইহা যে প্রকৃতই দারুনির্ম্মিত কি না সে বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই; কারণ মূর্ত্তি প্রতিনিয়ত আবৃত থাকে। দুইখানি বহুমূল্য উজ্জ্বল প্রস্তর দ্বারা প্রতিমূর্ত্তির চক্ষু নির্ম্মিত; প্রস্তর দুইখানি সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে। এই স্থানে যাত্রিগণ ধর্ম্মাচরণে আসিয়া যে অর্থ দেবোদ্দেশে দান করে, তাহার অধিকাংশই মুলতানের আমিরের প্রাপ্য—তিনিই গ্রহণ করেন এবং তিনি স্বয়ং মন্দিরের কর্ম্ম-চারিগণের মধ্যে যোগ্যতানুসারে বিতরণ করেন। কখন কখন ভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণ এই মূর্ত্তি জোর করিয়া লইয়া যাইবার জন্য মন্দিরের সেবাব্রতগণের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তখন তাহারা প্রতিমূর্ত্তি বাহিরে আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে—এইরূপ ভয় দেখায়। তাহাতে আক্রমণকারিগণ নিরস্ত হয়।

মুলতানে একটি অভেদ্য দুর্গ আছে। এখানে দ্রব্যাদি সুলভ। মুলতানে স্বর্ণখনি আছে। মুসলমানগণ যে সময় মুলতান জয় করে, সে সময় আর এমন দরিদ্র মুসলমান কেহ ছিল না যে, মুলতানের স্বর্ণে আপন সৌভাগ্যের সূত্রপাত করিতে পারে নাই। মুলতানের

শাসনকর্ত্তা চান্দওয়া রায় অবস্থান করেন, তিনি বড় একটা মুলতানে আসেন না। কেবল প্রত্যেক শুক্রবারে হস্তিপৃষ্ঠে উপাসনার জন্য নগরে পদার্পণ করেন।

মিরান নদীর তীরে বাসমাদ আর একটী ক্ষুদ্র নগর। মিরান নদী এক "পারসান" (Leogue) দূর দিয়া প্রবাহিত। অধিবাসগণ এই নদীর জলই ব্যবহার করে। এখানে একটী দুর্গ আছে। সিন্ধু প্রদেশে প্রাচীরের জন্য আলোর (এই নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত), তরবারির জন্য দেবাল, উমারের (রাজপুত্র) বাসস্থানের জন্য বিলহা (বানিয়া) প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর আছে। (সে সমুদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ উক্ত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না।) কান্দাবিল নামক একটী স্থানে বৌদ্ধগণ সন্ন্যাস ছাড়িয়া ব্যবসা করিয়া থাকে। তাহারা বড়ই অদ্ভুত গৃহে বাস করে। তাহাদিগের গৃহ শর-নির্ম্মিত, ঘড়ের ছাওনী দেওয়া। তাহারা বহু গৃহপালিত পশ্বাদি লইয়া বাস করে।

কামাল, সিদান, সেমুর প্রভৃতি স্থানে জুম্মা মসজিদ অবস্থিত। এই সমুদায় স্থানই ক্ষুদ্র। এই সব স্থানে ইসলাম ধর্ম্মই প্রচলিত।

মানসুরা হইতে দেবাল ছয় দিনের পথ। মানসুরা হইতে মুলতান বার দিনের পথ। মুলতান হইতে বাসমাদ দুই দিনের পথ, এবং বাসমাদ হইতে আলোর তিনদিনের পথ।

সিন্ধু নদ মুলতান হইতে তিনদিনের পথে ; ইহা এক বিরাট নদ। জলের পর জল, সে জলের বিরাম নাই।

এই উপরি উদ্ধৃত অংশ সমূহ আমরা উক্ত পাণ্ডুলিপির নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা অনেক স্থলে আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র।

শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি।

পূর্ববঙ্গের রাজবংশ।

নাটোর।

(২)

লস্করপুর পরগণায় নাটোর মৌজায় কামদেব নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কামদেবের তিন পুত্র রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। পুঁঠিয়া-রাজ দর্পনারায়ণের সময় রঘুনন্দন ঐ সরকারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। রঘুনন্দন স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সদাচারে অচিরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমতঃ রঘুনন্দন গৃহ-দেবতার পূজায় ফুল বেলপাতা চয়ণ কার্য্যে নিযুক্ত হন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, একদিন এইরূপ ফুল তুলিতে তুলিতে, তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া, বাগানেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন এবং বিষধর কালসর্প তাঁহার মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া সূর্য্যের তাপ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে থাকে (১)। এই অলৌকিক কথা যথা সময়ে দর্পনারায়ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি

(১) Raghunandan was employed in the Putiya family. He at first served in an humble capacity; but he subsequently rose to power and affluence partly through the influence of that family and partly through his own inteligence, running and unscrupulousness, It was originally his business, as we have already stated, to gather flowers, for the Puja of the family idols. Tradition says that on one occasion, while he was employed in the vocation, he was fatigued and fell asleep in a garden and a snake was observed to spread its hood over his head to protect him from the scorching sun. This circumstance being reported to Darpanarayan, the head of the family, he was surprised at it predicted for the future greatness of Raghunandan. He for Raghunandan, assured him that he would be a great Puja and extorted from him a promise not to dispose his family by fair or foul means of the Pargana askarpur. *The Territorial Aristocracy of Bengal. Calcutta Review 1873.*

বিস্মিত হইলেন এবং রঘুনন্দনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। রঘুনন্দনের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল দেখিয়া দর্পনারায়ণ তাঁহার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র সম্পাদন করাইয়া লইলেন। এই পত্রে রঘুনন্দন প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে কখনও লস্কর-পুর পরগণা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রঘুনন্দন জানিতেন, তাঁহার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে লস্করপুর গ্রহণ এক প্রকার আকাশ-কুসুম; সুতরাং তিনি কোনও প্রকার আপত্তি না করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে আবদ্ধ হইলেন।

তৎকালে রাজধানীতে প্রত্যেক গণ্যমান্য জমিদারদের এক এক জন মোক্তার, জমিদারের স্বার্থ ও সম্মান বজায় রাখিবার জন্য নিয়োজিত থাকিত। (১) এই সকল মোক্তারদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্যতৎপরতার উপরেই বাঙ্গালার জমিদারদিগের মান সম্ভ্রম ও জমিদারী নির্ভর করিত। সুতরাং যাঁহারা স্বয়ং নবাব দরবারে বাস করিতে পারিতেন না, তাঁহারা নিজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করিতেন। এই সময়ে মোক্তারগণ রাজধানী জাহাঙ্গীর নগরে থাকিয়া কাননগো দপ্তরে হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিতেন। এই কার্য্যে দুইজন কাননগো নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা নবাব দেওয়ানের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করিয়া সিলমোহর করিয়া দিলে বাদশাহ তাহা গ্রহণ করিতেন; সুতরাং সুবাদারেরাও তাহাদিগকে একটু ভীতির চক্ষে দেখিতেন।

মুর্শিদ কুলিখাঁ নবাব হইয়া জাহাঙ্গীর নগরে আসিলে পুঁঠিয়ারাজ

(১) It was the custoum for the land-holders of distinction and other principal inhabitants to maintain in proportion to their rank an intercourse with the ruling power, and in person or by Vakil or agent to be constant attendance at the seat of the Government.

Fifth Report of Celcutta Review 1357.

দর্পনারায়ণের পক্ষ হইতে একজন মোক্তার নিযুক্ত করার আবশ্যক হয়। রঘুনন্দনের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া দর্প-নারায়ণ তাঁহাকে এই কার্য্যের উপযুক্ত মনে করিয়া জাহাঙ্গীর নগরে পাঠাইলেন। প্রতিভা কাহারও হাত ধরা নহে। রঘুনন্দনের অসীম প্রতিভার সম্যক্ পরিচয়, নবাব অচিরেই প্রাপ্ত হইলেন। রঘুনন্দনের সহজ সুকৌশল হিসাব নিকাশ প্রণালীতে প্রীত হইয়া নবাব তাঁহাকে কাননগো দপ্তরে "নায়েব কাননগো" পদে নিযুক্ত করিলেন *। দেখিতে দেখিতে রঘুনন্দন কাননগো দপ্তরে সর্ব্বেসর্ব্বা এবং নবাব দরবারে একজন ক্ষমতাপন্ন রাজকর্ম্মচারী হইয়া উঠিলেন। এই কার্য্যে মানসম্ভ্রম ও খ্যাতিপ্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইল।

এই সময় দিল্লীর সম্রাট আরঙ্গজেব বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। এই অপ্রীতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মুর্শিদকুলি খাঁ এক হিসাব প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু কাননগো তাহা দস্তখত করিতে সম্মত না হইলে মুর্শিদকুলি রঘুনন্দনের শরণাপন্ন হন (১)।

* Being satisfied with rare abilities both as lawyer and financier the Kanangu employu him as his assistant or Naib-Kanango.
Calcutta Review 1873.

(১) After this time the Nawab incurred the severe displeasure of his suzerian by his careless management of the Subha. With a view to ward off his majesty's displeasure and win back his favour, the Nawab had a false statement of account prepared. The Kanango being called upon to sign and stamp it with his seal, he refused to do so. The Nawab was placed in a delemma. During this crisis, the Nawab, *according to tradition*, sent for Raghunandan and asked him to put the seal on this account Raghumandan complied with the requisition. The account was sanctioned by the Emperor and Nawab was saved. *The Territorial Aristocracy of Bengal.*

এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন—"সম্রাট-পৌত্র আজিমশ্মানের সহিত মুর্শিদকুলিখাঁর মনোমালিন্যের পর কুলিখাঁ হিসাব নিকাশ লইয়া স্বীয় সম্রাটের নিকট গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অবস্থা বলিবার অবসর পাইবেন, এই চিন্তায় আজিমশ্মানের মুখ শুকাইয়া গেল; তিনি কানন-গোদিগকে নবাব দেওয়ানের হিসাবে মোহর দস্তখত না করার জন্য শাসন করিয়া দিলেন; সুতরাং কেহই সম্রাট-পৌত্রের বিরুদ্ধে যাইতে সাহসী হইল না, কুলিখাঁর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যদি একজন কাননগোও মোহর দস্তখত না করেন তবে সে কাগজে বাদশাহ দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং নিতান্ত অপদস্থ হইয়া, তাঁহাকে নবাবী পদ ত্যাগ করিতে হইবে। তখন অনন্যোপায় হইয়া নায়েব কাননগো রঘুনন্দনের শরণাগত হইলেন।" রঘুনন্দনের চেষ্টায় একজন মাত্র কাননগোর মোহর দস্তখত যুক্ত হিসাব ও বহুতর উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া কুলিখাঁ সম্রাটের নিকট গমন করিলেন। সম্রাট তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, অর্থের তখন বড়ই অনাটন; কুলিখাঁও বহুতর অর্থ লইয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান; সুতরাং দুইজন কাননগো কেন মোহর দস্তখত করেন নাই, সে কথা বলিবার সময় হইয়া উঠিল না। বাদশাহ উপঢৌকন দ্রব্য ও রাজকর গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদের চিহ্ন স্বরূপ মূল্যবান্ রাজ পরিচ্ছদ "খেলাত" দিয়া কুলীখাঁকেই বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার একমাত্র নবাব করিয়া পাঠাইলেন। কুলীখাঁ আসিয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং উপকারী বন্ধু রঘুনন্দনকে আনাইয়া তাঁহাকে "রায় রাইয়ান" বা দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। রঘুনন্দনের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল।

তৎকালে দেওয়ানই প্রকৃত প্রস্তাবে নবাব ছিলেন। লোক সহসা দেওয়ানের অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিয়া নবাব দরবারে গমন করিতে পারিত না; সুতরাং রাজা জমিদার সকলকেই দেওয়ানের নিকট নত

জানু হইয়া তাঁহার শুভ কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করিতে হইত। রঘুনন্দন (১) এখন মান সম্ভ্রম ও উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। সেই উচ্চক্ষমতা ও প্রতিভার সম্মিলনে এই নাটোর রাজ্য স্থাপিত হইল।

মুসলমান শাসন-সময়ে যাঁহাদের রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তাঁহাদের আত্মীয়েরাই অতি সহজে অন্যের জমিদারী হস্তগত করিতে পারিতেন। রঘুনন্দনের নবাব-দরবারে প্রভুত্ব হইল এবং সেই প্রভুত্বই রামজীবনের রাজ্যলাভের মূল কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রামজীবন বুদ্ধিবলে এবং প্রবল পরাক্রমে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করায়, অতি অল্প দিন মধ্যে নবাবের প্রিয় জমিদার বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছেন। তখন বিনা চেষ্টায় অনেক জমিদারী রামজীবনের হস্তগত হইল। রামজীবন পুঁঠিয়ার রাজাদিগের অধীন তরফ কানাইখালীর অন্তর্গত নাটোরে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া প্রবল-প্রতাপে জমিদারী শাসন করিতে লাগিলেন এবং নবাবের অনুকম্পায় দিল্লী হইতে ২২খান 'খেলাত' ও রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়া ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নাটোরের রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন।

মুর্শিদ কুলীখাঁ বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া, রাজস্ব নির্দ্ধারণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। এই কার্য্য রঘুনন্দন তাঁহার

(১) His Excellency evinced his gratification and gratitude by appointing Raghunandan Ray Rayan and Dewan. The Ray Rayan is the principal officer of the province rent Dewan and the Dewan represent the Nawab in all matters of detail regarding the Government. These posts opened to him a vista of greatness and enabled him to reap a rich harvest of rupees. The Dewanship was especially a post of great importance and honour. It clothed incumbent with the powers of the Nawab.

Calcutta Review

দক্ষিণ হস্ত। সমুদয় দেশ ১৩টী চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত করিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের ভার দৌহত্রী-পতি সৈয়দ রেজা খাঁর উপর অর্পিত হইল। রেজাখাঁ অমানুষিক দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন কিন্তু রাজস্ব আদায় হইল না। অবশেষে রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতার নামে নূতন নূতন জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) মুর্শিদ কুলিখাঁর দেওয়ানী আমলে পরগণা বানগাছির চৌধুরী গণেশ রায় ও ভগবতীচরণ বারংবার রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায় রাজ্যচ্যুত হন। এই জমিদারী রঘুনন্দন রামজীবনের নামে কৌশলে দখল করিয়া লন। ১১১৩ সালে প্রথম জমিদারী প্রাপ্ত হন।

(২) বাঙ্গলা ১১১৭ সালে (১৭১০ খৃঃ) পরগণা ভাতুরিয়ার সাঁতুল রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সর্ব্বাণী উত্তরাধিকারী ছিলেন। রাণী সর্ব্বাণীর নামে দেওয়ান রঘুনন্দন সাঁতুল রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাণীর মৃত্যুর পর রঘুনন্দনের ভ্রাতা রাম-জীবন ও তৎপুত্র কালিকাপ্রসাদের নামে বন্দোবস্ত হয়। *

(৩) উদিত নারায়ণ সমস্ত রাজসাহীর জমিদার ছিলেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য তাঁহার অধীনে গোলাম মহম্মদ নামক একজন মুসলমান জমাদার এবং দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। কয়েক মাসের বেতন না পাইয়া উদিতের সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সংবাদ পাইয়া নবাব বাহুবলে বিদ্রোহ দমন করিবার আশায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবাব-সৈন্যের সহিত বিদ্রোহী সৈন্যের যুদ্ধে গোলাম মহম্মদ নিহত হন। মনঃকষ্টে উদিত নারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন। (১) উদিতের দুটি শিশু পুত্র ছিল। শিশুর শাসনাধান রাজ্য নিরাপদ নহে

* Raja of Rajshahi

(১) Stuarts History of Bengal.

মনে করিয়া নবাব রঘুনন্দনকেই রাজসাহী রাজ্য প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে রামজীবন ও তৎপুত্র কালিকাপ্রসাদের নামে রাজসাহী রাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

* (৪) বাঙ্গালা ১১২২ সালে নবাব নলদাহ পরগণা রামজীবনকে প্রদান করিলেন।

রাজসাহীর জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া রাজা রামজীবন রাজসাহীর মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব দরবারে সর্ব্বপ্রধান সামন্তের আসন প্রাপ্ত হইলেন। *

রঘুনন্দনের মন্ত্রণা ও প্রতিভাবলে বাঙ্গালা দেশে অধিকাংশ পরগণাই নবাবের করায়ত্ত ছিল কিন্তু তখনও দক্ষিণ বঙ্গে সীতারামের স্বাধীন পতাকা পতপত করিয়া নবাবের রাজশক্তিকে উপহাস করিতেছিল।

রাজা সীতারাম প্রবল-প্রতাপান্বিত মুসলমান রাজত্বের এক কোণে বাস করিয়াও একদিনের জন্যও যবন-রাজকে কর প্রদান করেন নাই। বিন্দু বিন্দু জল একত্র করিয়া মহাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে, কণা কণা ধূলি লইয়া বিশাল মরুভূমি গঠিত হইয়াছে—সীতারাম ভাবিলেন ভোগবিলাস-নিরত বাদশাহের দুর্ব্বল মুষ্টি হইতে তিল তিল করিয়া বঙ্গভূমি কাড়িয়া লইয়া পুনরায় নূতন হিন্দুরাজ্য গঠন করিবেন? সীতারামের আশায় আকাশ কুসুম মুকুলেই শুষ্ক হইয়া গেল। কিন্তু তাহার সৌরভটুকু আজও ইতিহাস-বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গলার নিকট সীতারামের সমুচিত সমাদর হয় নাই, কিন্তু ইতিহাসের বিনোদ নিকুঞ্জে যদি প্রতাপাদিত্যের বা মহারাষ্ট্র-কুলতিলক শিবাজির জন্য অমর সিংহাসন নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তবে তাহার পার্শ্বে কায়স্থ-কুল-প্রদীপ সীতারামের স্থানই বা হইবে না কেন?

* সাহিত্য ১৩০৪ সাল।

এই ক্ষুদ্র পরগণাদার সীতারামকে পরাস্ত করিবার জন্য নবাব যতই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন, সীতারামের প্রবল পরাক্রম ততই চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। নবাব অবশেষে মন্ত্রণাদাতা রঘুনন্দনের উপর সকল ভার অর্পণ করিলেন। রঘুনন্দন নাটোর রাজবংশের সুচতুর দেওয়ান দয়ারাম রায়কে সংগ্রামসিংহের অধীনে সৈন্যদলের সহিত ভূষণায় প্রেরণ করিলেন। এতদিন বাহুবলে যাহা হয় নাই এইবার তাহা সিদ্ধ হইল। সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইলেন।

সীতারামের রাজ্য ভূষণা ইব্রাহিমপুর এখন রামজীবনের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিল। এবং রামজীবনের কর্ম্মচারী দয়ারাম "রায় রাইয়া" উপাধি ও সীতারামের তৈজস পত্র প্রাপ্ত হইলেন, এখন হইতে মহারাজা রামজীবন স্বরাজ্যে স্বাধীন নরপতির ন্যায় সমুদায় ক্ষমতাই পরিচালন করিবার অধিকার পাইলেন। এর পর মহারাজ রামজীবন ক্রমে ক্রমে নূতন জমিদারী পাইতে লাগিলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষরূপ উল্লেখ যোগ্য হাবেলি, মহম্মদাবাদ, সাহুজিয়াল, তুক্সী, স্বরূপপুর প্রভৃতি পরগণাগুলি কিশোর খাঁ সমসের খাঁ ও এলায়েত খাঁর জমিদারী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। পুখুরিয়ার জমিদারীও তখন ইস্কান্দার বেগ নামক একজন মুসলমান জমিদারের অধীন ছিল। নরহত্যা অপরাধে এই সকল জমিদার রাজ্যচ্যুত হইলে রামজীবন সেই সকল জমিদারী প্রাপ্ত হন। জালালপুরের জমিদার এনায়েতুল্লা রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া ফতেহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি পরগণা রামজীবনের নিকট বিক্রয় করেন। এইরূপে এই সময়ে তাঁহার জমিদারী পশ্চিমে সাহুজিয়াল এবং ভূষণা পূর্ব্বে নলদি ও মকিমপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সাধারণ লোকে নাটোর রাজবাড়ীকে ৫২ লক্ষের জমিদারী বলিয়া থাকে। *

১১৩১ বঙ্গাব্দে রামজীবনের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র কালিকাপ্রসাদ

* Raja of Rajshahi.

কালগ্রাসে পতিত হন। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! পুত্রের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই, সেই বৎসর নাটোর বংশের প্রতিষ্ঠাতা, নবাবের মন্ত্রণাকুশল প্রিয় সহচর রঘুনন্দন ভ্রাতাকে কাঁদাইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ রামজীবন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এবং এই বিশাল সম্পত্তি কে উপভোগ করিবে, তাহাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল; কেহ দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন, কেহ বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকেই রাজ্য দান করিবার প্রস্তাব করিলেন। অবশেষে দত্তক পুত্র রাখাই স্থির হইল এবং রামকান্তকে দত্তক গ্রহণ করিলেন। দত্তক-পুত্র গ্রহণের পর দেবীপ্রসাদ রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। রামজীবন দত্তক-পুত্রকে রাজ্যের ৷৷৵০ আনা ও দেবী প্রসাদকে ।৵০ আনা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু দেবীপ্রসাদ সম্মত না হওয়ায় সমগ্র রাজ্য দত্তক-পুত্র রামকান্ত প্রাপ্ত হইল।

রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর রামজীবনের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া অনেকে তাহার শাসন ক্ষমতা চূর্ণ করিতে আয়োজন করিয়াছিল কিন্তু প্রভুভক্ত দয়ারামের শাসন কৌশলে আবার চারিদিকে প্রবল প্রতাপ বিরাজিত রহিল।

দয়ারামের উদ্যোগে বগুড়া জেলার ছাতানি গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত কুমার রামকান্তের বিবাহ হয়। বিবাহে রামজীবনকেও ছাতানি গ্রামে পদধূলি দিতে হইয়াছিল। এই পরমাসুন্দরী রাজলক্ষ্মীই বাঙ্গালার ইতিহাসে সুপরিচিতা প্রাতঃস্মরণীয়া —রাণী ভবানী। এই বিবাহের পর রামজীবন অধিক দিন জীবিত ছিলেন না।

নাটোর রাজবংশের ইতিহাসে দয়ারামের স্মৃতি চির-জীবন্ত। দয়ারাম একজন অসাধারণ লোক। তিনি যদিও কোনও উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি বহু গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি রামজীবনের অধীন

ক সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন *। ক্রমে তাঁহার কার্য্য-নৈপুণ্যের রিচয় পাইয়া দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। দয়ারাম সাহসী, প্রভুভক্ত ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলিয়া রামজীবন তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। দয়ারাম যেরূপ ভাবে রাজসাহী রাজ্যের শাসন ভার পরিচালন করিয়াছেন, তাহা যথার্থই সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইহাতে দয়ারামের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিরপেক্ষ স্বভাবের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। একদিকে যেমন রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদে বসিয়া জমিদারী গ্রহণ করিতেছিলেন; দয়ারাম তখন নাটোরে বসিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন। দয়ারামের প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া রামজীবন সময় সময় তাঁহাকে বড় বড় তালুক প্রদান করিতেন। রাজকুমার রামকান্ত দয়ারামকে দাদা বলিয়া ডাকিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মন্ত্রী দয়ারামকেই রাজকুমার রামকান্তের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া রামজীবনও পরলোক গমন করেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রামজীবনের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে সময় রামকান্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক। দয়ারাম সে সময় এমন কৌশলে রাজ্যরক্ষা করেন যে, দেবীপ্রসাদ নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াও কোনও ফল লাভ করিতে পারেন নাই। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় দীঘাপাতিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখনও তিনি রামকান্তের মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন।

* He first appears on a stage of Natore an inferior officer of Raja under its founder Ramjiban. But consummate tact of ar judgment he convinced in the transaction of Zaminderri rs soon won the golden opinions of his chief & he was soon pointed the Dewan of the Raja.

Raja of Rajshahi.

১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রামকান্ত স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইলে নবাব সুজা খাঁর আদেশে ঐ সম্পত্তি রামকান্তের হস্তে সমর্পিত হইল।* ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রামকান্ত জমিদারী স্বরূপপুর পাতিলাদহ প্রাপ্ত হইলেন।† রামকান্ত অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী রাজসাহী রাজ্য নিম্নলিখিত পরগণায় বিভক্ত করেন।

রাজসাহী প্রদেশে	৭৮ পরগণা।
ভাতুড়িয়া	২৩ „
ভূষণা	২১ „
বাজে মহাল	৪২ „

এই ১৬৪ পরগণায় বার্ষিক রাজস্ব ১৮৫৩৩.৫ টাকা ধার্য্য ছিল।

সুজা খাঁর পর সরফরাজ খাঁ নবাব হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিয়ার প্রান্তরে পরাজিত করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার মসনদে বসিলেন। এ সময় রাজা রামকান্তের নিকট রাজসরকারের বহু রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে। সুতরাং বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রামকান্তকে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে উপদেশ দিলেন এবং রাজস্ব না দিলে রাজ্যরক্ষাও হইবে না—ইহাও বলিলেন। পিতৃ বিশ্বাসী দয়ারামের কথার মর্য্যাদা রক্ষা দূরে থাকুক, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অবশেষে দয়ারামকে মন্ত্রিপদ হইতে চ্যুত করিলেন। এই অসম্ভাবনীয় অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রামকান্তকে শিক্ষা দিবার জন্য আলীবর্দ্দী খাঁর সমীপে উপস্থিত হইয়া রামকান্তের রাজ কার্য্যে শৈথিল্য ও রাজস্ব বাকীর বিষয় বিস্তারিত জ্ঞাত করাইলেন। নবাবদরবারে দয়ারামের বেশ প্রতিপত্তি ছিল; সুতরাং দয়ারামের

* সাহিত্য ১৩০৪

† Raja of Rajshahi.

খাঁ বিশ্বাস করিয়া নবাব রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিলেন এবং
দয়ারামের পুত্র দেবীপ্রসাদকে রাজ্য অর্পণ করিলেন। রামকান্ত ও
রাণীভবানী অনন্যোপায় হইয়া জগৎশেঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।
জগৎ শেঠ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন অবশেষ দয়ারামের
শরণাগত হইলে তাঁহার স্নেহের হৃদয় বিগলিত হইল, বিশেষতঃ
রাণী ভবানীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকায় দয়ারাম আর স্থির থাকিতে
পারিলেন না, কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। অবশেষে
নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ রামকান্তকে রাজসাহী রাজ্য প্রদান করিতে
বাধ্য হইলেন এবং বিশ্বাসী দয়ারামই মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। *
এ সম্বন্ধে বহু যুক্তি দেখাইয়া ঐতিহাসিক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্র
মহাশয় বলেন, "কুচক্রী দেবীপ্রসাদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়াই যে রামকান্ত
ও রাণীভবানীকে রাজ্যচ্যুত ও গৃহতাড়িত হইতে হইয়াছিল এবং
প্রভুভক্ত দয়ারাম এবং ক্ষমতাশালী জগৎশেঠের অধ্যবসায়-গুণেই
যে তাঁহারা নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তাহাই
বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত।"

রাণী ভবানীর গর্ভে রামকান্তের দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম-
গ্রহণ করে। পুত্রদ্বয় অকালেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কেবল কন্যা
তারাকে জীবিত রাখিয়া ও দত্তক পুত্রের অনুমতি দিয়া বাঙ্গালা ১১৫০
সালে (১৭৪৮ খৃঃ অব্দে) রামকান্ত পরলোক গমন করেন।

রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর. রাণী ভবানী রাজসাহীরাজ্যের ভার
গ্রহণ করিলেন। রাজসাহী জেলার খাজুড়া গ্রামের রঘুনাথ লাহিড়ীর
সহিত কন্যা তারার বিবাহ হয়। রাণীভবানী জামাতা রঘুনাথের হস্তে
রাজ্যভার অর্পণ করিবেন বলিয়া নবাবদরবারে রঘুনাথের নাম জারি
করিয়াছিল এবং রাজ্যের ভারও জামাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল;

* Raja of Rajshahi.

কিন্তু বাঙ্গালা ১১৫৮ (১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে) সালে জামাতার মৃত্যু হওয়ায় রাণী ভবানী স্বয়ং রাজ্য পুনঃ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন ইহার পর ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ নন্দকুমারের চক্রান্তে রাণী ভবানী রাজ্যচ্যুত হন এবং গৌরীপ্রসাদ রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জগৎশেঠের কল্যাণে রাণী ভবানী কয়েকমাস মধ্যেই নষ্টরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। *

রাণী ভবানী পুণ্যশীলা এবং ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া ঘরে ঘরে পূজিতা। তিনি সর্ব্বদা দেবসেবা ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তিনি অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বরী হইয়াও ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। তিনি জমিদারী কার্য্যে বিচক্ষণ-কার্য পটুতার ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি দয়ারামের কার্য্যপটুতার সম্যক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং গুরুতর কার্য্য তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত করিতে সাহসী হইতেন না। তিনি ঐশ্বরিক গুণসমন্বিতা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে নাটোরের নাম বঙ্গালার চতুর্দ্দিকে অতি আদরের সহিত গৃহীত হইত। তিনি অহঙ্কারী ছিলেন কিন্তু সদাশয়। এক সময় তিনি ব্রহ্মোত্তর লাখেরাজসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পান যে, অনেক সনন্দে রামজীবনের দস্তখত নাই কিন্তু দয়ারাম তাহাতে দস্তখত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি চটিয়াছেন অথচ মিষ্ট কথায় দয়ারামকে বলিলেন যে, রামজীবনের যাহাতে দস্তখত নাই সেই সকল লাখেরাজ আমি বন্ধ করিব। দয়ারাম হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন 'যদি রামজীবনের দস্তখত নাই বলিয়া লাখেরাজ বন্ধ করিতে হয়, তবে আপনার বিবাহের চিঠিতেও রামজীবনের

* In 1165 she was deprived of the Raj through the Intrigue of Nandakumar Rai & it was given to Gouriprosad son Deviprosad. Gouriprosad held the Ray for few months & then it was made over to Moharani.

নাই সুতরাং বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। যেহেতু ঐ সকল পত্র আমিই দস্তখত করিয়াছি ” ইহাতে রাণী একটু অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইলেন এবং দয়ারামের উপদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আরও লাখেরাজ প্রদান করিলেন।

রাণী ভবানী শুধু জমিদারী কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, তিনি ধর্ম্মকার্য্যের জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি অতিথিশালা ও দীন দরিদ্রের জন্য অন্নসত্র স্থাপন করেন। বারাণসী তীর্থে তিনি ৩৮০টী অন্নসত্র, অতিথিশালা ও ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ করেন। তাহারা আজও রাণী ভবানীর যশোগান করিয়া জয় ঘোষণা করিতেছে। তিনি ১০ মাইল ব্যাপী বারাণসীর চতুর্দ্দিকে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। মুর্শিদাবাদে শ্যামরাম নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ও তাহার খরচ নির্ব্বাহের জন্য বিপুল জমিদারী প্রদান করেন। রাণী ভবানী রাজনীতিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, দাতা, পরোপকারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সৎকার্য্যান্বিতা ও বিবিধ গুণরাজিতে ভূষিতা ছিলেন।

রাণী ভবানী যে বিপ্লব-সংক্ষুযুগে নাটোর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যে প্রকার সহৃদয়তার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া রাজ্য-পরিচালন করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিক সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য।

এই তরঙ্গচঞ্চল-নীলাম্বুবিধৌত-চরণ বঙ্গভূমির অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা জগতের সর্ব্বত্র বিদিত। এই ঐশ্বর্য্যের জন্য বঙ্গমাতাকে যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। একদিন পাঠান-সেনা সোণার বাংলা বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, তারপর আবার পাঠানকে সুবর্ণরেখাতীরে নির্ব্বাসিত করিয়া মোগলের বিজয় বৈজয়ন্তীতে বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তর মুখরিত হইয়াছিল। তারপর রাণী ভবানী যখন নাটোর রাজ্যের সুবর্ণসিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন আবার বঙ্গভাগ্যে অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লব সূচিত হয়। ইহাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ “বর্গীর হাঙ্গামা”।

মহারাষ্ট্র-প্রদীপ শিবাজীর জীবলীলার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাষ্ট্র-প্রদেশে লুণ্ঠনলোলুপ একদল দস্যু ভারতের বিবিধ প্রদেশে আত্মবিস্তার করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। ইহাদের বারবার আক্রমণে পতনশীল দিল্লী-সম্রাট্ আরও নিস্তেজ হইয়া যায়। এই মহারাষ্ট্রবাহিনী শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালার কানন-প্রান্তর মুখরিত করিয়া "হর হর মহাদেব" রবে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত করিল। বাঙ্গালার শ্যামল প্রান্তর শ্মশানে পরিণত হইল। নবাব আলিবর্দ্দি সে শক্তির সংঘর্ষে দাঁড়াইতে পারিলেন না, মুর্শিদাবাদ রাজধানী পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইয়া গেল।

বর্গীর হাঙ্গামা তখন বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইয়া গেল। আজ এখানে, কাল সেখানে আক্রমণকারীর নির্য্যাতনে প্রজাকুল প্রপীড়িত হইতে লাগিল। দুর্ব্বল রাজশক্তি প্রজাপালনে অসমর্থ দেখিয়া দলে দলে লোক, গঙ্গার প্রবল প্রবাহ উত্তীর্ণ হইয়া, পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে পলাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখনও রাণীর সুবন্দোবস্তে রাজসাহীর প্রজাদল সে নির্য্যাতন সহ্য করে নাই। নবাব আলিবর্দ্দিও নিজ পরিবারের জন্যও রাজসাহী রাজ্যই নিরাপদ মনে করিয়া রামপুর বোয়ালিয়ার অনতিদূরে গোদাগড়ি গ্রামে এক নূতন নবাব বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। কেল্লা বারুই পারা'তে অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ বিরাজিত আছে।

অতঃপর যৎকালে বঙ্গীয় রাজনৈতিক গগনের এক দিকে মোগল-শাসন-গৌরব-সুধাকর অস্তাচল গমনোন্মুখ,—অথচ ইংরেজ-শাসন-দিনকর উদয়াচল-শিখরে আরোহণ করিয়া মহিমাময় কিরণজালে বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত করেন নাই—অরাজকতার ঘোর তিমিরের সুযোগে বঙ্গদেশ দস্যুতস্করাদি নিশাচরগণের ক্রীড়াক্ষেত্ররূপে পরিণত হওয়ায়, প্রজাকুল তাহাদের নির্য্যাতনে হাবুডাবু খাইতে লাগিল, তখন রাণী ভবানীর কার্য্যনৈপুণ্যে রাজসাহীর বুকের উপর ঐ সকল পিশাচ তাণ্ডবনৃত্য

করিবার সুযোগ পায় নাই,—তখনও রাজসাহী সুশাসনে পরিচালিত হইতেছিল।

রাণী ভবানী সর্ব্বপ্রকারে রাজসাহীর প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিপ্লব-সান্ধ্য-যুগেও রাজসাহীবাসীর কোনও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। এই সময় রাজসাহী রাজ্যের আয় সম্বন্ধে Holloway লিখিয়াছেন,—"Raja Ramkanta of the race of Bramhins who deceased in the year 1748 and was succeeded by his wife; a princess named Bhawani Rani, whose Dewan or minister was Dayaram of the Teely caste. They possess a tract of country about thirtyfive days travel and under a settled Government their stipulated annual rent to the crown was seventy lacs of sicca Rupees the real revenues about one Krore and a half.

বাঙ্গালায় যখন বড় দুর্দ্দিন—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাঙ্গালার নামমাত্র নবাব খায় আর ঘুমায়—ইংরেজ ডিস্পাচ্ লিখে, বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়, সেই দুর্দ্দিনে দীনপালিনী রাণী ভবানী রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া প্রজারক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী রাণী ভবানীর রাজকোষ দুর্ভিক্ষাবসানে অর্থশূন্য হইয়া গেল, তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে দিন গণিতে লাগিলেন!

এই সময়ে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার গভর্ণর। তিনি এক কমিটি গঠন করিলেন, তাহাতে মেম্বরগণ পরগণায় পরগণায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য এক এক জন করসংগ্রাহক নিয়োজিত করিবেন। কমিটী ক্রমে নদীয়া কাশীমবাজার হইতে রাজসাহী আসিলেন। রাজসাহীতে আসিয়া ঘোষণা করিলেন, যে অধিক রাজকর দিতে পারিবে, তাহাকেই

রাজসাহী রাজ্য পাঁচ বৎসরের জন্য প্রদান করা যাইবে। এই ব্যাপারে অধিকতর মর্ম্মপীড়িত হইয়া, প্রতিভাশালিনী রাণী দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের হস্তে রাজসাহী রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া রাজসাহী পরিত্যাগ করিলেন। ভবানী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই নাটোরের রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইল। এই স্থান হইতেই রাজসাহী রাজ্যের করুণকাহিনীর মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস আরম্ভ হইল।

রামকৃষ্ণ ধার্ম্মিক, সর্ব্বদা জপতপে নিয়োজিত থাকিতেন। তিনি রাজকার্য্যে মোটেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার কর্ম্মচারী আমলা এমন কি সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্ত এই সুযোগে নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। ইহাদের মধ্যে নড়াইল পরিবারের কালীশঙ্কর প্রধান। তাঁহাকে রাজপরিবারের সকলেই বন্ধু এবং অভিভাবক মনে করিত কিন্তু তিনিই এই রাজবংশের অধঃপতনের মূলীভূত কারণ! (১)

কথিত আছে যে, একটি গানের জন্য রামকৃষ্ণ তাঁহার কড়ীহাতি পরগণা কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করেন এবং ভূষণা ভাবি-উন্নতির আশায় তাহার নিকট ইজারা পত্তন করেন। ১৭৯৩ সনের এপ্রল হইতে ইজারা আরম্ভ হয়। এক বৎসরের মধ্যে কালীশঙ্কর রাজস্ব তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার ৩২৪০০০৲ হইতে ৩৪৮০০০৲হাজার দাবী করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিঃস্ব প্রজার উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। প্রজাকুল

(১) His officers Amla and even his menial servants robbed him on every side and accumulated wealth for themselves. Among them, Kalisankar Rai, the ancestor of the Nawab family, was the principle. He was on the contrary a principal of evil introdused into the Natore Raj for its destruction.

The Rajas of Kajshai.

অসমর্থ হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। আদালত কালীশঙ্করের বিরুদ্ধে তিন গুণ ডিক্রী প্রদান করেন। এই সময়ে নানা কারণে কালীশঙ্করের প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইয়া যায়। চারিমাস তাঁহাকে জেলেও থাকিতে হয়। মহারাজা রামকৃষ্ণ কালীশঙ্করের এই জবরদস্তী প্রণালী মনঃপূত না হওয়ায় তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথকে এই ভূষণা অর্পণ করেন। বিশ্বনাথ নাবালক সুতরাং court of wards এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। যদিও রাজস্ব বাকী ছিল তথাপি কালেক্টরের হাতে আসার পর কয়েকদিনের জন্য কোন প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টেট্ বিশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয় বলিয়া Mr. Earnest ভূষণার কমিশন নিযুক্ত হন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য নূতন বন্দোবস্তের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ করিলে প্রজারা বড় গোলযোগ আরম্ভ করে, কিন্তু হঠাৎ তাহা থামিয়া যায়—তিনি বন্দোবস্ত আরম্ভ করেন। তিনি রাজস্ব ১৽৭৮০০ এবং সদর জমা ২৪৮১১৮ ধার্য্য করেন এবং একটা উপস্বত্ব যদি আদায় হয় তবে জমীদারি প্রাপ্ত হইবেন—এরূপ বন্দোবস্ত করেন।* রাজকুমার বিশ্বনাথ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে সম্পত্তি দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না কেননা court of wardsএর নিয়ম আছে যে বাকী রাজস্বের জন্য সম্পত্তি ডিক্রী হইতে পারিবে, সেই জন্য পূর্ব্ব বাকী রাজস্বের জন্য আংশিক ভাবে সম্পত্তি নিলাম হইতে লাগিল।

* He fixed the enter revenew at Rupees 327800 assessing the sader Zama at Rupees 24118 and adarding a Zamindari allowance provided it would be realized

The Teritorial Aristocracy of Bengal.

১৭৯৯ যশোর কালেক্টরীতে ভূষণার নিম্নলিখিত পরগণাগুলি বিক্রী হইল।

পরগণা।	রাজস্ব।	বিক্রয়ের তারিখ।	ক্রেতা।
হাভিলী	৩৬৮১৩	১৫।২।১৭৯৯	রামনাথ রায়।
মাকিমপুর	২৫৩৪৭	১৫।২।১৭৯৯	ঐ
নছিবসাহি	১৬৯৩৭	২৫।২।১৭৯৯	ভৈরবনাথ রায়।
সাতর	৫৯৯৬৮	২৮।২।১৭৯৯	শিবপ্রসাদ রায়।
নলদি	৬১৭৬০	২৩।৩।১৭৯৯	ভৈরবনাথ রায়।

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিও সেই বৎসর বিক্রয় হইয়া গেল। অধিকাংশ সম্পত্তি কালীশঙ্কর রায় ক্রয় করিলেন। পুখুরিয়া পরগণা ময়মনসিংহের চৌধুরীরা, দিহি আড়পাড়া গোবরডাঙ্গার কেনারাম মুখার্জী, দিহি কালেশপুর, ডিহি স্বরূপপুর গোপীমোহন ঠাকুর ক্রয় করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই নাটোর রাজ্যের অধঃপতন আনয়ন করে। অনেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে জমীদারদের Magna charta বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথম প্রথম এই বন্দোবস্তই প্রাচীন জমীদারবংশের উৎসন্নের কারণ হয়। Mr. West Land তাঁহার যশোর সম্বন্ধীয় Settlement Reportএ লিখিয়াছেন ইউসফপুর ৫০২৩০২ এবং সৈয়দপুর ৯০৫৮৩ টাকায় বন্দোবস্ত হয়, কিন্তু এক বৎসর পূর্ব্বে ইউসফ্-পুর ৫০০০ হাজার ও সৈয়দপুরে ২০০টাকা কম ছিল এই প্রকার অত্যধিক দাবী জমিদারদিগের অকৃতকার্য্যতা ও দরিদ্রতার কারণ।

Mr. Henckell ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে নাটোরের জজ মাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। রামকৃষ্ণ তখন বাকী রাজস্ব প্রদান করিতে অসমর্থ হইলেন তজ্জন্য ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ৬ই মে তারিখে রাজসাহীর তদানীন্তন কমিশনর

Mr. T. H. Harington মহারাজা রামকৃষ্ণকে কারারুদ্ধ করেন। তখনও যাহা প্রদান করিয়াছিল তদতিরিক্ত মোট ২৬৮৮৪২৸৶১৪ গণ্ডা প্রাপ্য। কমিশনার এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বোর্ডে লিখিলে যে উত্তর আসে তাহা এই ;—

"We approve your having put the Raja in confiinement confirmably to the Regulations and of your haviny vested the management ot his estate in Ramjimall to whom you will afford every neccessary assistance to secure the realization of the sums now remaining outstanding."

কিন্তু ১৫ই মার্চ্চ গবর্ণর জেনারেল মহারাজকে আরও সময় দান করেন এবং মহারাজকে কারামুক্ত করিতে কমিশনরকে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু যথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় তাহার সম্পত্তির কতক অংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে নাটোরের সর্ব্বনাশ হইতে থাকে। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত মহাল বিক্রয় হয় :—পরগণা পাতিলাদহ, পরগণা আমবাড়ী, কিসমত, পরগণা কতোয়ালী, চৌঘড়িয়া মানিকদি।

এর পর মহারাজ রামকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট জমায় বিক্রী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে বোর্ড আপত্তি উত্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করেন ;—

If however, it be only his intention to grant bases. fixing the rent for tne period of his own engagement with the Goverment, he is of course, at liberty to do so, but with regard to your affixing your signature to any engagement between the Zaminder and his underrenters, we are of openion that it is liable to objection.

লর্ড হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া রাজ্য শাসন প্রণালী অনেক পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিলেন। তাঁহার সময়েই জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদিত হইল। এই বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৩) পর্য্যন্ত নাটোরের রাজাদিগের হস্তে রাজ্যের ফৌজদারী দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতেই তাঁহাদের ক্ষমতা একেবারে লোপ পাইয়া গেল এবং রাজার কারাগার উঠিয়া গিয়া কোম্পানির কারাগার স্থাপিত হইল এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাটোরই রাজসাহী জেলার সদর কাছারি ছিল। কোম্পানী একজন সাহেবকে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর পদে নিযুক্ত করিলেন। একজনের হাতে জেলার সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত হওয়ায় প্রতিকার পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল; দেশে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে নাটোর হইতে জেলা পদ্মার তীরে রামপুর-বোয়ালিয়ায় উঠিয়া গেল এবং ক্রমে শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নাটোর-রাজগণ যে হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, সেই অবস্থা হইতে ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইতে লাগিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণের দুই পুত্র—বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। রামকৃষ্ণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ নাটোরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তখন নাটোরের রাজলক্ষ্মী চিরতরে অন্তর্হিতা। রাণী ভবানীর সময় যে রাজদণ্ড অর্দ্ধবঙ্গ-ব্যাপী শাসনচক্র পরিচালন করিত, তাঁহারই পুত্র রামকৃষ্ণের সময় সেই বৃহৎ রাজ্যের সমস্তই ধ্বংস হইয়া অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট ছিল। বিশ্বনাথ পিতার সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকারী হইলেন। এবং কনিষ্ঠ সহোদর শিবনাথ দেবোত্তর ভূমি অধিকার করিয়া সেবাইত রাজা হইলেন।* হায় বিধাতার কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন!

* এই বিশ্বনাথের বংশধরই নাটোরের বড় তরফ এবং শিবনাথের বংশধরই ছোট তরফ।

মহারাজ রামকৃষ্ণ ঘোর শাক্তি উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বিশ্বনাথের তিন স্ত্রী—রাণী কৃষ্ণমণি, রাণী গোবিন্দমণি এবং রাণী জয়মণি। প্রথম দুই জন বৈষ্ণব-উপাসক কিন্তু জয়মণি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিতে থাকেন।

বিশ্বনাথ নিঃসন্তান। পরলোক গমন করিলে তাঁহার পত্নী রাণী কৃষ্ণমণি অনুমতি পত্রানুসারে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্রও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৮৩৬ খৃঃ)। মৃত্যু সময় গোবিন্দচন্দ্র পত্নীকে দত্তকের অনুমতি দিয়া মাতাকে অভিভাবক নিযুক্ত করেন। গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা কৃষ্ণমণি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। তিনি সুচতুর ও কার্য্যক্ষম লোক। তাঁহার বুদ্ধি ক্রমে নাটোর রাজ্যের কিঞ্চিৎ পরিমাণে নষ্টোদ্ধার হয়। (১) গোবিন্দচন্দ্রের অনুমতি-পত্রানুসারে রাণী শিবেশ্বরী গোবিন্দনাথকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দনাথ পিতৃরাজ্য অধিকার করিলেন; এই সময় মাতাপুত্রে বিবাদ আরম্ভ হইল। রাণী শিবেশ্বরী দত্তক পুত্রের অসিদ্ধির মোকদ্দমা রাজসাহী জজ আদালতে উপস্থিত করিলেন। রাজসাহীর জজ মিলুইস্ জ্যাক্‌সন দত্তক পুত্র অসিদ্ধ করিলেন। মহামান্য হাইকোর্ট জেলার জজের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দত্তক পুত্র সিদ্ধ করিলেন। প্রিভি কৌন্সিলে হাইকোর্টের আদেশ রহিয়া গেল। ইংলণ্ড হইতে এই সংবাদ আসিবার পূর্ব্বে রাণী কৃষ্ণমণি ও রাজা গোবিন্দ নাথ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজা গোবিন্দনাথ বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। পরদুঃখমোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই ব্যথিত।

(১) Raja of Rajshahi

রাজা গোবিন্দনাথের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। অনুমতি-পত্রানুসারে তাঁহার পত্নী মহারাজ জগদীন্দ্র নামক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তিনি রাজসাহী কালেজে শিক্ষিত হইয়া পিতৃরাজ্য গ্রহণ করেন। তিনি পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতাগুণে বাঙ্গালা কাউন্সিলের মেম্বার পদে নিযুক্ত হন। জগদীন্দ্রনাথ সৎকর্ম্মান্বিত ও সদালাপী।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চারিপুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রনাথ কতকদিনের জন্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যগুণে অল্পদিন মধ্যে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন এবং 'ফরেন্ আফিসে' বড় লাটের অধীনে আটাচারী পদ প্রাপ্ত হন। চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন. যোগেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান্, তেজস্বী ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তাঁহার যথাসাধ্য কষ্ট মোচন করিতে ত্রুটি করিতেন না, আবার যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেন তাহার নাটোররাজ্যে থাকা দায় হইত। যোগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এইরূপ একটি গল্প আছে।

একদিন এক কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাবিবাহের সাহায্য জন্য যোগেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হয়। যোগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এক কন্যার বিবাহে কি খরচ লাগবে।" ব্রাহ্মণ যাহা খরচ পড়িবে তাহা বলিলে তিনি তাহা সমস্তই দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিলেন যে, তুমি তোমার মেয়ের বিবাহে অন্য কোথায়ও যাইও না, যদি বেশী লাগে আমার নিকট আসিও।

ক্রমশঃ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সারানাথ বুদ্ধস্তূপ।

ঐতিহাসিক চিত্র।
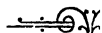
ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণ।

১। নাদিরসাহ্।

নাদিরকুলি খোরাশানের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পল্লীর দরিদ্র পরিবারে ১৬৮৮ খৃঃ ১১ই নভেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন। যে বীরের অসিমুখে মোগল রাজলক্ষ্মী রুধিরাক্ত কলেবরে দিল্লী ও ভারতবর্ষ হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিতা হন, সেই বীর নাদির কুলির বাল্য জীবনের দু একটী অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র ইতিহাস-পৃষ্ঠে আপনাকে দুই শতাব্দী ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নাদিরের জন্মস্থান লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানা মতভেদ থাকিলেও নাদিরের সহচর খোজা আব্দুল করিম নামক জনৈক কাশ্মীরীর বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খিলাৎ ও আবুদের মধ্যস্থিত কোন ক্ষুদ্র পল্লী মধ্যে তাঁহার জন্ম হয়। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পল্লীর স্থান ও সীমা নির্দ্দেশ করা সহজ নয়; তবে তাঁহার জীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নাদিরকুলি নাদিরসাহ উপাধি লাভ করিয়া, একটী ক্ষুদ্র পল্লীকে তাহার প্রাচীন নাম হইতে স্খলিত করিয়া, "মুলুকগড়" অর্থাৎ জন্মভূমি নামে অভিহিত করেন। এই স্থানে তিনি একটী মসজেদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং এই ক্ষুদ্র পল্লীকে জনশালী করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই 'মুলুকগড়' যে তাঁহার

জন্মভূমি, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ এই মুল্লুকগড়ের কোন সন্ধান পান নাই ; সুতরাং অদ্যাপি নাদিরের জন্মস্থান লইয়া, ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা ঘুচে নাই।

নাদিরসাহের পিতার নাম ইমামকুলি। তিনি "আফসার"-বংশোদ্ভূত। "এই বংশ সাধারণতঃ দুইটী শাখায় বিভক্ত 'সামূলু' ও 'কার্লু'। ইমামকুলি এই শেষোক্ত "কার্লু" বংশে জন্মগ্রহণ করেন।"* "ইমামকুলি টুপী বুনিয়া ও মেষের চামড়া বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন"। † দরিদ্র ইমামকুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নী বালক নাদিরকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন, এবং গত্যন্তর না দেখিয়া বালক নাদির মাতার ভরণ পোষণের জন্য প্রত্যহ বনমধ্যে কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহের জন্য যাইতেন এবং প্রত্যহ কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করিয়া, বাজারে বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসিতেন। এইরূপে তিনি যে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই মাতাপুত্রের অতি কষ্টে দিনপাত হইত। এই সময় নাদিরের বয়ঃক্রম তের বৎসর মাত্র। তখনও তাঁহার হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হয় নাই। যে উচ্চাশা-মদিরা পানে তিনি একদিন পৃথিবীর পৃষ্ঠে উৎপাতের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই উচ্চাশা তখনও বালক নাদিরকে মত্ত করিয়া তুলে নাই। মানুষের ভাগ্য কি করিয়া পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। বালক নাদির যখন কর্ম্ম-ক্লান্ত পদে কাষ্ঠের বোঝা মস্তকে ধরিয়া, পল্লীপথ অতিক্রম করিতেন, তখন কে চিন্তা করিয়াছিল যে, সেই বালকের নাম ইতিহাস-বিশ্রুত হইবে?

এইরূপে নাদিরের জীবনের চারি বৎসর অতিবাহিত হয়। যখন

* Moriar.
† Hansway.

তিনি সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করেন, সেই সময় ১৭০৫ খৃঃ "উস্‌বেগ"গণ খোরাশান আক্রমণ করে এবং তাহারা বহু লোককে ক্রীতদাসরূপে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই বন্দীগণের মধ্যে নাদির ও তাঁহার মাতা ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে নাদির কোন সুযোগে আপনাকে মুক্ত করিয়া পলাইয়া যান এবং চারি বৎসর ধরিয়া, বহুস্থান পর্য্যটন করিবার পর তিনি আবার খোরাশানে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় নাদির একবিংশ-বর্ষীয় যুবক।

নাদিরের আপনার বলিবার কেহ ছিল না। তিনি চারি বৎসর ধরিয়া দারিদ্র্যের সহিত ভীষণ সংগ্রামে ব্রতী ছিলেন। এই চারি বৎসর তিনি কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। কাহারও মতে * এই সময় নাদির দুষ্ক্রিয়াসক্ত যুবকগণের অগ্রণী ছিলেন। তিনি মেষশাবক চুরি করিয়া ও সেই অপহৃত মেষশাবক বিক্রয় করত, যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই কোনরূপে তিনি দিনপাত করিতেন। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য যেরূপ খরকর বরিষণে প্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, সেইরূপ যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের চিত্তে কামনা,উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বৃত্তিনিচয় সমুদিত হইতে থাকে, আর তাহারই ফলে বাল্যে যাহা ভাল লাগে, যৌবনে মানুষ তাহা লইয়া থাকিতে পারে না; একটা উদ্দাম চাঞ্চল্য ও মত্ততা তাহার প্রতিকার্য্যে পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। নাদির যতদিন বালক ছিল এবং সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যতদিন তাঁহার অল্প ছিল, ততদিন তিনি কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া ও মেষশাবক চুরী করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু যৌবনে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যতই বলবতী হইতে লাগিল ততই তিনি ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ১৭১২ খৃঃ নাদির জনৈক বেগের (chief) পার্শ্বচর নিয়োজিত হন। উক্ত কর্ম্মে নিয়োজিত হইবার পরেই তিনি স্বীয় দুষ্ক্রিয়াসক্তির পরিচয়

* Hansway

দিতে লাগিলেন। একদা ইস্পাহানের পথে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বিনা কারণে হত্যা করিয়া, আপনার অস্ত্রকুশলতার পরিচয় উপলব্ধি করেন। ইহার পর তাঁহার প্রভুকন্যার প্রতি তিনি আসক্ত হন; এবং তাহাকে নানারূপে প্রলুব্ধ করিয়া, আপনার আসক্তির কথা লোকসমাজে প্রচারিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। নাদিরের প্রভু নাদিরকে জামাতারূপে গ্রহণ করিয়া, আপনার বংশ-মর্য্যাদা নষ্ট করিতে অস্বীকৃত হইলে, নাদির স্বহস্তে প্রভুকে হত্যা করিয়া, প্রভুকন্যাকে লইয়া নিকটবর্ত্তী মজাদারুণ পর্ব্বতে গিয়া আশ্রয় লন। নাদিরের ঔরসে ও উক্ত নারীর গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তিনি ইতিহাসে কুলি মির্জ্জা নামে বিখ্যাত। পাঁচ বৎসর পরে উক্ত নারীর মৃত্যু হয়। সে যাহা হউক, এই সময় হইতে নাদিরের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। নাদিরের সাহসিকতায় ও বীরত্বে আকৃষ্ট হইয়া, শীঘ্রই দলে দলে বহুলোক তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। শীঘ্রই একটা ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল। সহজ কথায় এই দল দস্যু ভিন্ন আর কিছুই নয়। নাদির দুই বৎসর ধরিয়া এই দলের নেতৃত্ব করেন। তাঁহার সহসা আক্রমণে ও অদ্ভুত সাহসিকতায় তিনি শীঘ্রই লোকমুখে বহুদূর পরিচিত হইয়া পড়িলেন। সে সময় লোকে কেবল অসিমাত্র অবলম্বন করিয়া, সামান্য অবস্থা হইতে রাজসিংহাসন লাভ করিতে পারিত। বোধ হয় নাদিরের মনে সে কথা উদয় হইয়াছিল। দুই বৎসর ক্ষুদ্র বাহিনী পরিচালিত করিয়া নাদির খোরাশান রাজার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় আফগানগণ হিরাতে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল এবং "উস্‌বেগ"-গণের প্রতিনিয়ত আক্রমণে খোরাশানের সীমান্ত-প্রদেশবাসিগণ ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে কালযাপন করিতেছিল। নাদির এই সময়ে একটা অশ্বারোহি-দলের নায়করূপে রাজসরকারে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার অসীম উৎসাহ ও অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রকুশলতায় তাঁহাকে শীঘ্রই সৈন্যগণের মধ্যে পরিচিত করিয়া

তুলিল। উপর্য্যুপরি কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধে তিনি আপনার যেরূপ অকুতোভয়তার উদাহরণ প্রদর্শন করেন, তাহাতে তিনি খোরাশানরাজের অনুগ্রহ লাভ করতঃ আপনার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া লন। খোরাশানরাজ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে "মিম্‌বাসী" (সহস্র সৈন্তের নেতা)-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে এক অজানিত ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, দারিদ্র্যের কঠোর কষাঘাতে ও দারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে নিপীড়িত হইয়া, অজ্ঞাত-কুলশীল নাদির ক্রমে ক্রমে উন্নতির গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অধিরোহণ করতঃ আপনাকে ইতিহাসে বিপুল বাহিনীর অধিনায়করূপে ও সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের সংহারকরূপে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। সে সমুদয় বৃত্তান্ত যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

১৭১৯ খৃঃ বোখারার উস্‌বেগগণ রণসাজে সজ্জিত হইয়া, বীরদর্পে খোরাশানের দ্বারদেশে উপনীত হইলে, মস্‌বাদবাসিগণ প্রমাদ গণিল। বাবুলু খাঁ মস্‌বাদের শাসনকর্ত্তা। যখন তিনি অবগত হইলেন যে, দুর্দ্দান্ত "উস্‌বেগ"গণ আফগানদিগের সহিত একত্র হইয়া ১২,০০০ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে খোরাসান অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে, তখন মস্‌বাদাধিপতি চারি সহস্র অশ্বারোহী ও দুই সহস্র পদাতিক সৈন্ত লইয়া, কিরূপে শত্রু সম্মুখীন হইবেন, ইহা চিন্তা করিতে গিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রণা-সভা আহূত হইলে, সকলের মুখেই এক গভীর বিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিল। প্রায় সকলে একে একে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিল। সকলেরই অভিমত যে, শত্রু-আক্রমণে বাধা না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কেবল যুবক নাদির এ মতের পোষকতা করিলেন না। তিনি সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "ভ্রাতৃ-শোণিতে মাতৃভূমি কলঙ্কিত দেখিলে, যদি তোমাদিগের কিছুমাত্র দুঃখ বোধ হয়, তবে তোমাদিগের ঐ ছয় সহস্র সৈন্ত আমার নেতৃত্বে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত হও; আমি শপথ

করিয়া বলিতেছি যে, আমার ধমনীতে যতক্ষণ এক বিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ আমি কিছুতেই শত্রুগণকে খোরাসানের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবনা।” * তাঁহার নয়ন ভ্রূকুটিপূর্ণ, মুখমণ্ডল প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক; বাক্য উদ্দীপনাপূর্ণ। তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস করিল না। সুতরাং তিনি ছয় সহস্র সৈনিকের নায়কত্ব লাভ করিলেন। এই ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া, শত্রুসৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় “টাজান্দ” নদীর তীরে ব্যূহ রচনা করিয়া, তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই শত্রুগণ অদম্য ঝটিকার ন্যায় নাদিরের সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। ইতিহাসে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কেহ মরিবার জন্যই যুদ্ধ করে, তখন অপরের অপেক্ষা সে অনেক বিলম্বে মরে। নাদিরের সৈন্য সংখ্যায় অল্প হইলেও, তাহারা সকলেই নায়কের জ্বালাময়ী বক্তৃতায়, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য মরিতে প্রস্তুত। কে তাহাদিগকে পরাস্ত করিবে? অবসাদাচ্ছন্ন আফগানদিগের সমর-কৌশল ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে নাদিরের রণকৌশলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়াতে, জয়শ্রী তাঁহারই কপালে যশঃটীকা পরাইয়া দিল। নাদির শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া, বিজয়ী সৈন্যের সহিত মাস্‌বাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেশবাসী এতদিন পরে তাঁহাকে বীর বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিল।

নাদির বীর ও কর্ম্মকুশল। কিন্তু নানা বিপত্তির মধ্যে, অপরিসীম পরিশ্রমের দ্বারা তাঁহাকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিতে হইয়াছে। দেশকে আসন্ন বিপদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াও তিনি মসবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যখন “ছয় হাজারী” পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সৌভাগ্যের দিন এখনও বহুদূরে। সমরাঙ্গন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া,

* Owen & Wheeler.

তিনি জানাইলেন যে, এই ঘোর পরীক্ষার দিনে নায়কপদের সম্মান অটুট রাখিয়া, তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তিনি ঐ উচ্চপদের সম্পূর্ণ উপযোগী; সুতরাং তাঁহাকে উক্তপদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করা হউক। এ প্রস্তাবে অসম্মত হইবার উপায় ছিল না। যদি যোগ্যতানুসারে কাহাকেও সৈন্যদলের সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে যে বীর অঙ্গুলি সঙ্কেতে সৈন্যগণকে পরিচালন করিয়া, আপন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, যিনি আপনার হৃদয়ের শোণিতপাত করিয়া, দেশবাসীকে অত্যাচার ও অপমানের হস্ত হইতে বাঁচাইয়াছেন ও জাতীয় গৌরবকে কলঙ্কস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা আর যোগ্যতর ব্যক্তি কোথায় থাকিতে পারে? কিন্তু স্বার্থের ও ঈর্ষ্যার জন্য লোকে যোগ্যতার কথা চিন্তা করিবার অবসর পায় না। বাবুলু খাঁ আপনার জনৈক আত্মীয়কে উক্ত পদে নিযুক্ত করিবার জন্য নাদিরকে প্রথম স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট ও পরে ভয় দেখাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। সে সময় খোরাসান ইস্‌পাহানের অধীন ছিল। কোন উচ্চপদে কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, ইস্‌পাহান রাজের অভিমত গ্রহণ করিতে হইত। নাদিরকে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বাবুলু খাঁ নিয়োগ-প্রস্তাব ইস্‌পাহান রাজের নিকট পাঠাইতে সম্মত হন। নাদির তাঁহার প্রভুর উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে নিয়োগ-প্রস্তাব ইস্‌পাহানে পাঠান ত দূরের কথা; বরং বাবুলু খাঁ ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিয়া, এক অকর্ম্মণ্য যুবককে তাঁহার ঈপ্সিত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নাদির এ অপমান নিঃশব্দে পরিপাক করিতে শিক্ষা করেন নাই। অবিচার ও অপমানের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি যে, আজ প্রাণপণ করিয়া, এই পাঁচ বৎসর

প্রভুর পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহা যে নিষ্ফল হইল, ইহার জন্য তিনি দুঃখিত নন। তাঁহার উন্নতির পথে এই অভাবনীয় প্রতিবন্ধক দেখিয়া তিনি চিন্তিত নন। একজন অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি যে, রাজ-অনুগ্রহের বলে, এই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহার জন্য তিনি চঞ্চল হইলেন। প্রকাশ্যে তিনি বাবুলু খাঁর প্রতারণা প্রকাশ করিয়া, এই নির্ব্বাচন রোধ করিতে চেষ্টা করিবার জন্য তিনি বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ইহার ফলে, বাবুলু খাঁ তাঁহাকে বিদ্রোহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ, নাদির কর্ম্মচ্যুত হইলেন। পাঁচ বৎসর উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নাদির এইরূপে অন্যায় ভাবে বিতাড়িত হইলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবন-নাটকের ইহাই প্রথম দৃশ্য—

(ক্রমশঃ)

যুবক সমিতি—বৈদ্যবাটী। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

শ্রীনিবাস আচার্য্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটলীলার অবসানে শ্রীজীব, রূপ, সনাতন, গোস্বামি-প্রমুখ যে সকল মহাপুরুষ তৎপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্রতী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। মহাপ্রভুর প্রকটাবস্থায় তিনি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তঃপাতী চাকুন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভগবান ভট্টাচার্য্য। তিনি শ্রীচৈতন্য-প্রেমের পরম অনুরাগী ছিলেন। একদিন শ্রীনবদ্বীপ-ধামে মহাপ্রভুর দর্শন-লালসায়

আসিয়া তিনি শুনিলেন যে, মহাপ্রভু কণ্টক-নগরে সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, তিনি কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নাপিত তাঁহার মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া দিতেছে। সে কালে মস্তকের কেশ বড় সখের ও শোভার ছিল। সেই কেশ মুণ্ডিত দেখিয়া, গঙ্গাধর ভাবাবিষ্ট হইয়া কেবলই "চাঁচর চিকুর" বলিতে বলিতে "দশা" প্রাপ্ত হইলেন। গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে পরম-ভাগবত দেখিয়া, "চৈতন্য দাস" আখ্যা দিল। তাহাতে তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। মোহমুক্ত হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার পর শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে ঘরে ফিরিলেন। ঘরে ফিরিবার সময়েও তাঁহার মুখে কেবল মাত্র কথা "চাঁচর চিকুর"। চাকুন্দী গ্রামের যেস্থানে আচার্য্য প্রভু জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থানে নাড়ীকাটার ডাঙ্গা বলিয়া একটা স্থান আছে। সেই খানেই তাঁহার জন্মের পর নাড়িচ্ছেদ হইয়াছিল বলিয়া সকলে অনুমান করে।

আচার্য্য প্রভু চাকুন্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যকাল সেই খানেই অতিবাহিত করেন, পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয়াদি, চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণাদির শিক্ষা-স্থানও ঐ চাকুন্দি। তাঁহার বাল্যকালের কোন বিশেষ ঘটনার কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে প্রকাশ যে, তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর তিনি চাকুন্দি এবং জাজিগ্রাম উভয়ত্রই অবস্থিতি করিতেন। কিশোর-বয়সে তিনি ব্যাকরণ সাহিত্য এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রবেশ-লাভ করেন। অতঃপর নীলাচলে গিয়া যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার ইচ্ছা জন্মিল, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া, তথায় যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে শুনিলেন, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ যুবক বড়ই কাতরভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেদিন আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তথায় অবস্থিতি

করিয়া, শোকের কিঞ্চিন্মাত্র পরিহার হইলে মহাপ্রভুর পার্ষদ ও অনুচরবর্গ সকলে কিরূপে তাঁহার বিরহে কালযাপন করিতেছেন দেখিবার জন্য নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অপ্রকট বার্ত্তা অবগত হইয়া, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মন-প্রাণের বলবতী ইচ্ছা যে, মহাপুরুষের সাক্ষাৎ-লাভে কৃতার্থ হইবেন, জন্ম সার্থক করিবেন এবং তাঁহার নিকটে থাকিয়া পূজা বন্দনাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া শ্রীভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইল না। আপন পরিপোষিত বাসনার চরিতার্থতায় অন্তরায় ঘটিল, এজন্য শ্রীনিবাস বড়ই ব্যথিত হইলেন। সেদিন আর তিনি নীলাচলের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কাজেই তথায় অবস্থিতি করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর পারিষদগণের সকলকেই শোকে মুহ্যমান দেখিলেন—সকলেই শোকার্ত্ত, সকলেরই মুখে শোকের কালিমাময় চিহ্ন, সকলেই হা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়া রোদন করিতেছেন, কাহারও মুখে অন্য কথা নাই। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শোকে সমগ্র নীলাচল—পশু পক্ষী, জীবজন্তু সকলেই যে স্ফূর্ত্তি বিহীন; কে কাহাকে সান্ত্বনা করিবে—সকলেরই এক অবস্থা।

শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের পূজারি আসিয়া, তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া মালা ও মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলে, তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত গোসাঞিের নিকট গমন করিলেন, তিনি তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই, তখনও তাঁহার উন্মত্তের ভাব। আচার্য্য প্রভু সেদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলেন। তাহার পর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর সমীপস্থ হইয়া, শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত আত্ম-বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীভাগবত

পড়িবার কথা শুনিয়া তাঁহার শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং যে শ্রীগ্রন্থ খানি পাঠ করিতেন, তাহা আচার্য্য প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। গ্রন্থ খানির স্থানে স্থানে পাতা পুড়িয়া গিয়াছে, অক্ষর সুস্পষ্ট নাই, কোন কোন জায়গা একবারে মুছিয়া গিয়াছে। মহাপ্রভু গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইলে, তাঁহার নয়নগলিত অশ্রুধারা পুথির উপর পড়িয়া গ্রন্থখানিকে সেইরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। পণ্ডিত গোসাঞি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—এগ্রন্থের আর উদ্ধারসাধন হইবার নহে। মহাপ্রভুর পঠিত গ্রন্থের উপর অক্ষরারোপ করিবার কাহার শক্তি-সামর্থ্য নাই। আর আমারও সেরূপ অবস্থা নহে, কোথায় আছি, কি করিতেছি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই—যদি তোমার শ্রীভাগবত পাঠের ঐকান্তিকী ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, মহাপ্রভুর আদেশে রূপ-সনাতন শ্রীবৃন্দাবন ধামে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার-সাধন আর জগৎকে প্রেম-ভক্তি শিখাইবার জন্য ভক্তি গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্ট আছেন। তাঁহাদের নিকট ভট্ট রঘুনাথ নামে এক পরম ভাগবত মহাপুরুষ আছেন, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও মহা ভাবুক শ্রীভাগবতের তেমন পাঠক আর নাই। আর কিয়দ্দিন হইল দক্ষিণ দেশ হইতে গোপাল ভট্ট নামে এক মহাপুরুষ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে আরও অনেক ভক্ত আছেন, তুমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে যে কোন মহাপুরুষের নিকট ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা শুনিতে পার। একটী কাজ করিও, গদাধর দাসকে বলিও—"মিতাও বাড়ী যাইবেন।" এই বলিয়াই পণ্ডিত গোসাঞি অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন, এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আচার্য্য প্রভু মনে মনে স্থির করিলেন, শ্রীবৃন্দাবন ধামে গিয়া শ্রীরূপের শ্রীচরণ-আশ্রয়ে

শ্রীভাগবত-পাঠ এবং প্রেমভক্তি শিক্ষা করিবেন। আচার্য্য প্রভু নীলাচল ত্যাগ না করিয়া, অনেক বৎসর তথায় অবস্থিতি করিয়া মহাপ্রভুর লীলাভূমির প্রত্যেক স্থান দর্শন করিলেন।

এই মত কয়েক বৎসর রহি তথা।
সর্ব্বত্র দেখিল যে যে লীলাস্থল যথা॥
বিদায় কালেতে দেখি শ্রীজগন্নাথ।
গৌড় দেশে আইলা করি দণ্ড প্রণিপাত॥

অনুরাগবল্লী ২২ পৃঃ।

অতঃপর শ্রীনিবাস গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করিয়া, মহাপ্রভুর বাল্য ও পৌগণ্ড লীলার সকল স্থান ভাল করিয়া দেখিয়া বেড়াইলেন, তাঁহার পার্ষদগণের কৃপালাভে একবার শ্রীভাগবত পড়িয়া লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, মহাপ্রভুর পার্ষদগণ ক্রমশঃই তিরোহিত হইতেছেন, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ইতঃ পূর্ব্বেই প্রকটলীলার পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। অপর সকলে যতদিন থাকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া, ভগবৎ-প্রেমের রসাস্বাদ-সুখ ভোগ করিয়া পরে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিবেন আর ফিরিবেন না।

গৌড়দেশে আসিয়া, শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শন করেন, গদাধর দাসকে দেখিয়া তাঁহার পণ্ডিত গোসাঞির কথা মনে পড়িল, তাঁহাকে বলিলেন, নীলাচলে পণ্ডিত গোসাঞি তাঁহাকে বলিতে বলিয়াছেন যে "মিতাকে কহিও মিতাও বাড়ী যাবেন" এই কথা শুনিয়া, গদাধর ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাহার চারিদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত গোসাঞির ইহলীলা সংবরণ বার্ত্তা এদেশে পৌঁছিয়াছিল। গদাধর পূর্ব্বে এই সংবাদ পাইলে, পণ্ডিত গোসাঞির পরলোক যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু শ্রীনিবাসের ত্রুটীতে তাহা ঘটিয়া উঠিল না বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি বড়ই বিরক্ত

হইলেন। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, উভয়ের মধ্যে এরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, ইহলোক পরিত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবে।

তাঁহার আমার এই সুসত্য বচন।
শেষ কালে অবশ্য পাঠাব বিবরণ॥
যথা তথা থাক আসি হইবা বিদিত।
কতদিন অপেক্ষা করিব সুনিশ্চিত॥
সে কথা কহিল মোর হৈল বড় দুঃখ।
চলি যাহ পুন মোরে না দেখাইহ মুখ॥

অনুরাগবল্লী ২২।২৩ পৃঃ।

শ্রীগদাধর দাসের বিরক্তি জন্য শ্রীনিবাসের মনে বড়ই নির্ব্বেদ জন্মিল, তিনি স্নানাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাটীর সমীপবর্ত্তী গঙ্গার ঘাটে গিয়া পড়িয়া রহিলেন অনবরত চক্ষে অশ্রুধারা, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সমস্ত দিন হরিনাম করেন, নামসংখ্যা রক্ষার জন্য যে এক একটি আতপ তণ্ডুল রাখেন, অপরাহ্ণ সময়ে সেই তণ্ডুল গুলি সাক্ষী করিয়া,তাহারই কিছু ভক্তগণকে প্রসাদ স্বরূপ বিতরণ করেন, অবশিষ্ট আপনি গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকেন। দামোদর দাস ভিন্ন তিনি অপরের হস্তে জলগ্রহণ করেন না, দাসীগণ যে জল আনয়ন করে, তাহাতে হস্তপদাদির প্রক্ষালন হয়। দাসীগণ অপরাহ্ণ সময়ে গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে গিয়া শ্রীনিবাসকে তদবস্থায় পতিত দেখে। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসায়, তৎপ্রতি গদাধরের বিরক্তির কথা জ্ঞাপন করিয়া, আপনার নির্ব্বেদ বার্ত্তা জানাইলেন। দাসীগণ বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর নিকটস্থা হইয়া শ্রীনিবাসের কথা আদ্যন্ত জ্ঞাপন করিল। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী গদাধরকে ডাকাইয়া, ব্রাহ্মণ-বালকের কথা সমস্ত বলিলেন এবং তাঁহার কৃতাপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গদাধর ঠাকুরাণীর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, আচার্য্য প্রভুর অপরাধ

মার্জ্জনা করিলেন। শ্রীনিবাস তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা, অধিকন্তু তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম প্রস্ফুরিত হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর আচার্য্য প্রভু প্রশান্ত মনে কিছুদিন নবদ্বীপে অবস্থিতি করিয়া শ্রীমতী সীতা ঠাকুরাণী, শ্রীমতী অদ্বৈত-গৃহিণী ও শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর কৃপা ও দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলেন। তাহার পর খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীল শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর প্রকটলীলার সংবাদ পাইয়া, তাঁহার দর্শনলাভ লালসায় যাত্রা করিলেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়া, আচার্য্য ঠাকুর দেখিলেন, অভিরাম স্বামী পার্ষদবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবত্তত্ত্বালোচনায় নিবিষ্ট আছেন। শ্রীনিবাস তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহার নাম ধামাদির পরিচয় লইয়া, তথায় কিছুদিন অবস্থিতির জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং প্রতিদিন তাঁহার ভোজনের দ্রব্যাদি যোগাইবার আজ্ঞা দিলেন। শ্রীনিবাস সেদিন সিধা গ্রহণ করিয়া আহারাদি সমাপন করিলেন।

শ্রীল শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর পাটে শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ নামে বিগ্রহ-মূর্ত্তি দর্শনে শ্রীনিবাস আপনাকে চরিতার্থ মানিলেন। দিন দিন শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-সেবনে তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ জন্মিতে লাগিল। প্রথমদিন তিনি শ্রীশ্রীঅভিরাম গোস্বামী ঠাকুরের ভাণ্ডারীর নিকট সিধা লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পর আপনিই আপনার আহারীয় সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে তাঁহার যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল সবই ফুরাইয়া গেল। ক্রমে তৈজসপত্র—লোটা কম্বলাদি সন্ন্যাসীর সম্বল বিকাইল। সকলি খরচ হইয়া গেল—পাঁচটি গণ্ডা কড়ি মাত্র রহিল। শ্রীল শ্রীঅভিরাম স্বামী সংবাদ লইতেছিলেন। এইবার আচার্য্য ঠাকুরের পরীক্ষার দিন আসিল। তিনি ষোল কড়া কড়ির তণ্ডুল ক্রয় করিলেন, মালসা একটি এককড়া কড়ি দিয়া পাইলেন, অবশিষ্ট তিন কড়া কড়ি রহিল। তাহার

মধ্যে দুইকড়া কড়ির কাষ্ঠ এবং এককড়া কড়ির লবণ কিনিয়া দারকেশ্বর নদীতটে গমন করিলেন। নদীর তীরে অনেক কলাগাছ ছিল। হইতে পাতা সংগ্রহ করিলেন। কাজ শেষ হইয়া আসিল সংবাদ পাইয়া, অভিরাম স্বামী চারিজন বৈষ্ণবকে পাঠাইয়া উপদেশ দিলেন,—যখন শ্রীনিবাসের ইষ্টদেবতার ভোগ দেওয়া হইবে, তখন তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা তাহাই করিলেন, নদীতীরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন, পরে যখন শ্রীনিবাস ইষ্টদেবতাকে অন্ন উৎসর্গ করিয়া ভোজনে বসিবার জন্য প্রস্তুত, তখন বৈরাগি-চতুষ্টয় "হরেকৃষ্ণ" বলিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন।

শ্রীনিবাস বড়ই আনন্দিত হইলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া, অতিশয় ব্যগ্রভাবে সাদর সম্ভাষণ করিলেন, এবং আহারের সময় হইয়াছে আসুন, সকলে মিলিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করি—বৈষ্ণবেরা তাহাই করিলেন।

সেকালে হাটে বাজারে কড়ির প্রচলন ছিল। বর্ত্তমান সময়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খুচরা কেনা বেচায় কড়ি চলিত। পল্লীগ্রামের হাট বাজার করিতে গিয়া,এখন যেমন আমরা টাকা ভাঙ্গাইয়া পয়সা লই, তখন তেমনি পয়সা দিয়া কড়ি লইয়া পটোল, উচ্ছে, বেগুন প্রভৃতি তরি তর কারী শাক মাছ কিনিতাম। মুদ্রা আজি কালিকার মত শস্তা ছিল না—চারি পয়সায় একটা মজুর সমস্ত দিন কাজ করিত। পুষ্করিণী খাত করাইবার সময় এক এক ঝুড়ি মাটি তুলিবার জন্য চারিকড়া করিয়া কড়ি দেওয়া হইত। সকল জিনিসই সস্তা ছিল, তাই আচার্য্য প্রভু চারিগণ্ডা কড়ি দিয়া আপনার খাদ্যোপযোগী চাউল কিনিতে পাইয়াছিলেন।

প্রস্তুত অন্নে আচার্য্য ঠাকুরের অতিথি-সৎকারের প্রবৃত্তি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই অভিরাম স্বামী তাঁহার নিকট আহার কালে চারিজন বৈষ্ণবকে পাঠাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবকে যেরূপ হইতে হয়

এতদ্দ্বারা তাহারই পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার আরও কিছু বাকী ছিল, তাহার কথা পরে বলা যাইতেছে।

আচার্য্য প্রভুর আচরণ দর্শনে অভিরাম স্বামীও আশ্চর্য্য মানিলেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর, তিনি এরূপ বৈষ্ণব প্রায় দেখেন নাই। আচার্য্য প্রভুর বৈষ্ণব-প্রীতি দর্শনে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন বাহ্যজ্ঞান একবারে শূন্য, দিবা তৃতীয় প্রহর অতীত—শ্রীনিবাস ইহা অবগত হইয়া গোস্বামী প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার আগমনে প্রভুর চেতনা সঞ্চার হইল, তিনি চাবুক লইয়া আচার্য্য ঠাকুরকে প্রহার আরম্ভ করিলেন, তাঁহার সেবাপরায়ণা মালিনী ঠাকুরাণী আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর কি করিলেন, ব্রাহ্মণ-বালককে এরূপে নিগৃহীত করা কি ভাল হইল?"

আচার্য্য ঠাকুরও তখন ভগবদ্ভক্তিতে বিভোর—মনে ভাবিলেন—প্রভুর নিকট কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে। তাহার সংশোধন জন্য তিনি তাঁহাকে প্রহার করিয়াছেন। এরূপ উদারচেতা পুরুষ কয়জন মিলে? খ্রীষ্ট চরিতে আমরা এরূপ উদারতার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাই। মালিনী ঠাকুরাণীর কথায় গোস্বামী প্রভু আচার্য্য প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া কোলে বসাইলেন এবং পুনঃপুনঃ তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"কোন চিন্তা নাহি মনে যে ভাবিলা বিধি।
বৃন্দাবন যাহ তাঁহা হবে কার্য্যসিদ্ধি॥
এতবলি গলাগলি কাঁন্দিতে লাগিলা।
দোঁহে বিচ্ছেদের লাগি বিকল হইলা॥

অনুরাগবল্লী ৩৮ পৃঃ।

গোস্বামী প্রভুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া, তিনি তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন, অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে যথারীতি বন্দনা করিয়া, বৃন্দাবনাভিমুখে

যাত্রা করিলেন। পথে অযাচিত ভাবে কোথাও কিছু পাইলে খাইতেন, না পাইলে অনশন উপবাসে দিন কাটাইতেন। বৃন্দাবন যাইবার জন্য তাঁহার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল—সেখানে গিয়া কিরূপে সাধুজনগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সহবাস সুখে সুখী হইবেন ইহার জন্য তিনি অনশন উপবাস বা পথশ্রমজনিত ক্লেশ গ্রাহ্য করিতেন না। কিরূপ অনন্ত অটল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইলে মনুষ্য ইষ্টলাভে সমর্থ হইয়া থাকে, শ্রীনিবাসের চরিত্রালোচনা করিলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠা ভিন্ন ইষ্টলাভ হয় না। কেবল ভগবৎসম্বন্ধে নহে, যে কোন বাঞ্ছিত বিষয় লাভ করিবার জন্য এরূপ করিতে হয় নতুবা তাহা হয় না।

দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এইরূপে চলিতে চলিতে আচার্য্য প্রভু মথুরায় উপনীত হইলেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সারনাথ।

সারনাথ একটী পল্লী মাত্র। বারাণসীর উত্তর পশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সারনাথ প্রভুর নাম হইতেই এই স্থানের নামকরণ। ইহা একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান। পণ্ডিতগণের অবিরাম চেষ্টায় অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সারনাথ হইতে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে একদিকে ভারতের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে ও অপরন্ত সারনাথের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইরূপ চেষ্টার সমষ্টিতে যে, কালে জাতীয় ইতিহাস সহজ হইয়া উঠিবে এরূপ আশা আর দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না।

সারনাথ দরিদ্র পল্লী। ইহা হয়ত আজ বিদ্রূপ ও অবহেলার পাত্র। কিন্তু বহু প্রাচীন স্মরণাতীত কাল হইতেই ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে, চৈন পরিব্রাজক ফাহিয়ান বারাণসী ও সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন। সে সময়েই সারনাথ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার-ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তখন এক এক জন প্রত্যেক বুদ্ধ এই স্থানে বাস করিতেন, এইজন্য ইহার নাম ছিল ঋষিপত্তন। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে, য়ুঅনচুয়ন্ নামক আর এক চৈন পরিব্রাজক ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি কাশীরাজ্যে গমন করিয়া সারনাথের বৌদ্ধকীর্ত্তি-বিষয়ক বর্ণনা লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই ঃ—

"বারাণসী-রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে বরণানদীর পশ্চিমে অশোক-নির্ম্মিত একটী স্তূপ ছিল। এই স্তূপ ১০০ ফিট উচ্চ, ঠিক ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তর-স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল। বরণানদীর উত্তর-পূর্ব্বে ১০ লিগ দূরে মৃগদাবের (সারনাথের) সঙ্ঘরাম অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর, মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত সঙ্ঘরাম আট মহলে বিভক্ত। ইহার শিল্প-নৈপুণ এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। এখানে প্রায় ১৫০০ বৌদ্ধাচার্য্যের বাস। অপর দিকে এক বিহার। ইহার ভিত্তি ও অধিরোহণী গুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু গম্বুজ ও গবাক্ষগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত। এক দিকে শতাধিক গবাক্ষ ও প্রত্যেক গবাক্ষ মধ্যে এক একটী স্বর্ণময়ী বুদ্ধ-মূর্ত্তি। বিহারের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ তাম্রময়ী বুদ্ধ মূর্ত্তি ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তনে নিরত। আবার বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অশোকরাজ-নির্ম্মিত সমুচ্চ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। ইহার সম্মুখে দুইটী পাষাণ-স্তম্ভ পদ্মরাগের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। প্রত্যেকটী প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ। মধ্যভাগ, তুষার-চিক্কণ, বুদ্ধের প্রতিবিম্ব তাহাতে পাত হইয়া এক স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করে।"

কথিত আছে, শাক্যসিংহ এইস্থানে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্তূপের অদূরে অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য, প্রত্যেক বুদ্ধবর্গ, মৈত্রেয়, বোধি-সত্ত্ব ও শাক্য বোধিসত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন স্তূপ বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন বেষ্টনীর মধ্যে যে, কত শত বিহার ও স্তূপ বিদ্যমান ছিল, কে তাহা গণনা কবিবে? পশ্চিমে একটী স্বচ্ছ-সলিল সরোবর ছিল। বুদ্ধদেব এই সরোবরে স্নান করিয়াছিলেন। কালসহকারে এই পবিত্র সরোবর নষ্ট হইয়াছে, তাহার স্মৃতিটুকু আছে মাত্র।

সারনাথের পূর্ব্ব গৌরব নষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে খৃঃ সপ্তম শতাব্দী হইতেই সারনাথের পতনের সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী পাল রাজাগণের যত্নে কতকটা পূর্ব্বকীর্ত্তি রক্ষা হইলেও, মুসলমানগণের হস্তে এখানকার বৌদ্ধ-প্রভাবের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের দ্বারা এখানকার বৌদ্ধকুল নির্ম্মূল ও বিহার ও সঙ্ঘরাম সমূহ বিধ্বস্ত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ সারনাথে এখন আর দর্শনীয় বড় বেশী কিছু নাই। সুতরাং বহু আয়াস-লব্ধ অবকাশ-কামী সম্ভোগ-পরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তি-বিশেষ যাহাকে ভ্রমণ আখ্যা দিয়া গৌরব বোধ করেন, তাহা বারাণসী ছাড়াইয়া সারনাথে বড় বেশী উপস্থিত হয় না। কেবল আমাদিগেরই ন্যায় কতিপয় বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি আজিও অবকাশের কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করিয়া, সেই ধ্বংস স্তূপের উপর অশ্রু বর্ষণ করিবার জন্য সারনাথে গমন করেন। সে যাহা হউক, খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কতিপয় প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের দৃষ্টি সারনাথের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কালে কতকগুলি বৌদ্ধস্তূপ ও তাম্রলিপি সারনাথের ভূগর্ভ হইতে লোক সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

এতাবৎ চারিটী স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহাদিগের কথা সংক্ষেপে বলিব—

জগৎসিংহ স্তূপ:—ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। কাশীরাজের দেওয়ান জগৎসিংহ ১৭৫৪ খৃঃ "মহল্লা" নির্ম্মাণ কালে এই স্তূপের সন্ধান পান। ইহা তিনি খনন করাইয়া ছিলেন বলিয়া "ইহা জগৎ সিংহ" স্তূপ নামে পরিচিত। এই স্তূপ খনন কালে, একটী বৃহৎ প্রস্তরধার মধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্রাকার মর্ম্মরধারে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মণি-মুক্তা-প্রবাল ও একটী সুবর্ণ-পাত্র পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত একটী বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তির পদতলে বঙ্গের পালবংশীয় রাজা মহীপালের খোদিত একখানি লিপি ইহার কয়েক বৎসর পরে পাওয়া যায়।

ধামেক স্তূপ:—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৮৩৫ খৃঃ জেনারেল কনিমহাম সাহেবের চেষ্টায় এই স্তূপ আবিষ্কৃত হয়। ধামেক শব্দের অর্থ লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে কনিমহাম সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, "ধামেক" অর্থে ধর্ম্ম-দেশক। ইহার অর্থ লইয়া আমরা বৃথা সময় নষ্ট করিব না। ইহা সমতল ভূমি হইতে ১২৮ ফিট উচ্চ। ভিত্তি ইষ্টক-খচিত বহু কারুকার্য্য-শোভিত।

অন্য একটী স্তূপ:—কলিকাতার মিউজিয়মে সারনাথ-স্তূপের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত এক মন্দিরাংশ রক্ষিত হইয়াছে, জেনারেল কনিমহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত আর একটী স্তূপের মধ্যে উক্ত মন্দির পাওয়া যায়। ইহা কারুকার্য্য-শোভিত। ইহার দুই পাশে দুইটী গৃহ আছে।

চৌখণ্ডি স্তূপ:—ধামেক হইতে ২৫০০ ফিট দক্ষিণে চৌখণ্ডি-নামক আর একটী স্তূপের ধ্বংসাবশেষ জেঃ কনিমহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহার উপরে একটী বুরুজ ছিল। এই বুরুজের উপরিস্থ একখণ্ড শিলা-লিপি পাঠে জানা যায় যে, পাতশাহ হুমায়ুন কর্ত্তৃক এই স্থান পরিদর্শন কালে এই বুরুজ নির্ম্মিত হয়।

১৯০৪ খৃঃ ইঞ্জিনিয়ার ওরেয়েণ্টল সাহেব গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সারনাথ পুনঃরায় খনন করাইয়া ছিলেন। এই খনন কালে তথা হইতে অনেক

গুলি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রাপ্ত জিনিষের একটী তালিকা দেওয়া গেল।

১। একটী মন্দিরের ভিত্তি।

২। মহারাজ কনিষ্কের সময়কার একটী বোধি-সত্ত্ব মূর্ত্তি।

৩। প্রস্তর ছত্র ও স্তম্ভগাত্রোৎকীর্ণ লিপি।

৪। মহারাজ অশোকের খোদিত স্তম্ভ-ফলকের ভগ্নাংশ।

৫। একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি।

৬। রাজা অশ্বঘোষের একখানি খোদিত লিপি।

৭। বহু হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি।

মন্দিরের ভিত্তি :—পূর্ব্ব-কথিত জগৎসিংহের স্তূপের ২০০ ফিট উত্তরে এই মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯৪ ফিট। তিনটি সোপান আরোহণ করিলে, মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। এই দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণটী দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফিট ও প্রস্থে ২৩ ফিট। প্রধান দ্বার ভিন্ন মন্দিরের আরও তিনটী দ্বার আছে। মন্দিরের অধিকাংশই ইষ্টক-নির্ম্মিত। স্থানে স্থানে কারুকার্য্যও আছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী মস্তক-বিহীন মুদ্রাবস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি মন্দিরের শোভা-বর্দ্ধন করিতেছে। এই মন্দিরের পাদদেশে উৎকীর্ণলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই মূর্ত্তি স্থবির বন্ধুগুপ্তের দান।

বোধি-সত্ত্ব মূর্ত্তি :—একটী ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে একটী বোধি-সত্ত্বের মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে যে খোদিত লিপি আছে, এখনও তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। ৬ ষ্ঠ পংক্তি হইতে এই লিপি নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যতদূর পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, মহারাজ কনিষ্কের তৃতীয় সংবৎসর হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশ দিবসে ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি ও তাহার সঙ্গী ভিক্ষুবল কর্ত্তৃক ত্রিপটক

দ্বারা বোধি-সত্ত্ব মূর্ত্তি, ছত্র ও যষ্টি ত্রৈপিটক বুদ্ধ মিত্র ও ক্ষত্রপ বনস্পর ও থর পল্লনের সাহায্যে বারাণসীতে বুদ্ধের চংক্রমণ (সংক্রমণ ?) স্থানে স্থাপিত হয়।

অশোক-স্তম্ভ :—মন্দিরের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে দশ হস্ত পশ্চিমে মহারাজ অশোকের লিপিযুক্ত একটি খোদিত স্তম্ভ বাহির হইয়াছে। এই স্তম্ভ দশ ফিট গভীর একটী গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত। খোদিত লিপির প্রথম তিন পংক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা অনুশাসন মাত্র। ইহাতে উল্লেখযোগ্য কোন কথাই নাই।

সঙ্ঘরামের ভিত্তি :—মন্দিরের উত্তরে একটী বৃহৎ সঙ্ঘরামের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী গৃহ ছিল—এই স্থলে রাজা অশ্বঘোষের নামাঙ্কিত একটী প্রস্তর-ফলকের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে।

দেব দেবীর মূর্ত্তি :—আবিষ্কৃত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণু, গণেশ ও হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রায় দুই বর্গমাইল স্থান সারনাথ নামে পরিচিত। চৈন পরিব্রাজক যে স্তম্ভাদি ও সরোবরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সারনাথ এক্ষণে মৃগগণের আবাস ভূমি সেই পবিত্র বিহার-ক্ষেত্র এক্ষণে কাশীরাজের মৃগয়াভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,
বৈদ্যবাটী যুবক-সমিতি।

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুপ্রাচীন বৈদিক কালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজে রাজতন্ত্র কিরূপ ছিল, তাহার আভাস পাঠকবর্গকে পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠক দেখিয়াছেন, গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস প্রাচীন ভারতে যে প্রজাতন্ত্র-মূলক রাজ্যপদ্ধতি থাকার কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্ত কিংবদন্তীমূলক নহে। অথর্ব্ববেদে স্পষ্টাক্ষরেই রাজার নির্ব্বাচনের কথা, তাঁহার তিনটি সভার কথা, রাজকার্য্যে প্রকৃতিপুঞ্জের মতানুসরণের কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এমন কি—"রাজার প্রতি-পক্ষেরাও তাঁহাকে নির্ব্বাচন করুন—এই প্রার্থনায় সে কালেও নির্ব্বাচনে দলাদলি থাকার প্রমাণ পাইয়াছি। তাই অথর্ব্ববেদের অনুবাদক গ্রিফিথ সাহেবও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সেকালে রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। এই নির্ব্বাচন যে, অসভ্য-সমাজের নেতৃনির্ব্বাচনের অনুরূপ ছিল না, তাহা জনশক্তির "উৎক্রমণ"-বিষয়ক মন্ত্রণাবলীর প্রতি মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই কারণে আমরা সে কালের সমিতি, সভা ও মন্ত্রণাসভার কার্য্যপ্রণালীকে বহু পরিমাণে বর্ত্তমান পার্লামেণ্ট সভার অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে সাহসী হইয়াছি।

শুদ্ধ অথর্ব্ববেদে নহে, ঋগ্বেদেও যে প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা রাজার নির্ব্বা-চনের কথা আছে, তাহার আভাস গ্রিফিথ সাহেবের ঋগ্বেদানুবাদের একটি পাদটীকা উদ্ধৃত করিয়া গতবারেই পাঠকবর্গকে দেখান হইয়াছে। সে বিষয়ের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা অথর্ব্ব-বেদের আর কয়েকটি প্রমাণ পাঠকবর্গের গোচর করিব। যথা—

ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায়
ত্বিমাঃ প্রদিশঃ পঞ্চদেবীঃ।
বর্ষ্মন্ রাষ্ট্রস্য ককুদি শ্রয়স্ব
ততো ন উগ্রো বিভজা বসূনি ॥ ৩।৪।২

তোমাকে রাজ্যের (রাজকার্য্য পরিচালনের) জন্য প্রজারা নির্ব্বাচন করুক। এই পঞ্চ প্রদেশের লোকেই তোমাকে কামনা করুক। রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ অংশকে (সিংহাসনকে তুমি আশ্রয় কর। তৎপরে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে তুমি ধনবিভাগ করিয়া দাও।

ধ্রুবো অচ্যুতঃ প্রমৃণীহি শত্রূন্
শত্রূয়তো অধরান্ পাদয়স্ব।
সর্ব্বা দিশঃ সংমনসঃ সধ্রীচীঃ
ধ্রুবায় তে সমিতিঃ কল্পতামিহ ॥ ৬।৮৮

হে রাজা তুমি অচল হও; পদচ্যুত হইও না। শত্রুর সংহার কর, যাহারা শত্রুবৎ আচরণ করে তাহাদিগকে পদানত কর। সকল দেশের লোক ঐকমত্যের সহিত সম্মিলিতভাবে কার্য্য করুক, এবং এই সমিতি তোমার শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কল্পিত (কার্য্যকরী) হউক। এই মন্ত্রের শেষাংশে বিবৃত—

"ধ্রুবায় তে সমিতিঃ কল্পতামিহ।"

কথাগুলির প্রতি সকলেরই সবিশেষ মনোযোগ প্রার্থনীয়। এখানে সমিতির (The meeting of the people of the district-Griffith) সহিত রাজার স্থায়িত্বের সম্বন্ধ কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত "রাজকৃৎ" ও "রাজকর্ত্তা" প্রভৃতি পদেরও বিশেষত্ব এক্ষেত্রে স্মরণ করিবার যোগ্য।

নির্ব্বাচিত রাজা লোকমতানুসারী হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে সভা, সমিতি, সেনা ও সুরা (ঐশ্বর্য্য) তাঁহার অনুগত হয়, একথার

উল্লেখ পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম, এক্ষণে জেলা-সমিতির সহিত রাজার স্থায়িত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও পাওয়া গেল। অতঃপর আর একটি বৈদিক উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করুন। যথেচ্ছাচার রাজার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

ন বর্ষং মৈত্রাবরুণং ব্রহ্মজ্যামভিবর্ষতি।
নাহস্মৈ সমিতিঃ কল্পতে
ন মিত্রং নয়তে বশং॥ ৫।১৯

অর্থাৎ যথেচ্ছাচার রাজার মিত্র ও বরুণদেব যথাসময়ে বৃষ্টিদান করেন না; সমিতি—তাঁহাকে যোগ্য বলিয়া মনে করে না; মিত্রগণ তাঁহার বশীভূত হয় না। পাঠক দেখিবেন যে প্রজারঞ্জক রাজার সম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে যে,—

"ধ্রুবায় তে সমিতিঃ কল্পতামিহ।"

এক্ষণে সেইরূপ যথেচ্ছাচার রাজার সম্বন্ধে বলা হইল যে,—

"নাহস্মৈ সমিতিঃ কল্পতে।"

তাই সেকালের রাজাকে করযোড়ে প্রার্থনা করিতে হইত যে,—

"সভ্য সভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদাঃ" ১৯।৫৫

হে সভ্য সভাসদ্‌গণ! আপনারা আমার সভাটিকে রক্ষা করুন।

এবং প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে—

"চারু বদামি পিতরঃ সঙ্গতেষু॥" ৭।১৭

হে পিতৃস্থানীয় সভাসদ্‌গণ, সভামধ্যে আমি চারু বাক্যই বলিব।

এক্ষণে এই প্রজা-সভায় রাজা কিরূপ ভাবে প্রবেশ করিতেন, তাহার পরিচয় ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

পরিসদ্মেব পশুমন্তি
রাজানঃ সত্যাঃ সমিতীরিয়ানাঃ ৯।৯২।৬

হোতা যেরূপ পশুযুক্ত যজ্ঞগৃহে গমন করেন, সত্যকাম রাজা সেইরূপ

সমিতিতে গমন করেন।—ইহাতে বুঝিলাম, হোতাকে যেরূপ পূত ও সমাহিত চিত্তে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিতে হইত, রাজাকেও সেইরূপ পবিত্র ও সমাহিত চিত্তে সমিতিতে বা সভাগৃহে প্রবেশ করিতে হইত। এই সকল সভাসমিতি সেকালের লোকের কিরূপ শ্রদ্ধার বিষয় ছিল, তাহা যজুর্ব্বেদের—

"নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ নমঃ" ॥ ১৬।২৪

প্রভৃতি উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। সভা দ্বারা সে কালে জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত হইত বলিয়া—

"ধর্ম্মায় সভাচরং" যজুর্ব্বেদ ৩০ ৬

অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে সভাগমনকারীরও প্রতি সম্মান প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। আবার সভার নিয়ম লঙ্ঘন করা গুরুতর দোষ বলিয়াও সে কালে বিবেচিত হইতে দেখা যায়—

যদ্ গ্রামে যদরণ্যে যৎসভায়াং যদিন্দ্রিয়ে।
যৎশূদ্রে যদার্য্যে যদেনঃ চকৃমাঃ বয়ং
যদেকস্যাধিধর্ম্মণি তস্যাবয়জনমসি ॥ যজু ২০।১৭

"অর্থাৎ গ্রাম, অরণ্য, সভা, ইন্দ্রিয়, শূদ্র, আর্য্য প্রভৃতিদিগের সম্বন্ধে আমরা যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তৎসমূহের নিষ্কৃতির জন্য এই যজন করিতেছি।" এই মন্ত্রপাঠে অনুমিত হয় যে, (১) গ্রাম্য ব্যবস্থার নিয়ম, (২) বনবিভাগের নিয়ম, (৩) সভাবিষয়ক নিয়ম, (৪) ইন্দ্রিয়বিষয়ক (নৈতিক) নিয়ম, (৫) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম প্রভৃতির যদি কাহারও দ্বারা ব্যভিচার ঘটিত, তাহা হইলে তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কৃত ও যজ্ঞকালে প্রায়শ্চিত্ত ভাগী হইতে হইত। অথর্ব্ববেদে যে "জন্মভূমির স্তব" আছে, তাহাতেও দৃষ্ট হয় যে,—

যে গ্রামাঃ যদরণ্যং যাঃ সভা অধিভূম্যাং।

যে সংগ্রামাঃ সমিতয়ঃ তে চারু বদামি তে॥ ১২।১।৬

অর্থাৎ গ্রাম, অরণ্য, সভা, সংগ্রাম, সমিতি প্রভৃতি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সর্ব্বত্র (হে জন্মভূমি!) তোমার সম্বন্ধে চারু (হিতকর) বাক্য বলিব। এই মন্ত্রের সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের একবাক্যতা-পূর্ব্বক আলোচনা করিলে সে কালের ঋষিগণের রাজ্যব্যবস্থা বিষয়ে ধারণা কিরূপ ছিল, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রাচীন বৈদিক যুগেও এ দেশে সভাসমিতির কিরূপ বাহুল্য ও সম্মান ছিল,তাহার আভাস পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রনিচয়ে পাঠক অবশ্য লাভ করিয়াছেন। ঋক্ যজু—উভয় বেদেই নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পরিদৃষ্ট হয় যথা;—

সোমো ধেনুং সোমো অর্ব্বন্তং অশ্বং

সোমো বীরং কর্ম্মণ্যাং দদাতি।

অর্থাৎ সোম তাঁহার ভক্তকে গো ও দ্রুতগামী অশ্ব দান করেন; তিনি যজমানকে বীর, কর্ম্মঠ, সভায় খ্যাতি লাভের যোগ্য, বিদ্বৎসমাজে পূজ্য ও পিতার যশোবৃদ্ধিকর পুত্র দান করেন। (পাঠক এই স্থলে একবার বর্ত্তমান কালের পিতার কামনার সহিত প্রাচীন কালের পিতার আকাঙ্ক্ষার তুলনা করিয়া দেখুন।) সেকালের ঋষিগণ অন্যান্য বিষয়ের সহিত সভায় খ্যাতি লাভের যোগ্য পুত্র কামনা করিতেন, ইহাই এ স্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। বৈদিক আর একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন—

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী

সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং॥

(ঋগ্বেদ ১০।১৯১।৩ ও অথর্ব্ব ৬।৬৪

ইহাদিগের মন্ত্রণা বা গুপ্ত পরামর্শ যেন সমান (একবিধ) হয়, ইহাদিগের সমানী সমিতি হউক, মন সমান বা একবিধ হউক, ইহারা

সহচিত্ত হউক। এ স্থলে "সমানী সমিতি" বলিতে কি বুঝাইতেছে? সমিতিতে কাহারও যেন মতভেদ না ঘটে, ইহা কি ঋষির প্রার্থনা? অথবা "সমানী সভা" অর্থে "সার্ব্বজনিক সভা"? যে সভায় সকলের গমন করিবার অধিকার আছে, তাহাকেই কি এস্থলে "সমানী-সভা" বলা হইতেছে?

এ দেশে পঞ্চায়ৎ পদ্ধতি অতি প্রাচীন। পঞ্চায়তে বা পঞ্চজনের সভায় ত প্রায় সকল জাতীয় বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ লোকেরই সমাবেশ হইয়া থাকে, দেখা যায়। উত্তর-ভারতে পঞ্চায়েৎ বলিলে সামাজিক সভা বুঝায়। সামাজিক-সভায় সমাজস্থ সকলেরই স্থান থাকে। উক্ত বৈদিক মন্ত্রে কি এইরূপ সভাকে "সমানী সভা" বলা হইয়াছে? কে আর এখন আমাদিগকে উক্ত বৈদিক মন্ত্রের গূঢ়ার্থ বুঝাইয়া দিবে?

তবে পঞ্চায়ৎ কথাটি বৈদিক গন্ধযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ বৈদিক সাহিত্যে পঞ্চজন, পঞ্চমানব, পঞ্চ ক্ষিতি, পঞ্চ কৃষ্টি প্রভৃতি পদের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। ভাষ্যকারেরা ঐ সকল পদের অর্থ "নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও নিষাদ এই পঞ্চ জাতিতে সেকালের আর্য্যসমাজ বিভক্ত ছিল। নিষাদদিগেরও সেকালে বৈদিক যাগযজ্ঞ করিবার অধিকার ছিল। এই কারণে "পঞ্চজন" বলিলে প্রাচীন আর্য্যসমাজের পঞ্চবর্ণকে বুঝাইত। এই পঞ্চ বর্ণের বহির্ভূত লোকেরা দাস ও অনার্য্য প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। এই পঞ্চজন শব্দের সহিত "পঞ্চায়ত" পদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে। তাই মনে হয় যে, পঞ্চজনের আয়তন বা অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বুঝাইবার জন্য "পঞ্চায়ত" পদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এ অনুমান যদি অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে প্রাচীন কালের "সমানী সমিতি"তে পঞ্চবর্ণের আর্য্যেরই সমান প্রবেশাধিকার ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কি অসঙ্গত হইবে?

বৈদিক কালের রাজার রাজ-নির্ব্বাচনের ও সভা-সমিতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকেরা প্রাপ্ত হইলেন। এখন রাজসভার একটু পরিচয় গ্রহণ করুন :—

রাজানাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদাসি উত্তমে
সহস্র স্থূণ আসাথে॥ ঋ ২।৪।১

এই ঋগ্বেদীয় মন্ত্রে রাজসভার তিনটি বিশেষণ দৃষ্ট হইতেছে। (১) ধ্রুব, (২) উত্তম, (৩) সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট। যে বেদে সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট উত্তম রাজসভার উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই বেদকে আজকাল অনেকে "কৃষকের গীতি" বা "আর্য্যদিগের আদি অসভ্যাবস্থার গীতি" বলিয়া মনে করেন, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে?

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

প্রাচীন মূলতান।

মূলতান ভারতের একটী প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে ইহা পাঞ্জাবের নদীচতুষ্টয়ের জলধারা পরিপ্লাবিত হইত; তখন সম্পদে ও সৌভাগ্যে মূলতান ভারতে শ্রেষ্ঠতম নগর বলিয়া বিবেচিত হইত। "অল্‌মসুদি" নামক মুসলমান ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, খৃঃ ১০ম শতাব্দে এক মূলতান রাজ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাম ছিল। তখন মূলতান শস্য-সম্ভারে জগতে অতুলনীয় ছিল। মূলতানের সে সৌভাগ্যের দিন অতীতে মিশাইয়া গিয়াছে, সে জন্য আর বড় কেহ মূলতানের অতীত ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখে না।

আর্য্যজাতির পবিত্র প্রাচীন বাসভূমি শতদ্রুনদীর উপকূলবর্ত্তী ভূভাগ

হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, ইতিহাস-বিশ্রুত মুলতান নগরী প্রতিষ্ঠিত। ইহার উত্তরে ঝঙ্গ, পূর্ব্বে মণ্টগোমারী, দক্ষিণে বহালপুর রাজ্য ও পশ্চিমে মজঃফরগড় অবস্থিত। ধ্বংসস্তূপসমাকীর্ণ এই পার্ব্বতীয় অধিত্যকাপূর্ণ ভূভাগকে শত শত শতাব্দীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাচীনত্বের আবরণে বেষ্টিত করিয়া অতি সন্তর্পণে চিরবিস্মৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা পুরাতন গ্রন্থসমূহ হইতে মুলতানের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত করিয়া ইহার প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক মূলতাননগরী একটী দ্বীপের উপর অবস্থিত ছিল।. কিন্তু হঠাৎ বিশপা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, এখন মূলতান হইতে উক্ত নদী প্রায় ১৭ ক্রোশ দূর দিয়া প্রবাহিতা। ইহাতে ইহার সমৃদ্ধি হ্রাস পাইয়াছে। কতদিন পূর্ব্বে বিশপার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বলা সহজ নয়, তবে যে সময় বিশ্ববিজয়ী আলেকজন্দর ভারতে উপনীত হন, সে সময় মুলতান জলবেষ্টিত উক্ত দ্বীপের উপর অবস্থিত ছিল। তাঁহার বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নগরসহ দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহাকে নৌকা চড়িয়া বিশপার জলরাশি মথিত করিতে হইয়াছিল।

মূলতান নগরের প্রাচীন নাম কশ্যপপুর। প্রবাদ এই যে, আদিত্য ও দৈত্যগণের পিতা মহর্ষি কশ্যপের নামানুসারে এই নগরের নাম-করণ হয়। প্রাচীনকালে মুলতান সূর্য্যোপাসনার জন্য সমুদায় ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। তীর্থযাত্রী বহুদূর দেশ মইতে মূলতানে আগমন করিয়া 'মিত্রের' উপাসনা করতঃ ধন্য হইত। এই সূর্য্যোপাসনার প্রচার লক্ষ্য করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সূর্য্যোপাসক আর্য্যগণের সময়ে মূলতানের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই মুলতানে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত হয়। কথিত আছে যে, কৃষ্ণের

পুত্র মূলতানে সূর্য্যোপাসনার সৃষ্টি করেন। মূলতানের সূর্য্যমন্দির তাঁহার চেষ্টায় নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের নাম আত্মস্থান। ইহার মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিত এক সূর্য্যমূর্ত্তি; যে দেব-দর্শন আকাঙ্ক্ষায় দূরাগত মোক্ষকামী বহু শতাব্দী ধরিয়া, ভারতের বহুস্থান হইতে মূলতানে উপস্থিত হইয়াছে; ইহাই সেই ইতিহাসবিশ্রুত দেবমূর্ত্তি। পুরাণের মতে ইহা দ্বাপরের ঘটনা। সুতরাং মূলতান যে প্রাচীন নগর সে বিষয়ে সংশয় নাই।

মূলতানের ঐ প্রাচীনত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও অভাব নাই। হিকাটিয়োস্ হিরোদোতস্ টলেমী প্রভৃতি গ্রীক ভৌগোলিকগণের বিবরণ হইতেও মূলতানের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মূলতান নাম আধুনিক। সুতরাং উক্ত ভৌগোলিকগণের গ্রন্থে কোথাও মূলতান নামের উল্লেখ নাই। ইহারা সকলেই ইহাকে কাস্পিরিয়া, কস্পিরিয়াই প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে কশ্যপপুর ব্যতীত "হংসপুর," ভাগপুর প্রভৃতি আরও কতিপয় নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখানে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, তবে কশ্যপপুর যে, মূলতানের পুরাতন নাম, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? যে কারণে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ কশ্যপপুর মূলতানের পুরাতন নাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

টলেমী যে কশ্যপপুরকেই কাস্পিরা নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার বর্ণনাপাঠে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না। তিনি বলেন যে উক্ত নগর রুভিস (রাভি) ও সন্দবাগের (চন্দ্রভাগা) সঙ্গমক্ষেত্রে অবস্থিত। ১৩:৮ খৃঃ পর্য্যন্ত উক্ত নদী মূলতানের পাদদেশ ধৌত করিয়া যে প্রবাহিত হইত, তাহা তাইমুরের ভারত আক্রমণের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। এই নগর টলেমির সময় কাশ্মীর হইতে মথুরাপুরী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। শব্দগত সাদৃশ্য ও টলেমির ভৌগোলিক

বিবরণ অনুসারে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব ইহাকে নিঃসঙ্কোচে কশ্যপপুর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মূলতান শব্দের উৎপত্তি লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডাঃ কানিংহাম মূল সাম্বপুর হইতে মূলতান নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন, আবার ডাঃ অর্পাট প্রভৃতি ঐতিহাসিক-গণ মল্লিজাতির বাসভূমি অর্থাৎ মল্লস্থান হইতে মূলতান শব্দের অনুবৃত্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন। অপরন্তু অনেকের বিশ্বাস যে মূলস্থানপুর হইতেই মূলতানশব্দের উৎপত্তি। চৈন পরিব্রাজক হুয়েন সাং কাচ, বেলুচিস্থান, হাইদ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া ৬৪১ খ্রীঃ অব্দে মূলতানে উপনীত হন। তাঁহার বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা কচ তখন মূলতানের সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি প্রাচীন রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মূলতানের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর চন্দ্র মূলতানের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতি। চৈন পরিব্রাজকের বিবরণে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, আমাদিগের আলোচ্য মূলতান সে সময় 'মূলস্থানপুর' নামেই বিখ্যাত ছিল। যে কারণে মূলস্থানপুর মূলতান নামেরই অনুকৃতি বলিয়া আমা-দিগের বিশ্বাস তাহার কারণ এই।

চৈন পরিব্রাজক মূলস্থানের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মূলতানের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সূর্য্যমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এই মূর্ত্তি রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মন্দির মধ্যে অবস্থান করিত এবং ভারতের বিভিন্ন নরপতিগণও উক্ত দেবদর্শনমানসে সুদূর প্রদেশ সমূহ হইতে তথায় উপনীত হইতেন। এই সূর্য্যমূর্ত্তির বিষয় পাঠ করিয়া মূলস্থানপুর যে কশ্যপপুর বা মূলতানেরই নামান্তর মাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

এই স্থানে একটী কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আরবীয়গণ মূল-তানকে 'ফারজ' নামে অভিহিত করিত। ফারজ অর্থে স্বর্ণগৃহ।

মুলতানে স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত সূর্য্যদেবের মন্দিরে যে অনির্ব্বচনীয় ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল, তাহারই ফলে অর্থলোলুপ বিদেশিগণ মুলতানকে এই কৌতুকপ্রদ আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছিল।

৬৬৪ খৃঃ খলিফা আবু বেকরের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রথমে মুলতানরাজ্য আরবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। মহালিব নামক জনৈক আরবসেনাপতি আপনার অধীনস্থ এক ক্ষুদ্র দল সঙ্গে লইয়াও বৃহতী আরববাহিনীকে পশ্চাতে ফেলিয়া ঝড়ের ন্যায় মল্লদিগের রাজধানীর উপর আসিয়া পড়েন। মল্লগণ এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়াতে আরবগণের জয় হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের পর আরবগণ দেশ অধিকার করিয়া আপনাদিগের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা না করাতে, আবার পূর্ব্বশান্তি ফিরিয়া আসে এবং কালে আরব আক্রমণ ঠাকুরমার অতিরঞ্জিত কাহিনীমাত্রে পরিণত হইয়া পড়ে। তার পর বহু দিবস আর কোন উৎপাতের চিহ্ন সূচিত হয় নাই।

মুসলমান জাতির অভ্যুত্থানের কিছু পরেই সিন্ধু রাজ্যের সহিত মুলতান রাজ্যও মহম্মদ বিনকাশিম কর্ত্তৃক "খলিফা" সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। কাচনামা গ্রন্থে মহম্মদের মুলতান আক্রমণের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত আছে। এই স্থানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অর্থলোলুপ আরবগণের দৃষ্টি মুলতানের ধন সম্পদের উপর পড়িবা মাত্র, তাহাদিগের লালসা শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ফলে মুলতানবাসীকে পরাস্ত করিয়া ধন রত্ন হস্তগত করিবার জন্য, মুসলমানগণ উদ্যুক্ত হইয়া উঠে। মহম্মদ কাশিম মুলতান জয়ের জন্য প্রেরিত হন। এই গ্রন্থে মহম্মদ কাশিমের আক্রমণ-প্রসঙ্গে কাচনামার লেখক আলোচ্য স্থানটীকে সিক্কা মুলতান নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও মুলতান নামের উল্লেখ দেখা যায় না। সে যাহা হউক, মুসলমানগণ

সূর্য্য মন্দির লুণ্ঠন করিয়া দেবতার অবমাননা করিবে, জানিতে পারিয়া মুলতানবাসিগণ নিশ্চিন্ত রহিলেন না। উভয় পক্ষের আয়োজন শেষ হইলে, হিন্দু মুসলমানগণ মুলতানের প্রশস্ত প্রান্তরে ধূসর আকাশের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। হিন্দু মুসলমানের রক্তে নদী বহিয়াছিল (Rivers of blood flowed on both sides) ভীষণ যুদ্ধের পর, বিজয়লক্ষ্মী মুসলমানগণেরই কণ্ঠে জয়-মাল্য পরাইয়া দেন। কথিত আছে যে, এই যুদ্ধে প্রায় ছয় হাজার ব্রাহ্মণ পুরোহিত ক্রীতদাসরূপে মুলতান হইতে খলীফের নিকট প্রেরিত হয়।

মুসলমানেরা দেবমন্দির হইতে প্রভূত ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি করিয়া এই গুপ্ত অর্থের সন্ধান পান, আবু রেহানের বর্ণনা হইতে আমরা তাহা অবগত হই। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

"যুদ্ধ শেষ হইলে, সদস্য, রক্ষী ও সেনানায়কগণকে সঙ্গে লইয়া, মহম্মদ কাশিম মন্দিরের অধিরোহিণী অতিক্রম করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এই মন্দির মধ্যে এক স্বর্ণ নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। প্রতিমূর্ত্তি উজ্জ্বল, দুই খানি উজ্জ্বল মরকত মণি বসাইয়া মূর্ত্তির চক্ষু করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দূর হইতে ইহাকে মানুষ বলিয়াই ভ্রম হয়। কাশিমও ইহাকে কোন জীবন্ত মানব বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্কন্ধ হইতে মস্তক বিচ্যুত করিবার জন্য, অসিহস্তে তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। ইহা দেখিয়া, মন্দিরের ব্রাহ্মণগণ ভূতলে আছাড় খাইয়া পড়িল, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল "বীরেন্দ্র, এই মূর্ত্তি মুলতানের দেবমূর্ত্তি। আপনি ইহা নষ্ট করিবেন না। দেবতার পাদদেশে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত আছে, অর্থে আপনার প্রয়োজন থাকিলে, আপনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। আরব সেনাপতি মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিলেন; মূর্ত্তি অপসারিত হইলে

দেখা গেল যে, মাটির নিম্নে একটী গৃহ রহিয়াছে। কাশিমের আদেশে সৈন্যগণ সেই ভূমধ্যস্থ গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা ২৩০ মণ স্বর্ণ ও ৪০টী কলসপূর্ণ স্বর্ণরেণু ক্রমশঃ বাহিরে আনিয়া কাশিমের সম্মুখে সাজাইয়া দিল। তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া যাজকগণ বলিল "এই কলস মধ্যস্থ স্বর্ণরেণু ওজনে ১৩০০০ হাজার মণ। যাত্রিগণের প্রদত্ত ধন বহু শতাব্দী ধরিয়া ঐ গৃহে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে; আজ সৌভাগ্য বলে এই সঞ্চিত ধন তোমার হস্তগত।"

এই সময় হইতে মুলতান খলিফা সম্রাজ্যভুক্ত হয়। পরে খলিফা বংশের অবসান হইলে, সিন্ধু প্রদেশেও মুসলমান শক্তির অবসাদ ঘটে। খৃঃ ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে মুলতানে একজন স্বাধীন নরপতি রাজত্ব করিতেন, কিন্তু চন্দ্রভাগা ও শতদ্রুর সঙ্গমস্থলে আরব-রাজত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

আল্ মাসুদি নামক জনৈক বোক্‌দাদ্‌বাসীর লিখিত বিবরণ হইতে মুলতান সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। তিনি খৃঃ ৯১৫ অব্দে সিন্ধুনদের উপকূলস্থ প্রদেশ সমূহ পরিদর্শন করিতে ভারতে উপস্থিত হন। ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি "স্বর্ণ প্রান্তর" নাম দিয়া একখানি পুস্তক আনুমানিক ৯৪২ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা শতমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থ হইতে মুলতানের তৎকালীন অবস্থা ও তথায় মুসলমান ধর্ম্মের প্রসার প্রভৃতি বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। তিনি মুলতানের সূর্য্যমূর্ত্তির প্রসঙ্গে বলেন :—"বহুদূর দেশ হইতে নানা শ্রেণীর লোক এই মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য মুলতানে উপস্থিত হয়। ধনরত্ন, সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি তাঁহারা সঙ্গে আনয়ন করে এবং সে সমুদায় এই মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

এই যাত্রিগণের প্রদত্ত ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ রাজা গ্রহণ করেন; এবং তাহাতেই তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ হইয়া উঠে। কোন হিন্দু নরপতি মুলতান আক্রমণ করিয়া মুসলমানগণকে উত্ত্যক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, মন্দিরের দেবতাকে বাহিরে আনা হয় এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহাতে অগ্নি সংযোগ করিবার ভয় দেখাইলে, তাহারা নিরস্ত হয় ও মুলতান শত্রু আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা পায়।" তিনি মুলতানবাসীর শান্তি ও ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য করিয়া বার বার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, সে সময় আরবের মুসলমানগণ মুলতানে রাজত্ব করিতেন, এবং তথায় মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তার তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই সময় কনোজ মুলতানের অধীন ছিল।

৯৫১ খৃঃ লিখিত একখানি পুস্তকে মুলতান-বিষয়ক অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইবন্ হাকল ঐ পুস্তক হইতে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মুলতান সে সময় সুরক্ষিত ছিল। ইহার চারিদিকে প্রশস্ত প্রাচীর নগরকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত।

এইবার সংক্ষেপে সূর্য্যমন্দিরের বিষয় বলিব। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ধর্ম্মোদ্দেশ্যে চিরদিন মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়াছে। যে সমুদায় অভ্রভেদী দেবগৃহ ভারতের নানা স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, আজিও বিদেশীয় বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, সে সমুদায় নির্ম্মাণের জন্য কুক্ষিগত "চাঁদার খাতা" লইয়া কাহাকেও অপরের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। ধনিগণ মুক্তহস্তে ধন যোগাইয়াছেন, দরিদ্র স্বেচ্ছায় শরীরপাত করিয়া সে বিশাল সৌধরাশি গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার জন্য এত বড় বৃহৎ ভারতবর্ষে কেহ কখন বিস্ময় প্রকাশও করে নাই, কিম্বা সভা করিয়া

কেহ কাহাকেও অভিনন্দনও দেয় নাই। অতি সহজ পুরাতন প্রথায় নিঃশব্দে এসব কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বলিতেই হইবে যে, মুলতানের সূর্য্য-মন্দির প্রকৃতই এক বৃহৎ ব্যাপার ছিল। এরূপ বিরাট অট্টালিকা ভারতে অতি অল্প স্থানে বর্ত্তমানকালে দৃষ্ট হয়। সমতল ভূমি হইতে মন্দিরের চূড়া ৩০০ ফিটের অধিক হইবে। মন্দিরের চারিধারে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ মধ্যে অসংযত গৃহ। সেই সব গৃহে অন্যান্য দেব-মূর্ত্তি অবস্থিত। মন্দিরের পূজারীগণ মন্দিরমধ্যেই অবস্থান করিত। তাঁহাদিগের সংখ্যা সহস্রের উপর হইবে। মন্দিরের ও প্রাঙ্গণের পর সুদৃঢ় প্রাচীর প্রহরীর ন্যায় সতত শত্রু হইতে এই পবিত্র মূর্ত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের নিকট মুলতানের বাজার অবস্থিত ছিল। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের উচ্চ কলরবে সে স্থান সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্য ও অন্যান্য কারণে মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানেই কেবল যে সমধিক লোকের সমাগম হইত, তাহা নয়, কিন্তু মুলতান সহরের মধ্যে এই স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের বাস ছিল। শ্রেণীবদ্ধ দোকানপাট ক্রেতাগণের জন্য দিবারাত্র খোলা থাকিত। ভারতের নানা স্থান হইতে বহু লোক মুলতানের হস্তিদন্ত নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি ক্রয় করিবার জন্য প্রতিনিয়ত মুলতানে আসিত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার মন্দিরের নিকটস্থ দোকান সমূহে বিক্রয় হইত।

দেবদর্শনে মানুষের কলুষরাশি অপনোদিত হইয়া শুভ্র-পুণ্য-জ্যোতিতে তাহার জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী লক্ষ লক্ষ লোক শতাব্দীর পর শতাব্দীতে ভারতের প্রান্তে মুলতান অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এইবার সেই দেবাদিদেব সূর্য্য দেবের কথা বলিব।

কেমন করিয়া কোন সময় হইতে ভারতে সূর্য্যোপাসনার সৃষ্টি হইল, তাহার আলোচনা করিতে যাইলে, প্রবন্ধ অনর্থক দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের আলোচ্য মুলতানের সূর্য্যমূর্ত্তির সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে যে উপাখ্যান আছে, এখানে কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। প্রবন্ধান্তরে ভারতে সূর্য্যপূজার প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। মূলতানে সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে যে উপাখ্যান আছে, তাহা এই—

বিষ্ণুর ঔরসে জাম্ববতীগর্ভে সাম্ব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতি রূপবান্ ছিলেন। যৌবনে সাম্ব এতই রূপগর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। একদা দুর্ব্বাসা ঋষি দ্বারকায় বেড়াইতে আসেন। তাঁহার দীন হীন বেশ, রুক্ষ ও কৃশমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া সাম্ব মুখভঙ্গী করিয়াছিলেন; ইহাতে দুর্ব্বাসা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাম্বকে "তোমার কুষ্ঠ হইবে" এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন। ইহার কিছু দিন পরে একদিন নারদ বীণা বাজাইতে বাজাইতে দ্বারকায় উপনীত হইয়া, কথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণকে বলেন যে আপনার মহিষীগণও রূপবান্ পরপুরুষ দেখিয়া সহবাস আকাঙ্ক্ষা করেন। রমণী-চরিত্র এমনই অদ্ভুত। কৃষ্ণ আপনার মহিষীগণকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং তাহাদিগের সম্বন্ধে এ দোষারোপের উপর কোন আস্থা স্থাপন না করিয়া, নারদকে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার আদেশ করিলেন। সেইজন্য নারদ আর এক দিন দ্বারকায় আসেন। এ সময় কৃষ্ণমহিষীগণ মদ্যপানে বিভোর হইয়া রৈবতক শেখরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় সাম্বকে লইয়া নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। কন্দর্পসম সাম্বকে অবলোকন করিয়া, রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ভিন্ন অপর রমণীগণ চঞ্চল হইলেন। ইহাতে দ্বারকানাথ সাম্বকে বলিলেন "যে রূপ তোমার মাতৃগণের চিত্তে চাঞ্চল্য উপস্থিত করে, সে রূপ তোমার পক্ষে কালস্বরূপ। অতএব অচিরাৎ তোমার রূপ কুষ্ঠাক্রান্ত হইবে।"

সাম্ব কুষ্ঠাক্রান্ত হইলেন, ঋষিবাক্য পূর্ণ হইল। তিনি অশেষ যাতনা

ভোগ করিয়া নারদের শরণাপন্ন হইলেন,—সকাতরে তাঁহাকে কহিলেন "হে মেধার পুত্র! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমার আরোগ্যে উপায় বিধান করুন।" পরে সাম্ব নারদের উপদেশে মিত্রের তপস্যায় নিরত হইলেন। তাঁহার তপস্যায় মিত্র প্রসন্ন হন এবং অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করেন। যেখানে সাম্ব মিত্রের উপাসনা করেন, সেই স্থান মিত্রবন নামে খ্যাত হইয়াছিল, এইখানে সাম্ব সর্ব্বপ্রথম সাঙ্গোপাঙ্গ মিত্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্রনামা সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে, তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন। সদ্ ব্রাহ্মণেরা কেহই মিত্র দেবের সেবাইত হইতে চাহিল না। সুতরাং কে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে; কেই বা ইহাঁর পৌরহিত্য করে? তখন সাম্ব কুল-পুরোহিত গৌরমুখের নিকট গিয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন। তিনি কহিলেন "সূর্য্য পূজায় ও সূর্য্যোদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী ব্রাহ্মণ এখানে নাই। শাকদ্বীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত পুত্রগণ সূর্য্যপূজার একমাত্র অধিকারী।" সাম্ব তাহাদিগকে আনিবার জন্য শাকদ্বীপে গমন করেন। তাঁহার সহিত অষ্টাদশ কুল-মগগণ ভারতে আগমন করেন। শাকদ্বীপ হইতে এই প্রকারে মগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া সাম্ব চন্দ্রভাগা নদীর তটদেশে একটী মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করেন। ঐ পুরী পরে সাম্বপুর নামে খ্যাত হয়। সাম্ব এই পুরের অভ্যন্তরে দিবাকর মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহার পূজা নির্ব্বাহের জন্য বিবিধ ধনরত্নাদি রক্ষা করিলেন। সদাচারনিরত মগগণ বেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে সূর্য্যদেবের পূজাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, সাম্ব নিশ্চিন্ত হইলেন। এই রূপেই ভারত-বিখ্যাত সাম্বপুরের সূর্য্য মন্দির নির্ম্মিত ও মিত্রমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। পণ্ডিত-গণ অনুমান করেন যে, ভারতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম সূর্য্যমন্দির। আদিত্যের উপাসনা ভারতে বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত বটে। কিন্তু প্রতিমাগঠন বা মূর্ত্তি বিশেষের পূজা প্রচলিত ছিল না। "Indian Antiquities"

গ্রন্থে ভারতের সূর্য্যপূজার সহিত অন্যান্য স্থানের সূর্য্যপূজা তুলনা করিয়া টমাস্ মরিস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতে সূর্য্যপূজা প্রচলিত হইবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত সভ্য জগতে মিত্র পূজা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রবন্ধান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের চেষ্টাতেই ভারতে মিত্রের মূর্ত্তি গঠিত ও তৎপূজা প্রচারিত হয়। বঙ্গের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ নগেন্দ্র বাবুর মতে ভারতে যেখানে যত সূর্য্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমস্তই এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের প্রভাবে অথবা তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

মুলতানই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চৈন পরিব্রাজক হিয়েনসাং এখানকার সুবর্ণময়ী সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে আবু রিহান্ খৃষ্টীয় ১০ শতাব্দীতে এই সূর্য্যমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এই সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি তাঁহার সময় কাষ্ঠময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। * তিনি মূর্ত্তির সম্বন্ধে বলেন যে, ইহাঁ ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদীর উপর স্থাপিত ছিল। ইহাঁকে দেখিতে মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু উচ্চে মনুষ্য অপেক্ষা অনেক বেশী, প্রায় ২০ হাত হইবে। ইহা দারুনির্ম্মিত, ইহার চক্ষুতে দুইখানি লোহিত বর্ণের মরকত বসান ছিল; এবং মূর্ত্তির মস্তকে একখানি সুবর্ণ মুকুট ছিল। এই স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি কিরূপে দারুমূর্ত্তিতে পরিণত হইল, তাহা বলা সহজ নয়। হিয়েনসাং প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহাঁকে সুবর্ণ নির্ম্মিত বলিয়া একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছেন; অপরন্তু কাচনামার লেখক স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, মহম্মদ কাশিম ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াই সন্তুষ্ট হন। তাঁহার হস্তে উক্ত মূর্ত্তির কোন দুর্দ্দশা হয় নাই। কিন্তু আশ্বিন সংখ্যায় ঐতিহাসিক চিত্রে "সিন্ধু রাজ্যের" প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় আবু হাফিলের গ্রন্থ হইতে এই

* Al Beruni's India. Translated by E. Sachan, Vol. I. Page 121.

মূর্ত্তির বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে উক্ত মূর্ত্তিকে লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরবর্ত্তী সময়ে একটী আবরণের মধ্যে ঢাকিয়া রাখা হইত, এবং তাহার স্বর্ণদেহ না দেখিতে পাইয়া লোকে নানারূপ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া থাকিবে।

মুলতান হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে চান্দরা নামক স্থানে এক সুন্দর অট্টালিকায় মুলতানের শাসনকর্ত্তা বাস করিতেন। তিনি খোরেশ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি স্বাধীন নরপতির ন্যায় বাস করিতেন। বোগদাদের খালিফার নামে "খুদবা" পড়িয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিতেন। তিনি বড় মুলতানে আসিতেন না। কেবল প্রতি শুক্রবারে উপাসনার জন্য হস্তিপৃষ্ঠে মুলতান নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন।

ফেরিস্তা বলেন যে, মুলতানের প্রথম শাসনকর্ত্তা সেখ হামিদ লোদী সবক্তজীনের অধীনতা স্বীকার করিয়া, মুলতানের সিংহাসনে আরূঢ় হন; কিন্তু তাঁহার পর নাসীরের পুত্র দায়ুদ গজনীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া লাহোরের নরপতি জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালের সহিত ষড়যন্ত্র করাতে, মহম্মদ গজনী মুলতান আক্রমণ করেন। তিনি ভাটিওা দিয়া ১০০৫ খৃঃ নগর মধ্যে প্রবেশ করেন। নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি নগর অবরোধ করেন। ইতোমধ্যে পেশোয়ারের নিকট মহম্মদের হস্তে অনঙ্গপালের পরাজয়-বার্ত্তা দায়ুদের কর্ণগোচর হইল। যাঁহার ভরসায় তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহার পরাজয়ে তাহার যাবতীয় আশা নিদাঘ-দগ্ধ পরিম্লান কুসুমের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। তিনি যুদ্ধজয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মহম্মদের শরণাপন্ন হইলেন। মহম্মদ ২০,০০০ স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া দায়ুদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

গজনবী বংশের পতনের পর মুলতানে আবার হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার অব্যাহিত পরে আবার মুলতান সিয়াগণের অধীনে

আসে। তাহারা খ্রীষ্টীয় ১১৭৬ শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় আপনাদিগের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, ঐ সময় মহম্মদ ঘোরী সিংহাসনারূঢ় হন। সিংহাসন লাভ করিয়াই তিনি মুলতান জয়ের জন্য এক সৈন্যদল গঠন করেন। তাঁহার আক্রমণের ফলে মুলতানে সিয়া রাজত্বের অবসান হয়। তিনি মুলতান জয় করিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণের ন্যায় ক্ষান্ত হইলেন না। পরন্তু তথায় আপন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অধীনস্থ একজন সেনানায়কের হস্তে মুলতানের শাসন ভার অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহাঁর নাম আলি কারমানী।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।
"বৈদ্যবাটী যুবকসমিতি।"

পূর্ব্ববঙ্গের রাজবংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কথায় বলে আশা বৈতরিণী নদী—যত পায় তত চায়। ব্রাহ্মণ ভাবিল, যাহা পাইয়াছি, তাহাত আমার হাতেই, এখন বড় তরফ হইতে আরও কিছু পাইলে আরও বেশী লাভ হইবে। সুতরাং সে সেই দিকে যাত্রা করিল। বড় তরফের সদর দরজা পার হইতে না হইতেই যোগেন্দ্রনাথের লোক যাইয়া ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিল এবং সমস্ত অর্থ কাড়িয়া রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া বিদায় করিল। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বহু গল্প প্রচলিত আছে।

যোগেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান থাকিতেই তৎপুত্র জিতেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। এখন জিতেন্দ্রনাথের নাবালক পুত্র কুমার ধীরেন্দ্রনাথ ছোট তরফের অধিকারী।

মহারাজ রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শিবনাথ। তিনিই ছোট তরফের প্রথম রাজা।* রাজা শিবনাথের নয় রাণী ছিল। দক্ষিণা, জগদম্বা, হরিপ্রিয়া, অন্নপূর্ণা, কাশীশ্বরী, গৌরমণি, রতনমণি, সোণামণি ও অজ্ঞাত। রাজার পরলোক গমনের পর তন্মধ্যে তিন রাণী দত্তক গ্রহণ করেন। রাণী দক্ষিণা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হরিষপুরনিবাসী রতিকান্ত রায়ের পুত্র আনন্দনাথকে, রাণী জগদম্বা শিবুরায়ের পুত্র দুর্গানাথকে এবং রাণী হরিপ্রিয়া হরিশ্চন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই দত্তক লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই তিন জনের মধ্যে কে রাজা শিবনাথ-ত্যক্ত বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাহা লইয়া বড়ই আন্দোলন আরম্ভ হইল। উপর্য্যুক্ত তিন রাণীই নিজ নিজ দত্তককে সিদ্ধ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ইহার মীমাংসা না হওয়ায় সমস্যা উদ্ধারার্থ সকলেই রাজদ্বারে উপস্থিত হন। এই সময় হঠাৎ রাণী দক্ষিণার মৃত্যু হওয়ায় আনন্দনাথ মহা বিপদে পতিত হইলেন। মাতার মৃত্যুতে স্বপক্ষ অবলম্বনে কাহাকেও অগ্রসর হইতে না দেখিয়া তিনি নিরুপায় হইয়া রাজবাড়ী এবং রাজপরিবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মাতা বর্ত্তমানে আনন্দনাথের বাল্যকালে স্বরূপ পাল এবং রামকমল পাল নামে দুইজন অতি বিশ্বাসী চাকর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। আনন্দনাথ নিরুপায় হইয়া তাহাদের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং সেই ভৃত্যদ্বয়ও নিমকের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে নিজবাড়ীতে আশ্রয় দিয়া সম্ভবমত রাজার যথোচিত সম্মান ও সাহায্য করিতে ত্রুটি করে নাই। আনন্দনাথ যখন এইরূপ ভাবে নিরাশ্রয়,

* Raja Rojah.

চারিদিকেই নিরাশার শোণিতশোষী ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া শঙ্কিত, তখন শুভাদৃষ্টক্রমে তিনি তিন জন অসময়ের বন্ধু পাইলেন। বড় তরফের রাজা বিশ্বনাথের ত্যজ্যা রাণী জয়মণি, দেওয়ান ভবানী শঙ্কর ও রাজবংশের কুলগুরু। এই তিন প্রধান সহায় সর্ব্বতোভাবে আনন্দনাথকে রাজা করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। আদালতে দত্তক লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিচারক এই কঠিন সমস্যার কিছুতেই মীমাংসা করিতে না পারিয়া উপরি জানাইলেন। এতদনুসারে তৎকালীন ছোটলাট বাহাদুর আসিয়া তিন কুমারকে দেখিতে চাহিলেন এবং আনন্দনাথকেই তিন কুমারের মধ্যে সর্ব্বশুভলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া রাজবংশের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া চলিয়া গেলেন। এবং তখন হইতেই নিরাশ্রয়, সর্ব্বজন-পরিত্যক্ত হতভাগ্য আনন্দনাথ "রাজা আনন্দনাথ" হইয়া রাজ্যের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিলেন। রাজা হইয়া আনন্দনাথ প্রভুভক্ত ভৃত্যদ্বয়ের অসময়ের উপকার বিস্মৃত হন নাই।

রাণী হরিপ্রিয়া নিরুপায় হইয়া নিজ দত্তক পুত্র কুমার হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া রাজবাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজসাহী সহরে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে অবিবাহিত অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়।

আনন্দনাথ রাজা হইলেও কুমার দুর্গানাথকে নিজ সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। এবং তাঁহার দুরদৃষ্টের বিষয় প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন। দুর্গানাথের ইহার কিছুই ভাল লাগিত না। কিছুদিন পর তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বগুড়ায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ আনন্দনাথ বড়ই orthodox and conservative ছিলেন, কিন্তু পরে তাহার মত পরিবর্ত্তিত হয়। আনন্দনাথ রামপুর বোয়ালিয়াতে তাঁহার নামে দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি লাইব্রেরী প্রদান

করেন। এই মহৎকার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা বাহাদুর ও পরে সি, এস্, আই উপাধিভূষণে ভূষিত করেন। এ পর্য্যন্ত রাজসাহীতে অন্য কোনও রাজা সি, এস্, আই উপাধি পান নাই।

নাটোরের রাজবংশ।
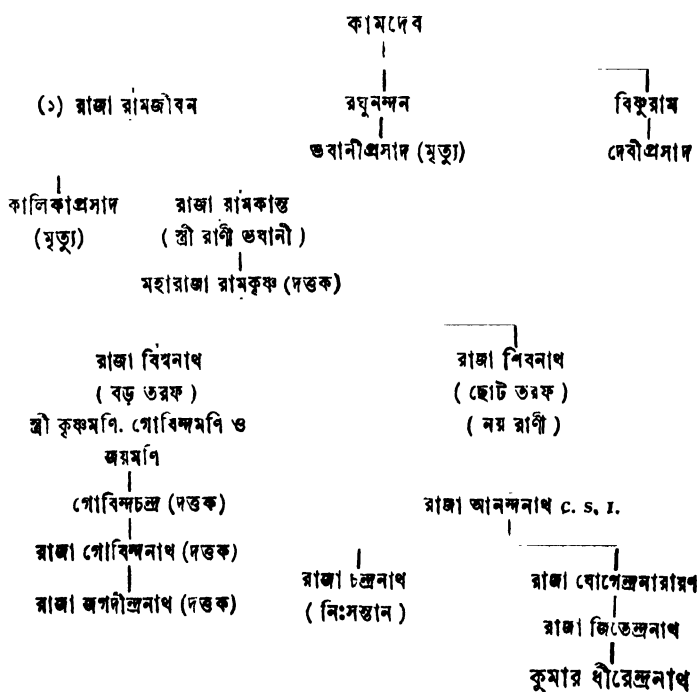
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বুধ্‌গয়া

হেরিলাম বুধ্ গয়া,—তরুরাজি-বেষ্টিত শ্যামল
নতোন্নত ভূমিখণ্ড রুক্ষরিক্ত প্রান্তর মাঝারে
শত শত শাখা-বাহু মেলি' দূর হ'তে বারে বারে
বিশ্বজনে করিছে আহ্বান—"আয় আয় রে চঞ্চল
ত্রস্ত সংসার-পিঞ্জর-বিহঙ্গম! এ শান্তি-কাননে
বারেক পশিয়া তুই করুণার অপূর্ব্ব পবনে
অবগাহি' জুড়া চিত্তদাহ। র'হেছেন হেথা বসি'
অনন্ত করুণাময় কপিলবস্তুর পূর্ণ শশী।"

সেই আবাহন মোর মর্ম্মমাঝে পবনমর্ম্মরে
প্রবেশ করিল দূর হ'তে। চলিনু ত্বরিতপদে;
পথিপার্শ্বে চরিছে ময়ূর,—উড়িছে উন্মদ-মদে
পবনে ঘুরিয়া পক্ষিকুল। দিগন্ত হইতে ক্ষরে
তরু-অন্তরালে দূর গিরি চুম্বি গগননীলিমা
মেঘমুক্ত অপূর্ব্ব বিলাসে। রচি' পূর্ব্বসীমা
শীর্ণ নৈরঞ্জনা চলে স্তূপাকার বালুকার মাঝে
হেথা হোথা কতগুলা সমাধিমন্দির আর রাজে।

নতশির প্রবেশিনু মন্দির-উদ্যানে।—কি উদার!
কি গম্ভীর! কি বিশাল শান্তিমাঝে মহানীরবতা
কি সুন্দর উল্লাসে বিরাজে! ধরাবাহী সে বারতা
ধরিছে প্রত্যক্ষ করি মুগ্ধ দুটি নয়নে আমার!
জগতের দুঃখে আহা! রাজার কুমার উদাসীন
বিষয়-বন্ধন ছিঁড়ি' সঁপিতে আপনা, দীনহীন

ভিক্ষুবেশে এইখানে বঞ্চিলেন কত না বরষ
বিশ্বের কল্যাণ আশে লভিবারে মুক্তির পরশ !
হেরিলাম শ্রীমন্দির ভূমিগর্ভে নামি' তা'র পরে
ধরিয়া আপন দেহে অতীত শিল্পের নিদর্শন
চিত্রিত দাঁড়ায়ে রয় চতুষ্কোণ চত্বর উপরে।
বিশ্বহিতে বুঝি কোন যাজ্ঞিক জ্বালিয়া হুতাশন
সমর্পিলা পূর্ণাহুতি—তাই যেন সে অগ্নি-সম্ভার
উঠেছে গগন ভেদি' ধরিয়া এ মন্দির-আকার।
শান্তজ্যোতিঃ যে শিখার অভিনব অমৃত-প্রভায়
অর্দ্ধেক ভূখণ্ড আজি তাপদগ্ধ অন্তর জুড়ায়।

দিবালোকে অন্ধকার সে গম্ভীর মন্দির মাঝারে
হেরিলাম পদ্মাসনে সুবিশাল সুবর্ণমূরতি
আচ্ছাদিত গৈরিক-বসনে ; দীপ্ত করুণার ভারে
অর্দ্ধনিমীলিত দুটি সুবিশাল আঁখি ম্লান জ্যোতিঃ
বিশ্ব-মানবের দুঃখে ! আহা ! আহা ! রাজার কুমার
বরাঙ্গ-কনক-রুচি কিবা আজি প্রবৃদ্ধ তোমার
সন্ন্যাসগৈরিক সাজে ! তোমা হেরি লজ্জায় লুটায়
দম্ভ মান ভোগ সুখ গর্ব্ব আর প্রভুত্ব ধুলায়।

কথা কও কথা কও হে মৌন করুণা-অবতার !
উদাস সন্ন্যাসী !
কথা কও কথা কও হৃদয়ের পাপতাপ ভার
দৈন্য তমঃ নাশি'।
কথা কও কথা কও অবিদ্যার আবরণ-জাল

ছিন্ন করি' দাও

কথা কও কথা কও—নেত্রবিষে মোর তপ্ত ভাল
উজলিয়া চাও।

নীরব নয়নে আমি নিবেদিয়া আপন অন্তর
মন্দির ত্যজিয়া ঘুরি' ফিরিলাম পশ্চাতে তাহার
দাঁড়ায়ে অশ্বত্থ এক সে 'বোধির' নব বংশধর
শ্রীবুদ্ধের ধ্যানাসন তলে লীন রহিয়াছে যা'র।
ধন্য ধন্য শিলাসন বহু তীর্থ হ'তে পুণ্যতম
তব ক্রোড়ে বসি প্রভু লভিলেন জন্ম নিরুপম
তোমার নিকটে তুচ্ছ কপিল বস্তুর রাজাসন
তোমারেও হেরি আজি ধন্য আমি কৃষ্ণ শিলাসন!

মন্দির দক্ষিণে হেরি পাষাণের কমল নিকর
খোদিত দাঁড়ায়ে আছে;—দলগুলি কালের তাড়নে
স্থানে স্থানে পাইয়াছে ক্ষয়। পাদচারণ চত্বর
ছিল হেথা শ্রীবুদ্ধের। যবে তিনি বিষণ্ণ নয়নে
বিশ্বব্যাধি প্রতীকারে বেড়াতে'ন হইয়া আকুল
প্রত্যেক চরণপাত ধরিত ধরণী পদ্মফুল
পাতি যত্নে। পাষাণ মুরতি ধরি' সে কমলদল
জানা'তে সার্থক জন্ম দাঁড়ায়ে রহেছে অবিচল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ময়ূর সিংহাসন
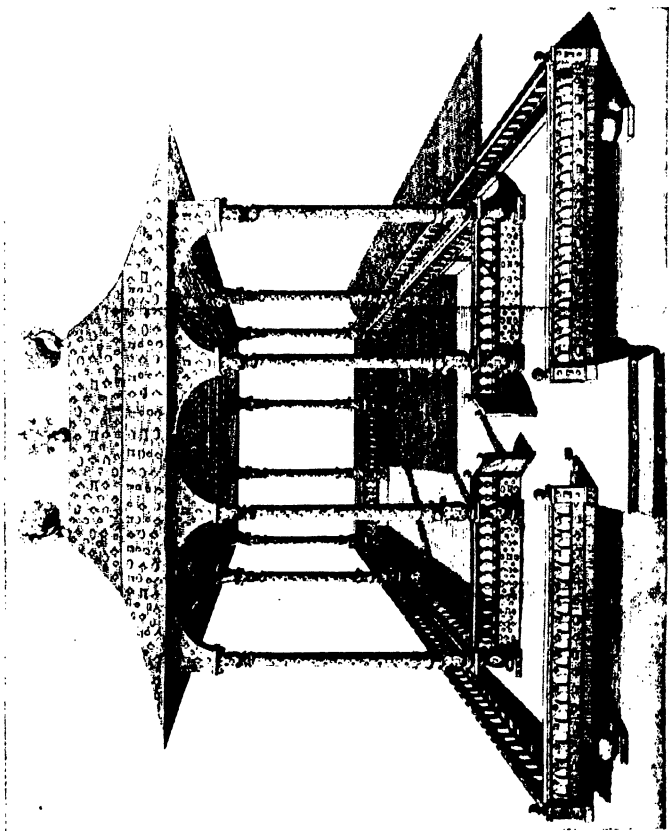
ঐতিহাসিক চিত্র।

মুসলমান রাজা ও হিন্দু প্রজা।

পৃথ্বীরাজের পতনের পর যখন দিল্লীর সিংহাসন পাঠানের করায়ত্ত হইল, তখন হইতে মুসলমান ভারতের রাজা হইলেন। কিন্তু প্রজা সাধারণ হিন্দুই থাকিয়া গেল। ক্রমে মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া হিন্দু প্রজাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল ও হিন্দু মুসলমান উভয়ে এই ভারত সাম্রাজ্যের প্রজা হইয়া উঠিল। অবশ্য মুসলমানেরা রাজার জাতি, কাজেই তাহারা যে হিন্দুগণ অপেক্ষা রাজানুগ্রহ অধিক লাভ করিবে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু হিন্দু প্রজারা যে একেবারে রাজার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এমন নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মুসলমান রাজারা হিন্দু প্রজাসাধারণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন।

ভারত সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিয়া পাঠানেরা যখন আপনাদের গৌরব-মদে মত্ত হইয়া উঠিল, তখন হিন্দু সাধারণ যে তাহাদের শাণিত কৃপাণের পিপাসা মিটাইবার জন্য আপনাদের শোণিত-দান করিতে লাগিল, ইতিহাস তাহার উল্লেখ করিয়া থাকে। কেবল তাহা নহে, শোণিত দানের সহিত অনেকে জাতি ধর্ম্মও দান করিয়াছিল। তাই শীঘ্র শীঘ্র ভারত সাম্রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিন্দুসাধারণে

মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাহসী না হইলেও হিন্দুজাতির ভস্মস্তূপের মধ্যেও তাহাদের শক্তি তখনও পর্য্যন্ত জাগ্রত ছিল। তাই রাজপুতের অসি ঝনৎকারে পাঠান সম্রাটের শোণিত ও রূপপিপাসা অনেক সময়ে তৃপ্ত হইতে পারে নাই। ভারতে হিন্দু জাতি তখনও পর্য্যন্ত আপনাদের অস্তিত্ব দেখাইতে বিস্মৃত হয় নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত পাঠান সম্রাটেরা আপনাদের গৌরবমদেই মত্ত ছিলেন। যখন দেখিলেন যে ভারতে এক-ছত্র মুসলমান সাম্রাজ্য বা মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুমাত্র সুযোগ নাই, তখন তাঁহারা হিন্দুদিগের প্রতি শুভদৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মের প্রভাব কমিয়া আসিল, রাজপুতনা প্রভৃতি জয়ের আশাতেও জলাঞ্জলি দিতে হইল। কিন্তু ক্রমে তাঁহারা ভারতের স্বাধীন সম্রাট হইয়া উঠিলেন, এবং প্রজা সাধারণের প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হিন্দু প্রজারা অনুগ্রহ পাইতে লাগিল। যাহারা কার্য্যদক্ষ, তাহারা রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইতে লাগিল। অবশ্য মুসল-মানের অনুগ্রহের মাত্রা যে অধিক ছিল, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

পাঠান সম্রাটেরা প্রজার যথা সর্ব্বস্বে হস্তক্ষেপ করা আর ন্যায়-সঙ্গত মনে করিলেন না। কাজেই তাঁহাদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট কর লওয়ার ব্যবস্থা হইল। হিন্দু রাজত্বকালে প্রজারা শস্যের ষষ্ঠাংশ কর স্বরূপে প্রদান করিত, অবশ্য মুসলমান রাজগণ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক লইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমে তাহার মাত্রা কিছু বাড়িয়া যায়। কারণ, আমরা আলাউদ্দীন খিলজীর বন্দোবস্ত কালে দেখিতে পাই যে, প্রজা-দিগকে আপনাদের আয়ের অর্দ্ধাংশ কর প্রদান করিতে হইত। সে যাহা হউক, তথাপি করের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট হার প্রচলিত থাকায়, তাহারা তাদৃশ কষ্ট ভোগ করিত না। মুসলমান প্রজাদের মধ্যে অনেকে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে পাইত, হিন্দুদিগের মধ্যে কাহারও

কাহারও প্রতি সেরূপ অনুগ্রহও বর্ষিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত হিন্দু-দিগের মধ্যে যাহারা রাজকার্য্যে দক্ষ তাহারাও রাজ দরবারে প্রবেশ লাভ করার অধিকার পাইল, তবে তাহাদের অধিকাংশই রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হইত।

দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে যখন বঙ্গরাজ্য স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল, তখন তাহার পাঠান রাজগণ হিন্দুদিগের সহিত বিশেষরূপ সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা হোসেন সাহাই ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া-ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ব্রাহ্মণের অধীনে সামান্য কার্য্য করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেম বলিয়া হিন্দুর প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া গিয়াছেন, রূপ সনাতনের ন্যায় কর্ম্মচারীর নিয়োগ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তদ্ব্যতীত হিন্দু গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অভিনব যুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নসারেৎ সাহাও পিতার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার পর যখন ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল, তখন হইতে হিন্দু-সাধারণের প্রতি রাজার আরও সুদৃষ্টি পড়িয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে কেহ কেহ যে নিগ্রহও দেখাইয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ আছে।

পাণিপথ ক্ষেত্রে আপনার বিজয় পতাকা উড়াইয়া যখন বাবর সাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন, তখন হইতে হিন্দুদিগের প্রতি মোগল বাদসাহদিগের সুদৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। সঙ্গরাণার অসি চালনায় মুগ্ধ হইয়া বাবর সাহ রাজপুত ও হিন্দুকে জাগ্রত জাতিই বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। হুমায়ুন বাদসাহ তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার পর মোগল কেশরী আকবর বাদসাহ হিন্দুদিগকে আপনার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ গণ্য করায় হিন্দুরা তাঁহাকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া অভিহিত করিত;

কেবল তাহা নহে, তিনি পূর্ব্বজন্মে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী নামে সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং সার্ব্বভৌমত্ব ইচ্ছা করিয়া পরজন্মে আকবর বাদসাহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও প্রচার করিয়াছিল, যমুনার প্রবল তরঙ্গ আগরার নূতন দুর্গের ভিত্তি যখন অপসারিত করিতে লাগিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশধর করৌলীরাজকে আনাইয়া যখন নূতন দুর্গের ভিত্তি পুনঃস্থাপিত হইল, তখন হিন্দুগণ বাদসাহের আচরণে মুগ্ধ হইয়া গেল। বীরবর, টোডরমল্ল, মানসিংহ যখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপে ভারতসাম্রাজ্য শাসনে ব্যাপৃত হইল, তখন সকলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। হিন্দু ব্রাহ্মণগণ যখন নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে লাগিল, তখন সকলেই তাঁহার রাজ্যের চিরস্থায়িত্ব কামনা করিতে লাগিল। হিন্দুর ধর্ম্ম যখন অক্ষুণ্ণ থাকিল, মন্দিরচূড়ায় যখন পতাকা হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, তখন সকলে মনে মনে হিন্দুরাজত্বের কথা স্মরণ করিতে লাগিল। পরবর্ত্তী মোগল সম্রাটগণও আকবর সাহের হিন্দুপ্রীতি একেবারে বিস্মৃত হন নাই, কিন্তু তাঁহাদের প্রীতি যে শিথিল হইয়া আসিতেছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাহাঙ্গীর ও সাজাহান প্রকাশ্যভাবে হিন্দুদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিলেও কৌশলে দেবমন্দির ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করেন নাই, তবে হিন্দুসাধারণের প্রতি তাঁহাদেরও যে যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার পর আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দুরা কিছুকালের জন্য একটু কঠোরতা অনুভব করিয়াছিল। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান হওয়ায় অনেক দেবমন্দির ভঙ্গের আদেশ দিয়াছিলেন। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু আকবরের পর হইতেই তাহার কিছু কিছু সূচনা না হইলে আরঙ্গজেব যে একেবারে এরূপ আদেশ দিতে সক্ষম হইতেন, তাহা বোধ হয় না। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান কৌশলে তাহা করিতে

প্রকাশ পাওয়ায় আরঙ্গজেব প্রকাশ্যভাবে এরূপ আদেশ দিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাকে যে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাও ইতিহাসে দেখা যায়, কেবল মন্দির ভঙ্গ বলিয়া নহে, হিন্দুদের প্রতি জিজিয়া বা শিরঃশুল্কের প্রচলন, ব্রাহ্মণদিগের নিষ্কর ভূমির প্রতি সামান্য কর স্থাপন এবং রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করায় হিন্দুরা তাঁহার রাজত্বে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাঁহার এই কঠোর ব্যবহারের জন্য হিন্দুজাতি আবার জাগ্রত হইয়া উঠে, তাই রাজপুত মহারাষ্ট্রীয় ও পরিশেষে শিখের বীরত্বকাহিনীতে আজিও ভারতের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া আছে। পরবর্ত্তী মোগল সম্রাটগণ কঠোরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময়ে হিন্দুগণ জাগ্রত হইয়া উঠায় ও বৈদেশিক ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ভারতে আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াসী হওয়ায়, তাঁহাদের প্রভুত্বের অন্তর্ধান ঘটে।

মোগল রাজত্বের শেষভাগে বঙ্গদেশে হিন্দুগণও যথেষ্ট রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। আরঙ্গজেবের মাতুল সায়েস্তা খাঁ ভাগিনেয়ের আদেশ রক্ষার জন্য বঙ্গদেশের হিন্দু প্রজাগণকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিলে, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা শান্তিলাভে সক্ষম হইয়াছিল। যদিও নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর সময়ে আমরা দুই একটি মন্দির ভঙ্গের কথা ও হিন্দু জমিদারগণের উৎপীড়নের বিষয় অবগত হই, তথাপি তাহার পর নবাব সুজাউদ্দীন ও আলিবর্দ্দীর সময়ে হিন্দুগণ যে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুজাউদ্দীন হিন্দু জমিদারগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাভাজন হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী রাজস্ব বিভাগ হইতে সৈনিক বিভাগে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের যে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ইহা আর কোন নবাব বা বাদসাহ করিতে পারেন নাই। সিরাজউদ্দৌলাও অনেক পরিমাণে আলিবর্দ্দীর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী নবাবগণের সময়েও

উক্ত দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না, তাহার পর হইতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে আমরা যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, হিন্দুরাজত্বের পর আমাদের ভাগ্যে আর তাহা ঘটে নাই। মুসলমান রাজগণ আমাদের প্রতি যে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ আলোচনা করিলে সকলেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন। তবে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে অনেক বিষয়ে অনুগ্রহ লাভ করিতেছি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে। সম্পাদক।

ইশা খাঁর মহত্ত্ব।

সে ষোড়শ শতাব্দীর কথা। তখন মোগলগৌরব-রবি আকবর সাহ স্বীয় সুদীর্ঘ জীবনের অবসানে দিল্লীর সুবর্ণ সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তখনও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যথিত প্রজা আকুল প্রাণে আপনাদের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইত; এবং এক এক জন পুরুষসিংহের পতাকার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। এই সকল পুরুষসিংহই বাঙ্গালার "বারভূঁইয়া" আমাদের আলোচ্য ইশা খাঁ তাহাদের অন্যতম। সে সময় যশোহরের প্রতাপাদিত্যের বিজয়বৈজয়ন্ত চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতেছিল, শ্রীপুরের দুর্গে চাঁদ রায় কেদার রায়ের স্বাধীন পতাকা পত পত করিয়া মোগলের বিজয়গৌরব খর্ব্ব করিয়া আপন প্রভায় বিরাজ করিত। তখন স্বাধীন বাঙ্গালী নৌ-সৈন্য আপন মনে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও পদ্মার বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মোগলশক্তিকে উপহাস করিত। তখন বাঙ্গালায় স্বাধীনতা ছিল, বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব ছিল, প্রাণে বল ছিল, হৃদয়ে শক্তি ছিল,—সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীর ঘরে পেটভরা খাদ্য ছিল, আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। দেশে বাস্তবিক একটা প্রাণ ছিল। সুখশান্তি শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর ক্রোড়ে ক্রোড়ে বিচরণ করিত।

বাঙ্গালার সেই সুখসমৃদ্ধির দিনে দিল্লীশ্বর আকবর তাহার সেনাপতি রাজপুত-কুলকলঙ্ক মানসিংহকে বাংলা মুলুকে মোগল আধিপত্য পূর্ণ-মাত্রায় বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে প্রেরণ করিলেন। কূটচরিত্র মান-সিংহ ছলে বলে কৌশলে একে একে সকলকেই নির্ম্মূল করিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস নূতন ভাবে লিখিত হইতে চলিল।

এইবার মানসিংহ পুরুষসিংহ ইশাখাঁর বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। ইশা খাঁ স্বীয় এগার সিন্ধু দুর্গে বসিয়া এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এগারসিন্ধু ময়মনসিংহ জেলায় নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র ও বানারের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখনও দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। তখন কুলপরিপ্লাবিনী বিপুলসলিলা বিপুল জলকল্লোলিনী ব্রহ্মপুত্র ও বানার দুর্গের পাদদেশ ধৌত করিয়া যৌবনের পুলকচাঞ্চল্যে দেশের গৌরবময় ইতিহাস গাহিয়া গাহিয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে লহর খেলিতে খেলিতে বহিয়া যাইত, কিন্তু হায় এখন তাহা কঙ্কালসার বালুকাস্তূপ। তখন তাহার সেই সুবিশালবক্ষে একদিন যে সমরলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, নির্ভীক বঙ্গবীরগণ যে বীরত্ব প্রদর্শনের অবকাশ পাইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন পর্য্যন্ত নাই, সেই করালরূপ ব্রহ্মপুত্রে এখন স্বল্পতোয়া জলধারা প্রবাহিত হইতেছে মাত্র। এই নদীমেখলা সুদৃঢ় দুর্গে বসিয়া ইশা খাঁ সম্রাটসৈন্যের বিপক্ষে দাঁড়াইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। কিছুদিন চলিতে লাগিল। মানসিংহ বানারের পূর্ব্বপারে আসিয়া স্বীয় শিবির সন্নিবেশিত করি-লেন। উভয় পক্ষে সাজ সাজ ডাক পড়িয়া গেল। একদিকে মোগলের "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি, অপর দিকে বাঙ্গালিসৈন্যের গভীর গর্জ্জন, ব্রহ্মপুত্রের বিশাল হৃদয় প্রকম্পিত করিয়া ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্যে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মপুত্রের বিশাল গর্জ্জন দিগ-দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইত। মানসিংহ সহসা ব্রহ্মপুত্রের বিশালতরঙ্গে ভাসিতে সাহসী হইলেন না, দিন ও সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগি-

লেন। ইশা খাঁ ব্রহ্মপুত্রের বাঁকে বাঁকে চর নিয়োজিত করিলেন এবং স্বীয় দুর্গে বসিয়াই নিত্য নব নব কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। দিন যতই যাইতে লাগিল, মানসিংহ ততই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গভীর রাত্রে বানার অতিক্রম করিলেন। এইবার ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিতে হইবে, মানসিংহ প্রমাদ গণিলেন। রাত্রে রাত্রে ইশা খাঁর চর দুর্গমধ্যে সংবাদ আনিয়া দিল। ইশা খাঁ আপনা আপনি বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। মানসিংহ তীরে পৌঁছিতে পারিলেন না। অরুণ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগার সিন্ধুর দুর্গ হইতে কামান গর্জিয়া উঠিল—সে রবের ভীষণ প্রতিধ্বনিতে মোগল-বাহিনীর প্রাণে এক কাল ছায়া নিপতিত হইল। মানসিংহ একটু বিপন্ন হইলেন। বুঝিলেন শত্রুপক্ষের গুপ্তচর তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা ইতিপূর্ব্বেই শত্রুশিবিরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে—এইবার বুঝি ব্রহ্মপুত্রের অতলজলে মোগলবাহিনী নিমজ্জিত হয়। ক্রমাগত এগারসিন্ধু দুর্গ হইতে কামান ধ্বনি উত্থিত হইয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। মোগলবাহিনীর কোন সাঁড়া শব্দ পাওয়া গেল না। অবশেষে ইশা খাঁ মানসিংহের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাজপুত বীর ইহাকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু ঘটনাস্থলে দেখা গেল প্রথম যুদ্ধে মানসিংহ নিজে না আসিয়া জামাতাকে প্রেরণ করিলেন এবং ইশা খাঁর সহিত সম্মুখ সমরে জামাতা নিহত হইলেন। ইশা খাঁ মানসিংহের ঈদৃশ কাপুরুষোচিত ব্যবহারে একটু দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন এবং স্বীয় দুর্গে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন শুনিলেন, রাজা মান অসি হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তখন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রু সমক্ষে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু মানসিংহের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া তিনি যুদ্ধ করিতে বিরত রহিলেন।

অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম যুদ্ধেই ইশা খাঁ মানসিংহের

তরবারি ভগ্ন করিলেন। তখন ইচ্ছা করিলে ইশা খাঁ মানসিংহকে হত্যা করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি বলিলেন"মহারাণা, অস্ত্রশূন্য করিয়া আপনাকে আঘাত করিব না আপনি প্রাণের মায়ায় জামাতাকে নিহত করাইয়াছেন, এখন এই অস্ত্র গ্রহণ করুন।" বলিয়া স্বীয় অস্ত্র সম্মুখে ধরিলেন। মানসিংহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ও ইশা খাঁর উদারতা লক্ষ্য করিয়া মোগল সেনাপতি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং ইশা খাঁর বন্ধুত্ব ভিক্ষা চাহিলেন। ইশা খাঁ মানসিংহকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিলেন।

মানসিংহের যুদ্ধে এই প্রকার পৃষ্ঠ প্রদর্শন এবং ইশা খাঁর সহিত বন্ধুত্ব হয়ে প্রাণ বাঁচান তাঁহার পরিবারের কাহারও অভিপ্রেত ছিল না। বিশেষ যখন মানসিংহের পত্নীর কাণে এ কথা উঠিল, তখন তিনি বুঝিলেন তাঁহার বৈধব্য নিকটবর্ত্তী। তিনি জানিতেন, মানসিংহকে বাঙ্গালা মুলুকে পাঠানের ভিতর একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছিল—মানসিংহের ন্যায় এক জন হিন্দু বীরকে এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করা মোগল সম্রাটের অভিপ্রেত নহে ; তবে যে বাঙ্গালাবিজয়ে প্রেরণ করা তাহার অন্য উদ্দেশ্য আছে ; হয় শত্রু সংহার, না হয় মানসিংহের বিনাশ ; উভয়তঃই সম্রাটের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এইবার ইশা খাঁর জয়ে রাণী মনে করিলেন সম্রাট, মানসিংহকে অসম্মান করিবেন তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবেন না। মানসিংহ একটু বিপদে পড়িলেন ; কি করেন। অবশেষে বন্ধুর শরণাপন্ন হইলেন। ইশা খাঁ বন্ধুর এই পারিবারিক গোলযোগের মীমাংসার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মোগলের রাজধানী বিশাল আগরা নগরীতে পৌছিতে না পৌছিতেই ইশা খাঁ বন্দী হইলেন। কিন্তু মোগল সম্রাট যখন এগারসিন্ধুরে মানসিংহের প্রতি ইশা খাঁর উদারতা ও মহানুভাবতার কথা শ্রুত হইলেন,

তখন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে "দেউয়ান মসনদ আলি" উপাধি খেলাৎসহ বহু পরগণা উপঢৌকন দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন। ইশা খাঁ অচিরেই সুখ, সম্মানসহ স্বীয় রাজধানী জঙ্গলবাড়ীতে পৌঁছিলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ঔরংজীবের পত্রাবলী।

সম্রাট ঔরংজীব তাঁহার পুত্রগণকে যে পত্রাবলী লিখিতেন, তাহার অনুবাদ আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। এই সমস্ত পত্র হইতে সম্রাটের বিশ্বাস, চরিত্র ও রাজ্যসংক্রান্ত বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় সাতখানি পত্র প্রকাশ করিব। এই পত্র কতিপয় সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহ আলমের উদ্দেশ্যে লিখিত।

প্রথম পত্র।

প্রিয় পুত্র, ঈশ্বর তোমায় নিরাপদ রাখুন :—

সম্রাট সাহজাহান স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে তাঁহার পৈতৃক জনপদ সমূহ জয় করিবার জন্য আমার ভ্রাতা মোরাদ বক্সকে বারম্বার বল্ক্, বদাখসান্, খোরাশান, হিরাত প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সমুদয় জনপদই সম্রাট সৈন্যগণের দ্বারা জিত হইয়াছিল, কিন্তু মোরাদের কার্য্য-শৈথিল্য হেতু উক্ত জিত জনপদ সমূহ তাঁহার শাসন হইতে মুক্ত হইয়া উঠে। কারণ বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বেই সম্রাটের আদেশ না লইয়া, মোরাদ উক্ত জনপদ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ইহাতে যথেষ্ট অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হয়। এই জন্যই লোকে বলে, 'অকর্ম্মণ্য পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।'

কথায় বলে, "পিতা যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, পুত্র তাহা সম্পন্ন করে।"

সুতরাং উক্ত প্রদেশসমূহ জয় করিবার আশায় আমি তোমাকে সুশিক্ষিত সৈন্য ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসমূহ প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু আমার বারংবার আদেশসত্বেও যখন তুমি এক কান্দহার জয় করিতে পারিলে না, তখন বর্ত্তমান অভিযানের যে কি ফল হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, তোমার দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। নিজের ভাল সকলেই বুঝে, আমরা আমাদিগের জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছি; উক্ত প্রদেশসমূহ আমাদিগের অধিকারে আসুক বা নাই আসুক, তাহাতে আমাদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি কি। কিন্তু তুমি কি করিয়া জগতে তোমার আত্মীয় স্বজনের নিকট এবং পর জগতস্থ সম্রাট সাজাহানকে মুখ দেখাইবে। আর মনে রাখিও, মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, তিনি তোমার কার্য্য দেখিতেছেন।

দ্বিতীয় পত্র।

পুত্র,

শুনিলাম যে এই বৎসর তুমি "নৌরোজ"(১) উৎসব সম্পন্ন করিয়াছ। ঈশ্বর করুন যেন তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস (২) অটুট থাকে। কিন্তু তোমাকে কে এই নূতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিল? হয়ত তুমি আরবগণের নিকট হইতে এই অভিনব ধর্ম্মমত শিক্ষা করিয়াছ। সে যাহা হউক এই "নৌরোজ" "মাগী"গণের উৎসব এবং এই দিন বিক্রমাদিত্য সিংহাসন আরোহণ

(১) পারস্যবাসীদিগের পঞ্জিকা অনুসারে নৌরোজ বৎসরের প্রথম দিন এবং এই দিন সূর্য্য মেষ রাশিতে পদার্পণ করে।

(২) পারস্যবাসীদিগের মধ্যে শিয়া ও শুন্নি এই দুই দল আছে। শুন্নিগণ "নৌরোজ" উৎসবে যোগদান করে না। সম্রাট নিজে শুন্নি ছিলেন। তাঁহার পুত্র শিয়াগণের উৎসবে যোগদান করাতে, তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহার পুত্রকে এই পত্র লিখেন।

করিয়া বিক্রম সম্বৎ প্রচার করেন; এই জন্যও উক্তদিন ভারতের কাফেরগণের (হিন্দু) নিকটে পবিত্র। অতএব তোমার ইহাতে যোগ দেওয়া উচিত নয়। ভবিষ্যতে আর এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিও না। (পদ্যে)—

"আমি বকিয়াই মরিতেছি! কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহই সৃষ্টি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিলে না।"

"আমার পাপের জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দিকে আমার চিত্তকে উন্মুখ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।"

তৃতীয় পত্র।

তোমার চতুর্থ পুত্রকে তুমি অত্যন্ত স্নেহ কর। তাহার উন্নতির জন্য তুমি আমাকে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছ, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। কিন্তু জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠের উন্নতি কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে। তোমার পুত্রের গৃহপরিশোভিত করিবার আদেশ চাহিয়াছ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি, কারণ ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তুমি তোমার নিজের ঘরের সম্বাদ রাখ না। যাহা হউক তোমার জন্য তোমার পুত্রের বিষয় স্মরণ রাখিব।

চতুর্থ পত্র।

শুনিলাম যে তুমি সৈন্য সংস্কারে মনোযোগ দিয়াছ এবং সৈন্য মধ্যে অধিক বেতনের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেছ। বোধ হয় তুমি কান্দাহারাভিমুখে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিয়াছ। ঈশ্বর তোমার উপর তাঁহার করুণাকণা বর্ষণ করুন। কিন্তু তুমি যে কেন লাহোরে যাইতে অনুমতি চাহিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেইজন্য আমরা নাশির খাঁর বেতন হইতে ৫০০ শত মুদ্রা কমাইয়াছি এবং সেই হিন্দু সভাসদকে

বিদায় দিয়াছি। তোমার জন্য এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, এই সমস্ত লোককে পূর্ব্ব হইতেই বিদায় দেওয়া উচিত ছিল।

পঞ্চম পত্র।

তুমি প্রকৃতস্থ থাকিয়াও কি করিয়া যে ফতেউল্লা খাঁকে রুষ্ট করিলে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যখন আমরা অল্প বয়স্ক ছিলাম, তখন আমরা ওমরাহদিগের প্রতি এরূপ ভদ্র ব্যবহার দেখাইতাম যে, তাঁহারা আমাদিগের সকলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সেই জন্যই দারার যথেষ্ট ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহার নির্দ্দয় ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া অনেকে আমাদিগের সাহায্য করিবার জন্য দারাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, আর যাহারা দারার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাঁহারাও আমাদিগের ধৈর্য্য ও শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়া আমাদের মহত্ব প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং আমাদিগের শৌর্য্য ও শিষ্টাচারে সম্রাট সাজাহানের পারিষদবর্গ মোহিত হওয়াতে আমরা পিপীলিকার ন্যায় অতি হীন হইলেও আমাদিগের অস্ত্রকুশলতার দ্বারা মহৎ ও দুষ্কর কার্য্য সমূহ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ফতেউল্লা খাঁ একজন উদ্যমশীল সাহসী সৈনিক পুরুষ, তোমার দুর্ব্যবহারের দ্বারা তুমি তাহাকে বিরক্ত করিয়াছ। কিন্তু তোমার অবিদিত নাই যে, সে আমাদিগের প্রভূত উপকার করিয়াছে (পদ্যে) "লক্ষ রত্ন দান করিয়া কি হইবে? তুমি ত একটী রত্ন ভাঙ্গ নাই, তুমি একটী হৃদয় ভাঙ্গিয়াছ।" অতএব অতীত বিষয়ের অনুশোচনা ছাড়িয়া দাও। তাহার সহিত মনোমালিন্য মিটাইয়া ফেল। তাহা হইলে তোমার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে (পদ্যে) "আমরা তোমাকে যে পরামর্শ দিই, কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া তাহা শ্রবণ কর। যদি কোন ব্যক্তি করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে কোন পরামর্শ

দেন, তবে তুমি সে পরামর্শ শুনিয়া কাজ করিও।” ভবিতব্যই ঈশ্বরের হস্তে। “যিনি ধর্ম্মপথে আছেন, আমি তাহাকে প্রণাম করি।”

ষষ্ঠ পত্র।

জনৈক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে, তুমি জাফ্‌রাণ্‌ বর্ণের * উষ্ণীষ শিরে ধারণ করিয়া রাজসভায় প্রবেশ কর। এবং “ফুলবাগি” পরিচ্ছদ (যে পোষাকের উপর পত্রপুষ্পাদি অঙ্কিত থাকে) তোমার অঙ্গে শোভাবর্দ্ধন করে। তোমার ন্যায় পলিত কেশ ব্যক্তির এরূপ বিলাসিতা শোভা পায় না।

সপ্তম পত্র।

আমার নিকট হইতে সম্বাদ লইয়া মুনাম খাঁ তোমার নিকট যাইতেছে। আমি কোথায় চলিয়াছি জানি না। আমি পাপী—আমার কি হইবে, তাহা সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বরই জানেন। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের হস্তে তোমাদিগকে সমর্পণ করিয়া, আমি বিদায় লইতেছি। আমার অবর্ত্তমানে যেন আমার পুত্রগণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া পরস্পরের সহিত বিবাদে না লিপ্ত হয়। মনে রাখিও সৈন্য ও প্রজাগণ ঈশ্বরের জীব; বিনা কারণে তাহাদিগের রক্তপাত করিতে তোমাদিগের অধিকার নাই কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, আমার মৃত্যুতে ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর মানবহৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবগণকে শুভ ইচ্ছা প্রদান করিতেছেন, যাঁহার অনন্ত জ্ঞানের এক কণিকা লাভ করিয়া মানুষ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত, তিনি এই সমুদয় নিরীহ প্রাণিগণকে রক্ষা করুন। সত্য বটে তিনি আমাদিগের হস্তে তাহাদিগের পালন ভার দিয়াছেন, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র ভ্রান্ত জীব মাত্র।

শ্রীসত্যচরণ সর্ব্বাধিকারী।

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি।

* মুসলমান ধর্ম্মে জাফরাণ বর্ণের পরিচ্ছদ নিষিদ্ধ।

দ্বারবাসিনী।

মহানদের সন্নিকটে, পাণ্ডুয়ার চারি পাঁচ মাইল পশ্চিমে, একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ইহা হুগলী জেলার অন্তর্গত, নাম দ্বারবাসিনী। দ্বারবাসিনীর ইতিহাস ভাণ্ডারে কোন অপরিজ্ঞাত সত্য অতীতের অন্ধকারে লুক্কায়িত আছে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু নিরাভরণা গ্রাম দ্বারবাসিনী যে নীলকর কুঠিয়ালগণের সেবিকারূপে বহুকাল অবস্থান করিয়া বসনে ভূষণে, সাজ সজ্জায়, হতাদৃতা গ্রাম্য প্রৌঢ়াগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন, গ্রাম মধ্যে অনাদরে ভগ্নপ্রায় নীলকুটীর বৃহৎ প্রাকার ও "চিম্‌নি" এ বিষয়ে আজিও সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামটী এখন তাহার পূর্ব্ব গৌরব বর্জ্জিত। ইহা স্বনাম ধন্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্গত। বর্ত্তমান দ্বারবাসিনী কতিপয় নিঃস্ব গ্রামবাসীর জননী। বৃদ্ধা আপনার নিঃস্ব সন্তানগণকে বক্ষপঞ্জরের মধ্যে কর্ম্ম মুখরিত জনপদের চক্ষু হইতে দূরে অতি দূরে দারিদ্র্যের আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে দারিদ্র্যব্যঞ্জক মালিন্য তাহার মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা প্যারীমোহনের ব্যয়ে পরিচালিত একটী ইংরাজি স্কুল দারিদ্র্য-স্তব্ধ গ্রামের নিভৃত পল্লীকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। মুমূর্ষু ব্যক্তির অঙ্গসঞ্চালন দৃষ্টে বুঝা যায়, যে জীবন প্রদীপ স্তিমিত, কালে যে তাহা পূর্ব্ব জ্যোতি লাভ করিতে পারিবে না, কে বলিতে পারে—অবাধ মুক্ত শিশুগণের আনন্দোচ্ছ্বসিত মুখমণ্ডল ও উচ্চ কণ্ঠধ্বনি গ্রামের নিস্তব্ধতা ব্যাধি ভগ্ন করিয়া জীবনী শক্তি প্রচার করিতেছে।

ম্যালেরিয়া বাংলার পরম শত্রু। ১৮৬৩ খৃঃ দ্বারবাসিনীতে ম্যালেরিয়া দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র গ্রাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল। সরকারী কাগজে প্রকাশ যে, ছয় বৎসরের মধ্যে ২৭০০

গ্রামবাসীর মধ্যে ১৯০০ শত জন ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। কি পরিতাপ !

দ্বারবাসিনীর পূর্ব্ব ইতিহাস নানারূপ অদ্ভুত গল্পজালে জড়িত। এককালে এই স্থানে একজন হিন্দু নরপতি বাস করিতেন। তিনি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলে এই গ্রাম মুসলমানগণের অধীন হয়। হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া এক গ্রাম্য প্রবাদ আছে, তাহা এই।

দ্বারপাল নামক এক সদ্‌গোপ বংশীয় রাজা দ্বারবাসিনীতে রাজত্ব করিতেন। রাজার সাত মহিষী। "সাতমহিষী" আপনাদিগের অলোক-সামান্যরূপে "সাতপুরী" উজ্জ্বল করিয়া বাস করিত। দ্বারপাল পরম নিষ্ঠাবান জিতেন্দ্রিয় হিন্দু। তাঁহার একদেশদর্শিতায়ও মানব কোন ছার, দেবতাও সন্তুষ্ট ছিলেন। চঞ্চলা লক্ষ্মী আপনার চঞ্চল স্বভাব বিস্মৃত হইয়া কিঙ্করীর ন্যায় রাজ অন্তঃপুরে বাস করিতেন। মাতা দ্বারবাসিনী মাঠে মাঠে শস্য-শ্যামল-অঞ্চল বিছাইয়া, সঙ্গীত মুখরিত তরু-গণের স্নিগ্ধ ছায়ায় যেন প্রগাঢ় স্নেহে গ্রামটীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে সুগভীর পুষ্করিণী যেন মাতৃবক্ষ নিঃসৃত পীযুষ আধার। সকলেরই দিন পরম আনন্দে অতিবাহিত হইত। দেবতা যতদিন প্রসন্ন ছিলেন, ততদিন দ্বারবাসিনীর সন্তানগণ দুঃখ কাহাকে বলে জানিত না।

ভাগ্য যখন প্রসন্ন থাকে, তখন কিছুরই অভাব থাকে না। দ্বারপাল আপনার বিস্তৃত উদ্যান সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে এক সুগভীর পুষ্করিণী খনন করিলেন। পরে আপনার তপোনিষ্ঠার বলে ইষ্টদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করিলেন যে, উক্ত পুষ্করিণীর জলে যে যাহা মনে করিয়া স্নান করিবে, পুষ্করিণীর দেবশক্তি বলে, তাহার কাম্য লাভ করিবে এই পুষ্করিণীর নাম কাম্য পুষ্করিণী। ইহা এখনও বিদ্যমান আছে।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। শুভ্র আকাশে কোথা হইতে কাল মেঘ উদয় হয়। যে ক্ষুদ্র গ্রাম খানি শান্তিসুখে সমাচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ একদিন বিজয়ীর সর্ব্বগ্রাসী অস্ত্রঝনৎকারে তাহার দ্বারদেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। দ্বারবাসিনীর সুখের দিন ফুরাইল।

মহম্মদ আলি সসৈন্যে দ্বারবাসিনীর দ্বারদেশে উপনীত হইল। দ্বার-পাল ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী মাত্র। রণমদমত্ত মুসলমানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার শক্তি ছিল না। ভরসা ইষ্টদেব। দেবানুগৃহীত দ্বারপালের রণনৈপুণ্যে মুসলমানগণ শ্রান্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মুষ্টিমেয় হিন্দুসৈন্য বহু যুদ্ধেও কোনমতে হ্রাস পাইল না। অথচ প্রত্যহ শত শত হিন্দু মুসলমানের ক্ষুধিত কৃপাণে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। মহম্মদ বহু অনুসন্ধানে অবগত হন যে, রাজ-প্রাসাদসংলগ্ন এক সরোবর আছে। ইহার নাম জীবনকুণ্ড। ঈশ্বর বরে আহত এমন কি মুমূর্ষু ব্যক্তি ইহাতে স্নান করিয়া, অচিরে সুস্থ হইয়া উঠে। মৃতব্যক্তি ইহার জলস্পর্শে সজীব হইয়া বহুবৎসর জীবিত থাকে। আহত ও মৃত হিন্দু সৈন্যগণ, আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক উক্ত সরোবর-তীরে নীত হইয়া, ইহার জলস্পর্শে আরোগ্যলাভ করতঃ পরদিন পুনরায় অসিহস্তে শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছে। হায়! দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত সামান্য মানব কি করিয়া সমকক্ষ হইবে? এ যে দুই হস্তের দ্বারা সমুদ্রবক্ষ বিদীর্ণ করিবার বৃথা চেষ্টা! তবে যে মহম্মদ সুদূর তুর্কীস্থান হইতে তরবারিমাত্র বক্ষে ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে কি বাংলাদেশের একজন অশ্রুতনামা ভূম্যধিকারীর নিকট পরাস্ত হইয়া, অধিকৃত জীবন বহন করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য? মহম্মদ আলি চিন্তিত হইল।

মুসলমান সৈন্যের মধ্যে একজন ফকির ছিলেন। তিনি মহম্মদকে আশ্বস্ত করিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উৎকট অমঙ্গল, মন পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারে। সাত রাণী এই সময় প্রমোদ উদ্যানে প্রিয় সখিগণের সহিত রহস্য করিয়া কলকণ্ঠের কাকলি শুনিয়া ও আপনাদিগের সুকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতে বনের পাখীদিগকে লজ্জা দিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, চলিয়া চলিয়া কাননভূমিকে উচ্ছ্বসিত রূপের তরঙ্গে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। অকস্মাৎ তাঁহাদিগের ডান অঙ্গ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। আনন্দ সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পৃথিবী যেন গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া তাঁহাদিগের পাদদেশ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। সাতরাণী ভীত ও সন্ত্রস্তপদে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। এমন সময় উক্ত ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির প্রতিহারীকে রাজদর্শন ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

রাজা দ্বারপালের সন্ন্যাসীর উপর অচলা ভক্তি। সুতরাং সন্ন্যাসীর নাম শুনিবামাত্র তিনি স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সাদরে রাজসভায় লইয়া আসিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর মস্তক ঘন, কৃষ্ণ, বৃহৎ জটাজালে বর্ষার মেঘাবৃত আকাশের ন্যায় আচ্ছন্ন। সুগঠিত সুন্দর দেহ প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক চক্ষু উজ্জ্বল ভ্রূকুটীপূর্ণ, মুখমণ্ডল গম্ভীর ক্রুরতামণ্ডিত। দ্বারপাল কৃতাঞ্জলিপুটে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে উত্তর করিল—"আমি অবগত হইলাম যে, তোমার প্রাসাদসংলগ্ন একটী সরোবরে স্নান করিলে পীড়িত ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করে। আমি পীড়িত, সুতরাং উক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আরোগ্যলাভ ইচ্ছা করি। স্নান করিবার অনুমতি প্রদান কর। রাজা বিনা আপত্তিতে তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির মুখবিবরে গোমাংস খণ্ড লুকাইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিল। গোমাংস স্পর্শে পুষ্করিণীর জল অপবিত্র হওয়াতে, সরোবর তাহার পূর্ব্ব শক্তি হইতে খলিত হইল। রাজলক্ষ্মী অনাচারী রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইবার হিন্দুগণ মুসলমানগণের অমিত পরাক্রমের নিকট পরাভব

স্বীকার করিল। শোকে মুহ্যমান দ্বারপাল তুষানলে প্রাণত্যাগে স্বীয় দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কথিত আছে যে ইহার পরে মুসলমানগণের হস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য সাত মহিষী ও তাঁহাদের সাত শত সখীসহ জ্বলন্ত চিতায় জীবনাহুতি প্রদান করে।

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি। শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণ—(১)

নাদিরসাহ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

মাস্‌হদ হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত খিলাতের রাজকীয় দুর্গে নাদিরের খুল্লতাত সেনানায়ক ছিলেন *। দারিদ্র্যপিষ্ট অবস্থা বৈগুণ্যে পরিচালিত নাদির দীনহীন বেশে খুল্লতাতের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া খিলাতে উপনীত হইলেন। খুল্লতাতের আশ্রয় ভিন্ন তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। ভ্রাতষ্পুত্রের লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া স্নেহপ্রাণ বৃদ্ধের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি নাদিরকে সস্নেহে গৃহের মধ্যে স্থান দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য নাদিরের উপর তখনও ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হন নাই। উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে লালিত উন্মার্গগামী

* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নাদির দরিদ্রবংশোদ্ভূত ও অজ্ঞাতকুলশীল পিতার পুত্র। কিন্তু নাদিরের খুল্লতাত কি করিয়া এই সম্মানার্হ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা সহজ নহে। ফ্রেজার সাহেব বলেন যে, নাদিরের পিতা খিলাতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহারই মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর নাদিরের খুল্লতাত উক্তপদ লাভ করেন। কিন্তু ইহা ফ্রেজার সাহেবের স্বকপোলকল্পিত উপন্যাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কারণ উত্তর জীবনে নাদির স্বয়ং বারংবার আপনার অজ্ঞাতকুলশীলত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

নাদির আপনার দুষ্ক্রিয়াসক্তির পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। খুল্লতাত স্নেহপুষ্ট অন্নে তাঁহার হৃদয়ের ক্ষুধা মিটিল না। তিনি খুল্লতাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহারই অন্নে পুষ্ট হইয়া নাদির তাঁহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া শাণিত অসি উঠাইলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। তাঁহার ষড়যন্ত্র শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। রোষে, ক্ষোভে ও লজ্জায় ১৭২১ খৃঃ খিলাত পরিত্যাগ করিয়া নাদির চলিয়া গেলেন। খুল্লতাতের স্নেহশীতল আলিঙ্গন হইতে এইরূপে অমানুষিক ভাবে আপনাকে বিচ্যুত করিবার কালে তাঁহার কুলিশোপম হৃদয়ে কোনরূপ ব্যথা লাগিয়াছিল কিনা, অন্তর্যামীই জানেন; কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই আমরা তাঁহাকে একটী ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া পরস্বাপহরণরত দেখিতে পাই। ১৭২১ খৃঃ হইতে ১৭২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর ধরিয়া নাদির এই দলের নায়কত্ব করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র সেনানীর নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি অত্যদ্ভুত কার্য্যকুশলতায় সকলেরই মনে ভীতি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। আমরা এক্ষণে পারস্যদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক ইতিহাসের সংক্ষেপতঃ আলোচনা করিব। নাদিরের জীবনের সহিত ইহার বিশেষ সম্পর্ক না থাকিলেও তাঁহার জীবনী বুঝিবার পক্ষে ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

১৭২২ খৃঃ আফ্গানগণ পারস্য আক্রমণ করিয়া ইস্পাহান দখল করে এবং সেই সময়ের পারস্য সাহ হুসেন রাজ্য ছাড়িয়া আফগান-দিগের শরণাপন্ন হন *। ইস্পাহান অবরোধের সময় হুসেন সাহের পুত্র তামাস্প্ পিতার জন্য সৈন্য সংগ্রহার্থে নগর ছাড়িয়া চলিয়া যান। কিন্তু নগরত্যাগের অব্যবহিত পরেই, লোক পরম্পরায় পিতার পরা-

* Malcolm's History of Persia.

জয়ের বার্ত্তা তিনি শ্রবণ করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। পরে বন্ধুগণের সান্ত্বনায় ও সাধারণের উৎসাহে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি 'সাহ' অর্থাৎ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার পিতা কারাগারে—পিতৃশত্রু আফ্‌গানগণ ইস্পাহানে ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এতদ্ব্যতীত "পিটার দি গ্রেট্‌" (Peter the Great) ও ক্যাথারাইন্‌ দি ফার্ষ্ট্‌ (Catharine the First) কাস্পিয়ান্‌ সাগরের উপকূলস্থ গিলান প্রদেশে রুষিয়া শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, সমর সাজে পারস্যের দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছিল। আবার তুর্কীগণ খুর্জিস্থান ও ইরাকের বিভিন্ন প্রদেশের উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। এই বিপ্লবের সময়ে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া, তামাস্প্‌ মহা সমস্যায় পড়িলেন। অসিতে শক্তি, মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও হৃদয়ে সাহসের সম্মিলন ব্যতীত এই ঘোর দুর্দ্দিনে শাসনদণ্ড কখনই অবিচলিত থাকিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার এই তিনেরই অভাব ছিল। তিনি দুর্ব্বলপ্রকৃতি বিলাসী নরপতি বলিয়া পরিচিত *। তাঁহার দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার আত্মীয়গণ ও তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছিল। আবার হিরাত ও খোরাশানের শাসনকর্ত্তা তাঁহার দুর্ব্বল শাসন অগ্রাহ্য করিয়া মালিক মহম্মদ নামক জনৈক আফগান সেনানীর সহিত একযোগে মাসহদ ও নিশাপুরে আপনাদের শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সম্মিলিত বাহিনী তাঁহার রাজ্যাভিমুখে পরিচালিত করিবার যাবতীয় আয়োজন করিতেছিল। সুতরাং দুর্ব্বলপ্রকৃতি তামাস্প্‌ উপায়ান্তর না দেখিয়া রুষিয়া ও তুর্কীর সহিত সন্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার দৌর্ব্বল্যের কথা রুষিয়া অথবা তুর্কীর কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার এই সাধু ইচ্ছা অপূর্ণই রহিয়া গেল। বহু কষ্টে ও প্রাণপণ যত্নে তিনি একটী ক্ষুদ্র সেনাদল

* Chronicles of a Traveller.

গঠন করিলেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই জনৈক সেনানায়কের সহিত তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে উক্ত সেনানায়ক তাহার অধীনস্থ প্রায় ১৫০০ শত সৈন্য লইয়া চলিয়া গেল। ইহাতে সেনাদল গঠনে যাবতীয় ভবিষ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। বন্ধুগণের দ্বারা পরিত্যক্ত ও চারিদিকে শত্রুদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি অনুসৃত মৃগশাবকের ন্যায় পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে আশ্রয় লইয়া, আপনার শোকদগ্ধ হৃদয়কে শত্রুগণের সর্ব্বগ্রাসী হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পারস্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল। বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্যে সাম্রাজ্য সমর্পণ করিয়া কাস্পিয়ান্‌ হ্রদের উপকূলবর্ত্তী কায়হাবাদ নামক স্থানে ফতে আলি খাঁ নামক জনৈক চীফের (chief) আশ্রয়ে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নাদির ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন কটাক্ষ অবলোকন করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দেশের রাজশক্তি অব্যাহত না থাকাতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ১৭২১ খৃঃ ১৭২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত অবাধে লুণ্ঠন কার্য্য পরিচালন করিয়া তিনি প্রায় সহস্র ব্যক্তির নায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সহস্র ব্যক্তির সাহায্যেই তিনি খোরাশানের শাসনকর্ত্তা মালিক মহম্মদকে পরাস্ত করিয়া উক্ত প্রদেশের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু যে দুরদর্শিতার বলে তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই দুর্দ্দিনে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় না করিয়া প্রদেশ বিশেষের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলে কখনই সে শাসনদণ্ড অবিচলিত থাকিবে না। তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার সৌভাগ্যের উদয়। একদিন তিনি খিলাতের অন্তঃপাতী স্থানসমূহে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি ১৫০০ সৈন্য লইয়া নাদিরের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইল। তামাস্পের সহিত মনোবিবাদের ফলে যে সেনানায়ক আপনার সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া তামাস্পের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইনি সেই ব্যক্তি। এই ব্যক্তি নাদিরকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করিল এবং আপনার যাবতীয় সৈন্য তাঁহার অধিনায়কত্বে নিয়োজিত করিয়া অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিবার সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

ভ্রাতুষ্পুত্রের শক্তিসঞ্চয়ের কথা শ্রবণ করিয়া নাদিরের খুল্লতাত ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, বুঝি বা তাঁহার শেষ জীবনে ক্ষীণ দীপশিখা বিশ্বাসঘাতকতার শাণিত কুঠারে ভিন্ন করিবার জন্যই নাদিরের এই বিপুল আয়োজন। অনেক চিন্তার পর গতস্ত্রের অনুশোচনা পরিহার করিয়া নাদিরকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি নাদিরকে বলেন "ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি এখন এক সৈন্যদল গঠন করিয়াছ; শুনিয়াছি যে তোমার অধীনস্থ লোকগণ তোমার আজ্ঞাবাহী। যদি এই সমস্ত লোক লইয়া তুমি তামাস্পের সাহায্য কর, তবে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি; রাজশক্তির আনুকূল্য হেতু তোমার যে পুণ্য সঞ্চয় হইবে, তাহাতে ঈশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন। আর এক কথা—যাহার শক্তি আছে, দেশের কার্য্যে প্রাণপাত করিয়া অতুল কীর্ত্তি লাভ করিবার পক্ষে বর্ত্তমান সময় তাহার বিশেষ উপযোগী।" তিনি আরও বলেন যে তামাস্প তাঁহাকে নিশ্চয়ই সাদরে গ্রহণ করিবে, আর নাদিরের হইয়া তিনি সম্রাটের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবেন। এই প্রস্তাব শুনিয়া তামাস্পের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবার জন্য নাদির বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাইতে লাগিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সাহকে এই বিষয় জানাইবার জন্য তাহার খুল্লতাতকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নাদিরের খুল্লতাত নাদিরকে ক্ষমা করিবার জন্য তামাস্পের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, শাহের নিকট হইতে যথাসময়ে তাহা ফিরিয়া

আসিল। নাদিরের দুষ্ক্রিয়ার জন্য কোনরূপ অনুযোগ না করিয়া তামাস্প উক্ত ক্ষমা পত্র খিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যথাসময়ে এই পত্র নাদিরের হস্তগত হইল। এই পত্র পাইয়া নাদির অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; কারণ দস্যু বলিয়া যে তাঁহার দুর্নাম ছিল, সাহের ক্ষমাপত্রের ফলে তাঁহার সে দুর্নাম অপনোদিত হওয়ায় তিনি আর সমাজের নিকট নিন্দনীয় ও রাজদ্বারে দণ্ডার্হ নহেন। এই পত্র পাইয়া একশত বাছা অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া তিনি খুল্লতাতের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। সকলেই মনে করিল দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের স্নেহালিঙ্গন দ্বারা আপন জীবন ধন্য করিবার জন্য বুঝি বা নাদির খিলাতে চলিয়াছে। কিন্তু স্নেহমমতা নাদিরের হৃদয়ে কখনও স্থান পাইয়াছে, তাহা তাঁহার সমস্ত জীবনের আলোচনার দ্বারা কখনই প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং যাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, নাদির তাঁহার খুল্লতাতের স্নেহভিখারী, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। নাদির ৫০০ অশ্বারোহীকে পথের নানাস্থানে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত রাখিয়া মাত্র একশত অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া হাস্যমুখে খুল্লতাতের দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধও দুইশত সৈন্যের সহিত নাদিরকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমোদ প্রমোদে ও বিশ্রম্ভালাপে এক দিন কাটিয়া গেল। বৃদ্ধের মনে যে সামান্য সংশয় ছিল, নাদিরের সুমিষ্ট আলাপে তাহা দূর হইল। আর কোনই ব্যবধান রহিল না, কিন্তু নাদিরের আগমনের দ্বিতীয় রজনীতে যখন শান্ত্রীগণ বিরামদায়িনী নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে দিবসের কর্ম্মক্লান্ত শরীরকে স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন হঠাৎ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নাদিরের দ্বারা নিয়োজিত ৫০০ শত সৈন্য উচ্চশব্দে দুর্গ আক্রমণ করিল। প্রহরিগণ এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহারা শীঘ্রই শত্রুহস্তে পরাজিত হইল। নাদির স্বয়ং খুল্লতাতের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধকে স্বহস্তে হত্যা করিলেন। এইরূপে

খিলাতের দুর্গ একরূপ বিনা বাধায় তাঁহার হস্তগত হইল! পরদিন প্রভাতে খিলাতবাসিগণ এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া, বিস্ময়ে ও ভয়ে নাদিরকে একবাক্যে খিলাতের শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিল।

ইচ্ছা করিলে নাদির অনায়াসে একজন স্বাধীন নৃপতির ন্যায় থাকিতে পারিতেন। প্রকৃত পক্ষে তামাস্প অথবা ইস্পাহানের আফগান অধিনায়ক অপেক্ষা তাঁহার অবস্থা ভালই ছিল। তিনি একজন সাহসী বীরপুরুষ এবং তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল। কিন্তু তিনি একটী ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিনায়কত্বে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। মাসহদ হইতে ৬০ মাইল দূরে নিশাপুর নগর অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই স্থান আফগানগণ ইতিপূর্ব্বে অধিকার করিয়াছিল। প্রায় তিন হাজার সৈন্য নগরের রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিত। নাদির তামাস্পের নামে এই স্থান জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তামাস্পের প্রতি এই অহেতুক অনুরাগের কারণ কি, তাহা বলা সহজ নয়; কিন্তু নাদির যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই, যথা স্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। এই স্থানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি বুঝিয়াছিলেন, যদি তিনি প্রজাসাধারণের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে পারেন যে পারস্যের ন্যায় সঙ্গত সম্রাটের জন্য প্রজা মণ্ডলীকে বিদ্রোহী নরপতি বিশেষের শাসন দণ্ড মুক্ত করিবার জন্য এই অভিযানের আয়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি প্রজা সাধারণের সহানুভূতি লাভে কখনই অপারগ হইবেন না; আর যে সিংহাসন রাজভক্তি ও প্রজানুরাগ ও সাধারণের সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে টলাইতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, বিচ্ছিন্ন পারস্যে তখন সে শক্তির একান্ত অভাব ছিল। সে যাহা হউক, নাদির একদিন আফগানগণকে একটী অধিত্যকার মধ্যে

ভুলাইয়া আনিয়া নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিলেন। তার পর বিজয়ীর ন্যায় নিশাপুরে প্রবেশ না করিয়া নিতান্তই বন্ধুভাবে সাধারণের সমক্ষে তিনি উপস্থিত হইলেন। সরল নিশাপুরবাসী কুচক্রীর চক্রান্ত বুঝিল না। তাহারা নাদিরকে নিতান্তই বন্ধুভাবে গ্রহণ করিল। নাদির তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি প্রজাগণের উপকারার্থই নিশাপুরে পদার্পণ করিয়াছেন। অত্যাচারনিমগ্নকণ্ঠ প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার এই অভিযানের আয়োজন, আর তাড়িত সম্রাটের ন্যায্য অধিকার দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে গ্রহণ করিবার জন্যই তাঁহার এই দুষ্কর সাধনা। যখন প্রজাগণ দেখিল যে দুর্গ মধ্যে সঞ্চিত দ্রব্যসমূহ সৈন্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া নাদির তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করতঃ প্রজাগণকে রক্ষা করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন—তাহাতে সাধারণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়া ও দূরের কথা, বরং সুরক্ষিত হইয়া উঠিল—তখন তাহাদের মধ্যে সন্দেহ মাত্র রহিল না। পারস্যবাসিগণ নাদিরকে দয়ার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করিল; এবং তাঁহার নেতৃত্বে আপনাদিগের জীবন ধন্য করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এইরূপে এক নিশাপুরে সহস্রাধিক ব্যক্তি নাদিরের পতাকামূলে সমাগত হয়।

বৈঁচিবাটী যুবক সমিতি। ক্রমশঃ—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

———

প্রাচীন মুলতান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

১১৯৩ খৃঃ হইতে ভারতে নূতন যুগের সূত্রপাত। সেই দিন ভারতের সমরক্ষেত্রে মুসলমানের অসিমুখে, ভারত-রাজলক্ষ্মী রুধিরাক্ত-কলেবরে ভারতবর্ষ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেন। মহম্মদ ঘোরী পানিপথ যুদ্ধে বিজয় মুকুটে বিভূষিত হইয়া ভারতে মুসলমান রাজত্বের

প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ভারতে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। ভারতের ভাগ্যচক্রের সহিত মুলতানেরও ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়। এতদিন মুসলমান স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত; মহম্মদ ঘোরীর ভারত জয় ও মুলতানে শাসনকর্ত্তা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মুলতানের স্বাতন্ত্র্য চলিয়া যায়—মুলতান গজনবীবংশের অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাজ্য শীঘ্রই স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার মুলতানেও হিন্দু-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লী সম্রাটের অধীনস্থ হিন্দু রাজ্যরূপে, মুলতান আপনার অস্তিত্ব বহুদিবস পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ১১৩০ খৃঃ হইতে গজনবী বংশের পতন আরম্ভ হয়। এই সময় মরক্কোর অল্ আদ্রিসির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার গ্রন্থেও আমরা মুলতানের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই গ্রন্থ হইতে আমরা অবগত হই যে, মুলতান তখনও ধন-গৌরবে ভারতে একটি শ্রেষ্ঠ নগর বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যতা হইতে স্খলিত হয় নাই। (তাঁহার বর্ণনার সারাংশ আমরা নিম্নে দিলাম):—

"ভারতের সন্নিকটে মুলতান অবস্থিত; কেহ কেহ বা মুলতানকে ভারতের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। ইহা আকারে প্রায় "মনসুবার" সমতুল্য;—ইতিহাসে ইহা স্বর্ণগৃহ বলিয়া কথিত। এই স্থানে যে দেবপ্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত, তাহার উপর হিন্দুগণের অচলা ভক্তি, ইহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় হিন্দুগণ বহু দূরদেশ হইতে সমাগত হয়। দেবোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া, মন্দিরের পূজক, দাস ও বহুশত ক্রীতদাস স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এই প্রতিমূর্ত্তি অত্যন্ত পুরাতন। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা কবে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। মুলতান একটি বৃহৎ নগর; নগরের

মধ্যে এক দুর্গ অবস্থিত। দুর্গের চারিটী দ্বার, এবং ইহার চারিদিকে পরিখা। মুলতানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রজাপুঞ্জের অবস্থা স্বচ্ছল; কর অপেক্ষাকৃত কম। হাজাজের ভ্রাতা মহম্মদ বিন য়ুসুপ মুলতানে ৪০ বাহার * স্বর্ণ প্রাপ্ত হন; এজন্য ইহা আরব ভাষায় "স্বর্ণগৃহ" বলিয়া পরিচিত।

অল্ আদ্রিসি মুলতানের যে বিবরণ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহাই তাহার সংক্ষিপ্তাংশের অনুবাদ। † ইহা উক্ত গ্রন্থে আমরা জানিতে পারি, মুলতানের প্রাচীন সূর্য্যমন্দির তখন পর্য্যন্ত বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের সহিত অল্ আদ্রিসির কোন বিরোধ নাই। অন্যান্য আরব ভৌগলিকগণের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি;—অল আদ্রিসির বর্ণনায় আর নূতন কথার উল্লেখ নাই। এইবার আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ আলোচনা করিব।

ভারতে মুসলমান শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কুতবউদ্দিন আপন প্রভুর হস্ত হইতে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া ভারতে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারত সিংহাসনে দাসনৃপতিগণ আসীন। এই সময় আমরা মুলতানে নাসিরুদ্দিন কুবাচা নামক জনৈক মুসলমানকে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতে দেখিতে পাই। ১২০৫ খৃঃ মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হয়। এই সময় কুবাচা সিন্ধু ও মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি দিল্লীশ্বর কুতবুদ্দিনের কন্যাকে বিবাহ করেন। মুলতানের শাসনকর্ত্তা ও কুতবের জামাতা বলিয়া, শক্তিসঞ্চয় করিবার তাঁহার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কুতবউদ্দিনের মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দিন আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া, স্বাধীন নরপতির

* ১ বাহার ওজনে ৩৩৩ মিনা; এক মিনা প্রায় ১ সের Janbert.

† Elliots' History Vol. I. Page. 82.

ন্যায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং মুলতান দিল্লীর শাসন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

নাসিরুদ্দিন প্রায় ১২ বৎসর স্বাধীন নরপতির ন্যায় মুলতান শাসন করেন। এই সময় মুলতানেই মুদ্রা প্রস্তুত হইত। নাসিরুদ্দিন দিল্লীর কোনরূপ আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া এইরূপে ১২ বৎসর ধরিয়া মুলতানকে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। পরে ১২১৭ খৃ: সামসুদ্দিন আলতামাস মুলতান জয়ের আয়োজন করেন। আলতামাসের সহিত নসিরুদ্দিনের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আলতামাস জয়লাভ করিয়া নাসিরুদ্দিনের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। ইহাতে মুলতান আবার দিল্লীরাজ্যের অধীন হইয়া পড়ে।

ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত মুলতানের আর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। জাকারিয়া আল কাজোয়ানী নামক জনৈক মুসলমান ১২৬৩ খৃ: একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও নগরীর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে আবার মুলতানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ সময় ভারতে দাস নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। এই দাস নৃপতিগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রাচীন নগরী মুলতান সুরক্ষিত। শত্রুগণ সহসা নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনিও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মুলতানের দেবমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্ত দেবপ্রতিমূর্ত্তির পবিত্রতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, এই দেবমূর্ত্তির জন্য মুলতান হিন্দুদিগের নিকট মুসলমানের মক্কা নগরীর ন্যায় পবিত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তিনি মুলতান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই—

মুলতান একটী বৃহৎ সুরক্ষিত নগর। ইহার চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত; শত্রুগণ সহসা নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মুসলমানগণের নিকট মক্কা যেরূপ পবিত্র, ভারতবাসী ও চীনবাসীর নিকট মুলতান সেইরূপ পবিত্র;

মুলতানের সূর্য্যমন্দিরই এই পবিত্রতার একমাত্র কারণ। নগরের শাসন মুসলমানদিগের হস্তে থাকিলেও, নগরমধ্যে হিন্দু ও মুসলমান একত্র বাস করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের যে সূর্য্যমন্দিরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা উচ্চে ৩০০ হস্ত এবং দেবতার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ হস্তপরিমিত। মন্দিরের পার্শ্বেই মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মসজিদ। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মুলতান জয়ের অব্যবহিত পরেই, এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়। হিন্দুমন্দির মুসলমানগণ কর্ত্তৃক যে ধ্বংসিত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে ভারতের বহু দূরদেশ হইতে যাত্রিগণ আসিয়া দেবোদ্দেশে যে ধনরত্ন দান করে, শাসনকর্ত্তা মন্দিরের সেবাইতগণকে তাহার কিয়দংশ প্রদান করিয়া উদ্বৃত্ত অংশ স্বয়ং গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হয়। *

মালফুজাত ই তাইমুরী নামক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে মুলতানের ধনসম্পদে লুব্ধ হইয়া তৈমুরের আদেশক্রমে পির মহম্মদ জাহাঙ্গীর ১৩৯৬ খৃঃ মুলতান আক্রমণ করেন। মুলতান আক্রমণ করিয়া, তৈমুরের নিকট হইতে সাহায্য প্রত্যাশায় তাঁহাকে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে মুলতান আক্রমণের বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। উক্ত পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মুলতান এসময় সারঙ্গ নামক একজন নৃপতির শাসনাধীন ছিল। এই সারঙ্গ কে? তিনি কি করিয়া মুলতানের সিংহাসন অধিকার করিলেন?—ইত্যাদি বিষয় নিরাকরণের জন্য আমরা দুই একটী কথা বলিব।

১৩৮৮ খৃঃ ফিরোজ টোগলকের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পরে ১১৯০ খৃঃ নাসিরুদ্দিনের অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ দিল্লী সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার শাসনদণ্ডগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল

* Elliot's History. Vol 1 Page 96.

মালয়, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশসমূহের শাসনকর্ত্তৃগণ বিদ্রোহী হওয়াতে, উক্ত প্রদেশসমূহ দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল। ১ এই সময় সারঙ্গ দিপালপুরের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিলেন। তিনি বিশৃঙ্খলাসমূহ পরিদর্শন করিয়া, অবিলম্বে মুলতানের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁকে তাড়াইয়া মুলতানের সিংহাসন অধিকার করেন। মহম্মদ টোগলক কোন বাধা দিতে পারিল না; সুতরাং সারঙ্গ অনতিবিলম্বে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ২ ইহার অব্যবহিত পরেই পির মহম্মদ ভারতের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। তিনি সমুদায় বিষয় অবগত হইয়া মুলতানের শাসনকর্ত্তা সারঙ্গের দরবারে এক রাজদূত প্রেরণ করেন। সারঙ্গের উদ্দেশ্যে লিখিত এক পত্র দূতের হস্তে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, রাজশ্রেষ্ঠ তৈমুর আমাকে ভারত সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসন কর্ত্তা নির্ব্বাচন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, যদি কোন নৃপতি আমাকে করপ্রদান করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী রূপে গ্রহণ করে, তবে যেন তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করা হয়। কিন্তু যদি কোন নৃপতি অবজ্ঞা বশতঃ আমার আজ্ঞা অমান্য করে, তবে ভারতজয়ের জন্য আমি আমার সমুদায় শক্তি নিয়োজিত করিব। যাহার জীবনের উপর মমতা আছে, সেই আমাকে বাৎসরিক কর প্রদানে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না। নতুবা আমি আর সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিব।" ইহার উত্তরে সারঙ্গ বলেন যে যাহা বাহুবলে জিত হইয়াছে, তাহা বাহুবলে রক্ষিত হইবে। নবোঢ়া পত্নীর ন্যায় বিনা বাধায় কোন সাম্রাজ্য বক্ষে ধারণ করা যায় না। অতএব আমার রাজ্যের প্রতি যদি তোমার লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়া থাকে,

১—Mountstwart Elliphinstone's History of India.
২—Ferista.

তবে তোমার সৈন্য লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।৩ পির মহম্মদকে প্রত্যুতই সারঙ্গের সহিত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধে সারঙ্গেরই পরাজয় ঘটে। তিনি বন্দী হন এবং পির মহম্মদ মুলতান জয় করিয়া নগর অধিকার করেন।৪

তৈমুলঙ্গের আক্রমণের পর প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া, মুলতানে ঘোর অরাজকতা বিরাজ করে। সত্য বটে খিজির খাঁ সৈয়দ নামক জনৈক মুসলমান তৈমুলঙ্গের নামে মুলতান শাসন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ সময় কোন নৃপতি বা রাজপ্রতিনিধি ছিল না। ইহার কিছু পরে ১৪৪৩ খৃঃ খিজিরের পৌত্র সৈয়দ মহম্মদের সময় মুলতানে "লাঙ্গা" নামক আফগান বিদ্রোহী হয়, ইহাতে চূড়ান্ত অরাজকতা উপস্থিত হয়।

সৈয়দগণের সময় মুলতান দিল্লীর শাসন উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়। তাহাদিগের সময়ে মুলতানে কেন ভারতে নানা স্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। মুলতানের কোন শাসনকর্ত্তাই ছিল না; তাহার উপর আবার মুলতান বৈদেশিক আক্রমণে অস্থির হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় লোকের কষ্টের পরিসীমা রহিল না। এই সময়ে বল্লাল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি মুলতান জয় করিবার জন্য দিল্লী ত্যাগ করিয়া মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথে দিল্লী আক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়া—মুলতান জয়ের আশা ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। উপায়ান্তর না দেখিয়া মুলতানবাসিগণ একমত হইয়া সেখ যুসুপ নামক জনৈক ব্যক্তিকে মুলতানের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন করেন। এই ব্যক্তি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও অন্যান্য গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি মুলতানের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া শান্তিস্থাপন

৩—Elliots' History vol. III Page 399.

৪—Ferista,

করিতে বদ্ধপরিকর হন। সৈন্যগণকে উপযুক্ত বেতন ও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া, তিনি বিভিন্ন জনপদের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হন। এই সমুদায় জনপদবাসিগণ মধ্যে মধ্যে মুলতান আক্রমণ করিয়া শান্তি নষ্ট করিত। রাজ্যশাসনের অন্যান্য ব্যবস্থার পর তিনি আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া লাঙ্গা-দিগের অধিনায়ক যুসুপের শরণাপন্ন হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল, এবং এই বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যুসুপের সহিত আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিল। যুসুপ এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। মুলতান নগরে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। ঘরে ঘরে আনন্দোৎসব। এই আনন্দের দিন যুসুপ বিবাহ করিবার জন্য আফগান অধিনায়কের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক আফগান জামাতাকে সাদরে গ্রহণ না করিয়া সহসা বন্দী করিল। তারপর যুসুপকে বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া, আপনি মুলতান কুতবউদ্দিন লাঙ্গা উপাধি গ্রহণ করিয়া ১৪৪৫ খৃঃ মুলতানের সিংহাসন গ্রহণ করে। যুসুপ মুলতান জয় করিবার চেষ্টা করিয়া প্রতিষ্ঠিত শান্তি নষ্ট করিতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, বল্লাল লোদী রাজ্যমধ্যে তাঁহার থাকিবার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কুতব উদ্দিন প্রায় ৬০ বৎসর মুলতান শাসন করেন। এই ৬০ বৎসরের মধ্যে মুলতানে একরূপ অবিরাম শান্তি বিরাজিত ছিল। ১৪৬৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি প্রজাপুঞ্জের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কোন মুলতানবাসীই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই।

কুতব উদ্দিনের পর, তাঁহার পুত্র হুসেন লাঙ্গা মুলতানের রাজা হন। তিনি বিদ্বান্, সাহসী ও কর্ম্মকুশল বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তাঁহার সময়ে মুলতান দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত হয়।

মুলতান প্রায় ৮০ বৎসর লাঙ্গাবংশীয় নরপতিগণের শাসনাধীন

ছিল। এই সময়ের মুলতান ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া পড়ে। কারণ আরবগণ এই সময় মুলতানের ভিতর দিয়া বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতের মধ্যে উপস্থিত হইত। এই সময় মুলতান ভারতের দ্বার বলিয়া বিবেচিত হইত। (Map of Hindusthan) এই সময় ধন-সম্পদে ও বাণিজ্য ব্যাপারে মুলতানের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইহার সৌভাগ্যে আকৃষ্ট হইয়া, বিভিন্ন জনপদবাসী এখানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ইহার লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত ও নষ্ট সম্পদ পুনরাগত হয়।

ক্রমশঃ

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি। শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতে ইউরোপীয় বণিক্।

পর্ত্তুগিজ।

এমন দিন গিয়াছে যেদিন ইউরোপের লোকে ভারতের নামটী পর্য্যন্ত জানিতেন না। যে ভারতের ঐশ্বর্য্যে তাঁহারা আজি আপনা-দিগকে অতুল ঐশ্বর্য্যান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন, সে ভারতের কথা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিবার লোক ছিল না। ভারতের আর্য্যঋষিগণ যখন আপনাদের ইহলোক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, যখন ভারতের চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয় নরপতিগণ আসমুদ্র হিমাচল আপনাদের করতলগত করিয়া দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে ভারত শাসন করিয়া গিয়াছেন, যখন ভারতের কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছে, যখন ভারতের

সভ্যতা ভব্যতা অন্যান্ত জাতির আদর্শ হইয়াছে, তখনও ইউরোপ খণ্ডের অধিবাসীরা ভারতের নামটী পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই। শুনিবার অবস্থাও তাঁহাদের ছিল না। তাহার কত শতাব্দী পরে এ পর্য্যন্ত কিছু নিশ্চিত হয় নাই, যখন চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনাসীন, যখন আর্য্যগৌরব হীনপ্রভ হইবার উন্মুখ, তখন ইউরোপের সুপ্রাচীনকালে গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ নরপতি আলেকজন্দার সিন্ধুকূলে আসিয়া আপনার বিজয়বেদিকা স্থাপিত করেন। সেই সময় হইতে ইউরোপে ভারতের পরিচয়, ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে তাহা যেন "সেদিনের" কথা। ইউ-রোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভারতের প্রাচীনত্ব লইয়া যতই টানাটানি করুন, —ভারত যে ভূমণ্ডলের সকল দেশ, সকল জাতিকেই এককালে শৈশবদোলায় দোদুল্যমান দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, সে পক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতের সত্য ত্রেতা গতে দ্বাপরের শেষে কলিযুগের প্রারম্ভে যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকালে তাহারা কোথায় কিরূপ অবস্থায় ছিলেন, তাহার পরিচয় দিতে তাঁহাদিগকেই ইতস্তত: করিতে হয়। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের নানা মুনির নানা মত শুনিতে পাওয়া যায়। সে সকল কথার আলোচনায় কাজ নাই; এখন দেখা যাউক, তাঁহারা কোন সময়ে, কিরূপ ভাবে ভারতের সুখ সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া এদেশে গতিবিধি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে মিসর ও আরবের লোকেরা ভারতীয় পণ্য আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিত। তৎকালে ইউরোপেও ভারতীয় পণ্যের ক্রয়বিক্রয় চলিত। কাবুল, কান্দাহার, সমরকন্দ, আষ্ট্রাকান এবং কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল দিয়া ইউরোপে ভারতীয় পণ্যজাত লইয়া যাইবার একটী পথ ছিল। আর একটী পথ ছিল—পারস্তের মধ্য দিয়া ডামস্কাস ও আলেক-জন্দ্রিয়া পর্য্যন্ত। এই পথ দিয়াই আলেকজন্দ্রিয়া, স্মর্ণা এবং ভূমধ্য-

সাগরের তীরবর্ত্তী অন্যান্য বাণিজ্যপ্রধান বন্দরে ভারতের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসায় চলিত। প্রধানতঃ জেনেওয়া ও ভিনিশ নগরের বণিকদিগের এই ব্যবসায় একচেটিয়া ছিল। নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত পারস্য উপসাগর দিয়া এডেন পর্য্যন্ত অনুকূল বায়ু-প্রবাহে বাণিজ্য-পোত সহজেই গতায়াত ক'রতে পারিত। জেনেওয়া ও ভিনিসের বণিকগণের বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা দেখিয়া পর্ত্তুগিজেরা সমুদ্র-পথে ভারতে আসিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে কলম্বসের চেষ্টা যত্নে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইতে দেখিয়া, তাঁহাদের উদ্যোগ-অনুষ্ঠান বাড়িতে লাগিল। পর্ত্তুগিজের রাজা ইংরাজ ও ইউরোপের অন্যান্য জাতির সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া যখন বিফল-মনোরথ হইলেন, তখন কাহার মুখাপেক্ষী হইয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন না। পর্ত্তুগিজ রাজা জন সর্ব্বপ্রথম অল্পসংখ্যায় বাণিজ্যতরী পাঠাইয়া আফ্রিকার উপকূলবর্ত্তী স্থান গুলির সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিলেন। এ যাত্রায় নান্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইল। দ্বিতীয়বারে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী অন্যান্য স্থানগুলির বিষয়ও অনেক জানিতে পারা গেল। তৃতীয় যাত্রায় নাবিকেরা বজাডর অন্তরীপের পর্ব্বতময় ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি-দর্শন ও ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে ভীত হইয়া প্রত্যাগত হইলে কুমার হেনরী * সেণ্ট ভিন্সেণ্ট অন্তরীপের সমীপবর্ত্তী "সেগার" নামক স্থানে বাস করিয়া উর্ম্মিসঙ্কুল মহাসমুদ্রের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ধন্য অধ্যবসায়, ধন্য উদ্যোগ আয়োজন! খৃঃ ১৪১৮ অব্দে তিনি আপন পারিবারিক কর্ম্মচারী জুয়েল পঞ্জাবে এবং ত্রিস্তামে ভেজ নামক

* Prince Henry was a younger son of John, by Phielipa of Laucaster. sister to Henry IV King of England.—ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ হেনরির ফিলিপা অফ ল্যাঙকাষ্টার নাম্নী ভগ্নীর সহিত পর্ত্তুগালের রাজা জনের বিবাহ হয়, ইনি তাঁহাদেরই পুত্র।

দুই ব্যক্তিকে একখানি মাত্র বাণিজ্য-পোত সঙ্গে দিয়া অকূল অনন্ত বারিধিবক্ষে ভাসাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তে পড়িয়া সেই জাহাজ খানি সর্ব্বপ্রথম পোর্ট শাণ্টো পরে মিডিয়ারা দ্বীপে উপস্থিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে এই দুইটী দ্বীপ ইউরোপীয়দিগের কাহারও পরিজ্ঞাত ছিল না।

পনর বৎসর পরে আর এক যাত্রায় আফ্রিকার সেনিগাল গাম্বিয়ার আবিষ্কার হয়। খৃঃ ১৪৭১ অব্দে গোমেজ নামক পর্ত্তুগিজের দ্বারা "গোলগু ফোষ্ট" স্বর্ণোপকূল নামক প্রদেশ আবিষ্কৃত হইলে পর্ত্তুগিজের তৎকালিক নরপতি আলফান্সো "লর্ড মফগিনি" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে এলমিনা নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইলে তাহাই আফ্রিকার উপকূলে পর্ত্তুগিজ উপনিবেশের রাজধানী বলিয়া গণ্য হয়।

আলফান্সোর পুত্র রাজা দ্বিতীয় জন আফ্রিকার উপকূলবর্ত্তী অন্যান্য স্থান আবিষ্কারের জন্য বড়ই আগ্রহশীল হইয়া উঠেন। খৃঃ ১৪৮৬ অব্দে "ডিগো কাম" নামক জনৈক পর্ত্তুগিজ এলমিনা হইতে যাত্রা করিয়া কঙ্গোনদের মোহানা আবিষ্কৃত করেন। ক্রমশঃ কঙ্গোতীরে অনেকগুলি স্থান পর্ত্তুগিজ বাণিজ্যের প্রধান বন্দর হইয়া উঠে।

খৃঃ ১৪৮৬ অব্দে রাজা দ্বিতীয় জন আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কারের বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া "বার্থলোমিউ ডিয়াজ" নামক পর্ত্তুগিজ নাবিককে তিনখানি বাণিজ্য-পোত সঙ্গে দিয়া যাহাতে আফ্রিকার দক্ষিণাংশ অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিবার আজ্ঞা করিলেন। বার্থলোমিউ আফ্রিকাবাসীদের জন্য এক নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কঙ্গোতীরবর্ত্তী স্থান হইতে চারিটী কাফ্রি কন্যা সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে ভাল কাপড় চোপড় সোনারূপার গহনা পরাইয়া হাতে ভাল ভাল খেলানা দিয়া সেখানে যাইতে লাগিলেন

সেইখানে তাহাদিগকে নামাইয়া দিতেন। তাহারা লোকালয়ে গিয়া পর্ত্তুগিজদিগের ঐশ্বর্য্যের কথা গল্প করিয়া বেড়াইত। এই কৌশল বেশ কার্য্যকর হইল।—এতদ্বারা নানা স্থানে পর্ত্তুগিজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া নূতন নূতন দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে এবং সর্ব্বত্রই তাহার নিদর্শনস্বরূপ এক একটী স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

সমুদ্রের সুবিশাল অম্বুরাশি প্রায়ই সর্ব্বদাই চঞ্চল —মধ্যে মধ্যে প্রবল বায়ুপ্রবাহে অত্যুচ্চ তরঙ্গমালা দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ ঝটিকাবর্ত্তে পড়িয়া জাহাজগুলি কখন উত্তরে কখন দক্ষিণে যাইতে যাইতে তাহারা একটী অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া সুদূর উত্তরে গিয়া উপস্থিত হইল, তের দিন কাল ঝটিকার বিরাম রহিল না। জাহাজ ও তন্মধ্যস্থ নাবিকদিগের প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিল। ঝড় আসিলে জাহাজগুলিকে পূর্ব্বদিকে চালাইবার চেষ্টা হইল, কিন্তু অনন্ত বারিরাশির কূল কিনারা মিলিল না দেখিয়া পোতাধ্যক্ষ উত্তর দিকে চালাইলেন, অবশেষে তাঁহারা একটী অন্তরীপে উপস্থিত হইলেন। পোতাধ্যক্ষ ইহার নাম দিলেন "ঝটিকান্তরীপ"। দুর্ব্বিষহ ঝটিকাতে নাবিকদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিল না—তাহারা দেশে ফিরিবার জন্য অস্থির হইল, খাদ্য ফুরাইয়া আসিল, জাহাজগুলিও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, বার্থলমিউ আপনার কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যাগমনই নিশ্চয় করিলেন। তিনি স্বদেশে পঁহুছিলে রাজা এ সমস্ত কথা অবগত হইয়া অন্তরীপটীর নাম দিলেন "উত্তমাশা"।

যে সময়ে ডিয়াস আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কারার্থ যাত্রা করেন, পর্ত্তুগালের রাজা সে সময়ে "কোভিঙ্গহাম ও "আলোঞ্জো ডি পেভা" নামক অপর দুই জনকে ভারতবার্ত্তা অবগত হইবার জন্য লোহিত-সাগরের পথে পাঠাইয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি মিসর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া

দেহত্যাগ করেন, এবং কোভিঙ্গ্হাম দুইবার চেষ্টার পর ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী কানানোর, কালিকট ও গোয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে পারস্যোপসাগরের তীরবর্ত্তী বাণিজ্য-প্রধান নগর অর্ম্মজনগর এবং আফ্রিকার উপকূলে সোকালা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি আবিসিনিয়ার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ খাতির যত্ন পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেখানকার রাজনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সেখানে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, দেশে ফিরিতে পারেন নাই। অগত্যা তিনি পর্ত্তুগালের রাজাকে ভারতের কথা পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠান যে ভারতবর্ষের বাণিজ্যে প্রভূত লাভের সম্ভাবনা আছে।

খৃঃ ১৪৯৫ অব্দে পর্ত্তুগালের রাজা জন পরলোক প্রস্থান করেন। তাঁহার পুত্র এমানুয়েল ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠেন। কিন্তু মন্ত্রিগণ বিরোধী হইলেন—তাঁহারা নানাপ্রকারে ভারতে বাণিজ্যতরী পাঠাইবার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, রাজা কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না, তাঁহার পিতা পিতামহাদির বাসনা পরিপূরণার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন, সুদৃঢ় বাণিজ্যতরী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ডিয়াজ সেই সকল জাহাজ নির্ম্মাণের পরিদর্শনের ভার পাইলেন। জাহাজ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে রাজা ভাস্কো ডিগামা নামক তাহার পারিবারিক কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তাহারই উপর ভারতযাত্রার ভারার্পণ করিলেন। তৎকালে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। রাজা গামাকে একটী শৌধের পতাকা অর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তিনি তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্যোদ্ধারের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিবার পক্ষে ত্রুটী করিবেন না। তাহার পর যে যে কাজ করিতে হইবে, তাহার লিখিত আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

খৃঃ ১৪৭৯ অব্দের ৮ই জুলাই যাইবার দিনস্থির হইল। ঐ দিন

তিন খানি জাহাজ সজ্জিত হইল। টেগাস নদীর তীরে লোকারণ্য হইল। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমুপস্থিত হইলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ ও নাবিকেরা ধর্ম্মমঠে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেই প্রতিজ্ঞাবাক্য পাঠ করিলেন। ধর্ম্মযাজকেরা দীপশলাকা হস্তে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইলেন, পোতারোহীদিগের আত্মীয় স্বজনেরা বিষণ্ণ-বদনে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, যাত্রিগণের উৎসাহার্থ সমাগত জন-মণ্ডল হইতে কোলাহল উত্থিত হইল, তদ্দ্বারা টেগাস নদীর তীরভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যাত্রীরা জাহাজে উঠিলেন, জাহাজ ছাড়িয়া দিল—তাহাদের প্রায় সকলেই সাশ্রুনয়নে জন্মভূমির প্রতি এক একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—তখন তাঁহাদের স্বদেশবাসীরা কূলে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল, ততক্ষণ স্তম্ভিতভাবে বিদায়দৃশ্য দেখিতে লাগিল। ক্রমে যখন জাহাজগুলি দৃষ্টিপথের বাহিরে পৌঁছিল, তখন সকলেই এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ইউরোপীয় বণিকদিগের সেই একদিন আর আজি একদিন। আজি কালি ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজে ভারতের জলপথ পরিপূর্ণ, ভারতের বন্দর ইউরোপের পণ্যে পরিপূর্ণ। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, একথা ইউরোপের বণিকসম্প্রদায়কে সার্থক করিল। ভারতের বাণিজ্যলক্ষ্মী ইউরোপীয় বণিকগণকেই আশ্রয় করিলেন। ভারতের বাণিজ্যপোত আজিকালি অদৃশ্য হইয়াছে। ভারতের বণিক আর জলপথে যান না, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" যে দেশের প্রবাদ বাক্য, সে দেশের লোক আজি বাণিজ্য-বৈমুখ, ভাবিলেও চক্ষের জল সম্বরণ হয় না।

এই সমুদ্রযাত্রার প্রথম চারি মাস কাল ঝড় বৃষ্টিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর পর্ত্তুগিজ পোত আফ্রিকার উপকূল বাহিয়া অগ্রসর হইবার সময় উপকূলবাসীদের ব্যবহারেও দৈবদুর্ব্বিপাকে নানা কষ্ট পাইতেছেন। সোফালা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এক নদীর মোহানায়

উপস্থিত হইলেন, এবং তদ্দেশবাসিগণকে অনেকটা সভ্যভব্য ও সুন্দর-পরিচ্ছদ-পরিহিত দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং ভাবিলেন অসভ্য জাতীয়ের আক্রমণ অত্যাচারে আর বড় কষ্ট পাইতে হইবে না। ক্রমশঃ জাহাজ-গুলি ভগ্ন ও অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। পরে কয়েকদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া মেরামত করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু নাবিক ও অন্যান্য আরোহি-গণ স্কার্ভি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল,—যাত্রাকালে তাঁহারা যে সকল ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহার করিয়া অবশিষ্ট লোকজন শুধরাইয়া উঠিল। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ১৪৯৮ অব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারিতে তাঁহারা বাণিজ্যবিভবশালী মোজাম্বিক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এখানেও বিপদ বিপত্তি কম ঘটে নাই, বন্দুকের গুলির ভয় দেখাইয়া তদ্দেশবাসিগণকে নিবৃত্ত করিলেন, এবং মম্বোজার পথ দেখাইবার জন্য একজন প্রদর্শক পাইলেন। অনুকূল বায়ুবলে গামার জাহাজ কুইলোয়া এবং সেখান হইতে মেলিণ্ডায় উপনীত হইল। মেলিণ্ডা অতি সুন্দর সুসজ্জিত সহর, সেখানকার অধিপতি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। বাণিজ্য বন্দরে অনেক বিদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ভারতের বণিকও অনেক ছিলেন। কয়েক দিন এই স্থানে অব-স্থিতি করিয়া ভারতের পথ প্রদর্শনার্থ একজন গুজরাটবাসীকে পাইয়া গামা ২৬শে এপ্রিল আফ্রিকার উপকূল ত্যাগ করিয়া অসীম অনন্ত ভারতমহাসাগরে পাড়ি দিলেন। চারিদিকে আকাশ ও সমুদ্র বই আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। এতদিন পৃথিবীর কুমেরু প্রদেশের নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁহাদের অদৃশ্য ছিল, ভারত মহাসাগরে আসিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া গেল। তিন হাজার মাইল পথ—অল্প দূর নহে—পবনদেব প্রসন্ন হইয়া ২৩ দিন প্রবাহিত হইলে পর সমুন্নত আর্দ্র সমাকুল উপকূল ভূমি তাঁহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। সেটিলভার পথ প্রদর্শক বলিলেন,—"উহাই ভারতভূমি।" ইউরোপীয় নাবিক ডিগামা! আজি তুমি ধন্য

হইলে, আজি তোমার নাবিক জন্ম সার্থক হইল। আজি ইউরোপের বাণিজ্য জগতে উষার আলোক দেখা দিল! ইউরোপের সৌভাগ্য সূর্য্য প্রকাশোন্মুখ। আসিয়া খণ্ডের উপর ইউরোপের প্রাধান্যের দিন নিকট হইল। ভারতবাসীর দিন ফুরাইল—প্রদোষকাল সমীপবর্ত্তী হইল।

যে স্থানটী প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল, সেটী গামার গন্তব্য কালিকট নগর নহে। জাহাজের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া চারিটী দিন গত করিলে পর গামা দেখিতে পাইলেন—একটী বৃহৎ নগর উপকূল জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে সুন্দর শস্যধর বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, তাহা অতিক্রম করিয়া আবার পর্ব্বতমালা। তিনি বুঝিলেন—ইহাই তাঁহার বিপদসঙ্কুল জলযাত্রার বিষয়ীভূত, পর্ত্তুগিজ জাতির উচ্চাশা পরিপূরণের ক্ষেত্র, এতদিন তাঁহার সজাতীয়েরা যে দেশের বাণিজ্য বৈভবে আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ করিবার জন্য আটুপাটু করিতেছিলেন—এ সেই দেশ, ইহাই ভাগ্যলক্ষ্মীর লীলাভূমি,—যে পুণ্যভূমিতে আসিয়া সাধনা করিলেই সিদ্ধি, বাণিজ্যলক্ষ্মীর ইহাই সেই প্রিয়তম স্থান। যে স্বর্ণভূমির কথা তাঁহারা দেশে বসিয়া শুনিয়াছিলেন, ইহাই স্বর্ণভূমি ভারত। এখানকার মাটিতে সোণা ফলে, এবং সমুদ্রজলে মহামূল্য রত্ন ভাসিয়া বেড়ায়, ভূগর্ভ অনন্ত রত্নের খনি—ভারতভূমি পদার্পণ করিতে পাইয়া পর্ত্তুগিজ নাবিকগণের আনন্দের সীমা রহিল না—তাহারা সকলে আহ্লাদে অধীর হইয়া আনন্দ কোলাহল উত্থিত করিলেন।

এই সময়ে গামা জাহাজে বসিয়া যুক্তি আঁটিতে লাগিলেন; কি উপায়ে তিনি কালিকটের রাজদরবারে প্রবেশ করিয়া রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবেন। তদ্ব্যতীত তথায় পর্ত্তুগিজ বাণিজ্যের কোন সুবিধাজনক উপায় নাই। তৎকালে মুসলমানেরা সেকেন্দর লোদীর অধীনতায় আর্য্যাবর্ত্ত আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে তখনও হিন্দু রাজাদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যে তাহাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কালিকটে তখনও হিন্দু রাজার সিংহাসন সংস্থাপিত। তাহা হইলে কি হয়, হিন্দু রাজার অধিকার সকল জাতিরই বাণিজ্যাধিকার সমান থাকিলেও মিশর ও আরবের মুসলমান বণিকেরা বাণিজ্য উপলক্ষে অনেকে কালিকট নগরে বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীর আশাপথ উন্মুক্ত করিতে নিতান্ত নারাজ। অন্যান্য পর্ত্তুগিজ বাণিজ্য-পোতের অধ্যক্ষকে অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল। সহজে তিনি কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

অবশেষে তিনি তাঁহার সেই পথ প্রদর্শকের সঙ্গে একজন পর্ত্তুগিজকে কূলে পাঠাইয়া দিলেন, এই পর্ত্তুগিজ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত। তাহাকে এইরূপ ও অন্যরূপ দুর্ঘটনা সম্ভাবিত কার্য্যের জন্য সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। সমস্ত দিন রাত্রি কাটিয়া গেল, দুইজনের কেহই যখন ফিরিল না—তখন গামা বড়ই চিন্তিত হইলেন। পরিশেষে তাহাদিগকে একখানি নৌকায় করিয়া আসিতে দেখা গেল। নৌকায় তাহারা ছাড়া আরও একজন আসিয়াছিল, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত পর্ত্তুগিজ আসিয়া বলিল,—সে কূলে উঠিবামাত্র চারিদিক হইতে জনসংঘ আসিয়া আশ্চর্য্যভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিল—সকলেই ভাবিয়াছিল যে, এই অভিনব জীব কোথা হইতে আসিল। সকলেই তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসিল। তৃতীয় ব্যক্তির পরিচয় জানিতে পারা গেল—তাহার নাম মনজেদ Monzaide একজন আরবদেশীয় লোক—টিউনিস্ হইতে আসিয়াছে। তথায় অবস্থিতিকালে সে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। সে ব্যক্তি তাহাদিগকে আপন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া নানারূপ খাদ্যে পরিতুষ্ট করিয়াছে এবং তাহাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বন্ধুভাবে সাহায্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। এই জন্য তাহাদের ফিরিতে বিলম্ব হইল। গামার সহিত কথোপকথন কালে তৃতীয় ব্যক্তি এদেশে

মহামূল্য ধন রত্নাদি পাইবার কথা জানাইল এবং দেশের রাজা ৬।৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাহার পল্লীবাসে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার প্রার্থনা জানাইতে পরামর্শ দিল। ভাস্কো তাহার যুক্তিমত দুইজন কর্ম্মচারীকে মনজেদের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা কালিকটের হিন্দু রাজার নিকট বেশ আদর অভ্যর্থনা পাইলেন। রাজা তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া কালিকটের কিছু দূরবর্ত্তী জান্দারন নামক স্থানে বাণিজ্য কুঠী সংস্থাপনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত।

চিত্র পরিচয়।

ইতিহাসবিশ্রুত ময়ূর সিংহাসনের ছবি বর্ত্তমান সংখ্যার পুরোভাগে প্রদত্ত হইল। ময়ূর সিংহাসনের পরিচয় একান্তই নিষ্প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিক চিত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, বঙ্গীয় ঐতিহাসিক বিভাগে সুপরিচিত মাননীয় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় ১৩১৫ সালের ঐতিহাসিক চিত্রের ২য় সংখ্যায় ময়ূর সিংহাসন শীর্ষক যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে ময়ূরসিংহাসনের একখানি চিত্র ঐতিহাসিক চিত্রে প্রকাশ করিবার সাধু ইচ্ছা "ঐতিহাসিক চিত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে উদয় হয়। কিন্তু চিত্র সংগ্রহ করিতে যাইয়া তিনি দেখিতে পান, ময়ূর সিংহাসনের সুলভ প্রচলিত চিত্রসমূহ আধুনিক ও কষ্ট কল্পনা-প্রসূত। বর্ত্তমান চিত্র একখানি পুরাতন মূল চিত্রের প্রতিলিপি। যখন কৃতান্তদূতসম

নাদের সাহের সৈন্যগণ দিল্লীর রাজপথে রক্তের নদী বহাইয়া রূপৈশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ ময়ূর সিংহাসনকে বিখণ্ড করিয়া ফেলিবার জন্য শাণিত তরবারি উঠাইয়াছিল, সেই সময় একজন য়ুরোপীয় চিত্রকর ১৭৩৯ খৃঃ স্বহস্তে ইহা অঙ্কিত করিয়া লন। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্র উক্ত চিত্রেরই প্রতিলিপি। "বাবরের শাণিত তরবারি পাঠান ও রাজপুত রক্তে রঞ্জিত হইয়া, যাঁহার আগমনপথকে রক্তচন্দনসিক্ত করিয়াছিল, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' আকবরের সুবিশাল রাজছত্র যাঁহার মস্তকে ধৃত হইয়াছিল, সেই মোগল রাজলক্ষ্মীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাজাহান বাদসাহ এই ময়ূর সিংহাসনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" মোগল রাজভাণ্ডারে যে সমুদায় রত্ন বহু শতাব্দী ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল, সে সমুদায়ই মোগলদিগের ময়ূর সিংহাসনে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। আজ আমরা সেই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য ময়ূর সিংহাসনের ছবি প্রকাশ করিয়া প্রত্যুতই সুখী হইয়াছি। মাননীয় সম্পাদক মহাশয় ময়ূর সিংহাসন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অতি অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ আবদুল হামিদ লাহোরীর বাদশাহ নামা অবলম্বনে লিখিত। সুতরাং তাহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর, আর 'চিত্র পরিচয়' দিবার জন্য আয়োজন কেমন এক প্রকার অসঙ্গত ও ধৃষ্টতাসূচক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান চিত্র পরিচয়ের ভিতর দিয়া আমি ঐতিহাসিকগণের নিকট কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন উপস্থিত করিতে চাই। সে প্রশ্ন সংক্ষেপতঃ এইঃ—

Baron javer mir এই ময়ূর সিংহাসন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই—ময়ূর সিংহাসন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজাসন। ইহা দরবার কক্ষে স্থাপিত ছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে ছয় ফিট এবং প্রস্থে চারি ফিট। ময়ূর সিংহাসনের ভিতরকার চন্দ্রাতপ মুক্তা ও হীরকখচিত ছিল। সিংহাসনের উপরে একটী মাত্র ময়ূরপুচ্ছ

বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান, উক্ত ময়ূরের পুচ্ছদেশ বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত এবং ইহার বক্ষদেশে একখানি উজ্জল মরকত মণি শোভা পাইত। * * এই বিখ্যাত ময়ূরাসন তৈমুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সাজাহান ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করেন।
Javernier's Indian Travels Edited in 1713.

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইতেছে যে,—Tavernierএর বর্ণনার সহিত অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের বর্ণনার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উদাহরণস্বরূপে তিনটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ ময়ূরাসনের আয়তনের কথাই বলি। নিখিলবাবুর প্রবন্ধ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, আবদুল হামিদ লাহোরীর মতে ময়ূর-সিংহাসন দৈর্ঘ্যে ৩ গজ বা ৯ ফিট, প্রস্থে ২॥ গজ এবং উচ্চতায় ৫ গজ হইবে। আবার এমায়ত খাঁ সাজাহান নামায় লিখিয়াছেন যে, ময়ূর-সিংহাসন দৈর্ঘ্যে ৩॥ গজ ছিল। কিন্তু Javernier স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে এই আসনখানি দৈর্ঘ্যে মাত্র ৬ফিট ও প্রস্থে ৪ফিট ছিল। এই তিন ব্যক্তির বর্ণনার মধ্যে এরূপ পার্থক্যের কারণ কি? ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থই প্রামাণিক। সুতরাং যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া বর্ণনার পার্থক্যের হেতু নির্দ্দেশক কোন প্রবন্ধ ঐতিহাসিক চিত্রে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে—তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। অপর কথা এই যে Javernierএর বর্ণনার উদ্ধৃত অংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে, সিংহাসনের উপরে একটী ময়ূর অবস্থিত ছিল; কিন্তু প্রকাশিত চিত্রের দুইটী ময়ূরের কল্পনা করা হইয়াছে। যে মূল চিত্রখানি হইতে বর্ত্তমান চিত্র গৃহীত, তাহাতেও দুইটী ময়ূর সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পার্থক্যেরই বা কারণ কি? যে দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন ঐতিহাসিক আর একজন চিত্রকর। দুইজনই ময়ূর সিংহাসন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। আশা করা যায় যে,

"ঐতিহাসিক চিত্রের" পাঠকবর্গ এ প্রশ্নের সমাধান করিতে সমর্থ হইবেন। তৃতীয় কথা এই যে ইতিহাস হইতে * জানিতে পারি যে, সম্রাট —সাজাহান এই মোগল সিংহাসন নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু Javernier বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তৈমুরলঙ্গ এই ময়ূরাসন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং সম্রাট সাজাহান ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদন করেন। কোন প্রামাণিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া, Javernier এই উক্তির পোষকতা করিয়াছেন?—Indian Anquity গ্রন্থে Thomas Maerice এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্যক্তি "ঐতিহাসিক চিত্রের" পৃষ্ঠ-পোষক; তাহাদিগের শিরোভূষণ ঐতিহাসিক জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ইহার সম্পাদক। সুতরাং—ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টি এই প্রশ্ন ত্রয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেই যে কোন বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে সর্ব্ব সংশয়ের নিরাকরণ হইবে, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র থাকিতে পারে না।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষাল
যুবক সমিতি, বৈষ্ণবাটী।

* ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৫ Elphinstone's History.

দন্ত-সহায় চূর্ণ।

(দন্তরোগের মহোপকারী স্বদেশী দন্তমার্জ্জন)।

প্রত্যহ ইহা দ্বারা দন্তধাবন করিলে দাঁতের গোড়া ফুলা, রক্ত পড়া, কন্‌কনানি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ অতি শীঘ্র নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এ যাবৎ যত প্রকার দন্তমার্জ্জন বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুস্থাবস্থায় ইহার ব্যবহারে দাঁতগুলি মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছ, দৃঢ়, কার্য্যক্ষম ও বহুকালস্থায়ী হয়। যাঁহারা অন্যান্য দন্তমার্জ্জন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পান নাই, তাঁহারা অন্ততঃ পরীক্ষার্থ একবার ইহা ব্যবহার করিয়া দেখুন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

এস্, সি, কাব্যতীর্থ।

৩৩।১ চূণাপুকুর লেন, কলিকাতা।

আদিনা মসজিদ।

ঐতিহাসিক চিত্র।

প্রাচীন-ভারতে বাণিজ্যের কথা।

(বৈদহক রক্ষণ)

বিক্রেতা বা বন্ধকদাতা যখন নিজপণ্যে স্বাধিকারত্ব প্রমাণে সক্ষম হইবেন, কেবল মাত্র সেই সকল ক্ষেত্রে সংস্থ্যাধ্যক্ষ সেই সকল পণ্য বিক্রয়ে বা বন্ধক দিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। প্রতারণা নিবারণার্থে তিনি তুলা ও মান পরিদর্শন করিবেন।

পরিমাণী (১) এবং দ্রোণে (২) অর্দ্ধপল (৩) ব্যতিক্রম হইলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু এক পল ব্যতিক্রম হইলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। অধিক বিভিন্নতা হইলে, যে পরিমাণে ব্যতিক্রম হইবে, সেই পরিমাণ গুরুতর দণ্ড হইবে।

তুলা নামক তুলাদণ্ডে কর্ষের (৪) প্রভেদ হইলে, উহা গণ্য করা হইবে না। দ্বিকর্ষহীন বা অতিরিক্ত হইলে ৬ পণ অর্থদণ্ড হইবে। অধিক ব্যতিক্রম হইলে দণ্ডের হার বৃদ্ধি করা হইবে।

আধক নামক তুলাদণ্ডে অর্দ্ধকর্ষের প্রভেদ হইলে উহা গণ্য করা হইবে না। কিন্তু এক কর্ষের প্রভেদ হইলে উহাতে তিন পণ অর্থদণ্ড হইবে। অধিক প্রভেদ হইলে দণ্ডের হার বৃদ্ধি পাইবে।

অন্যান্য প্রকার তুলাদণ্ডের ব্যবধানজনিত দোষের দণ্ড পূর্ব্বোক্ত হারাহারি মতে হইবে।

যখন কোন বণিক প্রতারণাপূর্ব্বক ভিন্ন তুলাদণ্ড দ্বারা অতিরিক্ত পণ্য খরিদ করে এবং ঐ প্রকার অস্বাভাবিক তুলাদণ্ড সাহায্যে ক্রীত পণ্য বিক্রয় করে, তখন তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে।

যে সকল পণ্য গণনা করিয়া বিক্রয় হয়, সেই সকল পণ্য বিক্রয়ে একের অষ্টমাংশ প্রতারণা করিলেও বিক্রেতার ছিয়ানব্বই পণ অর্থদণ্ড হইবে।

কাষ্ঠ, লৌহ, মণি, রজ্জু, চর্ম্ম মৃণ্ময়পাত্র, সূত্র, বল্কল এবং পশমে প্রস্তুত পণ্যের নিকৃষ্ট দ্রব্য যদি উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়া হয়, তবে বিক্রীতপণ্যের আটগুণ অধিক দণ্ড হইবে।

যখন কোন ব্যবসায়ী নিকৃষ্ট দ্রব্যকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রয় বা বন্ধক দেয়, এক স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য অন্য স্থানের বলিয়া পরিচয় দেয়; অথবা অপদ্রব্য মিশ্রিত বিক্রয় বা বন্ধক দেয় বা বিক্রীত দ্রব্য প্রতারণাপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করে, সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে ৪ পণ অর্থদণ্ড ব্যতীত ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। এক পণ মূল্যের ক্ষতি করিলে ২ পণ এবং ১০০ শত পণ মূল্যের ক্ষতি করিলে ২০০ পণ এইরূপ হিসাবে দণ্ড বৃদ্ধি করিতে হইবে।

যাহারা কারিকরগণের লাভের হার হ্রাস করিবার ইচ্ছায় অথবা তাহাদের পণ্যের ক্রয় বিক্রয় প্রতিহত করিবার জন্য তাহাদের পণ্যের অপকৃষ্টতার জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের সহস্র পণ অর্থদণ্ড হইবে।

যে সকল বৈদেহকগণ পণ্যবিক্রয়ে বা অধিক মূল্যে পণ্যবিক্রয়ে বা ক্রয়ের জন্য ষড়যন্ত্র করে, তাহাদের সহস্র পণ অর্থদণ্ড হইবে।

মধ্যবর্ত্তিগণ যাহারা প্রতারণাপূর্ব্বক অথবা ভিন্ন তুলাদণ্ড দ্বারা অথবা নিকৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা কোন ক্রেতা বা বণিকের এক অষ্টমাংশ ক্ষতি করে,

তাহাদের দুই শত গুণ অর্থদণ্ড হইবে। অধিক ক্ষতি করিলে অধিক অর্থদণ্ড হইবে।

ধান্ত, স্নেহ, ক্ষার, লবণ, গন্ধ এবং ভেষজদ্রব্যে সমবর্ণবিশিষ্ট অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে।

মধ্যবর্ত্তিগণ দ্বিবর্ষে কত উপায় করে, বণিক ইহা স্থির করিবেন এবং জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বিধিবদ্ধ করিবেন। কেন না, ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের মধ্যে যে লাভের হার নির্দ্ধারিত হয়, উহা প্রকৃত লাভ নহে। এই জন্য কেবল মাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ধান্য এবং অন্যান্য পণ্য সংগ্রহ করিবে। অনুমতি ব্যতিরেকে এই সকল সংগ্রহ করিলে, পণ্যাধ্যক্ষ উহা গ্রহণ করিবেন। এইজন্য বণিকগণ শস্য এবং অন্যান্য পণ্য-বিক্রেতার প্রতি সদয় থাকিবেন।

সংস্থাধ্যক্ষ স্বদেশীয় পণ্যের উপর ও নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর শতকরা ৫ এবং বৈদেশিক পণ্যের উপর শতকরা ১০ লাভের হার নির্দ্ধারণ করিবেন। যে সকল বণিকগণ উহাপেক্ষা মাত্র অর্দ্ধপণ অধিক মূল্যেও পণ্যাদি ক্রয়বিক্রয় করিবে বা ঐ পরিমাণ লাভের চেষ্টা করিবে, তাহার ২০০ পণ অর্থদণ্ড হইবে। ইহার অধিক লাভের চেষ্টায় দণ্ডের পরিমাণও বৃদ্ধি হইবে।

সংগৃহীত পণ্য দ্রব্য সমুয় বিক্রয় না হইলে উহার মূল্য পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রতিবন্ধক হইলে সংস্থাধ্যক্ষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।

যখন পণ্যবাহুল্য হইবে, সংস্থাধ্যক্ষ তখন পণ্য একত্রীভূত করিবেন এবং ঐ প্রকারের পণ্য অন্যত্র বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেন।

দৈনন্দিন বেতনের সুবিধার জন্য বণিকগণ প্রজাগণকে এই একত্রীভূত পণ্য সুবিধাদরে বিক্রয় করিবেন।

উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ, শুল্ক, মূলধনের সুদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অনুপাতে অধ্যক্ষ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন এবং তৎকালে ঐ পণ্য বিদেশজাত কি বহুপূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার অনুসন্ধান রাখিবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
হাজারীবাগ।
বি. এ. এফ্. আর্. Hist, S.

ইলোরার গিরি-মন্দির।

প্রথম প্রস্তাব।

বৌদ্ধযুগ।

—০—

পরাধীন জাতির যে শুধুই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লুপ্ত হয়, তাহা নয়; পরন্তু সর্ব্ববিষয়েই, তাহার প্রতিভা সঙ্কীর্ণপথাবলম্বিনী হয়। এই ভারতে,—শিল্পে যে ঐন্দ্রজালিক ছিল, যাহার মানসী পরিকল্পনার বহির্বিকাশে প্রজাপতিও হারি মানিত এবং অদ্যাপি যাহার কাল-ক্ষয়িত শিল্পাবশেষ দর্শন করিয়া বিশ্বজন মুগ্ধ ও স্তম্ভিত,—আজ তাহার সে শক্তি কোথায়? ইহার উত্তর দিতে গেলে, মৌনাবলম্বন ভিন্ন আমাদের আর দ্বিতীয় গতি নাই।

আবার জিজ্ঞাসা করি, কোথায় সেই শিল্প? কোথায় সেই অম্বর-চুম্বিতপ্রায় প্রাসাদসকল, কোথায় সেই দৃষ্টিসীমামুক্ত দেবালয় সকল, কোথায় সেই নির্জ্জনকাননমধ্যস্থ কারু-কর্ত্তিত গিরিগুহা সকল,—যাহার আমূলচূড়াব্যাপ্ত ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির কেহ ধ্যানস্তিমিতনেত্রা, কেহ নৃত্য বঙ্কিমা, কেহ হাস্যে বিকসিত-আস্যা, কেহ অভিমানে স্ফুরিতাধরা, কেহ

প্রেমে পুলকোজ্জ্বলনয়না, কেহ করুণায় বিগলিতপ্রাণা ও কেহ ক্রোধে কুঞ্চিতভ্রূ ;—যাহার নিরন্তরাল ক্ষোদনচিত্রের লতাগুলির কোনটী পুষ্পিতা, কোনটী মুকুল-আকুলিতা, কোনটী বঙ্কিম পত্র সৌন্দর্য্যক্ষমা ও কোনটী ফলদলফলিতা ; যাহার অভ্যন্তরে কত অমলজল জলাশয়,—কত গৃহ—গৃহের পরে গৃহ—কোনটী উপাসনার, কোনটী বিশ্রম্ভালাপের, কোনটী ভোজনের ও কোনটী শয়নের ;—আজ এই রাজলোভনীয় শিল্প কঙ্কালাবশেষে পরিণত, মহাকালের বিরাট ত্রিশূল তাহারও উপরে উদ্যত দুদিন বাদে যাহা আছে, চূর্ণ ইষ্টক, ভগ্ন মন্দির,—কর্ত্তিতনাসা ক্ষয়িত মূর্ত্তি—তাহাও থাকিবে না—তাহাও যাইবে—কিন্তু তাহার স্মৃতি যাইবে কি ? সেই স্মৃতি অমর,—তাহার জন্য দু'ফোটা চোখের জল ফেলিও।

যে শিল্পের জন্য এত কথা বলিলাম,—ইলোরা তাহারই অন্যতম মহৎ দান।

নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত আরেন্দাবাদ হইতে প্রায় বার মাইল পূর্ব্বে ইলোরার গুহা মন্দির। কিন্তু আর একজন বলেন, "আরেন্দাবাদ হইতে উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া এই গুহাগুলির নিকটে গিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। * একজন বলিতেছেন, গুহাগুলির অবস্থান পূর্ব্ব দিকে ; আর একজন বলিতেছেন, উত্তর দিকে! ঐ রহস্য ভাল বুঝিলাম না। ইলোরার অবস্থান এক মাইলেরও বেশী এবং চারি দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব্ব। উর্দ্ধে, অনন্তের উদ্দেশে অনন্ত ধ্যানমত্ত অনন্ত ও অনাহত মহাব্যোম,—নিম্নে,—চরণতলে তৃণ-শ্যামলিতা মেদিনী এবং চতুর্দ্দিকে শ্যাম সুন্দর কানন ও রজতরেখপ্রতিমা তটিনী ও ধূমধূসর শৈল! সংসার চির অসার, তাই এখানে তাহার প্রবেশ নিষেধ। সুধুই বিহগ-

* Journal of Science and Literature.—Madras Dr. W. H. Bradlay.

বিরাব,—সুধুই বনমর্ম্মর, সুধুই পবন স্বনন! তাহার সহিত তাল রাখিয়া তটিনী তটতলে ভাঙিয়া পড়িতেছে এবং তিমিরতুলিকালিপ্তা স্তব্ধনিশায় কেবল ঝিল্লী ঝুঙ্কুর তাহার সহিত সুর ছাড়িয়া দিতেছে। এই সর্ব্বজনমনোহারিণী প্রকৃতি এখানকার শিল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে।

ইলোরা যে কেবল বৌদ্ধগণের বাটালির মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নয়; পরন্তু ব্রাহ্মণ এবং জৈন শিল্পিগণও তাহার নানাস্থানে আপনাদের শিল্পসুন্দর ক্ষোদন-পটুতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। ইহার ব্রাহ্মণপ্রদত্ত নাম গ্রীষ্মেশ্বর। এখানে ঐ নামে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এবং এই দেবতার সম্মানও অল্প নয়। দ্বাদশ শিব তীর্থের মধ্যে ইহা অন্যতম। *

জনপ্রবাদবলে, স্থানীয় সলিল-সেবনে ইলু নামে প্রসিদ্ধ কোন রাজা কষ্টকর রোগযাতনার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এবং তাহার ফলে, কৃতজ্ঞ রাজা এখানে অনেক শিল্পানুষ্ঠান করেন। তদবধি, এই গুহা-মন্দির উক্ত নামে বিখ্যাত। †

অন্য মতে আমরা জানিতে পারি যে, বুধ-বনিতা ইলার নামানুকরণে ইহার নাম ইলোরা হইয়াছে। ‡

ইহার নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে একজন বলেন, এই গুহা ৩৫০।৫০০ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে সম্পাদিত। §

আর একজন বলেন ইহার নির্ম্মাণ কাল ৩৫০।৫৫০ খ্রীঃষ্টাব্দে ¶

* Archœal. Sur. Rep. Vol III. p. 82.
† Asiatic Researches. VI. p. 385.
‡ Wilson's Analysis of the Mackenzine Manuscript.
§ Guide to the cave-temples of Ellora.
¶ বিশ্বকোষ।

ফারগুসান সাহেবও এই মতাবলম্বী। *

জৈন মন্দিরের কালনির্ণয় সম্বন্ধে আর একজন বলেন, "এখানে যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে জানা যায়, ১১৫৬ শকে ইহার প্রতিষ্ঠা। তাহা হইলে, ইহা ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। †

এ বিষয়ে আর অনেক মত আছে; কিন্তু কাল নির্ণয় লইয়া বেশী গোলমাল ভাল নয়। কারণ, তাহার ফলে পাঠকদের মাথার ভিতরেও গোলমাল বাধিতে বড় বেশী বিলম্ব হয় না।

বৌদ্ধগুহাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। একদিকে বৌদ্ধগুহা, অন্যদিকে জৈনগুহা এবং তাহার মধ্যেই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গুহাগুলির অবস্থান। জৈনগুহাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক এবং ইলোরার শ্রেষ্ঠ যে শিল্পসৌন্দর্য্য,—"ইন্দ্রসভা",—তাহা জৈন হস্তেই খোদিত। ইন্দ্রসভার কথা তৃতীয় প্রস্তাবে বলিব।

বৌদ্ধগুহা হইতেই আমাদের বর্ণনা আরম্ভ করা যাক্। প্রথম গুহাটীর অধিকাংশ স্থান মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দেখিতেও তত ভাল নয়। প্রাচীনতম গুহাগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহার ছাদ বড় নিচু তাহাতে গুহাটীর সৌন্দর্য্য হানি হইয়াছে। ইহার নাম ঢেরাবাড়া। পরবর্ত্তী গুহার সহিত ইহা সংযুক্ত। তাহা একটী বৌদ্ধ বিহার। আটটী ঘর। এই ঘরগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ থাকিতেন।

* The cave-temples of India. By James Fergusson and James Burgess.

† Cave-temples and Monasteries and other ancient remains of Western India. By John Wilson, D. D., F. R. A. S., p. 31.

"There are evidently immitations of parts of Kailas, in the northern group of caves of Elora, commencing with the series nicknamed the Indrasabha. These, then, must be posterior, in point of execution to the first half of the ninth century." (Journal of Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. Jan. 1850. p. p. 8೭-84.)

ঘরগুলির ভিতরে চারিটী পিছনদিকে ও চারিটী দক্ষিণদিকে। পরিমাপ,—প্রস্থে ৪১ ফিট ৬ ইঞ্চি ও গভীরতায় ৪২ ফিট ৩ ইঞ্চি। সম্মুখের দিকটা পড়িয়া গিয়াছে। কেবল একটী মাত্র স্তম্ভ এখনও অবশিষ্ট। স্তম্ভটী, দক্ষিণদিকের শেষাংশে। বাহিরে, দক্ষিণস্থ শেষাংশে একটী বারান্দা আছে এবং সেইখানেই আর একটী ঘর।

দ্বিতীয় গুহাটী সুবৃহৎ ও দেখিতেও অতি চমৎকার। ইহা নাটমন্দির। এখানে উপাসনা হইত। কয়েকটী সোপানসাহায্যে ইহার ভিতরে যাওয়া যায়। এখানে অনেক মূর্ত্তি আছে। এক যায়গায় চারিটী স্তম্ভ,—এক সময়ে সেগুলি বারান্দার ছাদের ভারবহন করিত; কিন্তু এখন সে ছাদ ধ্বংস-গর্ব্তে।

তৃতীয় গুহাটীও বিহার,—পাহাড় হইতে নিম্নাভিমুখী এবং তাহার নির্ম্মাণাদর্শ দেখিয়া বলা যায় যে, তাহা দ্বিতীয় গুহারই সমসাময়িক। এখানে আর একটী খুব বড় বিহার আছে,—তাহার পরিমাপ—প্রস্থে প্রায় ৫৮ ফিট ও গভীরতায় ১১৭ ফিট। চব্বিশটী স্তম্ভ ইহার ছাদভার বহন করিতেছে। গুহাগুলির মধ্যে এটি ধর্ম্মশালা ছিল।

বৌদ্ধ গুহাগুলির ভিতরে বিশ্বকর্ম্মাগুহাই এখানকার এক মাত্র চৈত্যগুহা। * ভিতরের মন্দিরে একটী চক্রনাভি (nave) এবং মধ্যপথ (aisles) আছে। মন্দিরের পরিমাপ উচ্চে ৩৪ ফিট।

* বিশ্বকর্ম্মা গুহার পরিমাপ।

Area—square	...	...	...	49 feet,
Verandah-below	...	..	...	14 ,,
,, high	...	...	...	10 ,, 4 inches.

Doorway—four feet broad by eight feet four inches high.

Gallery above the door—square ..		...	14 feet.
Length of the temple	...	...	79 feet.
Breadth of the temple—from wall to wall...			43·5 ,,
Height of temple,—from the centre of the arch to the floor	...	...	35 feet.

Asiatic Researches.

আটাশটী অষ্টকৌণিক স্তম্ভদ্বারা চক্রনাভিটী মধ্যপথ হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্তম্ভগুলি উচ্চে ১৪ ফিট,—উপরে ব্র্যাকেট আছে।

বিশ্বকর্ম্মা গুহার সহিত সংলগ্ন আরও কতকগুলি বিহার আছে। বিশ্বকর্ম্মা গুহার পরেই একটী অতি ক্ষুদ্র এবং সুন্দর বিহার,—তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া একটী পথ আছে। *

দ্বিতল।—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহা খনিত হয়। একটী বারান্দা আছে,—তাহার পরিমাপ লম্বে ১০২ ফিট ও চওড়ায় ৯ ফিট। দুটী ঘর। এখানে একটী ক্ষোদনচিত্র পাওয়া গিয়াছে। পদ্মপাণি বুদ্ধ এবং তাঁহার সঙ্গিরূপে বজ্রপাণি,—অর্থাৎ ইন্দ্র। তাঁহার ডানহাতে বজ্র।

ত্রিতল।—নিজাম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিস্কৃত। এরূপ কঠিন পর্ব্বতবক্ষ খনন করিতে কত পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা অনুভবযোগ্য। আঙিনা হইতে যে সোপানশ্রেণী উঠিয়াছে, তাহার সাহায্যে প্রথম ঘরটীতে যাওয়া যায়। এখানে অষ্টসংখ্যক চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে, তাহাদের সম্মুখদিকে ব্র্যাকেট। মধ্যস্থ স্তম্ভ দুটীর উর্দ্ধাংশে শিল্পরম্য পুষ্পালঙ্কার আছে। পশ্চাদ্দিকে আরও দু'থাক স্তম্ভ,—প্রত্যেক থাকে আটটী করিয়া। তাহার পিছনে আরো ছয়টী স্তম্ভ। অতএব সর্ব্বসমেত ত্রিংশ সংখ্যক স্তম্ভ।

বৌদ্ধহস্ত গঠিত গুহাগুলির ভিতরে এই উচ্চতলটীই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী। ইহাতে পাঁচটী মধ্যপথ আছে,—তাহাতে আটটী করিয়া স্তম্ভ। একটী মূর্ত্তির সম্মুখে আরও দুটী স্তম্ভ,—সর্ব্বসমেত বিয়াল্লিশটী। স্তম্ভগুলি চতুষ্কোণ। পথগুলির শেষভাগে বুদ্ধের কতকগুলি বৃহৎ মূর্ত্তি,—সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট, নিয়মিত সঙ্ঘের সহিত।

* History of Indian and Eastern Architecture. By James Fergusson. p. 164.

পিছনের পথের দক্ষিণস্থ শেষভাগে,—একটী সিংহাসনারূঢ় বুদ্ধমূর্ত্তি। সিংহাসনের মধ্যে চক্র। সম্মুখে দুটী কারুকর্ত্তিত হরিণ,—এখন ভগ্নচূর্ণ,—সম্ভবতঃ কোন মূর্খের কবলে পড়িয়া তাহাদের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। বারাণসীর মৃগদাবমঠে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন,—এই ক্ষোদন চিত্রের পরিকল্পনায় সম্ভবতঃ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পথেরই উত্তরদিকস্থ শেষভাগে আর একটী বুদ্ধমূর্ত্তি,—সম্মুখদিকে অবনত অবস্থায় এবং হাত দুটী উপদেশ দানের ভঙ্গীতে ক্ষোদিত। এই মূর্ত্তিটীও সিংহাসনে উপবিষ্ট,—মধ্যভাগে নিয়মিত সঙ্গিগণের পরিবর্ত্তে একটী সিংহ আছে। অন্যদিকে, (১) একটী ক্রোড়স্থাপিতকর বুদ্ধমূর্ত্তি,—ধ্যানস্থ ও আসনপিড়ী হইয়া বসিয়া আছেন। সম্ভবতঃ, ইহা তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যোগসাধনার চিত্র। (২) ইহার উপরে আর একটী বুদ্ধমূর্ত্তি,—দেবতাগণের কাছে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য স্বর্গে আরোহণ করিতেছেন। (৩) বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভ। তাঁহার আনন অবিকৃত এবং তিনি হেলান দিয়া চিরবিশ্রামভোগ করিতেছেন। এই চিত্রগুলি বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটী প্রধান কার্য্যের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। *

আমরা ইলোরায় বৌদ্ধযুগে ক্ষোদিত গুহাগুলির একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম মাত্র,—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, আমাদের বক্তব্য ইহা অপেক্ষা বিশদ করিতে পারিলাম না।

কিন্তু ইলোরার শিল্পকীর্ত্তির প্রধান অধ্যায়, বিদ্যমান নিবন্ধে অসমাপ্ত রহিয়া গেল,—বারান্তরে সে চেষ্টা করিব।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

* The cave-temples of India. By James Fergusson and James Burgess.

খুলনার খাঞ্জয়ালী মসজিদ।

পুরাকালে খুলনা জেলা প্রাচীন বঙ্গ অথবা সমতট সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। তদনন্তর তাহা রাজা বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের বাগড়ী বিভাগের অন্তর্ভূত হয়। এইরূপ কিম্বদন্তী, খাঞ্জয়ালী নামে জনৈক মুসলমানের সময়ে উহা প্রখ্যাত হইয়া উঠে। খাঞ্জয়ালী সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে খুলনা জেলায় আগমন করেন। তিনি যে কোন্ স্থান হইতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা নিতান্ত দুরূহ। তবে কেহ কেহ বলেন, তিনি লোদীবংশের রাজত্বকালে দিল্লী হইতে কোন কার্য্যানুরোধে এই স্থানে প্রেরিত হয়েন। ইনি অত্যন্ত সুচতুর লোক ছিলেন। ইনি গৌড়রাজের নিকট হইতে একটী জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুন্দরবন জঙ্গলাবৃত দেখিয়া তাহার বহু স্থান পরিষ্কার করতঃ কৃষিকার্য্যে কৃষাণ নিযুক্ত করেন। এই প্রকারে তিনি আজীবন এই সকল ভূখণ্ড লইয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় প্রজাপালন ও শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহার ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তিনি এই প্রদেশ মসজিদ ও কবরে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ অধুনা বাগেরহাট ও মসজিদকুড়ে পরিদৃষ্ট হয়।

আমরা আজ পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য উক্ত স্থানের কতিপয় ঐতিহাসিক বিবরণ অত্রস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। আমরা খুলনা জেলায় বাগেরহাট মহকুমার কয়েকটী পুরাতন মসজিদ ও দীর্ঘিকা সম্বন্ধে কতিপয় বিষয় বর্ণনা করিব। এই স্থানের একটী মসজিদের গাত্রে পারস্যভাষায় কতিপয় ছত্র লিখিত আছে। তাহার অর্থ আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম।——

পারস্তভাষার প্রচলন অধিকাংশ যন্ত্রালয়ে দৃষ্ট হয় না এবং তজ্জন্য সেই সকল স্থানে পৃথক কম্পোজিটারও নাই, সুতরাং আমাদের বাধ্য হইয়া উক্ত সকল পরিহার করিতে হইল। যাহা হউক, উক্ত পারস্ত লিপির অর্থ এই——"যগুপি কেহ অর্থলিপ্সু হইয়া থাক, তাহা হইলে সে এই মসজিদের চতুর্দ্দিকে ৩/, ৪/ বিঘা জমি খনন করিলে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইবে।" এই প্রকার লিখিবার বা কৌশল অবলম্বন করিবার হেতুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। জমি গভীররূপে খনন করিলে তাহার উর্ব্বরাশক্তি অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবেক। কেহ ইচ্ছা করিয়া কৃষিকার্য্যোপলক্ষে এবংপ্রকারে সুচারুরূপে খনন করিয়া শস্ত বপন করিতে পারে না। অর্থের লালসা স্বতন্ত্র। অপিচ, অর্থলিপ্সু হইয়া যগুপি কেহ ভূমি খনন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তাহার কার্য্যই সমধিক সন্তোষজনক হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ৩/, ৪/ বিঘা জমির মধ্যে অর্থ লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থ-গৃধ্নু ব্যক্তিগণ ধনলোভে প্রাগুক্ত মসজিদের চতুঃপার্শ্বে বহু শত বিঘা জমি সুগভীররূপে খনন করিয়া ফেলিয়াছিল। অদৃষ্টক্রমে বহু লোকে উহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই বহু অর্থ লাভ করিয়া দৈন্যদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাহার কৌশল কোন প্রকারেই অপ্রশংসার যোগ্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত মসজিদের চতুঃপার্শ্বের বহু বিঘা জমি শস্তশালিনী হইয়া সুবর্ণ প্রসব করিতেছে। ইহাও খনন কার্য্যের বিশেষ ফল বলিতে হইবে। পরন্তু যে পরিমাণ অর্থ ভূমধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ মাত্র ব্যয় করিলেই জমির উর্ব্বরাশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত; তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তদীয় হস্তে প্রচুর অর্থ ছিল বলিয়া তিনি ঐ প্রকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তবে বহু কৃষক এই স্থানের জমি খনন করিয়া ধনী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

ষাট-ঘোমট—

মস্‌জিদ্‌টিতে কারুকার্য্য অত্যল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্ব-ভাগে একটী সুবিশাল "হল" লক্ষিত হইয়া থাকে; তাহার সহিত মস্‌জিদের কোন সম্বন্ধ নাই। দুইটিই স্বতন্ত্র অট্টালিকা বর্ত্তমান আলোচ্য "হল"টি সুদৃঢ়রূপে গঠিত। উহা ষষ্টিতমদ্বারবিশিষ্ট। ইহাকেই "ষাট-ঘোমট" বলে। "ঘোমট" অর্থে দ্বার বুঝায়। উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অতঃপর ইহার চতুঃসীমা প্রদত্ত হইল। ষাট ঘোমটর উত্তরে বাগেরহাট রাস্তা। তাহার উত্তরে মগরা ও চিন্তার খোল গ্রামদ্বয় এবং হাউলী পরগণা। হাউলী পরগণার ঠিক উত্তরে ভৈরব নদী। দক্ষিণে মধুদিয়া পরগণা, খোস্তাকাটা চক ও চৌমোহানা নদী। পূর্ব্বদিকে কাড়াপাড়া ও হাউলী পরগণা। পশ্চিমে বারাকপুর ও রাঙ্গদিয়া পরগণা। এই পরগণার সীমা ভৈরবনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দীর্ঘিকার বিবরণ—

রাঙ্গদিয়া পরগণার অন্তর্ভূক্ত বারাকপুর গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি দৃষ্ট হয়। তাহাকে লোকে "ঘোড়াদীঘি" বলিয়া থাকে। উহা দৈর্ঘ্যে এক মাইলের অধিক হইবে। উক্ত দীঘি অত্যন্ত সুগভীর ও জল অতি-শয় পরিষ্কার। "ঘোড়াদীঘি" প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্যে পরিপূর্ণ। উহা মস্‌জিদের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। প্রাগুক্ত সুবিশাল "হল" ষাট-ঘোমটের ঠিক পূর্ব্বদিকে "ঠাকুরদীঘি বলিয়া একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। উহার অপর নাম "দেব-দীঘি।" উহা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইল হইবে। এই জলাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুগভীর বলিয়া অত্রস্থলের লোকের ধারণা। বাস্তবিক উক্ত দীঘি বিলক্ষণ গভীর বটে। এই ঠাকুরদীঘির ঠিক মধ্য স্থলে একটি দেবালয় আছে। ঐ মন্দিরটি অত্যন্ত মনোরম।

কি প্রকারে যে ঐ গভীর জলাশয়ের মধ্যে মন্দির প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। জলের মধ্যে উক্ত মন্দির কতিপয় শতাব্দী মগ্ন থাকিয়াও কোন প্রকার বিকৃতভাব দৃষ্ট হয় নাই। চৈত্র, বৈশাখ মাসে ঐ মন্দিরের শিরোভাগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট মাসে উহা জলমগ্ন থাকে। এই স্থানে আরও একটী আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। পাঠকগণ বোধ হয় সে সকল বিষয় কি তাহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। সেই দীঘির মধ্যে সুবৃহৎ কুম্ভীরদ্বয় বিরাজ করিতেছে। আমরা অধুনা তাহার বিষয়ই বলিতে যাইব। লোকে তাহাদের "ধলা পাহাড়" ও "কালাপাহাড়" বলিয়া থাকে। নামানুযায়ী তাহাদের বর্ণও সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ তন্মধ্যে একটী শ্বেত ও অপরটি কাল। পূর্ব্ববঙ্গে শ্বেত বা সাদাকে "ধলা" বলিয়া থাকে। আমাদের মনে হয় "ধলা" ধবল শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। "ধবল" সংস্কৃত শব্দ সুতরাং "ধলা" কথাটি নির্ভুল বলিতে হইবে। উক্ত নক্রদ্বয় বিলক্ষণ শান্ত, শিষ্ট এবং প্রতিহিংসানিরত। তাহারা কদাচ লোক ক্ষতিকর ব্যাপারে বিনিযুক্ত নহে। যদ্যপি কেহ তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকে, তাহারা তৎক্ষণাৎ ঘাটের দিকে ছুটিয়া যায়। তাহাদের আশা তথায় যাইলে আহারোপযোগী খাদ্য যথেষ্ট মিলিবে। লোকে আদর করিয়া তাহাদের জন্য পায়রা, মুরগী প্রভৃতি প্রদান করে। কখন কখনও কেহ কেহ সন্দেশ, চিনি আদি মিষ্টসামগ্রীও দিয়া থাকে। তাহারও স্বেচ্ছায় "মুখ হাঁ" করিয়া উক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে না। আমাদের বর্ণিত ঠাকুরদীঘির ঠিক পূর্ব্বভাগে "পচাদীঘি" তিন পোয়া মাইল জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। "পচাদীঘি" দীর্ঘিকাদ্বয় মধ্যে তথায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অত্র বর্ণিত দীর্ঘিকাদ্বয় কাড়াপাড়া গ্রামের অন্তর্গত।

খুলনা পর্য্যন্ত জোয়ার ভাটার ক্রীড়া বিলক্ষণ পরিস্ফুট হয়; সুতরাং

নদী আদির জল জোয়ার দ্বারা পরিচালিত হইয়া লবণাক্ত হইয়া পড়ে। জলে অত্যধিক লবণের বিদ্যমানতাহেতু উক্তবারি পানোপযোগী নহে। এবংবিধ কারণনিবন্ধন খুলনা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা কূপ ইত্যাদি হইতে পানীয় জলের কার্য্য সংসাধিত হয়। এই স্থানের দীর্ঘিকা ও কূপাদির প্রাচুর্য্য বোধ হয় প্রাগুক্ত কারণেই হইয়া থাকিবে। চৌমোহানা নদী ঠাকুর দীঘির একটি বিপর্য্যয় সংঘটিত করিয়াছে—উহা উক্ত দীঘির সহিত মিলিত হইয়া উহার জল লবণাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে; সুতরাং উহা পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম ও তৃতীয় দীর্ঘিকার জল এমত স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ যে, বাগেরহাট মহকুমায় পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্য তথাকার কর্তৃপক্ষ এই দীর্ঘিকাদ্বয়ের সহিত পাইপ বা নলের সংযোগ করিয়া জল লইয়া গেলে কি প্রকার হইতে পারে;—বহুদূর হইতে পাইপ দ্বারা জল সরবরাহ সুবিধাজনক কিনা, তাহার প্রস্তাব চলিতেছে। বহু বিজ্ঞ ডাক্তার এই স্থানের জল পরীক্ষা করিয়া এমত কোন বিষাক্ত জীবাণু (Microbe, bacilli etc) প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যদ্দ্বারা শারীরিক অবনতি সংঘটিত হইতে পারে। কলিকাতায় কলের জল প্রস্তুত করিতে হইলে যথেষ্ট শ্রমসাধ্য কার্য্য সংসাধন করিতে হয়। কলিকাতার বহির্ভাগ হইতে পাইপ সাহায্যে জল লইয়া আসা হয়। তাহা রিজার্ভ চৌবাচ্চায় রাখিয়া দিলে উহার কর্দ্দমাদি থিতাইয়া নিম্নে পতিত হয়। উহাকে 'তলানী" বলে। পরে ঐ জল তথা হইতে নীত হইয়া পরিষ্কার ও গরম করা হয়। সর্ব্বশেষে তাহা কলিকাতার প্রতি গৃহে সংপেষণী-যন্ত্র-সাহায্যে গৃহে গৃহে সংযুক্ত পাইপ দ্বারা প্রেরণ করা হয়। এই হইল কলিকাতার অবস্থা। যে জল পরিষ্কার করিতে বহু আয়াসসাধ্য কার্য্য সংসাধন করিতে হয়। যদ্যপি তাহা স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আর স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া কে তাহার অপলাপ করিতে প্রয়াসী হয়? বাগেরহাট সহরবাসী পাইপ

সংযোগে কাড়াপাড়া ও বারাকপুর হইতে জল প্রাপ্ত পরিষ্কার এমত হইলে কম সুবিধা হইবে না।

এক্ষণে আমরা খাঞ্জয়ালী সাহেবের মসজিদাদি প্রস্তুত বিষয়ে দুই, চারিটি কথা বলিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এইরূপ কিম্বদন্তী তিনি বাগেরহাট ও মসজিদকুড়ে তাঁহার কীর্ত্তিসংরক্ষণ মানসে বদ্ধপরিকর হইয়া অট্টালিকাদির সরঞ্জাম আনয়ন করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রাম হইতে নৌকাসংযোগে দ্রব্যাদি আনয়ন বিশেষ সুবিধাজনক স্থির করিয়া তথা হইতেই সমগ্র উপকরণাদি লইয়া আসিবার মানস করিলেন। খুলনা হইতে মধুমতী নদী হইয়া সুন্দর বনের মধ্য দিয়া সহজেই চট্টগ্রামে পৌছাইতে পারা যায়। এমত সুবিধা আর হইবার নহে; সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া খাঞ্জয়ালী সাহেব চট্টগ্রামের একটি ক্ষমতাশালী ফকিরের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। সেই ক্ষমতাশালী ফকির কিঞ্চিৎ উদ্ধতপ্রকৃতির ছিল। সে তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিতরূপ লিপি প্রেরণ করিলেন:—"এক রত্তি বাড়ানী তার চাটগাঁয়ে বরাৎ"।* ইহার অর্থ এই খাঞ্জয়ালি, তুমি একখণ্ড ক্ষুদ্র জমির অধিকারী হইয়া আমার ন্যায় ফকিরের নিকট হুকুমনামা প্রেরণ করিতে লজ্জাবোধ কর না! ইহা তোমার কম বেয়াদবী নহে। আমি তোমাকে বাড়ানী বা চাউল প্রস্তুতকারী বলিয়া মনে করি। তুমি এতাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়া আমার নিকট হুকুমনামা প্রেরণ করিয়া ভাল কার্য্য কর নাই।" এইরূপ প্রত্যুত্তর পাইয়া খাঞ্জয়ালী অতিমাত্র অপমানিত হইয়া যথাসময়ে ইহার প্রতিবিধান করা যাইবে বলিয়া অপর স্থান হইতে প্রস্তর ও অন্যান্য

* এক রত্তি—অতি অল্প; বাড়ানী—যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, ধান ভানিয়া যৎসামান্য পারিশ্রমিক চাউল প্রাপ্ত হয়, তদ্দারা দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন চলে। চাটগাঁয়ে—চট্টগ্রামে, বরাৎ—পাওনা দ্রব্য অপর লোক দ্বারা আনয়ন; এবং অদৃষ্ট।

আসবাব আনয়ন করিয়া মস্‌জিদাদি প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই ফকির তাঁহাকে একজন বড় জায়গীরদার বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং পরিশেষে তাঁহার যখন যে দ্রব্যের আবশ্যক হইত, সে তাহা প্রেরণ করিত। দীর্ঘিকার ঘাট, এখনও সুন্দরভাবে বিদ্যমান। মস্‌জিদ ও অপরাপর ইমারতাদি খিলানে প্রস্তুত। তাহাতে বীম ও বরগার আবশ্যক হয় নাই। এই প্রকার প্রকাণ্ড ইমারত, মস্‌জিদ ও কবর বীম বরগার সাহায্য না লইয়া কি প্রকারে যে দণ্ডায়মান হইয়া কতিপয় শতাব্দী থাকিতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয় বটে। সেই খিলনের কার্য্য আবার এমত সুন্দর যে, বহুদিন অতীত হইয়াছে তথাপি ইহার কোন প্রকার বিকৃতি লক্ষিত হয় নাই এবং ভূমিকম্পেও ইহার কোনস্থান ভগ্ন করিতে পারে নাই। ইহার গাথুনী বা নির্ম্মাণ-পারিপাট্য এতাদৃশ সুন্দর। লোক চলিয়া যায়; কিন্তু তাহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাই কালের নিয়ম।

শ্রীগণপতি রায়।

আকবর শাহের বন্ধুপ্রীতি।

উদারহৃদয় ও জনপ্রিয় মোগল সম্রাট্ আকবর শাহের অনেকগুলি বন্ধু ছিলেন। তন্মধ্যে বীরবল, ফৈজি ও আবুলফাজলই প্রধান। বীরবল বাদশাহের কার্য্যে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন। ফৈজির স্বাভাবিক মৃত্যুই ঘটিয়াছিল; কিন্তু আবুলফাজল সম্রাট্পুত্র সেলিমের ষড়যন্ত্রে তাঁহারই নিয়োজিত উচণ্ডার রাজা বীরসিংহের হস্তে বিদেশে নিহত হয়েন। একে একে বন্ধুত্রয়ের বিয়োগ-শোকে আকবর

কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন, ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা সে বিবরণ এস্থলে প্রদান করিলাম।

পেশয়ারের নিকটস্থ পর্ব্বতবাসী আফগানেরা অতিশয় কঠোর ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠায় তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট্ আকবর ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা বীরবল ও জৈন খাঁর অধিনায়কত্বে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই পর্ব্বতবাসীদিগের সহিত যুদ্ধেই জৈন খাঁর হঠকারিতায় বীরবর বীরবল অকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সংবাদে সম্রাট্ অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন এবং জৈন খাঁর হঠকারিতায় এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে অবগত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মুখদর্শনে বিরত ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবলের মৃতদেহ না পাওয়ায় লোকে গুজব রটাইয়াছিল যে, আফগানেরা তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। বন্ধুবৎসল আকবর এগুজবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বীরবলের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন। একজন দুষ্ট কৌশলী লোক এই সুযোগে বীরবল সাজিয়া সম্রাটের নিকট আসিতেছিল; কিন্তু এব্যক্তিও সম্রাটের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সম্রাট্ বীরবলকে এতই ভাল বাসিতেন যে, এই 'জাল বীরবলে'র মৃত্যু-সংবাদেও তিনি নূতন শোক পাইয়াছিলেন।*

* 'In the course of action for subduing Yusufies, Akbar's greatest personal friend Raja Birbal died owing to the rashness of Zein Khan, the general. Akbar refused to see Zein Khan, and was long inconsolable for the death of Birbal. As the Rajah's body was never found, a report gained currency that he was alive among the Prisoners and it was so much encourged by Akbar, that a long time afterwards an impostor appeared in his name. As this second Birbal died before he reached the court, Akbar was again mourning.

Elphinstone's History of India.

ফৈজি আকবরের সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। কথিত আছে—তিনি ব্রাহ্মণবেশে কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। আকবর ইঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে ৫ই অক্টোবর ফৈজি পরলোক গমন করেন। বদৌনি বলেন—যে কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ রব করিতে করিতে ফৈজি প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত দৌর্ব্বল্যবশতঃ বাক্‌রোধ হইয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়। পীড়িত হওয়ায় ফৈজি কয়েকদিন রাজসভায় আসিতে পারেন নাই। সম্রাট্ প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দ্বিপ্রহর রাত্রে ফৈজির অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠায় তাহার স্বজনবর্গ সম্রাট্‌কে সংবাদ প্রদান করেন। সম্রাট্ তখন দিবসের কর্ম্মক্লান্ত দেহ লইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুষুপ্তিসুখে মগ্ন ছিলেন; কিন্তু স্নেহের বন্ধুর পীড়াবৃদ্ধির অবস্থা জ্ঞাত হইয়া সে সুখ-শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজবৈভব সমভিব্যাহারে সামান্য লোকের ন্যায় পদব্রজে ফৈজির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফৈজির তখন মুমূর্ষু অবস্থা। বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া সম্রাট্ বালকের ন্যায় বিলাপ করিয়া একেবারে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া করুণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'সেখজি! আমি তোমার জন্য হেকিম লইয়া আসিয়াছি। তুমি কি আমার সহিত একটি কথাও বলিবে না?'—কিন্তু ফৈজির কথা বলিবার শক্তি ছিল না। উত্তরে তিনি শুধু সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিলেন। সম্রাট্ বন্ধুশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রাজমুকুট দূরে নিক্ষেপ করিয়া মাতার ন্যায় ভূমি লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।*

* Feizi died, 5th October, 1595, barking like a dog according to the austere Badauni—but really weak and speachless. Akbar saw him at mid-night supporting his friend he said gently—Sekhji I here is a doctor, will you ;not speak to me ?' One fancies

দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেলিমের নিয়োজিত উড়চার রাজা বীরসিংহের হস্তে আবুলফাজল নিহত হয়েন। সম্রাট্ এক দুই করিয়া দিন গণিতেছিলেন—আবুলফাজল আসিবেন; কিন্তু আবুলফাজল আসিলেন না। আগ্রায় তাহার মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছিল। আর সকলেই শুনিল—আকবর জানিলেন না। তাঁহাকে এ সংবাদ শুনায় কে? তৈমুরবংশের এই রীতি ছিল, রাজপুত্র প্রভৃতি কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার উকিল হাতে কালো রুমাল বাঁধিয়া সম্রাটের কাছে উপস্থিত হইতেন। আবুলফাজলের মৃত্যু-সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার উকিল হাতে কালো রুমাল বাঁধিয়া আকবরের সম্মুখে গেলেন। উকিলকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং তখনই দরবার ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শোকে আকবর এতদূর মুহ্যমান হইয়াছিলেন যে, সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেদিন রাত্রি তিনি কেবল কাঁদিয়াই কাটাইয়াছিলেন।*

শেষে যখন শুনিলেন। সেলিমই আবুলফাজলের মৃত্যুর কারণ—তখন গভীর মনোদুঃখে বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন—"সেলিমের যদি রাজ্য লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে আমার প্রাণ বিনষ্ট করিল না কেন? আবুলফাজল বাঁচিয়া থাকিলে আমি সুখী হইতাম।"

the faint look of the closing eyes, but no words escaped the lips. The Emperor throw his headdress on the ground and wept aloud.'

Keen's—The Turks in India.

* 'When the news of that dire calamity and dreadful event—the murder of Abul Fuzel—reached that shadow of god, the Emperor Akbar, he was extremely grieved, disconsolate, distressed and full of lamentaion. That day and night he neither shaved as usual nor took opium, but spent his time weeping and lamenting.'

'Wakayai—'Asad Beg'

ক্রমে আসল কথা প্রকাশ হইল—সেলিমের প্ররোচনায় উচণ্ডার রাজা বীরসিংহ আবুলফাজলকে হত্যা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সম্রাট্‌ পাত্রসিংহ ও রাজসিংহকে নিযুক্ত করিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বীরসিংহ প্রাণভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—তাঁহার—অদৃষ্ট—সুপ্রসন্ন, তাই কিছুদিন পরে আকবরের মৃত্যু হইল—আকবর বাঁচিয়া থাকিলে আবুলফাজলের হত্যাকারীর আর কিছুতেই নিস্তার ছিল না!

'খোসরোজের' প্রবর্ত্তক আকবরকে 'মহামতি' আখ্যায় অভিনন্দিত করিতে পারি না বটে; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তাঁহার গুণ কীর্ত্তনে কুণ্ঠিত হইব কেন? ইন্দ্রিয়পরায়ণ আকবর ইতিহাসপৃষ্ঠায় চিরদিনই মসীবর্ণে চিত্রিত থাকিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বন্ধুবৎসলতা যে আদর্শস্থানীয়, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না, একথা আমরা স্পর্দ্ধাসহকারে বলিতে পারি।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

মহাবীর সমরসিংহ।

প্রকৃতি দেবীর সুরম্য লীলা-নিকেতন আমাদের এই ভারতভূমি চিরকালই বীরপ্রসবিনী। এই হিমাদ্রিকৃতশেখরা সমুদ্র-মেখলা পুণ্যভূমিতে যে সকল বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করতঃ স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ রণক্ষেত্রে আপনাদিগের নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন; চিতোরের রাবল মহাবীর সমরসিংহ তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান।

সমরসিংহ সূর্য্যবংশীয় নরপতি অযোধ্যাপতি পুণ্যশ্লোক মহারাজ

রামচন্দ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার লব পঞ্চনদ প্রদেশে যাইয়া লবপুর (আধুনিক লাহোর) নামক নগর স্থাপন করতঃ তথায় বাস করেন। ইঁহারই বংশধর কনক সেন সৌরাষ্ট্র প্রদেশে যাইয়া তত্রত্য প্রমর রাজাদিগের রাজ্য জয় করতঃ উক্ত দেশ আপনার অধিকারভুক্ত করেন এবং তথায় বীরনগর নামক একটি নগর স্থাপন করেন। কনকসেনের অধস্তন চতুর্থপুরুষ বিজয়সেন রাজা হয়েন; তিনি বিজয়পুর, বিদর্ভ এবং বল্লভীপুর নামক নগরত্রয় স্থাপন করেন। এই বল্লভীপুরেই বিজয়সেনের রাজধানী ছিল। ৫১৪ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে শিলাদিত্য নামক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বল্লভীপুর রাজ্যের অবসান হয়; শিলাদিত্য এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার রাজ্ঞীগণও তাঁহার সহিত সহগমন করেন। কেবল একজন মাত্র রাজ্ঞী গর্ভবতী থাকায় তৎকালে পিত্রালয়ে ছিলেন। পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে তিনি এই দারুণ শোক-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎকালেই প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। তৎকালে লক্ষ্মণাবতী নাম্নী বীরনগরের জনৈক ব্রাহ্মণী রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারে ছিলেন; তাঁহারই অনুরোধে রাজ্ঞী পতির বংশরক্ষার্থ আপনার প্রসবকাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিতে সম্মত হইলেন এবং মলিয়া প্রান্তস্থিত কোন এক পাহাড়ে গমন করতঃ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল এবং ইহার নাম কেশবাদিত্য রাখা হইল। রাজ্ঞী বীরনগরের উক্ত ব্রাহ্মণীকে পুত্রের লালন পালনের ভার সমর্পণ করতঃ জ্বলন্ত চিতারোহণে স্বয়ং স্বামীর সহগামিনী হইলেন।

লক্ষ্মণাবতী কেশবাদিত্যকে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং শত্রুভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহাকে ইডোরের জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিলেন।

কেশবাদিত্যের রাজোচিত গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া পরিণামে ইডোরের ভীলরাজা আপনার কোন পুত্রাদি না থাকায় তাঁহাকেই আপন সিংহাসনের অধিকারী করেন। কেশবাদিত্যের বংশ তাঁহার অধস্তন ৮ম পুরুষ পর্য্যন্ত ইডোরে রাজত্ব করেন। ইডোরের চতুঃপার্শ্বস্থ ভীলগণ বিদেশী রাজার রাজত্বে অসন্তুষ্ট হয় এবং এই বংশের অন্তিম রাজা নাগাদিত্যকে হত্যা করতঃ পুনরায় তাহাদের রাজ্য হস্তগত করে। এই সময়ে (৭১৬ খৃষ্টাব্দে) নাগাদিত্যের তিন বৎসরবয়স্ক একটী পুত্র ছিল; ইহার নাম বাপ্পা। ইনিই পরিণামে বাপ্পা রাবল নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

নাগাদিত্যের মৃত্যুর পর রাজগুরু গোপনে বাপ্পাকে নাগেন্দ্র নামক স্থানে লইয়া যান। এই স্থানেই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। বাল্যকালে বাপ্পা তাঁহার মাতার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতুলালয় চিতোরে। এই কথা স্মরণ করিয়া একদিন তিনি নাগেন্দ্র পরিত্যাগ করতঃ চিতোরে গমন করেন। চিতোরের প্রমর রাজা তাঁহাকে জায়গীর প্রদান করিয়া আপনার সর্দ্দারশ্রেণীভুক্ত করেন। পরিণামে অন্যান্য সর্দ্দারগণের সহায়তায় তিনিই চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বাপ্পা রাওলের বংশে সুবিখ্যাত মহাবীর সমরসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। সমরসিংহ মেবারের ইতিহাসে একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি আর্য্যকুল-তিলক চৌহান বংশীয় রাজা দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি এবং অতিশয় বীরপুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের তিনি একজন প্রধান সহায় ছিলেন। যে সময় হইতে পৃথ্বীরাজ সংযোগ্যাতাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে তিনি এতদূর ভোগবিলাসে মগ্ন হইয়াছিলেন যে, রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করাত দূরে থাকুক, গৃহ হইতে বহির্গতও হইতেন না। তৎকালে ভারতের পশ্চিম দিক্স্থিত গজ্‌নি প্রদেশে সাহাবুদ্দীন ঘোরীর

ভ্রাতা রাজত্ব করিতেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজাদিগের মধ্যে কলহ-প্রসূত দুর্ব্বলতা দেখিয়া, সাহাবুদ্দীন আপনার স্বার্থসিদ্ধি-মানসে ভারত আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে দিল্লীর সামন্তগণ সংযোগ্যতার দ্বারা পৃথ্বীরাজের চৈতন্য উৎপাদন করাইলেন। সংযোগ্যতার গুরুত্বপূর্ণ বাক্যে পৃথ্বীরাজের মোহ অপনীত হইল। তিনি আপনার অধীনস্থ রাজন্যবর্গ ও আত্মীয় স্বজনদিগকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে চিতোররাজ রাবল সমরসিংহ আপনার সেনা সমভিব্যাহারে দিল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং যথাসময়ে যুদ্ধে যোগদান করিলেন। তৎকালে পৃথ্বীরাজের অজহলবাড়া প্রদেশের ভোলা ভীমসেনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করিবার আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু সমরসিংহ ভীমসেনের আত্মীয় হওয়াতে তিনি তথায় যাইতে পারিলেন না; স্বয়ং পৃথ্বীরাজকে তথায় গমন করিতে হইল। পৃথ্বীরাজের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যদি মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হয়, এজন্য তাহাদের গতিরোধের নিমিত্ত সমরসিংহকে রাখিয়া তিনি স্বয়ং অজলহলবাড়ায় গমন করিলেন। এদিকে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই সাহাবুদ্দীন ভারত আক্রমণ করিলেন। মহাবীর সমরসিংহ দিল্লীশ্বরের প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত অসাধারণ বীরত্বের সহিত মুসলমানের গতি-রোধ করিয়া রহিলেন। পৃথ্বীরাজ গুজরাট জয় করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমরসিংহের সহিত মিলিত হইলেন এবং সুবিখ্যাত পাণিপথ ক্ষেত্রে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইলেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে এইস্থানে সাহাবুদ্দীন সদলে পরাজিত ও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পলায়ন করিলেন; এই যুদ্ধে সমরসিংহের রাজপুত সৈন্যগণ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই সময়কার রাজপুতরমণীগণ মুসলমানের সহিত শত্রুতা করিবার জন্য আপনাদের পতিপুত্রকে উৎসাহিত করিতেন। ইঁহারা আপন আপন পুত্রদিগকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "বৎস, রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া

যেন আমার গর্ভ কলঙ্কিত করিও না; হয় বিজয়মাল্য পরিধান করিয়া সগর্ব্বে ফিরিয়া আসিও, নতুবা রণক্ষেত্রেই আপনার ছার জীবন বিসর্জ্জন দিও" কতবার এই বীরা রাজপুতরমণীগণ সশস্ত্র হইয়া স্বামীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের সময়েও এই রাজপুতরমণীগণ এমনই তেজস্বিনী ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী ভারতবর্ষের প্রতি তৎকালে অপ্রসন্ন ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজাদিগের মধ্যে এই সময় ঈর্ষা, দ্বেষ আদি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, অনবরত ঝগড়া বিবাদ বশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র ঐক্য ছিল না। এই গৃহবিবাদের ফলে তাঁহাদিগের যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিতেন না। তাঁহারা আপনাদের এই গৃহকলহের জন্য শত্রুর বলবৃদ্ধি হইবার যে সুযোগ প্রদান করিতেন, তাহারই ফলে একে একে ইঁহাদের সকলেরই অবসান হইল।

সাহাবুদ্দীন পরাজিত হইয়াও আপনার আকাঙ্খা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি পুনরায় বৃহতী সেনা সমাবেশ করিয়া আবার ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পৃথ্বীরাজও যথাসময়ে এ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু বিলাসিতা এবং প্রথম বারের বিজয়-গর্ব্ব বশতঃ তিনি ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। যখন তাঁহার নিকট সংবাদ আসিয়া পৌছিল যে, সাহাবুদ্দীন তাঁহার রাজ্যের অত্যন্ত সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল। কিন্তু হিন্দুরাজ্য বিধ্বংসকারী সাহাবুদ্দীনের আগমন-সংবাদেও অন্যান্য রাজাদিগের চৈতন্যোদয় হইল না। তাঁহারা দিল্লীর সাহায্য না করিয়া তাহার কি দশা হয়, তাহাই দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। মূর্খ রাজগণ একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে, আজ দিল্লীর যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, একে একে তাঁহাদিগকেও সেই বিপদে পড়িতে হইবে! সাহাবুদ্দীনের আগমনে যদিও পৃথ্বীরাজের বিলম্বে চৈতন্যোৎপাদন হইয়াছিল; তথাপি তিনি

সামলাইয়া লইয়া ত্বরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। তিনি আপনার সমুদয় সেনা একত্রিত করিয়া তাঁহার ভগিনীপতি সমরসিংহকে সত্বর তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মহাবীর সমরসিংহ আর্য্যধর্ম্মের রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার কল্যাণকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুসলমান এতদূর অগ্রসর হইয়াছে; তথাপি পৃথ্বীরাজ নিশ্চিন্ত আছেন বলিয়া সমরসিংহ তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার ভগিনীপতির সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানের সহিত যুদ্ধার্থ বিশেষভাবে প্রস্তুত হইলেন। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত করিবার এবং হিন্দুদিগকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশে প্রায় এক লক্ষ মুসলমান সাহাবুদ্দীনের পতাকাতলে সমবেত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। এই সময় ভারতের সমুদয় রাজন্য-বৃন্দের তাঁহাদের স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সর্ব্বনাশকারী গৃহবিবাদের ফলে তাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন না। যাহা হউক, তত্রাপি পৃথ্বীরাজের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। প্রায় তিনলক্ষ রাজপুত দিল্লীদুর্গের সম্মুখে সমবেত হইল। পৃথ্বীরাজ এই রণতৃষ্ণ সেনা লইয়া পাণিপথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সমরসিংহ তাঁহাকে বলি-লেন যে, অনর্থক নরহত্যা করা অপেক্ষা যদি সাহাবুদ্দীন কোন প্রকারে বিনাযুদ্ধেই চলিয়া যায়, তবে তাহাই হইতেছে সর্ব্বোত্তম। তাঁহার এই পরামর্শে পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দীনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "একবার প্রহার খাইয়া পলায়ন করিয়াছিলে, তাহার পর দুই বৎসরও হয় নাই, ইহারই মধ্যে আবার আপনার মৃত্যু আহ্বান করিতে আসিয়াছ। এইজন্য বলিতেছি যে, যদি এখনও তুমি ফিরিয়া যাও, তবে আমি তোমাকে বিনা বাধাতেই যাইতে দিতে প্রস্তুত আছি।

আর একান্তই যদি তোমার মরণকালই আসিয়া থাকে, তবে তাহাতেও আমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার সহিত এই নিরপরাধ সৈন্যদিগকে কেন ধ্বংস করিবে? এইজন্য বলিতেছি, এস, তুমি আর আমি দুইজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।" ইহার প্রত্যুত্তরে সাহাবুদ্দীন বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমি আমার ভ্রাতার আজ্ঞাধীন সর্দ্দারমাত্র; তাঁহার আজ্ঞানুসারেই আমি যুদ্ধার্থ আসিয়াছি। আপনার প্রস্তাব আমি সঙ্গত মনে করি; এজন্য এবিষয়ে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য অদ্যই তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলাম। অতএব তাঁহার আদেশ না আসা পর্য্যন্ত আপনি যুদ্ধ স্থগিত রাখুন।" ইহাতে সাহাবুদ্দীনের কূট অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। তাহার উপরোক্ত বাক্যে রাজপুতগণ মনে করিলেন যে, সে তাঁহাদিগের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, এইজন্য তাহার ভ্রাতাকে কোনরূপে বুঝাইয়া সুঝাইয়া সে বিনাযুদ্ধেই ফিরিয়া যাইবে। এইরূপ মনে করিয়া রাজপুতগণ মহাভ্রমে পতিত হইলেন। ইহার মধ্যে যে সাহাবুদ্দীনের কোন কূট অভিসন্ধি আছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। স্বয়ং বিশ্বাস-পাত্র হওয়ায় তাঁহারা আপনাদের শত্রুকেও তদ্রূপই মনে করিতেন; কিন্তু মুসলমান সাহাবুদ্দীন বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন না। এদিকে পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দীনের বাক্যে সম্প্রতি যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া অসাবধান ভাবেই রহিলেন। তাঁহার সৈন্যগণও গান তামাসা আনন্দ উৎসব প্রভৃতিতে মত্ত রহিল। তাঁহাদিগের এই অসাবধানতায় মুসলমানগণ আপনাদিগের কার্য্যসাধনে সমর্থ হইল। রাজপুতদিগকে অসাবধান দেখিয়া একদিন মুসলমানপক্ষীয় সেনা অকস্মাৎ তাঁহাদিগের উপর আপতিত হইল এবং রাজপুত সৈন্যগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের বহুসংখ্যককে নিহত করিয়া ফেলিল। কিন্তু রাজপুতগণ ইহাতেও কিছুমাত্র ভীত হইল না।

তাহারা সশস্ত্র হইয়া স্ব স্ব স্থানে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

যদিও দিল্লীশ্বরের অসাবধানতাবশতঃ তাঁহার বহুসৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় মুসলমানদিগের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার সৈন্যগণ মুসলমানদিগের পক্ষে আগত নূতন নূতন সৈন্য-সমূহকে অক্লান্তভাবে বিনষ্ট করিতে লাগিল। এই বিপদ দেখিয়া মুসলমানপক্ষ রাজপুতদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য পশ্চাদ্দিকে হটিয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাজপুতগণ মনে করিল যে, সাহাবুদ্দীনের সৈন্যদল তাহাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া যাতায়াত করিতেছে, এই মনে করিয়া বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া তাহারা রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই মহাসুযোগে ধূর্ত্ত সাহাবুদ্দীন আট সহস্র সৈন্যের সহিত আসিয়া দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে বন্দী করিলেন।

মুসলমান সেনাপতির এই কৌশলে পৃথ্বীরাজ দুর্ভাগ্যবশতঃ ধৃত এবং অবশেষে নিহত হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় গজনীতে লইয়া যাওয়া হয়, এবং তথায় অন্য প্রকারে তাঁহার প্রাণান্ত হয়।

এদিকে সমরসিংহের পুত্র কুমার কল্যাণ আপনার সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে রণক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছিলেন। এই মুষ্টিমেয় সৈন্যগণের পরাক্রম দেখিয়া মুসলমান পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীত, চকিত এবং স্তম্ভিত হইয়া গেল। কুমার এবং তাঁহার সৈন্যগণ অসাধারণ বীরত্বের সহিত বহুসংখ্যক অরাতি বিনাশ করিয়া অবশেষে রণক্ষেত্রে চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন।

আপনার পুত্রকে এইরূপে বীরগতি লাভ করিতে দেখিয়া সমরসিংহ কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কপটী মুসলমানদিগকে পূর্ণ প্রতিশোধ প্রদান করিবার জন্য মহাবেগে তাহা-

দিগের উপর আপতিত হইলেন। যেমন হেমন্তকালে কৃষকগণ মহোৎসাহে ধান্য কাটিতে থাকে, তেমনই তিনি অপ্রতিহত তেজে মুসলমানসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহাতে সাহাবুদ্দীনের সৈন্যগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল; তাহারা রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারই মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বীর সিসোদিয়াগণ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের রক্ষাকল্পে অসম সাহসে যুদ্ধ করিতেছিল। তিন লক্ষ সৈন্যের মধ্যে অধিকাংশই রণক্ষেত্রে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তথাপি একজনমাত্র সৈন্যও তাহার মাতৃনির্দেশ লঙ্ঘন করতঃ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল না। বীরবর সমরসিংহ মনে করিলেন যে, জয়লাভের তো আর কোনই সম্ভাবনা নাই; সুতরাং পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করতঃ আপনার পবিত্র-কুলে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবেন কেন? এই মনে করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে বীরগতি লাভ করিবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ত্রয়োদশ সহস্র সিসোদিয়ার মধ্যে পাঁচশত মাত্র এক্ষণে অবশিষ্ট ছিল। তাহারা সমরসিংহের বীরবাক্যে উত্তেজিত হইয়া কেসরিয়া বস্ত্র পরিধান করতঃ রণক্ষেত্রে বীরগতি লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই মুষ্টিমেয় সিসোদিয় বীরগণ বীরবর সমরসিংহের নেতৃত্বে ভীমবেগে অরাতি সৈন্যের উপর আপতিত হইল এবং অনন্যসাধারণ বীরত্ব সহকারে পঞ্চসহস্রেরও অধিক শত্রু বিনাশ করিয়া অবশেষে রণক্ষেত্রে চিরবিশ্রাম লাভ করিল। মহাত্মা সমরসিংহও ইহাদিগের সহিত বীরোচিত শয্যায় শয়ন করিলেন।

তিন দিবস পর্য্যন্তও অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং রণক্ষেত্রে ভূরিভূরি শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া মহাবীর সমরসিংহ অবশেষে এইরূপে প্রাণত্যাগ করিলেন। মুসলমানগণও তাঁহার বীরত্বের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। ধন্য সেই স্বদেশপ্রেমিক বীরগণ! শত্রুও যাঁহাদিগের প্রশংসা করে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে বীর?

বীরশ্রেষ্ঠ সমরসিংহের নিধনের পরে সাহাবুদ্দীন নিরুপদ্রপে আসিয়া ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দিল্লীনগরী অধিকার করিলেন। হিন্দুর সৌভাগ্যসূর্য্য সেই দিবস চিরতরে অস্তাচলে গমন করিল। সোণার ভারতের পুণ্যভূমি বিদেশীর পাদস্পর্শে কলঙ্কিত হইল—ভারতে হিন্দু রাজত্বের অবসান হইল।

পৃথ্বীরাজের সভার প্রধান কবি সুপ্রসিদ্ধ চন্দ লিখিয়াছেন যে, "রাবল সমরসিংহ বীর, শান্তস্বভাব এবং ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি অসাধারণ যুদ্ধকুশলতা, সুমন্ত্রণাদাতা এবং সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সমুদয় সর্দ্দারগণ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন; এমন কি স্বয়ং চৌহানরাজও ইঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। অশ্বারোহণে, ভল্লচালনে এবং ব্যূহ-রচনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। আমার পুস্তকে রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা সমরসিংহেরই প্রদত্ত শিক্ষার ফল।" কবিশ্রেষ্ঠ চন্দের এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, বীরবর রাবল সমরসিংহ একজন অতি অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাপুরুষ তৎকালে আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মহাবীরের তিরোধানে তৎকালীন ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আর কোন কালে পূর্ণ হইবার নহে। ইহারই অপরিহার্য্য ফল স্বরূপ দিল্লীতে হিন্দুরাজ্যের পতন ও যবনরাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই মহাপুরুষের স্মৃতি কোনকালে লুপ্ত হইবার নহে। অতীত সাক্ষী ইতিহাস তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তি-কাহিনী চিরকাল গৌরবের সহিত জগতে ঘোষণা করিবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার।
(রাজসাহী)।

ঔরংজীবের পত্রাবলী।

আমরা ঔরংজীবের কতিপয় পত্রাবলীর অনুবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। উক্ত পত্রাবলী তাঁহার পুত্র সাহ আলমের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা আরও কতিপয় পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিব। এই পত্রগুলি সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজাম সাহ বাহাদুরের উদ্দেশ্যে লিখিত।

প্রথম পত্র।

মহামহিমার্ণব পুত্র,

তুমি আমাকে যে ক্ষিপ্রগামী অশ্বটী প্রেরণ করিয়াছ, তাহা প্রাপ্ত হইয়া আমি অতীব আনন্দিত হইয়াছি। কারণ ইহার দ্বারা তোমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি তোমার ঐকান্তিকী ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ পাইতেছে। আর ইহাই স্মরণ করিয়া আমি অশ্বটীর নাম রাখিয়াছি "খুশ খারাম" (স্নেহ প্রদত্ত সামগ্রী) আমি জানি যে, তুমি উপযুক্ত নাম নির্দ্ধারণ বিশেষ পারদর্শী। সুতরাং আমি অতাবের কর্ত্তৃক রচিত একটী তালিকা তোমাকে পাঠাইতেছি। বলা বাহুল্য যে, ইহা আমার নানা বর্ণের ও নানা জাতীয় অশ্বের একটী ক্ষুদ্র তালিকা। তুমি প্রত্যেক অশ্বের নাম নির্দ্ধারণ করিয়া জানাইবে।

দ্বিতীয় পত্র।

তোমার প্রদত্ত আম্র ভক্ষণ করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছি। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নাম নির্দ্ধারণের পক্ষে তুমি আমা অপেক্ষা পারদর্শী; তবে তুমি কেন আবার আমাকে নাম নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়া অনর্থ বিরক্ত করিয়াছ; যাহা হউক আমি ইহাদিগকে নাম দিলাম "রসবিলাস।"

তৃতীয় পত্র।

তুমি যে খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলে, তাহা তোমার গৃহে আমি আহার করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইসলাম খাঁ একবার "কুবলি" প্রস্তুত করাইয়া আমাকে খাইতে দিয়াছিল; কিন্তু তোমার প্রদত্ত অন্নের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। আমরা তোমার সুলেমান নামক পাচকটীকে এখানে আনিতে বহুপূর্ব্বে মনস্থ করিয়াছি। এখন লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইতেছি যে, উক্ত পাচকটী এই সুন্দর খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়াছিল। যদি তোমার কষ্ট না হয়, তবে তাহাকে এইখানে পাঠাইয়া দিবে; নতুবা তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আমরা সোৎসুক ভাবে অবস্থান করিব। কারণ আমরা জানি যে, সেই দিন তোমার সহিত একত্র এই সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব।

চতুর্থ পত্র।

তোমার পুত্র বিদার বকৎ যে তোমার অনুরূপ আদর্শ অনুকরণ করিয়া উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্ররূপে পরিচিত হইতে পারিয়াছে, সে জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। দিন দিন তাহার সৌভাগ্যের উদয় হইবে। কিন্তু তোমার দ্বিতীয় পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিও না। জাটদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান যদি সাফল্য লাভ করে, তবে তোমার মহম্মদ বিদার বকৎকে মালব্যের শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত করা হইবে। আমি ইতোমধ্যে বিষণ সিংকে তাহার সহিত যাত্রা করিতে আদেশ দিয়াছি এবং আগরার দুর্গাধ্যক্ষের নিকট হইতে যুদ্ধ সরঞ্জম সংগ্রহ করার জন্য আমি পরোয়াণা পাঠাইয়া দিয়াছি এবং তোমার নিকট হইতে আদেশ লইয়া ইসলামাবাদ * অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য আমি তোমার পুত্রকে আদেশ করিয়াছি।

* হিন্দুদিগের প্রাচীন তীর্থ মথুরা নগরে। সম্রাট্ ঔরংজীব এই স্থান অধিকার করিয়া ইহাকে ইস্লামাবাদ নামে অভিহিত করেন।

পঞ্চম পত্র।

সম্রাট্ সাজাহান বলিতেন যে, যাহাদিগের কোন কাজ নাই, তাহারা শিকার করিয়া বেড়ায়। পর জগতের কার্য্যের উপর আমাদিগের কোন হাত নাই; কিন্তু ইহ জগতের কার্য্যাবলীত আমাদিগের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। "এই জগৎ একটী প্রকাণ্ড শস্যক্ষেত্র। ইহ জগতে আমরা যাহা রোপণ করি, পর জগতে তাহা কেবল কর্ত্তন করি মাত্র।" সম্রাট্ সাজাহান প্রভাতের চারি ঘটিকা (দণ্ড) পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া ও কোরাণের নিয়মিত অংশ আবৃত্তি করতঃ তিনি মৌলভিদিগের সহিত প্রভাতের উপাসনা সমাপন করিতেন। তারপর বাতায়ন-পথে তিনি প্রজামণ্ডলীকে দর্শন দিতেন। প্রভাত হইবার চারি দণ্ড পরে তিনি প্রকাশ্য দরবারে উপবেশন করিতেন। এই স্থানে সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত। তারপর প্রধান দেওয়ান ও মীর বকসী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের নাজিম্, আমীন ও করসংগ্রহকারিগণের আবেদন সম্রাট্-সমক্ষে নিবেদন করিত। ইহার পর তিনি তাঁহার অশ্ব ও হস্তিগণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং এক প্রহর পরে তিনি তাঁহার গুপ্ত (Private) কক্ষে প্রবেশ করিতেন। এই স্থানে সেনানায়কগণ অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যকলাপ নিবেদন করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিতেন। সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সমুদয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংঘটিত হইত, তাহাও তাঁহারা এই সময়ে নিবেদন করিতেন এবং সম্রাট্ "ফারমান" ও জাইগীর উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতেন। ইহাতে প্রায় দুই প্রহর অতীত হইত; তারপর সম্রাট আপনার পরিশ্রমলব্ধ অর্থে * প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতে গমন

* কথিত আছে যে, সম্রাট্ সাজাহান সহস্তে টুপি বুনিয়া বিক্রয় করিতেন এবং তাহাতেই যে অর্থ সংগৃহীত হইত, সেই অর্থ দ্বারা অতি সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

করিতেন। তিনি অত্যন্ত মিতাহারী ছিলেন এবং শরীর রক্ষার জন্য যে পরিমাণ অন্নের প্রয়োজন, তিনি কদাচ তাহার অধিক ভক্ষণ করিতেন না। ভোজনের পর তিনি স্বয়ং রাজানুগৃহীত ব্যক্তিগণের বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন। এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তিগণের মধ্যে পণ্ডিত, ছাত্র, দরিদ্র, বিদেশী, মাতৃপিতৃহীন বালক, দুঃস্থ ব্যক্তি ও নানা জাতীয় লোক ছিল। সম্রাট্ প্রায় সকলকে চিনিতেন। ইহার পর তিনি শয়ন করিতেন ও অল্প সময়ের জন্য নিদ্রা যাইতেন। চতুর্থ প্রহরে তিনি শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং হস্তমুখ প্রক্ষালন করতঃ প্রার্থনাগৃহে কোরাণ আবৃত্তি করিতেন। তারপর সম্রাট্ সহাস্যবদনে "আশাদ" নামক কক্ষে আসিয়া উপবেশন করিতেন। এই স্থানে প্রধান দেওয়ান রাজসংক্রান্ত বিষয়ের অবতারণা করিত এবং রাজস্বসংক্রান্ত আদেশ-পত্রে সম্রাটের দস্তখত গ্রহণ করিতেন। দিন শেষ হইবার চারি দণ্ড পূর্ব্বে তিনি প্রকাশ্য দরবারে যাইয়া উপবেশন করিতেন, এখানে প্রধান বকসী এবং দেওয়ান সম্রাট্-সমক্ষে জাইগীরের আবেদন-পত্র উপস্থিত করিতেন এবং তিনি যোগ্যতা অনুসারে জাইগীর এবং পারিতোষিক দান করিতেন। সন্ধ্যার পর সায়ংকালীন উপাসনা সমাপ্ত হইলে তিনি তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেন। এই স্থানে ঐতিহাসিকগণ, সুকণ্ঠ গায়ক ও পর্য্যাটকগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিত। পর্দ্দার ভিতর হইতে রমণীগণ এবং পুরুষগণ মহৎ চরিত্র ও প্রাচীন নৃপতিগণের বিষয় বর্ণনা করিত। এইরূপে বহুশতাব্দীর পূর্ব্বে যে সমুদয় অত্যাশ্চর্য্য বিষয়সমূহ সংঘটিত হইয়াছে, সম্রাট্ সেই সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিতেন।

তোমার প্রতি আমাদের স্নেহ অত্যন্ত অধিক জানিবে, সেই জন্যই তোমার পক্ষে কি মঙ্গলকর, তাহাই ইঙ্গিতে জানাইলাম।

বৈন্তবাটী যুবকসমিতি। শ্রীসত্যচরণ সর্ব্বাধিকারী।

অমার্জ্জনীয় অপরাধ। *

ওঁ

ইতিহাস—ইতিহাস, তাহা পুরাণ-কথা বা ভক্তিতত্ত্ব নহে। ঐতিহাসিক ও ভক্ত, উভয়েরই ক্ষেত্র বিভিন্ন; উদ্দেশ্যও বিভিন্ন। ঐতিহাসিকের ক্ষেত্র সসীম,. ভক্তের ক্ষেত্র অসীম; ঐতিহাসিক সান্তে, ভক্ত অনন্তে প্রধাবিত। ভক্ত ঐতিহাসিকের ক্ষুদ্র ক্ষেত্র পদদলিত ও অতিক্রম করিয়া, ঐতিহাসিকের অনধিগম্য ও অচিন্তনীয় স্বীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 'সূচিকায়ুধ' ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধ স্বক্ষেত্রের সীমান্তে উপস্থিত হইবামাত্র, প্রতিহত হইয়া প্রত্যাগত হন; তাঁহার সূক্ষ্ম সূচিকা ঐ সীমারেখায় স্পৃষ্ট হইয়া শতধা বিচূর্ণ হইয়া যায়; ঐ অভেদ্য সীমা-প্রাকারে পথ প্রস্তুত করা তাহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তাঁহার ক্ষীণ জ্যোতিঃ ক্ষুদ্র জ্ঞানবর্ত্তিকা এই স্থলেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়; ঐ সীমারেখার অতীত স্থল তাঁহার চক্ষে ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন অনন্ত শূন্য মাত্র; তাঁহার অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এ স্থলে সম্পূর্ণ পরাভূত। এস্থল কেবল ভক্তের চক্ষেই আলোকিত—অপূর্ব্ব শোভা-সম্পদ-সম্পন্ন। এস্থলে একমাত্র ভক্তেরই পূর্ণ অধিকার, এ দেশের প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত ইতিহাস কেবলমাত্র অসাধারণ শক্তিশালী ভক্ত ঐতিহাসিকই ধারণা ও বর্ণনা করিতে সক্ষম। "সূচিকাপাণি" শুষ্ক ঐতিহাসিক, যদি স্বীয় সুকৃত ও সৌভাগ্য বশতঃ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে দ্বিধা বোধ না করেন, তবে তাঁহাকে ভক্তের সেই অসাধারণ ক্ষেত্রের আলো-

* ৬ষ্ঠ পর্য্যায় ৫ম+৬ষ্ঠ সংখ্যা "ঐতিহাসিক চিত্রে", "ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ" নামক প্রবন্ধে, ৫ম পর্য্যায় পৌষের সংখ্যায় প্রকাশিত "বিদ্যারত্নের বেয়াদবী" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ পাঠ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

চনায়, ভক্তবর্ণিত বিষয়ই ধ্রুব সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইবে ; নতুবা সে ক্ষেত্রে তাঁহার মূকধর্ম্ম গ্রহণ করাই সর্ব্ববাদিসম্মত ও শ্রেয়স্কর।—এ সকল কথা বোধ হয়, কোনও অপক্ষপাতী অবিকৃতবুদ্ধি ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না।

গুপ্ত বিদ্যারত্নের "শঙ্করের মুণ্ডক ভাষ্য" নামক প্রবন্ধে তিনি স্বক্ষেত্রে স্বাধিকার মধ্যে থাকিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন, কেহই তাহার প্রতিবাদ বা তজ্জন্য তাঁহার উপর কোনও দোষারোপ করেন নাই ; কিন্তু তিনি অতি অহঙ্কারে ও বিদ্যা-মদে মত্ত হইয়া স্বীয় অতি লঘু অকিঞ্চিৎকর অনুমানবিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বসীমা অতিক্রম করতঃ "আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর" লইয়া অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাওয়াতেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, স্বভাবশীতল শিলাখণ্ড লৌহদণ্ডাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রসব করিয়াছে। সে জন্য অপরাধী কে ?

একই শালগ্রামশিলা পরিদর্শন করিয়া, অন্তর্মুখ ভক্ত ও বহির্মুখ অভক্ত, দিব্য শোভাময় অপূর্ব্ব বস্তু ও সামান্য শিলাপিণ্ড দর্শন করিলেন। ভক্ত যাহা দেখিলেন, তিনি তদ্রূপই বর্ণনা করিলেন ; অভক্তও স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, সেইরূপই ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তা'বলিয়া, অভক্ত কি বলিতে পারেন যে, ভক্ত যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা অসত্য ও স্বকপোলকল্পিত ? মাতৃঅঙ্কের মন্দভাগ্য জন্মান্ধ শিশু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন দেখিল বলিয়া, সে কি প্রচার করিতে পারে যে, বিধাতার এই বিচিত্র শোভা-সম্পদ-সম্পন্ন অনন্ত সৃষ্টি, সুগভীর তিমিরগর্ভে চিরমগ্ন ?

কোনও আত্মবন্ধুহীনা অবীরা বৃদ্ধা, তাহার অতি সাধের বস্তু, অতি যত্নে রোপিত ও বর্দ্ধিত একটি পুতিকালতা স্বগৃহে পরিত্যাগ করিয়া, লোকের উত্তেজনায় অনিচ্ছাসত্বে ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে ৺শ্রীক্ষেত্র গমন করিয়াছিল। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অবধি তাহার মনে কোন

সুখশান্তিই ছিল না; সে দিবারাত্র অনন্যমনা হইয়া কেবল তাহার সাধের পুতিকালতাটিই চিন্তা করিয়াছিল। যথাসময় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া, অন্যান্য দর্শকবৃন্দসহ ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সে কি দেখিল? দেখিল,—মন্দির মধ্যে আর কিছুই নাই, দেবও নাই, দেবীও নাই, আছে কেবল সমগ্র মন্দির ব্যাপিয়া প্রকাণ্ড এক "পুঁইমাচা!" হরিবোল হরি! এই কি এত সাধের ৺জগন্নাথ!—বৃদ্ধা হাসিয়াই অজ্ঞান। সে সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইল—"মন্দিরমধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল এক প্রকাণ্ড "পুঁইমাচা!" আ মরি মরি, কি সুন্দর গাছগুলি! কেমন পাতা ফেলিয়াছে—কেমন 'ডগ্‌' মেলিয়াছে! এমন সুন্দর গাছ তো কখনও দেখি নাই,—এর 'চড়্‌চড়ী' না জানি কত মিঠাই হবে!" বৃদ্ধা এই পর্য্যন্তই বলিতে পারে; তাহার জ্ঞানবুদ্ধি এই পর্য্যন্তই। কিন্তু, পবিত্রহৃদয় ভক্তবৃন্দ ৺জগন্নাথের যে অপূর্ব্ব শোভাময় সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিল, তাহার সে কি জানে? সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার, তাহার কি শক্তি, সৌভাগ্য বা অধিকার আছে?

আমাদের ঐতিহাসিক গুপ্ত বিদ্যারত্নও, ঐতিহাসিক ভাবে, শঙ্করের ভ্রমাদি সম্বন্ধে আলোচনা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অধিকার নিশ্চয়ই আছে এবং তাহার প্রতিবাদীও কেহ নহে। কিন্তু ভক্তের ভক্তি-সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের সহিত যে কি লীলা করিয়াছিলেন বা করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার তাঁহার (গুপ্ত বিদ্যারত্নের) কি সামর্থ্য বা অধিকার আছে? তাঁহার অচক্ষুর্বিষয়, অনধিগম্য, জ্ঞানাতীত, ধ্যানাতীত, ধারণাতীত, কল্পনাতীত ও স্বপ্নাতীত, চিরপবিত্র অত্যুন্নত ভক্তিরাজ্যের গূঢ়তম তত্ত্বের সত্যাসত্য বিচার করিতে, তিনি ('সূচিকায়ুধ' শুদ্ধ ঐতিহাসিক) কোন শক্তিও প্রমাণ প্রয়োগ করিতে সক্ষম? তিনি, শুদ্ধ

ঐতিহাসিকের চক্ষে, 'পুঁইমাচা মাত্র দর্শন করিয়া, তাঁহার করস্থিত 'সূক্ষ্ম সূচিকার' অগ্রভাগে পূতিকার পত্র গণনা, মূলান্বেষণ, রোপণের সময় রোপণকর্ত্তার নাম-ধাম-জাতি প্রভৃতি 'গূঢ়' তত্ত্বোদ্ঘাটন করিতে ও তদ্বিষয় বর্ণনা করিতেই অধিকারী ও সক্ষম। কিন্তু 'পুঁইমাচাই' সত্য এবং ৺জগন্নাথ মিথ্যা, এ কথা তিনি কোন্ সাহসে বা কোন্ জ্ঞানে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন? "শঙ্করের মুণ্ডক ভাষ্য" নামক প্রবন্ধে অতিবিজ্ঞ অধৈর্য্য লেখকের এই অসঙ্গত ও অসহ্য অনধিকারচর্চ্চাই অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ইতিহাস—ইতিহাস; তাহা পুরাণ-কথা বা ভক্তিতত্ত্ব না হউক; কিন্তু তাহা পুরাণ কথা বা ভক্তিতত্ত্বের অপলাপ-কারী হইলেই ধর্ম্মময় মহাভারতে মহাপ্রলয়! তাহা কোনমতে কাহারও বাঞ্ছনীয় বা শুভপ্রদও হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রবন্ধ বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে, সানুনয় নিবেদন, মান্যবর 'উকিল' মহাশয় যেন তাঁহার শ্রদ্ধেয় 'মক্কেল' মহাশয়কে তাঁহার প্রকৃত দোষটি 'সমঝাইয়া' দিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন। আমরা এ প্রকার অতি হেয় বাগ্‌বিতণ্ডা ও অযথা বিরোধের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের এ সকল করিতে নাই। কারণ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন চিন্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"*

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

* এ সম্বন্ধে আর আমরা কোনও বাদ-প্রতিবাদ করিব না।

চিত্রপরিচয়।

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর যে মহাপুরুষ কোন মন্ত্রবলে বহুধা বিভক্ত শিকজাতিকে সংহত করিয়া এক নূতন শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বীরকেশরী পঞ্জাব-রাজ রণজিৎ সিংহের প্রতিকৃতি ঐতিহাসিক চিত্রের বর্ত্তমান সংখ্যার পুরোভাগে প্রদত্ত হইল। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর ৫০ বৎসর পরে Sir Lepel Griffin, মহারাজের জীবনী বিবৃত করিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন—His name is still a house-hold word in the province : His portrait is still preserved in Castle and in Cottage—কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যাঁহাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে a born ruler বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যিনি বর্ত্তমান যুগে একজন প্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাহার প্রতিকৃতি অদ্যাপি কোন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। ঐতিহাসিক চিত্রের সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজের প্রতিকৃতি চিত্রে প্রকাশ করিয়া বহু দিনের একটী ক্ষুদ্র অভাব দূর করিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রতিকৃতি এখনও একান্ত দুষ্প্রাপ্য হয় নাই; এতদ্ব্যতীত সমসাময়িক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ নানা আলোচনারও (description) অভাব নাই। আমরা নিম্নে Baron Hugel প্রদত্ত বিবরণী হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

তিনি ক্ষুদ্রকায় ছিলেন; আকৃতিগত সৌন্দর্য্য তাঁহার আদৌ ছিল না। প্রত্যুতপক্ষে যদি অসামান্য মানসিক শক্তি দ্বারা তিনি আপনাকে লোকসমাজে সুপরিচিত না করিতে পারিতেন, তবে সাধারণকে আকৃষ্ট করিবার তাঁহার আর কোন উপায় ছিল না বলিতে হইবে। বসন্ত রোগে তাঁহার বাম চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহার মুখাকৃতি একান্তই বিকৃত হইয়া পড়ে।

কিন্তু ইহা আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি না। গাম্ভীর্য্য নির্ভীকতা ও প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জকতায় যে মানুষ আকৃষ্ট হয় না, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। হইতে পারে মহারাজ স্বভাব-সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্বেতদীর্ঘ শ্মশ্রু, চঞ্চল সূক্ষ্মদর্শী আয়ত নেত্র ও স্থির বা গম্ভীর প্রকৃতি অবলোকন করিয়া ব্যক্তিমাত্রেই আকৃষ্ট হইত। এ সম্বন্ধে নানা সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে। ১৮৩১ খৃঃ ফকীর আজিজ উদ্দীন ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা Lord William Bentickএর নিকট প্রেরিত হন। সে সময় একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বলিতে পারেন, মহারাজের কোন্ চক্ষু নাই?' উত্তরে—তিনি বলেন 'মহারাজের মুখে এরূপ এক দিব্য জ্যোতি বিদ্যমান যে, আমি তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিতেই পারি নাই।' লেফটেনাণ্ট বার্ণিসের উক্তি এই মতেরই সমর্থক। তিনি স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তের এক স্থলে লিখিয়াছেন "I never quitted the presence of a native of Asia with such impression as I left this man; ইহা পাঠ করিলেও মনে আনন্দের উদ্রেক হয়।

হয়ত কয়েকটী অবান্তর কথার অবতারণা করা হইয়াছে। এইবার আর একটী কথা চিত্র সম্বন্ধে বলিয়া পরিচয় শেষ করিব। যে চিত্রখানি চিত্রের পুরোভাগ সজ্জিত করিয়াছে, তাহা একখানি পুরাতন চিত্রের অনুলিপি। original চিত্রটী জীবনরাম নামক জনৈক চিত্রকরের তুলিকা-সম্পাতে চিত্রিত হয়। জীবনরাম দিল্লী নগরীতে অবস্থান করিতেন। ১৮৩১ খৃঃ যখন Lord William Bentick মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পঞ্জাবে গমন করেন, তখন শতদ্রু নদীর তীরে রূপার নগরে একটি প্রকাশ্য দরবারের আয়োজন হয়। সেই সময় জীবন সিং গভর্ণর সাহেবের সহিত দরবারকক্ষে প্রবেশ করিয়া

স্বহস্তে মহারাজের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন; সুতরাং এই চিত্রটীর একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষাল
বৈদ্যবাটী যুবকসমিতি

জবচার্ণক।

"Go ye, who inherit this heritage wide,
By deeds of two centuries bravely won,
Go seek the old record how Job Charnock died,
Seek the grave where he lies with his wife side by side,
T' is the churchyard round the church of St. John"
("Specimens of Ballad Poetry, applied to the Tales and Traditions of the East". 1862 by H Prinsep.

প্রথম প্রস্তাব পাটনা।

স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য যে কয়েকজন ইংরাজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে, জব চার্ণকও যে উহাদের মধ্যে একজন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী, বিদ্যা, শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান "রাজপ্রাসাদ নগরী" কলিকাতা এই জবচার্ণকই স্থাপনা করিয়াছেন। সে বহুদিনের কথা। আজ আমরা সেই পুরাতন কথার কথঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাইব।

জবচার্ণকের বাল্যকালের কোন কথাই জানা যায় না এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই। ইংলণ্ডের কোন্ প্রদেশে বা কোন্ গ্রামে, কোন্ সময়ে বা কোন্ বংশে জব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এইমাত্র জানা যায় যে ১৬৫৫ অথবা ১৬৫৬—অর্থাৎ আড়াই শত বৎসরেরও পূর্ব্বে খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর অধীনে পাঁচ বৎসরের

সর্ত্তে মাসিক কুড়ি পাউণ্ড বা ৩০০ শত টাকা বেতনে জব চার্ণক ভারত-বর্ষে আগমন করেন। তাঁহার প্রথম চাকুরী-স্থল পাটনা (১)। ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের হুগলির কুঠীয়ালকে যে পত্র লিখেন, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে. ডিরেক্টরগণ, হুগলির অধীনে বালেশ্বর, কাশিমবাজার ও পাটনার তিনটি ক্ষুদ্র কুঠী স্থাপনার আদেশ দেন। (২) এই বন্দোবস্ত অনুসারেই জবচার্ণক কাশিম বাজার কুঠীর কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হন।

যতদূর জানা যায়, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে ১৬৫৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বে কাশিমবাজার কুঠীর বন্দোবস্ত হয় নাই এবং সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, চার্ণক বালেশ্বর ও রাজমহল হইয়া পাটনায় পৌছেন। এই পাটনায়ই চার্ণক তাঁহার ভারতীয় জীবনের অন্ততঃ প্রথম পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেন।

(১) ডিরেক্টরসভা চার্ণককে কাশীমবাজারে নিযুক্ত করেন। ২নং টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কাশীমবাজারে কুঠী স্থাপিত হয় নাই। সেইজন্য চার্ণককে যাইতে হয়। সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সময়ে পাটনায় কুঠী স্থাপিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সম্ভবতঃ ১৬২০ সনে পাটনায় কুঠী স্থাপনার চেষ্টা করা হয়।

(২) ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টর সভা তাঁহাদের হুগলির এজেণ্টকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন—

"Since dispeede of our prementioned of 31 st. December, we have proceeded and made some good progresses as to settling of our several ffactories in all partes of India and have concluded to reduce all ffactories both to the north wards and south wards. Persia and the Bay, to be Subordinate into our presidencie which we shall settle in suratt. We have likewise resolved to establish four agencies Viz one at Fort St. George, one in Bantam, a third in Persia and the other at Hughli, which last place being your Residence, it most necessarilie requires your knowledge of what we have determined in relation there unto, which as followeth Viz.

ইহার পর হুগলি, ও বালেশ্বরের কুঠীর নিযুক্ত সাহেবদের নাম; পরে "At Cassim-bazar. John Renu, chief at £ 40; Daniel sheldon, 2nd at £ 30; John Priddy, 3rd at £ 30; Job charnock, 4th, at £ 20.

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে চার্ণক বিলাতের ডিরেক্টরগণকে অবগত করেন যে, যদি তাঁহাকে পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত না করা হয়, তবে তিনি কোম্পানীর চাকুরী ইস্তাফা দিবেন। এই আবেদনের ফলে চার্ণক পাটনার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। চার্ণকের কর্ত্তৃত্বে পাটনায় কোম্পানীর কার্য্য সুচারুরূপেই সম্পাদিত হইত। ডিরেক্টরগণ অনবরত পাটনা হইতে সোরা পাঠাইবার জন্য তাগিদ দিতেন এবং অল্পমূল্যে পাটনা হইতে সোরা পাঠাইবার ফলে মছলিপট্টম হইতে সোরা প্রেরণ স্থগিত করা হয়। ডিরেক্টরগণ তাঁহার কার্য্যে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া ১৬৭১ সনে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময় হইতে ১৬৭৫ সন পর্য্যন্ত চার্ণকের বেতন মাসিক ৬০০ শত টাকা ধার্য্য হয়। শেষোক্ত বৎসর হইতে চার্ণক বেতন ব্যতীত ৩০০ শত টাকা করিয়া পারিতোষিক পাইবার জন্যও ডিরেক্টরগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

কেবল যে পাটনার কার্য্য লইয়াই চার্ণককে নিযুক্ত থাকিতে হইত, তাহা নহে। পাটনার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চার্ণককে দিল্লীর খবর লইতে হইত। ডিরেক্টরগণ ১৬৭৬ সনের ১৫ই ডিসেম্বর চার্ণককে দিল্লীপ্রেরণের আদেশ দেন। নানাকারণে চার্ণকের দিল্লী যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। বিশেষতঃ চার্ণকের মতে অর্থব্যয়ে দিল্লী হইতে সনন্দ আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না (১)।

কিছুদিন পরে জব চার্ণক পাটনা হইতে কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ-

(১) The King's hookim is as small value as an ordinary Governors (জবচার্ণকের ৬ই জুলাইয়ের পত্র, ১৬৭৮). "In our opinion the Summa of money demanded is very large considering all circumstances. Had it been another king, as shajehon, whose phermaund and Kasbullhookims were of such great force and finding that none dare to offer to make the least exception against any of them, it might have seemed somewhat reasonable; but this with king Oramshand it is the contrary none of which in the least feare with the people, all his Governours making small account thereof" জবচার্ণকের ১৮ই জুলাইয়ের পত্র। vide Hedge's Diary vol II.)

পদে নিযুক্ত হইবার আদেশপ্রাপ্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌন্সিলের দ্বিতীয় সভ্যও নিযুক্ত হন। নবেম্বর মাসে পাটনা হইতে সোরা প্রেরণ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব, চার্ণক কাশিমবাজারে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু চার্ণকের পাটনা পরিত্যাগের ইচ্ছা ছিল না। নানা আপত্তি তুলিয়া তিনি দেরি করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য ষ্ট্রিনসাম কুপিত হইয়া চার্ণককে অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করেন এবং কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষের পদ হইতে পদচ্যুত হইবার আদেশ ও হুগলিতে দ্বিতীয় সহকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। ডিরেক্টরগণ এই আদেশে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের মতে, তাঁহাদের যে কর্ম্মচারী ২০ বৎসর ধরিয়া বিশ্বস্তরূপে তাঁহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার ষ্ট্রিনসামের কিছুতেই সমীচীন হয় নাই। (১) তাঁহারা যখন চার্ণককে কাশিমবাজারের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সে আদেশ প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক। এই আদেশের বলে চার্ণক কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন।

চার্ণক পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। পরম্পরা প্রকাশ চার্ণক পাটনায় এক হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পাটনা পরিত্যাগের পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণনার পূর্ব্বে আমরা চার্ণকের হিন্দু রমণী গ্রহণের প্রসঙ্গ বিচার করিব।

প্রবাদ এইরূপ যে, ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে চার্ণক গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালীন এক সতীদাহের দৃশ্য দেখিতে পান। 'সতী' সুন্দরী যুবতী; অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায়, সমাজচ্যুতা হইবার আশঙ্কায় মৃত স্বামীর সহিত সহমরণে প্রস্তুতা হইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলে, চার্ণক

(১) "He had served them faithfully for 20 years and had never been a prowber for himself. He had stayed on at Patna to despatch this saltpetre simply out of a sense of duty and care for this servisce. Besides they had given clean orders that he was to be chief at Cassimbazar and so it should be" (ডিরেক্টর সভার পত্র vide wilson).

সতীকে রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। সতী পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী মাত্র; বৃদ্ধ স্বামীর সহগমনে উদ্যতা হইলে সতী-সৌন্দর্য্য-লুব্ধ চার্ণক তাঁহার প্রহরিগণকে সতীর উদ্ধারের আদেশ দেন। ফলে প্রহরিগণ কালের করাল কবল হইতে সতীকে রক্ষা করিয়া চার্ণকের হস্তে সমর্পণ করে। চার্ণক যুবতীকে লইয়া গৃহে গমন করেন এবং ঐ যুবতীর গর্ভে চার্ণকের সন্তানসন্ততি হয়, তন্মধ্যে তিন কন্যার তিন ইংরাজের সহিত বিবাহ হয়। প্রথমা মেরি, চার্ল্‌স্ আয়ারকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া কন্যা এলিজাবেথ কলিকাতার জনৈক বণিক উইলিয়াম বোব্রিজের সহিত বিবাহিতা হন এবং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিতা থাকেন এবং তৃতীয়া ক্যাথেরিন কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য জেনোথন হোয়াইটকে বিবাহ করেন। প্রচার এইরূপ যে, চার্ণকের হিন্দুপত্নী পঁচিশ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিলে, তাঁহাকে সেণ্ট জন চার্চ্চ ইয়ার্ডে গোর দেওয়া হয়। চার্ণক অত্যন্ত পত্নীবৎসল ছিলেন এবং স্ত্রীকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা দূরে থাকুক, স্ত্রীর পরামর্শে নিজেই পৌত্তলিক হইয়াছিলেন। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং তাহার গোর-স্থানে বাৎসরিক একটী করিয়া মোরগ উৎসর্গ করিতেন।

এই প্রবাদের মূল দুই ইংরেজের বর্ণনা। গবর্ণর হেজেস তাঁহার পুস্তকে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে লিখিয়াছেন যে (১) হুগলী ও কাশীমবাজারের শাসনকর্ত্তা বুলচাঁদ ঐ তারিখে হেজেসের

(১) পৃষ্ঠা "1682. Dec. This morning a Gentoo sent by Bulchand, Governor or Hughly and Cassimbazar made a(complaint to me that Mr. Charnock did shamefully, to ye great scandull of our Nation, keep a Gentoo woman of his kindred, which he had done these 19 years. I was further informed by this and devers other persons that when Mr. Charnock lived at Pattana upon (complaint made to ye Nabab that he kept a Gentoo's wife (her husband being still livning, or but lately dead) who was run away from her husband and stollen all his money and Jewels to a great Value, the said Nabab sent 12 Soldier to seize Charnock (Hedge's Diary).

নিকট একজন হিন্দু প্রেরণ করেন। প্রেরিত হিন্দু হেজেসকে নিবেদন করে যে, চার্ণক ১৯ বৎসর ধরিয়া এক হিন্দু স্ত্রীলোককে নিজ সঙ্গে রাখিয়াছেন এবং এই স্ত্রীলোকের স্বামী অদ্যাপি জীবিত আছে। হেজেস লিখিয়াছেন যে এই হিন্দু ও অন্যান্য হিন্দুর নিকট তিনি অবগত হইয়াছেন যে, চার্ণক যখন পাটনায় থাকিতেন, তখন একজন হিন্দু স্ত্রীলোক স্বামীর অর্থ ও অলঙ্কারাদি সহ তাহার স্বামীর আবাস ত্যাগ করিয়া চার্ণকের আশ্রয় গ্রহণ করে।

অন্য একজন ইংরাজ আলেকজান্দার হ্যামিল্টন (১) বলিয়াছেন যে মোগলদিগের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে চার্ণক সহমরণে গমনে উদ্যতা এক হিন্দু সতীকে উদ্ধার করেন এবং তাহার সহিত একত্র বাস করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান-সন্ততি জন্মে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার গোরস্থানে বাৎসরিক একটা মোরগ উৎসর্গ করেন।

এই দুই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই এই পর্য্যন্ত যে কেহই চার্ণকের কথা লিখিয়াছেন, তিনিই চার্ণকের হিন্দু স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কয়েকজন গ্রন্থকারের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) ১৮৫১ সনে যে "Bengal obituary" প্রকাশিত হয়, তাহাতে গ্রন্থকার জবচার্ণকের হিন্দু স্ত্রীর কথা বলিয়াছেন। হ্যামিল্টনের বর্ণনায়

(১) Before the Mogul war, Mr. Charnock went one time with his ordinary gard of soldiers to see a young widow act that tragical catastrophe, but he was so smitten with the Widow's beauty, that he sent his guards to take her by force from her Executioners and conducted her to his own Lodgings. They lived loringly many years and had several children, at length she died, after he had settled in Calcutta, but instead of converting her to christianity she made him a Proselyte to Paganism and the only part of christianity that was remarkable in him was was burring her decently and he built a Tomb over her, where all his life after her death, he kept the anniversary Day of her death hy sacrificing

উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থকার চার্ণকের সতী উদ্ধার, মোরগ উৎসর্গ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহাকে চার্ণক মৌসলিয়ামে কবর দেওয়া হয়।

(২) রেণী সাহেব তাঁহার ১৮৭৬ সনে প্রকাশিত কলিকাতার বিবরণীতে (Historical and Topographical Sketch of Calcutta) সতী উদ্ধারের কথা বলিয়াছেন এবং এই সতীর যে St. John's Church-yard এ গোর হয়, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। (১) রেণী এ বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন।

(৩) কেরী সাহেব "Good Old days of Honorable John Company" নামক পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইহা সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত কটন সাহেব প্রণীত "Calcutta: old and new" নামক গ্রন্থে কটন সাহেব এই ঘটনার উল্লেখ কালে বলিয়াছেন যে, কলিকাতাবাসী সকলেই চার্ণকের সময় হইতেই এই ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বৃত্তান্তের মূলই হইতেছেন দুইজন ইংরাজ—হেজেস ও হ্যামিল্টন। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা এই বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। প্রথমতঃ হেজেস ও হ্যামিল্টন কেহই চার্ণককে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। (হেজেসের সহিত চার্ণকের বিবাদ-প্রসঙ্গ আমরা এই প্রবন্ধেই আলোচনা করিব।)

a Cock on her tomb after the Pagan manner; this was and in the common report and I have been creditly informed, both by christians and Pagans who lived at Calcutta under his Agency, that the story was really matter of fact". (Hamilton's Journal)

(১) "She bore to him several children and dying shortly after the foundation of his new city, was entered at the Mausoleum, which to this day stands entire and is the oldest piece of masonery in Calcutta" (Bengal obituary. Page 2).

হ্যামিণ্টন সতীর ঘটনা উল্লেখ করিয়া চার্ণককে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে চান; কিন্তু হেজেস বলেন যে, পাটনায় চার্ণক এক পলায়িতা হিন্দুস্ত্রীলোকের সহিত থাকিতেন এবং ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী হেজেসের মতে জীবিত বা অল্পকাল পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। হেজেসে ও হ্যামিণ্টনে এই গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়। সার হেনরি ইউল বলেন যে, প্রথমতঃ চার্ণকের পক্ষে সহমরণে উদ্যতা হিন্দু স্ত্রীর উদ্ধার-সাধন দুঃসাধ্য ব্যাপার; কেননা, তাহা হইলে চার্ণক অবশ্যই যথেষ্ট শাস্তি পাইতেন। দ্বিতীয়তঃ, চার্ণকের খ্রীষ্টান হইয়া মোরগ উৎসর্গ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এতদুত্তরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঔরংজেবের সময়ে পাটনার ন্যায় মুসলমানবহুল নগরে "হিন্দু স্ত্রী উদ্ধার" কিছু গুরুতর বিষয় ছিল না এবং মোরগ উৎসর্গও কিছু অসম্ভবপর নহে।

কিন্তু হেজেসের ও হ্যামিণ্টনের বিবরণের প্রভেদ যথেষ্ট। "Bengal obituaryতে জব-চার্ণকের হিন্দু স্ত্রীর গোরের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ কবরখানা (যাহাতে জব-চার্ণকের হিন্দুপত্নীর গোর হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়) চার্ণকের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে প্রস্তুত হয়। সুতরাং চার্ণকের জীবিতকালে চার্ণকপত্নীর ঐ কবরখানায় কবর হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। পরলোকগত ডাক্তার উইলসন এ বিষয়ে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমান কলিকাতা ঐতিহাসিক-সমিতির মুখপাত্র "Bengal Past and Present"র সম্পাদক ফার্ম্মেঞ্জার সাহেবও এই সতী উদ্ধার ব্যাপার বিশ্বাস করেন নাই। (১)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার,

(১) "This story should be taken with large grains of salt. (C. R. wilson) "To the Patna period of Job Charnock's life must belong the —if indeed to belongs to Charnock's life at all—the story of mingled heroism and same reported of him, after his death by a bitter enemy—Alexander Hamilton" (Bengal Past & Present Vol I p 199)

বাঙ্গ

Printed by K. V. Seyne & Bros

ঐতিহাসিক চিত্র।

জব চার্ণক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

কাশীমবাজার ও হুগলি।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে যে হেজেসের উল্লেখ করিয়াছি, সেই হেজেসই ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। হেজেসের সহিত চার্ণক বা কৌন্সিলের অন্য কোন সদস্যেরই বনিবনাও হয় নাই। হেজেস বনিবনার জন্য চেষ্টাও করেন নাই। বঙ্গদেশে পৌঁছিয়া কোথায় অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন, তা না তিনি সকলের সহিত বিবাদে বদ্ধপরিকর হইলেন। চার্ণক তখন কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ও কৌন্সিলের দ্বিতীয় সভ্য। চার্ণক প্রায় পঁচিশ বৎসর কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিয়া পরিপক হইয়াছেন; সুতরাং হেজেসের ন্যায় নবাগত ব্যক্তির চার্ণকের পরামর্শানুসারেই কার্য্য করা উচিত ছিল। অন্যান্য সকলের সহিত পরামর্শ করা দূরে থাকুক, তিনি অন্যান্য সকলকেই অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। চার্ণক কুক্রিয়াসক্ত, চার্ণক হিন্দুর স্ত্রী অপহরণ করিয়া নিজ অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন, এই সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি চার্ণককে আদৌ দেখিতে পারিতেন না এবং সকল

কর্ম্মচারীকে নিজ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত করিতেও বিমুখ হইলেন না।

যতদূর অবগত হওয়া যায়, হেজেস সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেজেস জানিতেন যে, কোম্পানীর সকল কর্ম্মচারীই নিজ নিজ অর্থবৃদ্ধির জন্য গোপনে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে কোম্পানীর অবশ্যই কিছু কিছু ক্ষতি হইত। কিন্তু এই গোপন বাণিজ্য প্রতিরোধের জন্য তিনি এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন যে, অত্যল্প কালমধ্যে বঙ্গদেশে সকল ইংরাজই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। চার্ণক অনন্তরাম (১) নামক এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির সাহায্যে নিজ ব্যবসা চালাইতেন। সেজন্য হেজেস চার্ণককে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। হেজেস সাহস করিয়া চার্ণকের বিরুদ্ধে ডিরেক্টরগণকে জানাইতে ভরসা পান নাই; কিন্তু তাঁহার দৈনিক লিপির প্রত্যেক পৃষ্ঠায়ই চার্ণকের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। (২) চার্ণকও পদে পদে হেজেসের কার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন।

এই অন্তর্ব্বিদ্রোহের ফলে বাংলায় ইংরাজবাণিজ্যের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। কেহই কাহারও আদেশ প্রতিপালন করিত না। কোন কুঠীরই অধ্যক্ষ হেজেসকে সম্মান করিতেন না। চার্ণক প্রকাশ্যরূপে হেজেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন এবং কোন গবর্ণরই এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত এরূপ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে পারেন নাই, এইরূপ

(১) অনন্তরাম কোম্পানীর দালাল ছিলেন, রঘুপোদ্দার নামক কোম্পানীর খাজাঞ্চী তহবিল তছরুপাত করিবার জন্য রঘুকে অনন্তরামের নিকট রাখা হয়। অনন্তরামের নির্য্যাতনে রঘুর প্রাণত্যাগ ঘটে। মোগল শাসনকর্ত্তাকে ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দানে এই ব্যাপার শান্ত হয়।

(২) "Page after page of his diary is filled with secret complaint and innuendos but he never ventures to bring any formal accusation against them" (Wilson)

অহঙ্কার করিতে লাগিলেন। ফলেও তাহাই দাঁড়াইল। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখে হেজেস কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

মোগলের সহিত ইংরাজের এই সময়ে আদৌ বনিবনা ছিল না। নানা কারণে এই মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। বিহারের শাসনকর্ত্তা পাটনার কুঠীর কয়েকজন সাহেবকে বিনাপরাধে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে হুগলির অধ্যক্ষ গঙ্গাতীরে দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু নবাব সায়েস্তা খাঁ সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। অধিকন্তু, ইংরাজ কোম্পানী বাৎসরিক যে তিন সহস্র মুদ্রা শুল্করূপে রাজকোষে প্রদান করিতেছিলেন, তাহা ব্যতীত আমদানী দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা ৩।।০ টাকা অতিরিক্ত শুল্ক চাহিয়া বসিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ সম্রাটের ফার্ম্মানের দোহাই দিলেন; কিন্তু সায়েস্তা খাঁ তাহা আমলে আনিলেন না।

এই সকল কারণে হেজেস পদচ্যুত হইবার পূর্ব্বেই ডিরেক্টরগণকে লিখিয়াছিলেন যে, মোগলের সহিত যুদ্ধঘোষণাই সমীচীন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুবিধামত স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণও একান্ত কর্ত্তব্য। চার্ণক ও অন্যান্য সকলেই এই যুক্তির অনুমোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু ডিরেক্টরগণ প্রথমতঃ এপ্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে সকলই পণ্ড হইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় তাঁহারা সম্মতিপ্রদানে ইতঃস্তত: করিতেছিলেন। কিন্তু বিনা যুদ্ধেও বাণিজ্য নষ্ট হইতে চলিল। ঢাকার নবাব বিনাপরাধে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে শাস্তি দিতে লাগিলেন। চার্ণকের সহিত দেশীয় বণিকগণের বিবাদ হওয়াতে নবাব চার্ণক ও তাঁহার সহকারিগণকে ৪৩০০০ হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। জরিমানা না দেওয়াতে নবাব চার্ণককে ঢাকায় যাইবার জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। চার্ণক অবশ্যই অস্বীকার করিলেন। ইহাতে সায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত কুপিত

হইয়া যাহাতে চার্ণক গোপনে কাশীমবাজার পরিত্যাগ না করিতে পারেন, তজ্জন্য সিঙ্গীস্থ কুঠীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিবার আদেশ দিলেন।

এই সকল সংবাদে ডিরেক্টরগণ যুদ্ধঘোষণাই সমীচীন বোধ করিলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের শাসনকর্ত্তাকে ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে ফার্ম্মাণ গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ ইংরাজকে অধিকারের অনুমতি, হিজলীতে দুর্গনির্ম্মাণ এবং ভবিষ্যতে নবাব বা তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবর্গ যাহাতে ইংরাজের উপর অত্যাচার না করিতে পারে, তাহার আদেশপ্রদানের বন্দোবস্ত করিতেও গবর্ণর আদিষ্ট হইলেন।

ডিরেক্টরগণ আদেশ প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য প্রেরণেরও ব্যবস্থা করিলেন। সম্রাট যে এরূপ অন্যায্য প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না, ইহা ডিরেক্টরগণ সবিশেষ অবগত ছিলেন; সুতরাং ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেমসের নিকটে প্রতিশোধ কামনায় অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঔরংজীব ও সায়েস্তা খাঁকে শিক্ষা দিবার জন্য নিকলসনের অধীনে দশখানি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করিলেন। প্রত্যেক জাহাজে ১০।১২টী করিয়া কামান ও মোট ছয়শত সৈন্যও এই জাহাজে রওয়ানা হইল। মক্কাগামী মোগল জাহাজও সুবিধা বুঝিয়া মোগলের জাহাজলুণ্ঠনে ইংরাজ জাহাজের অধ্যক্ষগণ আদেশপ্রাপ্ত হইলেন।

ডিরেক্টরগণ নিকলসনকে মান্দ্রাজে পৌঁছিলে আরও চারি শত সৈন্য সহ বালেশ্বর পৌঁছিতে আদেশ দিলেন। তথা হইতে চট্টগ্রাম যাইয়া ঐ বন্দর অধিকার করিয়া সুরক্ষিত করিয়া এবং যাহাতে কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আরাকানরাজের সহিত মিত্রতা করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। নিকলসনকে ডিরেক্টরগণ টাকশাল নির্ম্মাণ, রাজস্ব সংগ্রহ প্রভৃতিরও আদেশ দিলেন। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া ইংরাজের প্রত্যেক সৈন্য ঢাকা অভিমুখে প্রেরণ করিয়া ঢাকা অধিকার করিয়া

মোগলের সহিত সন্ধি করিতে হইবে। ডিরেক্টরগণ সন্ধির সর্ত্তও স্থির করিয়া দিতে ক্রুটী করেন নাই। ইংরাজের প্রস্তুত টাকা বাংলার সর্ব্বত্র চলিত হইবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাট-দত্ত ফার্ম্মাণানুযায়ী সর্ত্তে ইংরাজগণ বাণিজ্য করিবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের ক্ষতিপূরণ করিবে। জব চার্ণক বাংলার গবর্ণর হইবেন, ইহাও তাঁহারা স্থিরীকৃত করিলেন।

ইতোমধ্যে চার্ণক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবাবী সৈন্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া কাশীমবাজার হইতে পলায়ন করিয়া হুগলি পৌঁছিলেন। চার্ণক হুগলি পৌঁছিয়া শুনিতে পাইলেন যে, ডিরেক্টরগণ যুদ্ধ করিতেই মনস্থ করিয়াছেন। ঐ সনের শেষভাগে মান্দ্রাজ হইতে ৪০০ শত সৈন্য হুগলি পৌঁছিল। এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের বিরুদ্ধে সায়েস্তা খাঁ তিন সহস্র পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী হুগলিরক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। হুগলির শাসনকর্ত্তা আবদুলগণি এই সৈন্যে বলীয়ান হইয়া ইংরাজদিগকে বাজারে খাদ্যাদি ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন এবং ইংরাজকে বাজারে যাইতেও নিষেধ করিলেন। এই নিষেধের ফলেই হুগলির যুদ্ধ ঘটে।

১৬৮৬ সনের ২৮শে অক্টোবর দুইজন ইংরাজসৈন্য চিরন্তন প্রথানুসারে হুগলির বাজারে খাদ্যাদি ক্রয়ে গমন করিলে ফৌজদারের আদেশে ইংরাজ ২ জনকে অত্যন্ত নির্য্যাতন করা হয়। এই সংবাদে কুঠী হইতে এক দল সৈন্যসহ কাপ্তেন লেজলি প্রেরিত হন। নবাবী সৈন্য ইংরাজদের সম্মুখীন হইয়া চিরন্তন প্রথানুসারে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ইংরাজের কুঠীর চতুর্দ্দিকস্থ গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। (১)

(১) ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে" During the conflict, Admiral Nicholson opened a caunonade on the town, and burnt five hundred houses; amongst which was the company's factory, valued, with the goods therein at £ 300,000." অর্থাৎ ষ্টুয়াটের মতে কুঠী ইংরাজের গোলায়ই ভস্মীভূত হইয়াছিল।

কাপ্তেন নিকলসনের মানোয়ারী সৈন্য নবাবের কামান অধিকার করে এবং ফৌজদার পলায়নই সর্ব্বাপেক্ষা অমোঘাস্ত্র বিবেচনা করিয়া ছদ্মবেশে নগর পরিত্যাগ করেন। ইংরাজপক্ষে মাত্র ১ জন হত ও মুসলমান পক্ষে ৬০ জন হত এবং অনেকে আহত হয়।

ফৌজদার এই ব্যাপারে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। চার্ণকও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পূর্ব্বাপর যেরূপ হইতেছিল সেইরূপ ইংরাজদিগকে খাদ্যাদি ও ভৃত্য সরবরাহ করিলে তিনি যুদ্ধ স্থগিত রাখিবেন, এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। প্রকৃত কথা এই যে, সে সময়ে কোম্পানীর সোরা বোঝাই হইতেছিল। যুদ্ধ চলিলে এই সোরা বোঝাই বন্দ হইবে, সেই আশঙ্কায়ই ইংরাজ সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন; সুতরাং যত দিন সোরা বোঝাই শেষ না হয়, অন্ততঃ ততদিন তাঁহাদের পক্ষে সন্ধিই সুবিধাজনক; কিন্তু সন্ধি হইলেও ইংরাজ নদীমুখে নবাবের জাহাজ অধিকারে বিরত হইলেন না। নিকলসনও বালেশ্বর পৌঁছিয়া সুবিধামত মোগলজাহাজ আটক করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ স্থানীয় এক জমিদারের সহিত গোপনে পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। এই জমিদার ইংরাজদিগের আবশ্যকমত রসদ সরবরাহ এবং দুর্গনির্ম্মাণে সহায়তায় প্রতিশ্রুত হইলেন। ইংরাজ স্থির করিলেন যে, সোরা বোঝাই হইয়া গেলে হুগলির কয়েকজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসীকে বন্দী করিয়া ঐ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। উহাদের বন্দী করিলে আবশ্যকমত বন্দী বিনিময় করা যাইবে, মনে মনে ইহাই ধারণা করিলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহারা সায়েস্তা খাঁকে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইংরেজদিগকে সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য, হুগলির খণ্ড যুদ্ধের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া মাত্র নবাব হুগলিতে যথোপযুক্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। হুগলিতে ইংরাজ দুই মাস থাকিয়া সোরা বোঝাই করিয়া ২০শে ডিসেম্বর হুগলি পরিত্যাগ করিলেন।

এই হুগলিপরিত্যাগ ব্যাপার রিয়াজ উসসালাতিনে কিছু নূতন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা চিত্তাকর্ষক বলিয়া আমরা উহা এই স্থানে শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় সম্পাদিত রিয়াজ-উস-সালাতিন হইতে উদ্ধৃত করিলাম। (১)

"নবাব জাফর খাঁর শাসনকালে ইংরেজ কোম্পানীর কুঠী হুগলির অন্তর্গত লক্ষ্মীঘাট ও মোগলপুর নামক স্থানে সংস্থাপিত ছিল। তৎকালে ইংরেজ সরদারগণ একদিন সূর্য্যাস্তের পর আহার করিতেছিলেন, তখন তাহাদের কুঠী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। তাঁহারা দৌড়িয়া বাহির হইয়া জীবনরক্ষা করেন; কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত মালপত্র নষ্ট হইয়া যায়। কয়েকজন লোক এবং গৃহপালিত পশুও নিহত হয়। ইংরেজ সরদার চার্ণক তাহাদের গোমস্তা বারাণসীর লক্ষ্মীপুরের বাগান ক্রয় করিয়া সমস্ত বৃক্ষ কর্ত্তন পূর্ব্বক একটী কুঠীর ভিত্তি পত্তন করেন এবং দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। চারিদিকের প্রাচীর শেষ হইবার পর ছাদের কাজ আরম্ভ হইলে সৈয়দ ও মোগল বংশীয় সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ স্থানীয় শাসনকর্ত্তা মীর নাশীরের নিকট উপনীত হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, বিদেশীয়গণ তথায় উচ্চ গৃহের ছাদে আরোহণ করিলে তাহাদের মহিলাকুলের লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত ও সম্মানের লাঘব হইবে। হুগলীর শাসনকর্ত্তা সমস্ত বৃত্তান্ত নবাব জাফর খাঁর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। তারপর তিনি মোগলবংশীয় অগ্রণীদিগকেও নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সেখানে উপনীত হইয়া আপনাদের দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আর একখানি ইটও গাঁথিতে নিষেধ করিয়া হুগলীর শাসনকর্ত্তার নিকট আদেশপত্র প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে হুগলীর শাসনকর্ত্তা রাজমিস্ত্রী ও সূত্রধরদিগকে অট্টালিকার কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। একারণ অট্টালিকা সকল অসম্পূর্ণ রহিল। মিষ্টার চার্ণক ক্ষুণ্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যা নগণ্য ছিল, বিশেষতঃ একখানি ব্যতীত যুদ্ধজাহাজ তৎকালে উপস্থিত ছিলনা; পক্ষান্তরে মোগলের সংখ্যা অধিক ছিল, ক্ষমতাশালী ফৌজদার তাহাদের পক্ষাবলম্বী ছিলেন; পরন্তু নবাব জাফর খাঁর নামও ভীতিকর ছিল। এই সব কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মিষ্টার চার্ণক জাহাজ খুলিয়া দিলেন। মিষ্টার চার্ণক যাত্রাকালে আফতাবি (যে দর্পণ সূর্য্যতেজে ধরিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, তাহাকে আফতাবি দর্পণ বলে) দর্পণের সাহায্যে হুগলী হইতে চন্দনগর পর্যন্ত নদীতীরবর্ত্তী জনাকীর্ণ স্থান অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিলেন। হুগলীর শাসনকর্ত্তা গৃহদাহের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মাথাওয়া থানার কর্ম্মচারীকে ইংরাজের জাহাজ আবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি গুরুভারযুক্ত লৌহ শিকল (ইহার এক একটা আংটীর দশসের ওজন ছিল) নদীর এক তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত টাঙ্গাইয়া

(১) Bengal : Past and Present Vol III. No. 2 লেখক কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দিলেন। ইংরাজের জাহাজ লৌহশিকলের সন্নিধানে উপনীত হইলে জাহাজের গতিরোধ হইল, তখন মিষ্টার চার্ণক তরবারি দ্বারা শিকল দ্বিখণ্ড করিয়া গন্তব্যপথ মুক্ত করিলেন এবং সমুদ্রপথে দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

সুতানটী বা কলিকাতা।

হুগলি পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ সুতানটী পৌঁছিলেন এবং কিছুদিন তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ঢাকা হইতে নবাবের কর্ম্মচারী পৌঁছিলে চার্ণক নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।—প্রথম, ইংরাজকে নবাব উপযুক্ত স্থান দিবেন এবং তথায় ইংরাজ দুর্গনির্ম্মাণ ও টাকশাল স্থাপন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ, নবাব মালদহের কুঠী পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন ও ইংরাজের অর্থ প্রত্যর্পণ করিবেন। অধিকন্তু ইংরাজদিগকে তাহাদের পাওনা আদায়ে সাহায্য করিবেন। এই দাবীর প্রত্যুত্তরে নবাব তিন জনকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। প্রতিনিধিগণ উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলে, সন্ধিপত্র নবাবের সহি ও মোহরাঙ্কিত করিবার জন্য নবাবের নিকট উহা প্রেরিত হইল। নবাব সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবেরও সহিমোহরাঙ্কিত করিয়া দিবেন, এরূপ ভরসাও দিলেন।

কিন্তু সায়েস্তা খাঁর বাস্তবিক সন্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল না। চতুর নবাব কেবলমাত্র অবসর অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিন সপ্তাহ গড়িমিশি করিয়া সন্ধিপত্র প্রত্যর্পণ করিলেন এবং ইংরাজগণের সকল দাবীই অন্যায্য এই সকল অন্যায্য দাবীতে তাঁহার প্রতিনিধিগণ স্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের উপর যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। ইংরাজ যাহাতে আর বাংলায় থাকিতে না পারে, তজ্জন্য অধীনস্থ সকল কর্ম্মচারীর নিকট আদেশ প্রেরণ করিলেন; সুতরাং ইংরাজের যুদ্ধ ভিন্ন আর গত্যন্তর রহিল না। ইংরাজ হুগলিস্থ নবাবের

লগণের কুঠী ভস্মীভূত করিয়া হিজলি অধিকার করিলেন। মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ মীরকাশিম বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। ১৬৮৭ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪২০ জন সৈন্যসহ চার্ণক হিজলিতে নিজেকে সুরক্ষিত করিলেন।

হিজলী অধিকারের পর চার্ণক ১৭০ জন ইংরাজ সৈন্যকে বালেশ্বর অধিকারে প্রেরণ করিলেন। বালেশ্বর সহজেই অধিকৃত হইল। ডিরেক্টর সভা কয়েকদিন মধ্যে হুগলি লুণ্ঠন, বালেশ্বর ধ্বংস ও হিজলী অধিকারের সংবাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন; কিন্তু ঔরংজেব এসংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বস্তুতঃ সম্রাট্ এই সংবাদ অবগত হইলে হুগলি ও বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত নগরগুলি কোথায়? এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। সায়েস্তা খাঁও অবিচলিতচিত্তে হিজলী পুনরাধিকারের জন্য যথেষ্ট অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন।

এদিকে হিজলীস্থ ইংরাজদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইতেছিল। হিজলীর জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ ছিল। গ্রীষ্মকাল—অনভ্যস্ত ইংরাজ-সৈন্যগণের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। রীতিমত রসদাদিও সরবরাহ হইতেছিল না। গোমাংস ও মৎস্য ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যাইত না। এই সকল কারণে প্রত্যহই ইংরাজসৈন্য ক্ষয় হইতেছিল। অধিবাসীরাও ক্রমে ক্রমে স্থান পরিত্যাগ করিতেছিল এবং যে জমিদার ইংরাজদিগকে সাহায্যের ভরসা দিয়াছিলেন, তিনিও এইক্ষণ পশ্চাৎপদ হইলেন। মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ রসুলপুরের অপর দিকে কামানশ্রেণী সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; সুতরাং ইংরাজও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ একবার আক্রমণ করিয়া তাঁহারা পঞ্চদশ সহস্র চাউলের বস্তা অধিকার করিলেন এবং দ্বিতীয় আক্রমণে মোগলের কামানশ্রেণী অধিকার করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর গোলা বারুদ ইংরাজের হস্তগত হইল।

এই সময় দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ নবাব-সেনাপতি আবদুল সামাদ খাঁ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আক্রমণে ইংরাজ-পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। ইংরাজপক্ষে মাত্র একশত সৈন্য অবশিষ্ট থাকিল। হিজলী অধিকার আবদুল সামাদের পক্ষে সহজ হইল; কিন্তু ইংরাজের উদীয়মান সুখ-সূর্য্য অস্তমিত মোগল চন্দ্রমার নিকট জ্যোতির্হীন হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে ৭০ জন গোরা সৈন্য পৌঁছিল। এই সৈন্য পৌঁছা সংবাদে মোগল সৈন্য ভীত হইয়া পড়ে। চার্ণক ২।১টী করিয়া সৈন্য দুর্গমধ্য হইতে বাহির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ঘাটে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ৪০।৫০টী ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া ঘাটে একত্রিত হইলে, সাজ সজ্জা সহ তাহাদের কুচ করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে কয়েক-বার ধূমধাম করা হইলে বিপক্ষগণ মনে করিতে লাগিল যে, ইংরাজ জাহাজে অনেক গোরা সৈন্য পৌঁছিয়াছে এবং হিজলী অধিকার সুদূর-পরাহত। "In war, the moral is to the physical force as 3 parts to one"—এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ ৪ঠা জুন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন; সুতানটীতে যে সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত হইয়াছিল, আবদুল সামাদ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং ইংরাজবাহিনী ধূমধামের সহিত হিজলী পরিত্যাগ করিল।

এই সকল বৃত্তান্ত নবাবের দরবারে পৌঁছিলে তিনি ইংরাজদিগকে উলুবেড়িয়া দুর্গ নির্ম্মাণে ও হুগলি কুঠীতে থাকিয়া বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু টাকশাল স্থাপন, ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সঠিক কিছুই সাহাসার আদেশ ব্যতীত সম্ভবপর নহে, এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। চার্ণক বুঝিতে পারিলেন যে, এ যুদ্ধ সহজে ক্ষান্ত হইবার নহে; কিন্তু বর্ত্তমানে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা তাঁহার কোন গত্যন্তর রহিল না।

চার্ণকের এই সম্মতিতে ডিরেক্টরগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিলেন, চার্ণকের নিজ গোপনীয় বাণিজ্যের ক্ষতি হয় বলিয়াই তিনি এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সম্রাট্ ও তাঁহার প্রতিনিধি নবাব যদি বঙ্গদেশে ইংরাজ কোম্পানীকে দুর্গ নির্ম্মাণে ও টাকশাল স্থাপনে অনুমতি না দেন, তবে তাহারা মোগল রাজ্যে আর বাণিজ্য করিবেন না এবং যে প্রকারেই হউক মোগল ও তাঁহার প্রজাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন। চার্ণক ইতোমধ্যে উলুবেড়িয়ায় ডক নির্ম্মাণ করিতেছিলেন ; কিন্তু ঐ স্থান পছন্দ না হওয়ায় তিনি নবাবের অনুমত্যনুসারে সুতানটীতে সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণের জন্য কুঠী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। চার্ণক হুগলি, উলুবেড়িয়া এবং হিজলি অপেক্ষা সুতানটীতে কুঠী স্থাপনই সমীচীন বিবেচনা করিয়া সুতানটী সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থাও করিতেছিলেন।

এই সময়ে নবাব আদেশ দিলেন যে, পত্র পাঠ ইংরাজ যেন সুতানটী পরিত্যাগ করিয়া হুগলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সুতানটীতে যেন তাঁহারা ইষ্টক বা প্রস্তরের কোন গৃহ নির্ম্মাণ না করেন। চার্ণকের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী করিলেন। এ সময়ে চার্ণক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না কিংবা উৎকোচপ্রদানে নবাবের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে হস্তগত করিবারও উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ছিল না ; সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি কৌন্সিলের ২জন সদস্যকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। সদস্যগণ নবাব যাহাতে ইংরাজগণ সুতানটীতে থাকিতে পান এবং কুঠী নির্ম্মাণের জন্য স্থানীয় জমিদারের নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইলেন।

ঠিক এই সময়ে ডিরেক্টরগণ কাপ্তেন হীথকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা চার্ণককে মিষ্ট ভাষায় তিরস্কার করিয়া (১) চট্টগ্রামে

(১) "It is of vanity to fancy that your prudence or subtlety

যাওয়াই স্থির করিলেন। হীৎ পৌঁছিয়াই চার্ণক ও অন্যান্য সকলকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগের আদেশ দিলেন। চার্ণক সুতানটী থাকিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া তখনও নবাবের সহিত সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু হীৎ নবাবের প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চার্ণকের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ডিরেক্টরগণ জানাইয়াছিলেন যে, যদি চার্ণক সুতানটী রক্ষার জন্য কোন বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, তবে হীৎ যেন চট্টগ্রাম না যাইয়া সুতানটী আরও সুদৃঢ় করেন। বিশেষতঃ কলিকাতায় কুঠী না থাকিলে মালদহে বা কাশীমবাজারে কুঠী রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে। এইজন্য চার্ণকের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবার জন্য হীৎ আদিষ্ট হইলেন। কলিকাতা কৌন্সিলও যুদ্ধে বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবে, এই আশঙ্কায় সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইংরাজের পরম শত্রু সায়েস্তা খাঁও এইক্ষণ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে শান্তিপ্রিয় নবাব বাহাদুর খাঁ রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সন্ধিরও বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু কাপ্তেন হীৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কৌন্সিলকে জানাইলেন যে, বঙ্গদেশে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার কেবল তাঁহার উপরই অর্পিত হইয়াছে; সুতরাং তিনি সুতানটী থাকিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু অব্যবস্থিত হীৎ শীঘ্রই সে মতলব পরিত্যাগ করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, নবাব আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন এবং নবাব যদি পুরাতন সকল সর্ত্ত রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং দুর্গ নির্ম্মাণে অনুমতি দেন, তবে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে তিনি

procured those good terms you obtained of Abdus Samad when you and your forces were by your own errrors reduced to that condition. It was not your wit or contrivance, but God Almighty's Good Presidence etc. etc. Director's Letter)

নবাবকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। নবাব এপ্রস্তাবে সম্মত হইবার পূর্ব্বেই হীৎ পুনর্ব্বার নিজ মত পরিবর্ত্তন করিয়া চট্টগ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ৮ই নবেম্বর সুতানটী পরিত্যাগ করিলেন।

১৯শে নবেম্বর হীৎ, কলিকাতা কুঠীর কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলে বালেশ্বর পৌঁছিলেন। বালেশ্বরে পৌঁছিলে হীৎ ও চার্ণক জানিতে পারিলেন যে, বালেশ্বরের ফৌজদার কোম্পানীর সকল দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ফৌজদার ইংরাজদিগকে বালেশ্বর পরিত্যাগ বা খাদ্যাদি ক্রমে নিষেধ করাতে (১) কাপ্তেন হীৎ দুইজন ফ্যাক্টরকে ফৌজদারের নিকট পত্রসহ প্রেরণ করিলেন। ফৌজদার উত্তর করিলেন যে, তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা নবাবের আদেশানুযায়ীই করিয়াছেন এবং কোম্পানীর দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করিলে তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইবে। তিন দিবস পরে কাপ্তেন হীৎ পুনরায় দুইজন ইংরাজ প্রেরণ করিলেন এবং বালেশ্বর পরিত্যাগের অনুমতি চাহিলেন এবং ফৌজদার যদি দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ না করেন, তবে ইংরাজ জোর করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ফৌজদার সম্মত না হওয়াতে, ইংরাজ বালেশ্বর আক্রমণ করিলেন। আক্রমণের ফলে ইংরাজপক্ষে ৪ জন হত ও তিন জন আহত হইলেন। মুসলমানপক্ষে যথেষ্ট হতাহত হইল এবং ইংরাজ ইচ্ছামত অত্যাচার করিতে লাগিলেন। (২)

এই সময়ে চার্ণক ও হীৎ সংবাদ পাইলেন যে, নবাব সন্ধি করিতে

(১) Princess Denmark নামক জাহাজের কাপ্তেন জোসেফ হাডকের পত্রে বালেশ্বর অধিকারের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই পত্র এইক্ষণ British Museum এ আছে। ইহার প্রতিলিপি ১৯০৯ সালের Bengal : Past & Present এ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) I bid. "Our soldiers (but seaman more espectially) have committed many inhuemence actions in the town plundringe not only Moors but several portugese houses and killed several innocent people."

প্রস্তুত হইয়াছেন এবং ইংরাজ যে সকল সর্ত্ত প্রার্থনা করেন, তাহাই তিনি পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক। চার্ণক পুনরায় তাঁহার সুতানটীতে প্রত্যাগমনে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু অব্যবস্থিত হীৎ ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৮ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম পৌঁছিলেন। চট্টগ্রামজয় সুদুর-পরাহত দেখিয়া হীৎ মাদ্রাজে প্রস্থান করিলেন (১)। ইংরাজ ভাবিলেন যে, বাংলার বাণিজ্য চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হইল। (২)

এই ব্যাপারে ঔরংজেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। একবার স্থির করিলেন যে, এই মুষ্টিমেয় উদ্ধত বণিককে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন; কিন্তু বোধ হয় ইহাদের দূরীভূত করা সহজসাধ্য নয়, বিবেচনা করিয়া এবং ইংরেজের সহিত বাণিজ্য বিশেষ লাভজনক বলিয়া ইংরাজদিগকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। অন্য আর একটী গুরুতর কারণও ছিল। সম্রাট্ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। ইংরাজের সহিত বিবাদে মক্কাগামী যাত্রী জাহাজ ইংরাজের করতলগত হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি নবাব ইব্রাহিম খাঁকে ইংরাজকে পূর্ব্বের মত বাণিজ্যাধিকার দিতে আদেশ দিলেন।

নবাব ইব্রাহিম শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি সাহানসার আদেশ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ ইংরাজদিগকে কারামুক্ত করিলেন এবং মাদ্রাজে জব চার্ণককে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করিলেন। চার্ণক পূর্ব্বের ব্যবহার স্মরণ করিয়া সম্রাটের ফার্ম্মাণ না পাইলে তিনি প্রত্যাগমনে প্রস্তুত নহেন, এইরূপ উত্তর দিলে নবাব দ্বিতীয় বার

(১)I bid"But I feare we shall not have strength sufficient to effect it the Nabab haveinge sent many tho (usands) of (men) this year ther to overrun and take the kingdom of Arraccan"।

(২) I bid "I feare the brave trade of Bengal will be lost, at which the Dutch and French rejoyce that this trade may wholy fall to them".

চার্ণককে পত্র দিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে ফার্ম্মাণ আনাইয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন ; কিন্তু ফার্ম্মাণ পৌছিতে বিলম্ব হইবে বিধায় চার্ণক যাহাতে সত্বর প্রত্যাগমন করেন, তজ্জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। এই নিমন্ত্রণের ফলে চার্ণক ও তাঁহার ফ্যাক্টরগণ ২৪শে আগষ্ট সুতানটী পৌছিলেন। হুগলির ফৌজদার তাঁহাদের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন।

১৬৯১ সনে নবাব নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে চার্ণককে সম্রাট-প্রদত্ত ফার্ম্মাণ আনাইয়া দিলেন। এই ফার্ম্মাণে নবাবের অধীনস্থ মুৎসুদ্দি, জাইগীরদার, গোমস্তা, ফৌজদার, জমাদার ও কাননগুদের অবগত করান হইল যে, ইংরাজের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হইয়াছে এবং তাহারা পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুসারে মাত্র তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং নবাবের কর্ম্মচারিগণ ইংরাজ-কোম্পানীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই ফার্ম্মাণের বলে সুতানটীতে কুঠী স্থাপিত হইল। (১)

সুতানটীতে কুঠী স্থাপনই চার্ণকের জীবনের শেষ কার্য্য। ভারতবর্ষের রাজধানী, ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তিস্থাপন করিয়া চার্ণক ১৬৯৩ সনের ১০ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন।

চার্ণকের জীবনী সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী কথা আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। পরলোকগত ডাক্তার সি, আর, উইলসন চার্ণক চরিত্র বর্ণনা করিতে করিতে একদিন এই ক্ষুদ্র লেখককে বলিয়াছিলেন—"For my

(১)"Sutanati the foundation stone of the British Empire"(wilson) "A city of sunshine, a city of palaces, a city of festivities, a city of incalculable Commerce, a city of wide empire, a city of stimulating friendship and social mirth,but'also a city of heroic disappointments, o parted friendship and of grief which abide).

part I prefer to forget the minor blemishes and to remember only his resolute determination, his clear sighted wisdom, his honest self-devotion and so bave him to sleep on in the heart of the city, which he founded, looking for a blessed resurrection and the coming of him by whom alone he ought to be judged'' সেই কথাগুলির পুনরুক্তি করিয়া আমরা পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। (১)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
হাজারীবাগ।

বঙ্গে জৈন-প্রভাব

আমাদিগের ধরিত্রীরূপিণী জননী বঙ্গভূমি সৃষ্টির অতি প্রাচীন যুগ হইতে আপনার কঠিন বক্ষপঞ্জরের মধ্যে তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানগণকে বহন করিয়া আসিতেছেন। অতীতের কোন্ অজ্ঞাত দিবসে কোথা হইতে, সর্ব্বগ্রাসী মানবজাতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া, বঙ্গভূমিকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছে, তাহা এক মহা জটিল সমস্যা। তাহার সমাধানতত্ত্বটী আমাদিগের

(১) ১৯০৮ সনের ২৪শে আগষ্ট জব চার্ণক ডোজে রেভারেণ্ট ফার্ম্মিঙ্গার বলিয়াছিলেন, "Who after many years of faithful and fruitful service, in which he had been twice unjnstly superseded, wearied often and exasperated by the long delays and deaf ears of unintelligent and frequently malicious supriors, weakened by constant fevers, on a forlorn Sunday afternoon in the rains, this day. 218 years ago, landed at Chutanati and there under a spreading *Neem* tree smoked the pipe of peace''.

দুর্ভাগ্যবশতঃ অতীতের এক বিস্মৃতি-হ্রদে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হইয়াছে। সেই জন্যই অতীতের সহিত বর্ত্তমানের মিল নাই; উভয়ের মধ্যে এক অন্তহীন ব্যবধান। তবে বিংশ শতাব্দীর উন্নতির দিনে ব্যক্তিগত গবেষণার ফলে যে সমুদায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে না হউক, আংশিক ভাবেও অনন্তকালের অনুকূল বাতাসে পরিবর্দ্ধিত সেই অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞতা ধীরে ধীরে অপনোদিত হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সেই অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা মাত্র।

বাঙ্গালা এক প্রসিদ্ধ জনপদ। ইহার নদীমালিনী তটভূমি, শস্যশ্যামল প্রান্তর ও নির্মেঘ ধূসর আকাশ সত্যই অতুলনীয়। এই শোভার আস্পদ চির হরিতের অত্যন্ত সমুদ্র বঙ্গভূমি কত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে আপনার পূর্ব্ব গৌরব অটুট রাখিয়া, আজিও শস্যসম্ভারে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে! প্রত্যুত জগতের ইতিহাসে বাঙ্গালার ন্যায় পুরাতন জনপদ বিরল না হউক, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রণোদিত আলোচনায় অমর হইবার উপযুক্ত। ইহার পুরাবৃত্ত আলোচনা করিবার অবসর অদ্য আমাদিগের হইবে না; কিন্তু বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদক অভিমত প্রসঙ্গে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকের ন্যায় সুপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থেও বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়! যথা—

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্তান্য অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥

এই প্রাচীন জনপদ অতি পুরাকাল হইতেই বিভিন্ন ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বিভিন্ন বঙ্গ নরপতিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই মগধ ও সুঙ্গের ক্ষত্রিয় বীরগণের সহিত মিত্রতা ও আত্মীয়তাপাশে বদ্ধ হইতেন। তাহাতে

তাঁহারা কিছু মাত্র দ্বিধা করিতেন না। দুর্ব্বলপেশী স্ফীতোদর বঙ্গবাসী আজ জগতবাসীর বিদ্রূপের পাত্র; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ এককালে শৌর্য্যে ও বীর্য্যে বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষত্রিয় নরপতি-গণের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। বঙ্গের সেই অতীত সৌভা-গ্যের দিনে, তুষার-কিরীট হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মের যে প্রবল তরঙ্গ ভারত-ভূমিকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল, তাহার লহরী-মালা বাঙ্গালার বেলাভূমিতে প্রহত হইয়া, সমুদায় বঙ্গকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য বিলুপ্ত ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হইবার বহুশত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয়গণ শাশ্বত ধর্ম্মের অধিকারী ছিলেন। যে সময় ব্রাহ্মণগণ বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন, সে সময় উন্মত্ত ক্ষত্রিয়সমাজ অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনায় আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর করিয়া তুলিতে ছিলেন। বলিতে কি, সে সময় ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নিকট হই-তেই ব্রহ্মবিদ্যা ও ওঁকারতত্ত্ব শিক্ষা করিতেন। মিথিলায় এই অধ্যাত্ম বিদ্যার সূত্রপাত, মগধে ইহার বিস্তৃতি এবং বঙ্গে ইহার পরিপুষ্টি লাভ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের ফলেই ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়। যে ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের মেরুদণ্ড, বঙ্গজননীর স্নেহ-শীতল অঙ্কে তাহার পরিপুষ্টি সাধিত হওয়াতে জৈন ও বৌদ্ধমতও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহারই ফলে আদিজিন ঋষভ দেব ব্যতীত ২৪ জন তীর্থ সঙ্করের মধ্যে ২৩ জনের সহিত বাঙ্গা-লীর সংস্রব ঘটিয়াছিল। জৈনগ্রহ হইতে সঙ্কলন করিয়া উক্ত ২৩ জন তীর্থসঙ্করের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

১। অজিত নাথ, ২। সম্ভব নাথ, ৩। অভিনন্দন, ৪। সুমতি নাথ, ৫। পদ্মপ্রভ, ৬। সুপার্শ্ব, ৭। চন্দ্রপ্রভ, ৮। সুবিধি নাথ,

৯। শীতল নাথ, ১০। শ্রেয়াংস নাথ, ১১। বাসুপূজ্য, ১২। বিমল নাথ, ১৩। অনন্তনাথ, ১৪। ধর্ম্মনাথ, ১৫। শান্তিনাথ, ১৬। কুন্থু-নাথ, ১৭। অরনাথ, ১৮। মল্লিনাথ, ১৯। মুনিসুব্রত, ২০। নমী-নাথ, ২১। নেমিনাথ, ২২। পার্শ্বনাথ, ২৩। মহাবীর।

উক্ত তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ আনুমানিক খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ৭৭৫ বাঙ্গালার মানভূম জেলাস্থ সমেত শিখরে (বর্ত্তমান পরেশনাথ পাহাড়ে) মোক্ষলাভ করেন। ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে রাঢ় বঙ্গ তাঁহার প্রভাবে অনেকেই তৎপ্রচারিত চাতুর্য্যাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

পার্শ্বনাথ স্বামীর তিরোভাবের পর, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের অভ্যুদয় হয়। মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। উভয়েই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উভয়েই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা ও উপনিষদ আদিষ্ট জ্ঞানকাণ্ডের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রাধান্যলাভ করিতে থাকে। কিন্তু ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরেও বঙ্গদেশ হইতে জৈন মতের একান্ত উচ্ছেদ সাধিত হয় নাই। জৈনদিগের শেষ শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহুর শিষ্য প্রশিষ্যে বঙ্গদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান শিষ্য গোদাস হইতে চারটী জৈন শাখার সৃষ্টি হয়; যথা তাম্র-লিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও দাসীকর্ব্বটিয়া; সুতরাং তাম্র-লিপ্ত কোটিবর্ষ (দিনাজপুরস্থ দেওকট পরগণা) পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও কর্ব্বট (মান-ভূম জেলা) প্রভৃতি স্থানে যে এককালে জৈন প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়।

ইহার পর চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাচার বিলুপ্ত হয় ও ফলে জৈনাচার প্রবল হইয়া উঠে। তৎকালীন ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার চেষ্টায় ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই

জৈন অনুষ্ঠান পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই সময় চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে পাটলীপুত্রে জৈন সঙ্ঘ আহূত ও জৈন অঙ্গ শাস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়।

উদয়গিরির হস্তীগুম্ফার উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কলিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ খারবেল মগধপতিকে পরাজিত করিয়া, মগধরাজ্যে আপন শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক মগধ জয় আনুমানিক ২০৯ খৃঃ সংঘটিত হয়। কলিঙ্গরাজ খারবেল নিষ্ঠাবান জৈন ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মগধে ও কলিঙ্গে জৈনাচার প্রধান হইয়া উঠে। এই সময় বঙ্গাধিপ তাঁহার সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, বঙ্গদেশে স্বভাবত আবার জৈনাচার বদ্ধমূল হয়।

ইহার পরই সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ধর্ম্মের শান্তিময় ক্রোড়ে বঙ্গবাসী বহু শতাব্দী ধরিয়া পুষ্ট হইয়াছিল, ফলে জৈনধর্ম্ম কালক্রমে, নিশাসমাগমে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের মন্দীভূত কিরণের ন্যায়,—শুধু বঙ্গদেশে কেন, প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে। আজ সেই ইতিহাসবিশ্রুত জৈনধর্ম্মের একান্ত নিঃশেষ না হইলেও, তুলনায় জৈনধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে B. Sc. (Birn)
F. G. S. M. G. G. M. I. M. E.

বিজাপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি।

সকলেই জানেন যে,বিজাপুর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কলাদগি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে বিজাপুরের

উৎপত্তি। ইহার ইতিহাসপ্রসঙ্গে ফিরিস্তা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

২য় মুরাদের পুত্র বিখ্যাত ওসমানলি সুলতান বিজাপুরে প্রথম মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পর তদীয় বংশধর ২য় মহম্মদ সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃবর্গকে হত্যা করিতে আদেশ দেন; কিন্তু তাঁহার মাতা কৌশল করিয়া য়ুসুফ নামক পুত্রের জীবন রক্ষা করেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া, য়ুসুফ আহ্মদাবাদ বিদাররাজের অধীনে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হন; কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরে, রাজার মৃত্যুতে তিনি আহ্মদ নগর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জন্ম ভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাধারণের সম্মতিক্রমে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি স্বীয় ভুজবলে বিজাপুর রাজ্যের সীমা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে গোয়া নগর পর্ত্তুগীজদিগের হস্তচ্যুত হইয়া বিজাপুরের অন্তর্গত হয়। বহু অর্থব্যয়ে তিনি বিজাপুরে সুবিস্তৃত দুর্গ-বাটিকা প্রস্তুত করেন। ১৫১০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইস্মাইল খাঁ শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া ১৫৩৪ খৃঃ পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন। ইহার পরে মুলু আদিল সাহ ছয় মাস কাল রাজত্বের পর রাজ্যচ্যুত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম ১৫৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজাসনে আসীন ছিলেন। তৎপুত্র আলী আদিল শাহ বিজাপুর নগরের চারিদিকে প্রাচীর এবং জমামস্জিদ ও জলপ্রণালী সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি ১৫৬৪ খৃঃ রামরাজাকে কালিকটের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয় নগর লুণ্ঠন করেন। ১৫৭৯ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অল্প বয়সে রাজ্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করাতে মৃত রাজের বিধবা পত্নী চাঁদ বিবিই প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। ১৬২৬ মহম্মদ আদিলশাহ রাজা হন। ইঁহারই অধিকারকালে মহারাষ্ট্র কেশরী ভারত-গৌরব শিবাজীর আবির্ভাব

হয়। তিনি ১৬৪৬-৪৮ খৃঃ মধ্যে বিজাপুররাজের অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করেন। এই সময় এক দিকে শিবাজীর আক্রমণে ও অপর দিকে মোগল বাহিনীর উপর্য্যুপরি অত্যাচারে মহম্মদ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। পরিশেষে শিবাজীর প্রতাপ দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহাতে মহম্মদ ক্রমশঃই হীনতেজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৬৬০ খৃঃ মহম্মদের মৃত্যু হওয়ায় ২য় আদিলশাহ রাজা হন; কিন্তু বিজাপুর রাজবংশের যে অধঃপতনের সূত্রপাত ইতঃপূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারিলেন না। ১৬৭২ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুতে শিশুপুত্র সিকেন্দর আদিল শাহ সর্ব্বশেষে রাজত্ব করেন।

ইহাই বিজাপুর রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই রাজ্য ১৬৮৬ খৃঃ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তার পর দিল্লীর মোগল রাজবংশের অধঃ-পতনের পর বিজাপুরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ মহারাষ্ট্রগ্রাসে পতিত হয়। ১৮০৮ খৃঃ শেষ পেশবার পদচ্যুতির পর বিজাপুর ও সাতারারাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। পরে সর্ব্বশেষে ১৮৪৮ খৃঃ সাতরারাজ অপুত্রক হওয়ায় ইংরাজরাজ ইহার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিজাপুরের মুসলমানকীর্ত্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত জুম্মা মস্‌জিদ ইব্রাহিমের রোজা মাঙ্কদের সমাধি মন্দির, অসুর মুবারক প্রাসাদ প্রভৃতি অট্টালিকা সমূহের শিল্প-চাতুর্য্য ও গঠন-প্রণালী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অদ্যকার প্রবন্ধে এইরূপ কয়েকটী মুসলমান কীর্ত্তির আলোচনা করিব।

মালিকী মেয়দান:—ইহা একটী প্রকাণ্ড তোপ। বাংলার জাহান কোষার ন্যায় বিজাপুরে ইহা একটী দর্শনীয় দ্রব্য। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর কামান ভারতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পশ্চিম ভারতে পুরাতন বিজাপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লোক-চক্ষুর অজ্ঞাতে অতীতের সাক্ষী এই 'মালিকী মেয়দান' অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে।

বিদেশী পর্য্যাটক কেহ বা ইহার প্রতি সানুগ্রহ কটাক্ষপাত করেন, কেহ বা করেন না। ইহার ওজন প্রায় ৪২ টন্। এই গুরুভার পদার্থকে স্থানচ্যুত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ইহার ভিতর সবুজ রং করা; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় ৪৫০ বৎসর আতপতাপ সহ্য করিয়াও ইহার উপরকার 'কলাই' নষ্ট হয় নাই। ইহার উপরি-ভাগ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ; এমন কি, দর্পণের ন্যায় ইহাতে প্রতিমূর্ত্তি-পাত হয়। ইহার উপরে একটী লিপি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, ইহা ১৫৪৯ খৃঃ আহ্মদ নগরে মহম্মদ কিমরি নামক জনৈক সেনা-নায়ক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৬৮৬ খৃঃ ঔরঙ্গজেব বিজাপুর জয় করেন। সে সময় তিনি উক্ত লিপিতে এই অংশটুকু যোজনা করিয়া দেন—সা আলমগিয়া গাজি, যিনি ন্যায় বিচার করিবার জন্য উৎসুক, এই বিজাপুর রাজ্য জয় করিয়াছেন। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজাপুরের সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। তিনি হিজ্‌রি ১০৭৭ খৃঃ বিজাপুরের নৃপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছেন। ইতিহাসপাঠে অবগত হই যে, আহ্মদ নগর হইতে ১৬৩৮ খৃঃ এই গুরুভার পদার্থটিকে বিজাপুরে আনিতে ১০টী হস্তী ১৪০০ ষণ্ড এবং অসংখ্য মনুষ্য নিযুক্ত হয়। একটী উচ্চ বেদীর উপর ইহা স্থাপিত হয়; কিন্তু এক্ষণে সম্ভ-বতঃ উক্ত স্থান হইতে ইহাকে নামাইয়া লওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ইহা প্রস্তরস্তূপের উপর পতিত রহিয়াছে। এই কামান সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে একটী গল্প শুনা যায়। তাহা এই—যখন এই কামানটী প্রস্তুত হয়, তখন রামুখাঁন নামক জনৈক ব্যক্তি আপন পুত্রকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া, তাহার রক্তে দেবতার পূজা দেন। ১৮২৯ খৃঃ এই কামানে ৮০ পাউণ্ড বারুদ দিয়া অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছিল। ইহাতে ২৭৭৪ পাউণ্ড ওজনে গোলা দিয়া অনায়াসে অগ্নিসংযোগ করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোপ নগরের নানাস্থানে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। একদিন ইহারাই শত্রু সৈন্যের উপর অগ্নি উদিগরণ করিয়া বিজাপুরের স্বাধীনতা অটুট রাখিয়াছিল। আজ আর সে বিজাপুর নাই। তাই তাহাদিগের সে আদরও নাই। তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইব্রাহিম রোজা :—পূর্ব্বেই যে বৃক্ষবাটিকার উল্লেখ করিয়াছি, ইহাই সেই উদ্যানসংলগ্ন অত্যাদ্ভুত অট্টালিকা। পৃথিবীতে ইহার তুলনা অল্পই আছে। ইহা বিজাপুর হইতে অর্দ্ধমাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। ২য় ইব্রাহিম আদিল শাহ ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা। এই উদ্যানমধ্যে প্রাসাদ ও একটী মস্‌জিদ অবস্থিত। ইব্রাহিম শান্তিতে ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাতে তিনি এমন একটী সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, যাহা ভারতে অদ্বিতীয়। এই একটী মাত্র অট্টালিকায় তাঁহার নাম অমর হইয়াছে।

আদিলের এক কন্যা ছিল। ইঁহার নাম জোলাল সুলতানা। ইনি যৌবনের প্রথম উন্মেষের দিনে কালগ্রাসে পতিত হন; স্নেহপ্রবণ পিতা কন্যার স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কবরের উপর 'তাজসুলতানা' নির্ম্মাণ করেন। পিতার বাৎসল্য প্রস্তরস্তম্ভে রচিত হইয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই ৪০০ শত বৎসর বিশ্ববাসী বিস্ময় ও আনন্দোৎফুল্ল নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে 'এই স্বার্থ ভিন্ন সংসারে এত স্নেহ কোথা হইতে আসিল।' ১৬২৬ খৃঃ এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। ইহা সম্পূর্ণ করিতে ৮৬ বৎসর অতীত হয়। এই অট্টালিকার দ্বারে একটী লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই তাজসুলতানা বহু পরিশ্রমে ও লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে মালিক সান্দাল্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। আর একখানি লিপি হইতে আমরা অবগত হই যে, এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৬৫৩৩ জন মজুর ৩৬ বৎসর

ধরিয়া নিযুক্ত ছিল। ইহা হইতেই সহজেই অনুমেয় যে, ইহার ন্যায় বিশাল সৌধ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই।

এই রোজা আজ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই। ইহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত প্রান্তর। এখানকার নীরবতাকে যেন সজীব করিয়া তুলিতেছে। লোকালয় হইতে দূরে এই জনহীন প্রদেশে দর্শকগণ কদাচিৎ উপস্থিত হন। কিন্তু ইহা প্রকৃতই দেখিবার উপযুক্ত। বোধ হয় আগ্রার তাজ শিল্পত্বের জন্য এবং বিজাপুরের তাজসুলতানা বিশালত্বের জন্য সমুদায় ভারতে অদ্বিতীয়। তাজের গাত্রে লিখিত লিপি এই উক্তি সমর্থন করে। লিপির অনুবাদ এই :—এই অট্টালিকার উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া দেবতাও বিস্মিত হইয়া-ছিলেন। 'অন্যে পরে কা কথা'। যখন এই বিশাল সৌধ ধরিত্রীর অঙ্ক হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল, তখন বোধ হইল আর একটী সুনীল নভস্তলের সৃষ্টি হইল। প্রত্যুত নন্দন কানন (Garden of paradise) এই কাননের সৌন্দর্য্য লইয়া নির্ম্মিত। এই সর্ব্বজীবাহ্লাদদায়িনী অট্টালিকা হিজরী ১০৩৬ তে নির্ম্মিত হয়।

আফজল পুরঃ—বিজাপুর নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে আফজল পুর অবস্থিত। এখন ইহার নানা স্থানে ধ্বংসস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু এক সময় ইহা একটী নগরী ছিল। মোগল সেনানী আফজল খাঁর নামানুসারে ১৬১৯ খৃঃ এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। আফজল খাঁর সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, আবুলফাজেল শিবাজীর বিরুদ্ধে একটী অভিযান পরিচালিত করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে সম্রাট্ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। কিন্তু যখন তিনি যুদ্ধযাত্রার জন্য সজ্জিত হইতেছিলেন, সে সময় অনেক দৈবজ্ঞ পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে যুদ্ধের ফল জানাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ যাত্রা করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তখন মুসলমানের মধ্যেও বীরের অভাব ছিল না। তাঁহারাও সমরক্ষেত্রে শত্রুনিপাত করিয়া মৃত্যুকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিতে ভীত

হইতেন না; সুতরাং আফজল নিরস্ত হইবেন কেন? কিন্তু ভবিতব্যের উপর তাঁহার হাত কি? সে জন্য যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার ১৭৭টী মহিষীকে তিনি প্রস্তুত হইতে আদেশ দেন। কথিত আছে তিনি তাহাদিগকে প্রাসাদসংলগ্ন সরোবরে ডুবাইয়া হত্যা করেন। তারপর তাহাদিগের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে একটী করিয়া কবর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন। একথা সত্য কি না নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়; কিন্তু এখনও বিজাপুরবাসিগণ এ স্থানের অসংখ্য কবর দেখাইয়া এইরূপ গল্প বলিয়া থাকে। এক রকমের অনেকগুলি কবরের একত্র সমাবেশ দর্শন করিয়া দর্শকগণ ইহাকে অলীক কাহিনী বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না।

মেহতর মহল:—১ম আদিলশাহ এক সময় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। অনেক চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিল; কিন্তু পীড়ার কোনরূপ উপশম হইল না। আদিল শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া চিকিৎসকগণকে কোতল করিবার আদেশ দিলেন। তারপর একদিন একজন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বলিতে পার, কি করিলে আমি রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারি?' দৈবজ্ঞ ভাবিল,ভাগ্য পবিবর্ত্তন করিবার পক্ষে ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। দৈবজ্ঞ আদিলকে বলিল 'রাজন্! কল্য প্রাতে যিনি প্রথমে আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন, যদ্যপি আপনি তাহাকে যথেষ্ট ধন রত্ন দান করেন, তবে আপনি—শীঘ্র রোগ হইতে মুক্ত হইবেন।' তারপর দৈবজ্ঞ প্রভাতে উঠিয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইবার আয়োজন করিল; যেন রাজা শয্যাত্যাগ করিয়া তাহারই মুখাবলোকন করেন। কিন্তু দৈবক্রমে সে দিন তাহার নির্দ্ধারিত সময়ে শয্যাত্যাগ ঘটিয়া উঠিল না। আদিল প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দৈবজ্ঞের পরামর্শানুসারে ধন বিতরণ করিবার জন্য যখন বাতায়ন তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন একজন নীচ জাতীয় ঝাড়ুদার মেথর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে তিনি আপন সমক্ষে

আনিয়া অযাচিতভাবে প্রভূত ধন রত্ন দান করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত বদান্যতায় সেই ঝাড়ুদার অবাক হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর সে প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন সমুদায় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল, তখন সে এই রাজপ্রদত্ত অর্থ একটী মসজিদ নির্ম্মাণকল্পে ব্যয় করিতে মনস্থ করিল। তাহারই ফলে যে সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত পাষাণ-নির্ম্মিত মস্‌জিদ্ আজিও বিজাপুর রাজ্যে অন্যান্য অট্টালিকাকে হীন-প্রভ করিয়া দিতেছে, তাহা একদিন কোন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার সন্ধান না লইলেও এই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ তাহাকে একেবারে হতাদর করিতে পারিবে না বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

জুম্মা মস্‌জিদ :—সমুদায় দাক্ষিণাত্যে এমন সুন্দর মস্‌জিদ আর নাই। মস্‌জিদ-দ্বার পারেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। ১৫৮০ খৃঃ আদিল শাহ সাধারণ মুসলমানগণের উপাসনার জন্য নির্ম্মাণ করেন। বৃহৎ অক্ষরে মস্‌জিদের গাত্রে একখানি লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনু-বাদ এই :—"এ জীবনকে বিশ্বাস করিও না; কারণ জীবন সদাই চঞ্চল। এ চঞ্চল জীবনে আবার সমস্তই অস্থির। আমি আমার চক্ষের সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য দেখিতে পাইতেছি। আমার জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছে বটে; এখন ইহা শেষ হইয়া আসিতেছে।" এই মস্‌জিদের চারিপার্শ্বে এখন কয়েকটী মাত্র মৃন্ময় কুটীর বিদ্যমান। এই মস্‌জিদে এক সময়ে একগাছি সুবর্ণ শিকলে মসজিদমধ্যস্থ দীপাধার ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। ১৬৮৬ খৃঃ ঔরঙ্গজেব উক্ত সুবর্ণ শিকল লইয়া যান। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কয়েকখানি বহুমূল্য গালিচা রক্ষিত আছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, এই গালিচা সমূহ প্রথম আদিলসাহের সময়কার।

গোল গম্বুজ :—ইহা একটী পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। ইব্রাহিম

আদিলশাহার পুত্র, মহম্মদ আদিলশাহা ১৬৬০ খৃঃ ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানে সুলতান মহম্মদ এবং তাহার মহিষী কবরিত হন। এই অট্টালিকা উচ্চে ১৭৫ ফিট, ইহার পরিধি ১৩৫ ফিট।

বিজাপুরের পতন :—১৬৮৬ খৃঃ হইতে বিজাপুরের পতন আরম্ভ হয়। তারপর ইহাকে আর কখন ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে দেখা যায় নাই। দাক্ষিণাত্যের এই ঐতিহাসিক নগর ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাই-তেছে। ১৭৯৫ খৃঃ বিজাপুর মহারাষ্ট্রদিগের হস্তগত হয়। সেই সময় হইতে বিজাপুরের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে। বিজাপুরের অতীত সৌভাগ্য আর কখন ফিরিবে কি না, অন্তর্যামীই জানেন।

শ্রীফণীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রাজা হরিনাথের চন্দন।

সুলতানপুর খড়রিয়ার ভূতপূর্ব্ব জমিদার বৈদ্য রায়চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জানকীবল্লভ সরকার বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপা-দিত্যের দরবারে কার্য্য করিয়া পুরস্কার স্বরূপ সুলতানপুর খড়রিয়া ও রাংদিয়া নামক পরগণাদ্বয়ের জমিদারী স্বত্বলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের সহিত সংঘর্ষে প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে যখন সমগ্র যশোহর রাজ্য মোগল বাদশাহের করতলগত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে জানকীবল্লভও বিত্তচ্যুত হইলেন। পরে এই জানকীবল্লভের পৌত্র হরিনাথ দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহের নিকট দরবার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'রাজা' উপাধিসহ পরগণাদ্বয়ের উপর এক ফরমান লাভ করিয়া আবার জমিদারী দখল করিয়া বসিলেন।

রাজা হরিনাথ বৈদ্য কুলীন সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা বিষ্ণুদাশ বংশোদ্ভব ছিলেন; কিন্তু এই বংশীয়েরা বঙ্গীয় কুলীন বৈদ্যের আদি ও প্রধান স্থান সেনহাটী পরিত্যাগ করিয়া মূলঘর গ্রামে বাস করিতে থাকায় স্থানত্যাগ দোষে দুষ্ট হন। অধিকন্তু রাজার বৃদ্ধ প্রপিতামহ নিমদাশ 'দেব' আখ্যাধারী নিম্নশ্রেণীস্থ বৈদ্যবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, অন্যান্য কুলীনবর্গ বিষ্ণুদাশ বংশকে যেন একটু হেয় চক্ষেই দেখিতেন।

এখনকার দিনে জমিদার ও ধনিসম্প্রদায় যেমন বহু অর্থ ব্যয়ে 'রাজা' ও 'রায় বাহাদুর' উপাধি ক্রয় করিতে পারিলেই পরমার্থ লাভ হইল মনে করিয়া কৃতার্থ হয়েন—তখনকার দিনে এমন ছিল না। তখন লোকে অর্থ অপেক্ষা চরিত্র ও আত্মসম্মান এবং 'রাজছত্র' অপেক্ষা 'কুলছত্র'কেই সমধিক মূল্যবান্ ও সম্মানজনক মনে করিতেন। তাই জমিদারী হাতে পাইয়া রাজা হরিনাথ সর্ব্বপ্রথমে সমগ্র বৈদ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে 'চন্দন' নামক সামাজিক ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিলেন। * রাজার আহ্বানে সমগ্র বৈদ্য-সম্প্রদায় মূলঘর গ্রামে সমবেত হইলেন; কিন্তু রাজা হরিনাথকে চন্দন অনুষ্ঠানের দ্বারা বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার

* এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কুলীন অকুলীন সমস্ত বৈদ্য সন্তানকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইলে নির্দ্দিষ্ট দিবসে এক সভার অধিবেশন হয়। এই সভার সর্ব্বপ্রধান স্থানে সমাজপতি এবং তাঁহার উভয়পার্শ্বে সমস্ত বৈদ্যগণ নিজ নিজ কুলগৌরব অনুসারে যথাক্রমে আসন পরিগ্রহ করেন। পরে কর্ম্মকর্ত্তা সভায় আগমন করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে প্রধান কুলাচার্য্য সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মকর্ত্তার ললাটে চন্দন দ্বারা তিলক প্রদান করিয়া ক্রমে সমাজপতি ও উপস্থিত বৈদ্য সন্তানগণের ললাটে তিলক প্রদান পূর্ব্বক, কার্য্য শেষ করেন। এ উপলক্ষে আহূত ব্যক্তিবর্গ বংশমর্য্যাদানুসারে কর্ম্মকর্ত্তার নিকট বিদায় পাইয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই কর্ম্মকর্ত্তা স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণনীয় হন। লেখক।

করিবার আয়োজনে ব্যাপৃত দেখিয়া কুলীনবর্গের সকলেরই গাত্রদাহ উপস্থিত হইল—তবে হরিনাথ তখন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার—কে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবেন? কিন্তু রাজার সফলতা ভগবানেরও বুঝি অভিপ্রেত ছিল না। তাই যশোহর বেন্দানিবাসী কান্নদাসবংশীয় রামকান্ত ঘটক বিশারদ নামক জনৈক যুবক কুলাচার্য্য সমগ্র কুলীন সম্প্রদায়ের মান রক্ষার নিমিত্ত রাজার অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামকান্ত নির্ভীক, সুকবি ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। রাজদ্বেষী কুলীনবর্গ তাঁহার কৃতকার্য্যতার উপর নির্ভর করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজবাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। সমগ্র বৈদ্য সন্তানসহ সমাজপতি ও স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তা রাজা হরিনাথ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে কুলাচার্য্য রামকান্ত নিম্নলিখিত শ্লোকে সভা বর্ণন করিলেন :—

সভাবিরিঞ্চের্ম্মধুসূদনস্য সেয়ং তৃতীয়া শশিশেখরস্য।
শক্রস্য তূর্য্যা তব পঞ্চমীয়ং ষষ্ঠী ন গোষ্ঠী নরনাথ আস্তে॥

সভাবর্ণন শেষ করিয়া রামকান্ত আসন পরিগ্রহ করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'সভায় সমস্ত বৈদ্য সম্প্রদায় উপস্থিত হইয়াছেন কিনা'। রাজার প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন—সকলের ব্যগ্র দৃষ্টি রামকান্তের উপর নিপতিত হইল—সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্ভীক যুবক রামকান্ত সতেজে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন :—

'সমাগতা ন দেবা নরদেবসংসদি'

রামকান্তের উত্তর দ্ব্যর্থবোধক। সরল অর্থে—"হে নরদেব! আপনার সভায় দেবতারা ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। আর

ব্যঙ্গ অর্থে—'হে নরদেব! আপনার সভায় আপনার পিতামহের মাতুল বংশীয় দেব উপাধিধারী বৈদ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দন কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া রাজা হরিনাথ বৈদ্যসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেন, কোন কুলীনেরই এ সদিচ্ছা ছিল না; সুতরাং রামকান্তের উত্তর ব্যঙ্গার্থে গ্রহণ করিয়া হরিনাথের কুলযজ্ঞ বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সকলেই করতালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সে করতালি ও হাস্য ক্রমে কারণানভিজ্ঞ জনসঙ্ঘের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করিয়া সভাস্থলে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হওয়ায় সভাভঙ্গ হইয়া গেল।

রাজা ও রাজশুভানুধ্যায়িগণ সে বিশৃঙ্খলতা নিবারণকল্পে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন—কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা! কোলাহলময় জনস্রোত বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় সবেগে সভাস্থল হইতে বহির্গত হইয়া রাজার সে চেষ্টা সামান্য তৃণ খণ্ডের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। কুলীন বর্গের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। রাজা হরিনাথ বড় আশা করিয়াছিলেন—কুলযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া তিনি স্বসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন—কিন্তু ভগবান্ বাদী, তাঁহার সে আশা পূরিতে পূরিতেও পূরিল না—ইহাকেই বলে অদৃষ্ট!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

বর্ত্তমান মূলতান।

প্রাচীন মূলতান শীর্ষক প্রবন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রতিপাদিত উক্তির দ্বারা পুরাতন কশ্যপপুর (আধুনিক মূলতান) নামক হিন্দু নগরের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন মূলতানে যে সমুদায় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি, সে সমুদায় গ্রন্থ ব্যতীত আরও বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থে মূলতানবিষয়ক বহুতর ঐতিহাসিক তত্ত্বের উল্লেখ দেখা যায়। সে সমুদায় বিষয়ের অবতারণা করিলে, ক্ষুদ্র 'ঐতিহাসিক চিত্রে' নিতান্তই স্থানাভাব হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস ; সুতরাং মূলতানের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদক ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগে প্রবন্ধকে অযথা গুরুত্বে পরিণত করা কথনই উচিত হইবে না। আমি সংক্ষেপে মূলতানের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় আলোচনায় অতীতের সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, 'বর্ত্তমান মূলতান' শীর্ষক প্রবন্ধ শেষ করিব। তৎপরে আর একটী প্রবন্ধে মূলতানের অধীনস্থ প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ, হিন্দু দেবমন্দির ও মুসলমান মস্‌জেদের আলোচনা করিয়া, মূলতান সম্বন্ধে আমার সমুদায় বক্তব্য শেষ করিব।

প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিনিয়ত 'ভাঙ্গা গড়া' চলিতেছে। আজ যে স্থানে অত্যুন্নত পর্ব্বত কঠিন ধরিত্রী অঙ্গভেদ করিয়া উঠিতেছে, কে বলিতে পারে যে, সহস্র বৎসর পরে সে স্থানে পর্ব্বতের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া, এক বিজন অরণ্য অথবা জনাকীর্ণ নগর শোভা পাইবে না ? সুতরাং সেই ঐতিহাসিক মূলতান যে আজ আমাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে তাহার স্থবির কলেবর সর্ব্বংসহা পৃথিবীর জঠরে লুকায়িত করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইতে পারে, ইহা একান্ত অবিশ্বাস্য নয়। প্রত্যুত স্থানে স্থানে দুই একটী প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন ব্যতীত আর অতীত মূলতানের চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান নাই। সে প্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দির যাহা এক দিন কত শত হিন্দুর নিকট সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া

চিত হইত, তাহা আজ অতীতে মিশাইয়াছে! যে মাল্লী বীরগণ এক দিন বিশ্ববিজয়ী আলেকসন্দরের সম্মুখে উন্নত মস্তকে 'উচ্চেতুলি" দাঁড়াইয়াছিলেন, যাঁহারা দেহের শোণিত অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয়তর জানিয়া, জননী জন্মভূমির হোমকুণ্ডে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? প্রাচীন মূলতানের সহিত তাঁহারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছেন!

বর্ত্তমান মূলতান চেনাব নদীর তীরভূমি হইতে চারি মাইল দূরে, প্রাচীন ধ্বংস স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান মূলতান নগরী যে অতীত ঐতিহাসিক মূলতান, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে, Cunningham প্রমুখ ব্যক্তিগণকে নানা বাদানুবাদের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিল। সে সমুদায় বিষয়ের অবতারণা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য Major Rennel এর অভিমত নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

বর্ত্তমান মূলতান নগরীতে প্রাচীনত্বজ্ঞাপক সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া Major Rennel বর্ত্তমান মূলতানকে আধুনিক নগর বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—প্রাচীন মূলতান ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছে। তোলাম্বার (Tolamber) যে ধ্বংস স্তূপ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রাচীন মূলতানের শেষ নিদর্শন। প্রত্যুত তিনি বর্ত্তমান মূলতানের সহিত অতীত মূলতানের কোনরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু বহু আলোচনা ও ভূপৃষ্ঠ খনন দ্বারা (Archæological Survey)-Cunningham. শেষে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মূলতানই যে মাল্লীগণের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর, সে বিষয় আমার কোন সংশয় নাই। * আলেকসন্দরের

* I am quite satisfied that the Capital City of the Malli was the modern City of Multan.

মূলতান আক্রমণের বিষয় আলোচনা করিয়া ও অতীত মূলতানের সীমা নির্দ্দেশের দ্বারা Burnes প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পর্য্যাটকগণও কনিংহামের মত সমর্থন করিয়াছেন।* এই সমুদায় পণ্ডিতগণের আলোচনার ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, চেনাব নদীর উপকূল হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত বর্ত্তমান মূলতান কশ্যপপুরের নামান্তর মাত্র। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে, ইহার সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিলেও এবং কালের প্রভাবে ইহার প্রাচীনত্বজ্ঞাপক প্রাচীন কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইলেও, বর্ত্তমান মূলতান যে অতীত মূলতানের অনুবৃত্তি মাত্র, সে বিষয়ে বৈদেশিক পণ্ডিতগণের আর কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান মূলতান অত্যুন্নত প্রাকারোপরি অবস্থিত। বহু শতাব্দী অর্জ্জিত ধ্বংসস্তূপে ও আবর্জ্জনারাশির দ্বারা ধীরে ধীরে এই উন্নত ভূভাগ গঠিত হইয়াছে। নগরের তিন দিকে কঠিন প্রাচীর বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় শত্রুহস্ত হইতে নগরকে রক্ষা করিবার জন্য দুরন্ত কালের প্রতাপ-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া আজিও দণ্ডায়মান। বর্ত্তমান মূলতান নগরীর পরিধি প্রায় তিন মাইল। উপনগর (Suburbs) সমূহের পরিধি প্রায় ২ মাইল; সুতরাং প্রকৃত পক্ষে উপনগর সমন্বিত সমগ্র মূলতানের পরিধি প্রায় পাঁচ মাইল। হুয়েন সাং মূলতান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মূলতানের প্রসঙ্গে মূলতানের পরিধি প্রায় পাঁচ মাইল বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব মূলতানের বর্ত্তমান পরিধির সহিত হুয়েন সাং প্রদত্ত প্রাচীন মূলতানের পরিধির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। সাহাজান বাদসাহার কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বক্সের শাসনকালে মূলতান প্রাচীর বেষ্টনীর দ্বারা সুরক্ষিত হয়; সুতরাং প্রায় তিন শত বৎসর প্রাচীর-গুলি কালের প্রভাব সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান।

"তোয়ারিক জিলা মূলতান" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে মুন্সী হুকম্ চাঁদ নামক জনৈক ব্যক্তি মূলতানের ঐতিহাস প্রসঙ্গে বলেন যে, সুদূর

* Travells into Bokhara Vol. III.

অতীতে সত্যযুগে হিরণ্যকশ্যপ নামে জনৈক হিন্দু নরপতি মূলতানে বাস করিতেন। মূলতান নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে মূল (মাল্য) নামক জাতি মূলতানের আদিম অধিবাসী। তাহাদিগের নাম হইতেই মূল স্থান অথবা মূলতান নামের উৎপত্তি। এই মূলতানে নানা ঐতিহাসিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রচলিত একটী প্রবাদ হইতে উক্ত মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। সে প্রবাদটী এই :—

হংসপুর, ভাগপুর, শ্যামপুর
চৌথা মূলতান
পঞ্চয়ানপুর ভাজকীর্ত্তি সি
আরীপুর সুলতান।

"প্রাচীন মূলতান" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, মূলতান নাম আধুনিক। বর্ত্তমান মূলতান পূর্ব্বে হংসপুর ভাগপুর প্রভৃতি নামের দ্বারা পরিচিত হইত। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে (ফেরিস্তা ব্যতীত) হংস নামক জনৈক হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক হংসপুর, বর্ত্তমান মূলতান নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। পাঁচশত বৎসর ধরিয়া হংসপুর সুশাসিত রাজ্যরূপে প্রসিদ্ধ ছিল ; কিন্তু ইহার পর হংসপুরের পতন হয়। পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বর্ত্তমান বহু লোকাকীর্ণ মূলতান প্রাণিশূন্য প্রান্তরে পরিণত ছিল। রাজা শ্যাম প্রেমনাথ নামক জনৈক হিন্দু নরপতি মূলতানে রাজ্য স্থাপন করায়, ইহা পুনরায় সমৃদ্ধি-শালিনী নগরীতে পরিণত হয়। ভগত কিসন ও শ্যাম প্রেম সিংহ কর্ত্তৃক মূলতান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইহা যথাক্রমে ভগতপুর ও শ্যামপুর নামে অভিহিত হয়। শ্যামপুর নদীগর্ভে বিনষ্ট হইলে কেবলমাত্র উচ্চ ভূখণ্ডে অবস্থিত মূলতানের দুর্গ রক্ষা পায়। পুনরায় পাঁচশত বৎসর পরে মুর নামক জনৈক নরপতি হিন্দুস্থান হইতে মৃগয়া ব্যপদেশে এই স্থানে উপনীত হইয়া বর্ত্তমান

মূলতান নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া, অনেকে বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমান মূলতান নগরীর পূর্ব্বদিকে প্রাচীন মূলতান অবস্থিত ছিল। এই নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে ধ্বংসস্তূপ সমূহ বহু বিস্তৃত; অনেকের বিশ্বাস যে—বর্ত্তমান মূলতান যে আধুনিক নগর, ইহা প্রতিপাদনের পক্ষে উক্ত ধ্বংসস্তূপ যথেষ্ট কারণ। আমরা পূর্ব্বেই কনিংহাম প্রমুখ ব্যক্তিগণের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, বর্ত্তমান মূলতান যে প্রাচীন কশ্যপপুর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং আমরা উক্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণের সহিত একমত হইতে পারিলাম না।

মূলতান এক্ষণে পঞ্জাব প্রদেশের একটী প্রধান নগর। ইহা অক্ষা ৩০° ১২′ উঃ এবং দ্রাঘি ৭১ ৩০′ ৪৫″ পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নগরের তিন দিক্‌ই উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। নগরের দক্ষিণ দিকে কোন প্রাচীর নাই। ক্ষীণকায়া ইরাবতী নগরের দক্ষিণ দিক দিয়া, মন্থর গমনে প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নদীর গতি ও প্রাচীন স্থানীয় নদীগর্ভ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টতঃ অনুমিত হয় যে, তৈমুরলঙ্গের ভারত আমক্রণ কালে এই নদী নগরের পাঁচক্রোশ দক্ষিণে চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত ছিল। নগর সম্মুখস্থ ঐ নদীর গতি পরিবর্ত্তন কালে দুইটী দ্বীপ গঠিত হয়। তাহারই উপর সৌধমালা বিভূষিত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মূলতানের দুর্গ সুগঠিত ছিল। এই দুর্গের পরিধি প্রায় ৬৬০০ ফিট। ১৮৫৪ খৃঃ ইংরেজ-সেনাদল এখানকার প্রাকারাদি ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তথাপি দুর্গের দুর্ভেদ্যতা আদৌ নষ্ট হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহার চারিটী দ্বার দৃষ্ট হয়—যথা খিজিরি দ্বার, দে দ্বার, রাড়ীদ্বার ও সিকি দ্বার। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের সময় মূলতানের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সৈয়দ খিজির খাঁ পশ্চিমদিকস্থ যে দ্বার নির্ম্মাণ করেন, তাহাই তাঁহার নামানুসারে খিজির দ্বার নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত দেওল মন্দির হইতে দে দ্বারের নামোৎপত্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

—"সিক্কা মূলতান" হইতেই সিক্কা দ্বারের উৎপত্তি। আমার 'প্রাচীন মূলতান' প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি—সিন্ধু ও আরবদেশীয় ঐতিহাসিকগণ মূলতানকে সিক্কা মূলতান নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই ঐতিহাসিক প্রাচীন দুর্গ বর্ত্তমান সময়ে অত্যাচারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে একদল ইংরাজসৈন্য অবস্থান করিয়া থাকে।

মুসলমানগণ মূলতানে প্রায় ১২ শত বৎসর রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁহারা হিন্দু প্রাধান্যের কোন চিহ্ন রাখেন নাই বলিলেই হয়। হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-কল্পে কত যে অমানুষিক অত্যাচারে ভারতের ইতিহাস মুখরিত, তাহা স্মরণ করিলেও দুঃখ ও ক্ষোভে বিচলিত হইতে হয়। বহুকালের আচার সম্মত গগনস্পর্শী দেব মন্দির ভঙ্গ করিয়াই যে তাঁহারা ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানগণের শাণিত অসিমুখে কত নরনারী যে অকালে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এককালে নর-শোণিতে পৃথিবী প্রকৃতই রুধিরাক্ত হইত। এই ধন-মদোন্মত্ত মুসলমানগণের বহুকাল শাসনাধীন থাকিয়া, যে মূলতান তাহার অতীত সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? মুসলমান নরপতিগণের সর্ব্বগ্রাসী হস্ত হইতে যে কয়েকটী দেবমন্দির কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে নষ্ট হয়। এই নরপতি—মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকল্পে—মূলতানসহ যাবতীয় প্রাচীন দেবমন্দির ধ্বংস করেন। যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দেন। প্রায় ১০,০০০ হিন্দু তাহার কঠোর আদেশে মানবলীলা সম্বরণ করেন।*

মূলতান নগরের ছয়টী দ্বার দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে আরও চারিটী দ্বার

* The land of the five Rivers and Sindh by Dovid Ross.

ছিল এবং এক্ষণে স্থানে স্থানে তাহাদিগের সামান্য চিহ্ন ব্যতীত তাহাদিগের পূর্ব্ব স্মৃতি রক্ষা করিবার পক্ষে আর কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান ছয়টী দ্বারের নাম এই:—দিল্লীদ্বার, দৌলতদ্বার, লাহোরীদ্বার, বোহারদ্বার এবং পাকদ্বার। ১৭৫৬ খ্রীঃ নবাব আলীমহম্মদ এই সমুদায় দ্বার "মেরামত" করিয়া, কালের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে মুলতান রেশম ও তূলার জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐ সময়ে তূলা, নীল ও রেশম প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ মুলতানবাসিগণ অবাধে সুদূর আরব প্রভৃতি প্রদেশে লইয়া যাইয়া বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে স্বদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিত। পরে ঐ সমুদায় দ্রব্য ফোনেসিয়া ও সুদূর য়ুরোপ খণ্ডে প্রেরিত হইত। আরবগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ব্যবসাসূত্রে ভারতে যাতায়াত করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও মুলতান তূলা নির্ম্মিত দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে স্বর্ণ খচিত সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত যেরূপ সুন্দর "লুঙ্গী" পাওয়া যায়, সেরূপ কারুকার্য্য বিশিষ্ট "লুঙ্গী" ভারতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত চীন দেশীয় পোর-সিলিন নির্ম্মিত এক প্রকার সুন্দর মসৃণ পাত্রের ব্যবহার মুলতানে বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, তৈমুরঙ্গের পত্নী চীনে ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তিনিই মুলতানবাসীকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে মুলতানে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মুলতানবাসীরা এই সকল শুভ্র মসৃণ পাত্রের উপর নানা প্রকার কারুকার্য্য করিয়া পাত্রগুলিকে সত্যই ক্রেতার নিকট লোভনীয় করিয়া তুলে। বহু শত শ্বেতপুঙ্গব ঐ সমুদায় পাত্র গৃহসজ্জার পক্ষে সৌখীনতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিশ্বাস করেন। ক্রমশঃ

বৈদ্যবাটী, যুবক-সমিতি। } হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চ্চা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খঃ পূঃ ৩২০—২১২

আলেকজেণ্ড্রিয়ার বিজ্ঞান বিদ্যালয়—সৌরকক্ষ এবং রাশিচক্র—
এরিস্‌টারচাস্‌—ইউক্লীড্‌—আর্কিমিডিস্‌।

এরিস্‌টট্‌ল্‌ যে সময় এথেন্স নগরে বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলেন, গ্রীকগণ ঠিক সেই সময়ই মহাবীর আলেকজেণ্ডারের সেনাপতিত্বে মিসর দেশে রাজ্য বিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন। মহাবীর আলেকজেণ্ডার মিসর প্রদেশে রাজ্য সংস্থাপন করিয়া ভূমধ্য সাগরের উপকূলে নিজ নামে একটী নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই তন্নামখ্যাত নগর—আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া, মহাবীরের অন্যতম প্রধান সেনাপতি টলেমী লেগাসের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। টলেমী লেগাসের মৃত্যুর পর ঐ বংশের কয়েকজন রাজন্যবর্গ, ক্রমে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই টলেমী বংশধরগণ বিদ্যা ও বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আলেকজেণ্ড্রিয়াতে যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

আলেকজেণ্ড্রিয়ার বিজ্ঞান বিদ্যালয়।

এই সময় গ্রীকগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে বহুবিধ তত্ত্ব শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তন্মধ্যে কতকগুলি তত্ত্ব মিসর দেশবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ।

তাঁহারা সৌরকক্ষ বা গগনমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির মধ্য দিয়া সূর্য্যের বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান (apparent) বার্ষিক গতি বৃত্তাকারে অঙ্কিত করেন।

(১) সৌরকক্ষ

এই সূর্য্যপথ তাহারা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটীকে এক একটী নক্ষত্রপুঞ্জের নামানুসারে আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জ আকৃতির অনুরূপে অধিকাংশই পশ্বাদির নাম গ্রহণ করিয়াছিল। যথা—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা. বৃশ্চিক, ধেনু, মকর, কুম্ভ, মৎস্য এই দ্বাদশটী নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা গঠিত বৃত্তকেই আমরা রাশিচক্র বলিয়া থাকি।

(২) রাশিচক্র

সূর্য্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ একই সময় দৃষ্ট হয় না বলিয়া গগনমণ্ডলে নক্ষত্র-রাজির মধ্য দিয়া সূর্য্যের গতি নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। এই নিয়মে তাহারা সান্ধ্য সময়ে সূর্য্য উদয় ও অস্তগমনের প্রাক্‌কালে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী তারকাসমূহ নিরীক্ষণ করিতেন। প্রতিদিনই এই সকল তারকারাশির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সম্বৎসরে ক্রমে দ্বাদশরাশির পরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়াছিলেন।

এইরূপে তাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সূর্য্য সম্বৎসরে দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণ করে; কিন্তু বালক দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথে আরোহণ করিলে যেরূপ ভ্রমে পতিত হয় যে, ঐ রথ (রেলগাড়ী) স্থির রহিয়াছে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গৃহ ও বৃক্ষাদি সবেগে ছুটিয়া যাইতেছে, তদ্দ্রূপ গ্রীকগণও সূর্য্য ও পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

সূর্য্য ও পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে গ্রীকগণের মত

এরিস্‌টার্চাস্ ৩০০ খৃঃ পূঃ

আমরা অধুনা পৃথিবীর যে গতি প্রকৃত বলিয়া মনে করি, গ্রীক-

জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণের মধ্যে একমাত্র এরিস্টার্চাস প্রথম সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে সামস্‌নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে আগমন করিয়া বাস করিতেছিলেন। পরে কোন এক টলেমী বংশধরের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত ছিলেন।

জীবন বৃত্তান্ত

সূর্য্য নক্ষত্রাদির ন্যায় স্থির ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং পৃথিবী সূর্য্য কক্ষের (ecliptic) চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া তিনি শিক্ষা দিতেন।

জ্যোতিষ
(১) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর গতি।

তিনি ইহাও জানিতেন যে, পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে সৌর কক্ষের উপর ঠিক লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকে না। উহা ঐ কক্ষের উপর চক্র বা তের্চ্ছাভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর মধ্য দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সরল রেখা অঙ্কিত করা যায়, তদুপরি সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কক্ষের (ecliptic) উপর পৃথিবীর এই চক্র অবস্থানের জন্যই ঋতুভেদ পরিলক্ষিত হয়।

(২) পৃথিবীর মেরুদণ্ড ও তাহার অবস্থানের প্রকৃতি।

(৩) ঋতুভেদের কারণ

কোন একটী প্রদীপকে সূর্য্যস্বরূপ ও পৃথিবীকে কমলা লেবুর ন্যায় কোন একটী গোলাকার পদার্থ মনে করিয়া পৃথিবীকে বক্র অবস্থানে যদি ঐ আলোর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করাইতে থাকি, তবে এই ঋতুভেদ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

কমলালেবুর দুই প্রান্তভাগ বা চাপা অংশের মধ্য দিয়া যদি একটী শলাকা বিদ্ধ করা যায় এবং উহা অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা আবদ্ধ করতঃ লম্বভাবে দণ্ডায়মান না করিয়া যদি অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী হইতে শরীরের নিকট-

বর্ত্তী স্থানে রক্ষা করা যায়, তবে ঐ শলাকা বক্রভাবে দণ্ডায়মান হইবে। আমরা এই প্রান্তভাগ বা চাপা অংশকেই পৃথিবীর মেরুপ্রান্ত ও এই বিদ্ধ শলাকাকেই মেরুদণ্ড বলিয়া থাকি। এক্ষণে আমরা যদি ঐরূপ বক্রভাবে দণ্ডায়মান কমলালেবুকে (পৃথিবী) যদি প্রদীপের (সূর্য্যের) চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া লেবুতে পতিত আলো ও ছায়া পরিলক্ষ্য করিতে থাকি, তবে দেখিতে পাইব—কোন সময় উত্তর চাপা অংশ (মেরুপ্রান্ত) আলোর প্রমুখ হওয়ায় তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই সময় দক্ষিণ চাপা অংশ (দক্ষিণ মেরু) আলো হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই সময় সূর্য্যের রশ্মি উত্তর ভাগে লম্বভাবে পতিত হওয়ায় তথায় গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণভাগে তির্য্যক্ (তের্চ্ছা) ভাবে পতিত হওয়ায় তথায় শীতকালের প্রাদুর্ভাব হয় এবং উত্তর মেরুপ্রান্ত বহুদিন সম্পূর্ণ উজ্জ্বল থাকাতে গ্রীষ্ম-কালের লম্বা দিন ও দক্ষিণ মেরুপ্রান্ত বহুদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় শীত-কালের লম্বা রাত্রি ভোগ করিতে থাকে।

(ক) গ্রীষ্মকাল।

তৎপর ঐ লেবু ঐরূপ অবস্থাতে দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণ করাইয়া বৃত্তের চতুর্থাংশ স্থানে আসিলেই উভয় মেরুপ্রান্ত সমান আলো প্রাপ্ত হওয়ায় পৃথিবীর উত্তরভাগে শরৎ ও দক্ষিণভাগে বসন্তকালের সমাগম হয়।

(খ) শরৎ

পুনর্ব্বার ঐরূপে পরিভ্রমণ করিয়া বৃত্তের পরবর্ত্তী চতুর্থাংশ স্থানে আসিলেই দক্ষিণ মেরুতে গ্রীষ্মকাল ও উত্তর মেরুতে শীতকালের প্রাদুর্ভাব হয়।

(গ) শীতকাল

এইরূপে ক্রমে চতুর্থ বা শেষ অংশের প্রারম্ভে আগমন করিলেই পুনর্ব্বার উভয় মেরুপ্রান্ত সমান আলো প্রাপ্ত হওয়ায় উত্তর ভাগে বসন্ত ও দক্ষিণভাগে শরৎকালের সমাগম হয়।

(ঘ) বসন্তকাল

পৃথিবীর কক্ষের উপর উহার মেরুদণ্ডের বক্র অবস্থানের জন্যই যে ঋতু-ভেদ হইয়া থাকে, এই তত্ত্ব এরিস্টার্চাসই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর দৈনিক ঘুরিয়া আসার জন্য যে দিনরাত্রি ভেদ হইয়া থাকে, তাহা গ্রীক্‌গণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় প্রথম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(৪) দিবা রাত্রি ভেদ

গ্রীক্‌গণ তাহার এই আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহ বিশেষতঃ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ যদি উপলব্ধি করিতেন, তবে বোধ হয় জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহারা আরও বহুবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাহার এই সকল আবিষ্কৃত তত্ত্ব কেহই বিশ্বাস করেন নাই ও তৎপর ১৭০০ বৎসর পরে কোপারনিকাস্ এই প্রধান তত্ত্ব পুনরায় আবিষ্কার করেন। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ বিষয়ে এই সমুদয় গ্রীক কল্পনাকে "পিথ্যাগোরিয়ান মত" বলা হয়; কারণ পিথ্যাগেরা'স্ এই তত্ত্ব সমুদয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে অনুমান করিয়া হইয়াছি; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, পৃথিবী শূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বটে; কিন্তু উহা যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

পিথ্যাগোরিয়ান মত

ইউক্লিড্ ৩০০ খৃঃ পূঃ।

আমরা ইউক্লিডের ন্যায় বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যামিতিবেত্তার নাম উল্লেখ না করিয়া খৃষ্টীয় পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী অতিক্রম করিতে পারিলাম না। তিনি আলেকজেণ্ড্রিয়াতে প্রায় খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বহুবিধ প্রতিজ্ঞা সঙ্কলন করিয়া তাহার "ইউক্লিডের জ্যামিতি" নামে বিখ্যাত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। আমরা তাঁহার এই জ্যামিতিই অধুনা প্রত্যেক বিদ্যার্থীর হস্তে দেখিতে পাই।

১) গণিত—জ্যামিতি।

তিনি যে সমুদায় গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান

করা আমাদের পক্ষে একান্ত দুরূহ। কিন্তু আমরা তাহার অন্যান্য

২) অন্যান্য গ্রন্থাবলী। পদার্থ বিজ্ঞান। 'আলোক রশ্মি।

আবিষ্কৃত তত্ত্বের মধ্যে "আলোক রশ্মি সরল-রেখাক্রমে গমন করে" এই একমাত্র তত্ত্ব উল্লেখ করিতে সক্ষম হইলাম।

যদি একটী সূর্য্যরশ্মি কোন একটী ধূলি সংযুক্ত অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই—ঐ রশ্মি সরল-রেখাক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া তৎপথমধ্যাস্থিত বালুকাকণাগুলিকে উজ্জ্বল করতঃ ভূমি বা দেওয়ালে পতিত হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিলেই দেখিব, সূর্য্যের কেন্দ্র ছিদ্রের মধ্যস্থল ও আলোকিত স্থানের মধ্যবিন্দু একেই সরলরেখায় অবস্থান করিতেছে।

থিওফ্রেটাস্ ৩৭১ খৃঃ পূঃ

থিওফ্রেটাস্ এরিস্‌টটলের একজন ভক্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি

জীবন বৃত্তান্ত।

৩৭১ অব্দে ইরিসাস নগরে জন্মগ্রহণ করেন ও জীবনের অধিকাংশ সময়েই উদ্ভিদ্ বিদ্যা আলোচনা করিয়াছিলেন।

তৎকালে যে সমস্ত গাছ গাছড়া কেবলমাত্র ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইত, তদ্ভিন্ন অন্যান্য উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে গ্রীকগণের কোনও বিশেষ জ্ঞান

উদ্ভিদ্ বিদ্যা। শ্রেণী বিভাগ—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ইত্যাদি।

ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু থিও-ফ্রেটাস্ অন্যূন পাঁচ শত (৫০০) বিভিন্ন গাছ গাছড়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া যান।

থিওফ্রেটাস্‌ই প্রথম উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ বলিয়া কথিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

"ঔরঙ্গজেব ও তদীয় বিদ্যাগুরু।"

(ঔরঙ্গজেব সম্রাট-পদে সমাসীন হইলে তদীয় বিদ্যাগুরু মোল্লা সালহ্ কোনও পদাধিকার লাভের আশায় তৎসমীপে উপস্থিত হয়েন। তদুপলক্ষে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। ইহা হইতে ধর্ম্মান্ধ ঔরঙ্গজেবের গভীর রাজনীতিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।)

সালহ্। জাঁহাপনা! আপনার রাজ্যলাভে যে আমি কি পরিমাণে আনন্দিত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিতে আপনিই সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি।

সম্রাট। সকলই ভগবানের ইচ্ছা। তাঁহারই ইচ্ছায় আজ আমি দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় হয়ত কালই পথের ভিখারী হইতে পারি। তাঁহার অনন্ত মহিমা কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে?

সালহ্। জাঁহাপনা! আমি আপনার বাল্যকালের শিক্ষাগুরু। বিধাতা যোগ্য ব্যক্তিকেই দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছেন। জাঁহাপনার এ যোগ্যতা কেবল আমারই প্রদত্ত শিক্ষার ফল। সুতরাং আশা করি যে জাঁহাপনা যাঁহার শিক্ষায় ভগবান কর্ত্তৃক এই বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত কর্ণধার বিবেচিত হইয়াছেন, আপনার সেই বাল্যকালের শিক্ষাগুরুকে কোনও উচ্চপদদানে পুরস্কৃত করিবেন।

সম্রাট। মোল্লাজী! আপনি আমার নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন? আপনি কি মনে করিতেছেন যে আমার আপনাকে একজন আমীর করিয়া দেওয়া উচিত? উত্তম—আমি এ বিষয়ের বিচার করিতেছি। আমি একথা মানিয়া লইতেছি যে, আপনি যদি আমাকে কোন উত্তম এবং উপযোগী শিক্ষা দিতেন, তবে অবশ্যই আপনি কোন উচ্চপদ পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইতেন। কিন্তু এ কথাতো বলুন যে আপনি আমাকে কি শিখাইয়াছেন? আপনি ইহাই শিখাইয়াছেন যে, সমগ্র ইউরোপ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের তুল্য; তাহার মধ্যে পর্ত্তুগালের রাজা

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ; তাহার পরে হলাণ্ড এবং তৎপরে ইংলণ্ড। ফ্রান্স, এন্দলুসিয়া প্রভৃতি দেশের নরপতিদিগের সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নরপতিদিগের অপেক্ষা ইহারা বড় নহে। এ দেশের বাদসাহীর সাম্‌নে অন্যান্য দেশের বাদ্‌শাহী অতি তুচ্ছ। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং সাহজাঁহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিলেন এবং ফরেস্, উজবেক্, কাশগড়, চীন, তাতার, পেগু এবং শ্যামদেশের নরপতিবৃন্দ বাদসাহ হিন্দের নাম শুনিতেই কম্পমান হইতেন। মহান্ ভূগোলবেত্তা! অদ্ভুত ইতিহাসজ্ঞ! আমার শিক্ষকের কি পৃথিবীর সমগ্র নরপতিদিগের প্রকৃত তথ্য সকল যথাযথ বিবৃত করা তাঁহাদিগের সেনাসামগ্রী এবং সম্পত্তির বর্ণনা করা, তাঁহাদিগের যুদ্ধ প্রণালী সামাজিক আচার ব্যবহার, ধার্ম্মিক বিচার এবং রাজ্য পদ্ধতির বিবরণ বিবৃত করা উচিত ছিল না? যথারীতি ইতিহাস শিক্ষা দিয়া প্রত্যেক রাজ্যের উৎপত্তি, উন্নতি এবং অবনতির কারণ সমূহ আমার নিকট বর্ণনা করা এবং আকস্মিক ঘটনা ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় দোষগুলির বর্ণনা করিয়া তাহার জন্য কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তন হইল, কোন্ কোন্ ক্ষতিবৃদ্ধি সাধিত হইল এবং দেশের উপর তাহার প্রভাবই বা কিরূপ বিস্তৃত হইল, এ সকল বিষয় বিবৃত করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল না? মনুষ্য জাতির ইতিহাস আমাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া ত দূরে থাকুক, আমার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি এই বিস্তীর্ণ ভারত-সাম্রাজ্যকে লণ্ড ভণ্ড করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্তও ভাল করিয়া বলেন নাই। তাঁহাদিগের জীবনচরিতের বিষয়ে, তাঁহাদিগের বাদসাহ হইবার কারণীভূত ঘটনা সমূহের বিষয়ে এবং তাঁহাদিগের বিজয়ী হইবার মূল সাধনের বিষয়ে আপনি আমাকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে রাখিয়াছেন। প্রতিবেশী দেশ সমূহের ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকা নরপতিদিগের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয়;

কিন্তু আপনি আমাকে সে সব কিছুই না শিখাইয়া কেবলমাত্র আরবী পড়াইতেন। এই কার্য্য করায় আপনি বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন যে, আপনি আমার কতই উপকার সাধন করিলেন। এই ভাষা শিক্ষার জন্য আমার বহু সময় আপনি বৃথা খরচ করিয়াছেন। আপনি একথা বুঝিতেন না যে, দশ বার বর্ষ পরিশ্রম না করিলে এই দুরূহ ভাষায় কেহই যোগ্যতালাভ করিতে সক্ষম হয় না। আপনি জানিতেন না যে, একজন সম্রাটের কোন্ কোন্ উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা হওয়া দরকার। আপনি ইহাই মনে করিয়াছিলেন যে একজন বড় বৈয়াকরণের যতখানি ব্যাকরণ শিক্ষার দরকার, একজন বাদসাহের পক্ষেও ততখানিই। আপনি আমার বাল্যকালের অমূল্য সময় এই প্রকার নীরস, অনুপযোগী এবং অন্তঃসারশূন্য শব্দ সমূহের উচ্চারণে বৃথা খরচ করিয়াছেন।

বাল্যকালের প্রদত্ত শিক্ষা যে লোকে কখন বিস্মৃত হয় না, তাহা কি আপনি জানিতেন না? সে সময় স্মরণশক্তি অতিশয় প্রবল থাকে, এইজন্য তৎকাল প্রদত্ত শিক্ষা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই সময় যদি উত্তম শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে মনুষ্য জীবন-সংগ্রামে অনেক মহৎ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। আচ্ছা—বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা কি কেবল আরবী ভাষাতেই দেওয়া যায়? ঈশ্বরের ভজন পূজন এবং বিদ্যাধ্যয়ন কি আমার মাতৃভাষায় হইতে পারে না!

আপনি আমার পিতা সাহজাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি আমাকে তত্ত্ব বিদ্যা এবং দর্শন শাস্ত্র পড়াইতেছেন। ইহা সত্য বটে। আমার বেশ মনে আছে যে, বহুকাল পর্য্যন্ত মূর্খতাপূর্ণ এবং নিরর্থক বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া আপনি আমার মগজ খালি করিয়া দিতেছিলেন। আপনি আমাকে এমনই সমস্ত বিষয় শিখাইয়াছেন যে তাহার কখনও কোন দরকার হয় না এবং তাহা হইতে মনুষ্যের কিছুমাত্র সন্তোষ জন্মে না। আপনি এমনই সমস্ত কল্পনা দ্বারা আমার মগজ পূর্ণ

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সে সমুদয় একেবারেই নিঃসার পদার্থ। তাহা বহু পরিশ্রমে অভ্যাস করিলেও শীঘ্রই ভুলিয়া যাইতে হয় এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যের বুদ্ধি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। হাঁ, আপনি আপনার প্রিয় তর্কবিদ্যা আমাকে শিখাইয়াছিলেন, যাহাতে আমার জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন আমি আপনার নিকট হইতে পৃথক হইলাম, তখন কতিপয় অর্থহীনা ক্লিষ্ট এবং দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ভিন্ন আপনার বিজ্ঞান-বিস্তার আর কোন কথাই আমার স্মরণ থাকিল না। যদি আপনি আমাকে এমন তর্ক-প্রণালী শিখাইতেন যাহাতে কার্য্য কারণপ্রধান বলিয়া গণ্য হয় এবং যে পর্যান্ত কোন বস্তুর সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত চিত্তের সন্তোষ হয় না; যদ্যপি আপনি আমাকে এমন শিক্ষা দিতেন, যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, এবং যাহার জন্য বিপদের সময় মনুষ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সমর্থ হয়; যদি আপনি আমাকে মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম শিখাইতেন; সৃষ্টির তত্ত্ব সমূহ শিক্ষা দিতেন এবং উহার উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বর্ণনা করিতেন, তবে সেকেন্দর যেমন অরস্তুর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন, আমিও আপনার নিকট তদ্রূপই কৃতজ্ঞ হইতাম। আচ্ছা, বলুন দেখি, রাজা এবং প্রজার ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াও কি আপনার উচিত ছিল না? ইহা এমন একটী বিষয়, যাহা বাদসাহদিগের পক্ষে জানা নিতান্তই দরকারী। আপনি কি কখন স্বপ্নেও আমাকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়াছেন? না ব্যূহচরণা শিখাইয়াছেন?—না আক্রমণ করা শিখাইয়াছেন? সৌভাগ্যবশতঃ আমি এ সমস্ত বিষয়ে আপনার অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞ পুরুষের উপদেশ পাইয়াছি। এখনই এস্থান হইতে বাহির হইয়া সোজা আপনার গ্রামে চলিয়া যাউন। আজ হইতে আর কখনও প্রকাশ করিবেন না যে, আপনি আমাকে বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন। *

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।

---

* বার্ণিয়ার সাহেবের পর্য্যটন পুস্তক।